অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

দ্বাদশ বর্ষ

ফাল্গুন, ১৩২১ হইতে মাঘ, ১৩২২।

সম্পাদক—

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্‌-এ, বি-এল্‌

সহযোগী সম্পাদক

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন

অর্চ্চনা-কার্য্যালয়

১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, (অর্চ্চনা পোষ্ট) কলিকাতা

হইতে শ্রীকৃষ্ণদাস ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্র বার্ষিক

অর্চ্চনা-সম্বন্ধে মতামত।

'অর্চ্চনা' সুপরিচালিত মাসিক পত্রিকা। অর্চ্চনায় সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইতেছে। অর্চ্চনা বাঙ্গালায় শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রসমূহের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত —হিতবাদী।

'অর্চ্চনা' সর্ব্বাংশে ভাল হইয়াছে। অর্চ্চনা সুপরিচালিত হইয়া মাসিকের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে। সাহিত্যে অর্চ্চনার উচ্চ স্থান। অর্চ্চনার বার্ষিক মূল্য পাঁচ সিকা। ইহার গুণ-মূল্যের অনুপাতে পাঁচ সিকা অকিঞ্চিৎকর।—বঙ্গবাসী।

'অর্চ্চনা' পত্রিকাখানি বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। প্রবন্ধগুলি সারগর্ভ ও পাঠ্য।—বসুমতী।

* * এই উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা "অর্চ্চনা" আজ কয় বৎসর ধরিয়া যেরূপ নির্ভীকভাবে বঙ্গ-সাহিত্যের ভাল মন্দ বিচার করিয়া আসিতেছে, যেরূপ অপক্ষপাতে ইহা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, যেরূপ অল্পমূল্যে বিক্রীত হইয়াও সময়ে প্রকাশিত হইতেছে, এরূপ পত্রিকা বর্ত্তমানে একখানিও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অর্চ্চনা বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিবে, সন্দেহ নাই। * * ইহা প্রত্যেক সাহিত্যসেবীরই পাঠ করা উচিত।—সময়।

'অর্চ্চনা' কয়েক বৎসরেই প্রভূত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। "অর্চ্চনা" অনেক মাসিকের আদর্শ হইতে পারে। আলোচ্য সংখ্যার প্রবন্ধগুলি যে কোনও প্রতিষ্ঠাপন্ন মাসিককে অলঙ্কৃত করিতে পারে। 'অর্চ্চনা' ক্ষুদ্র হইলেও অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিকের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। * * এক সংখ্যার এতগুলি সুখপাঠ্য ও সুলিখিত প্রবন্ধের সমাবেশ ঢক্কা-নিনাদী মাসিকসমূহেও দেখিতে পাই না।"—সাহিত্য।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্-এ,বি-এল্ মহাশয় লিখিয়াছেন—মাসিক-সাহিত্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাগজের নাম করা যাইতে পারে। যতগুলি উৎকৃষ্ট পত্রিকা আছে, তাহার মধ্যে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত * * অর্চ্চনা * * প্রভৃতি পুরাতন পত্রিকাগুলি * * প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

অর্চ্চনা—মাসিক পত্রের ভিতর শ্রেষ্ঠতায় ইহা যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। অর্চ্চনার লেখকবর্গের ভিতর কাহাকে রাখিয়া কাহার নাম করিব? সকলেই সুপরিচিত খ্যাত সাহিত্যিক। * * অর্চ্চনা পড়িবার জিনিস, পাঁচজনকে পড়াইবার জিনিস। মাসিক-বিত বাঙ্গালায় 'অর্চ্চনা'র আসন যে অনেক উচ্চে সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতচিত্র।

ARCHANA—The publication is devoted to philosophical and incidentally Bengali interests. &c. &c.—*The Statesman & Friend of India.*

ARCHANA—This monthly magazine is always interesting reading and has a large circle of readers.—*The Indian Daily News.*

ARCHANA—We are glad to find that the Bengali monthly *Archana* has an assured place among the vernacular periodicals of the country and among the organs of Indian public opinion in Calcutta. It makes its appearance with characteristic punctuality. The articles are thoughtful, well-written, interesting reading and bear ample evidence of judicious editing. (Summary of Opinions)—*The Bengalee.*

ARCHANA—It contains many valuable and interesting articles * * This magazine can be recommended highly to the reading public.—*The Telegraph.*

অর্চ্চনা

সিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ বর্ষ]　　ফাল্গুন, ১৩২১　　[প্রথম সংখ্যা।

অর্চ্চনা।

এ জীবন হ'ক চির অর্চ্চনা তোমার,
প্রতি কর্ম্ম হ'ক তব পূজা-উপচার ;
এ প্রতি নিশ্বাসে তব হোমাগ্নি জ্বলুক,
সকল সম্ভোগ সেথা আহুতি পড়ুক ;
পলকে পলকে এই নয়নে আমার
প্রকাশ হউক দীপ তব বন্দনার ;
গন্ধময়ী ধরণীর গন্ধে গন্ধে, তব
আরতির ধূপগন্ধ হ'ক অনুভব ;
জগতের কণ্ঠরব, অনন্ত বিচিত্র,
হ'ক তব মন্দিরের পবিত্র বাদিত্র ;
একাদশ ইন্দ্রিয়ের বিষয় আমার
হ'ক চিরনিবেদিত নৈবেদ্য তোমার ;
প্রসাদের পূতচিহ্নে লাঞ্ছিত এ প্রাণ
তব বাঞ্ছারূপ যূপে যা'ক বলিদান।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

চৈতন্য-চন্দ্রোদয়।

চৈতন্য-চন্দ্রোদয় বৈষ্ণব-যুগে রচিত চৈতন্যদেবের লীলাবর্ণনাত্মক একখানি সংস্কৃত নাটক। নাটকখানি দশ অঙ্কে সমাপ্ত। "পঞ্চাদিকা দশপরাস্তত্রাঙ্কাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ" বিশ্বনাথের সাহিত্য-দর্পণে উল্লিখিত এই বচন হইতে দশ অঙ্কে নাটক-রচনা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র সম্মত বলিয়া বুঝিতে হইবে। এক মহানাটক ব্যতীত দশ অঙ্কের অধিক অঙ্কবিশিষ্ট নাটক সংস্কৃত সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। দশ অঙ্কবিশিষ্ট নাটকই সংস্কৃত সাহিত্যে দীর্ঘতম।

চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকখানি ১৪৯৪ শকাব্দে বিরচিত হয়। নাটকখানির শেষের একটি শ্লোক হইতেই একথা জানিতে পারা যায়। যথা—

"শাকে চতুর্দ্দশ-শতে রবিবাজিযুক্তে
গৌরো হরির্ধরণীমণ্ডল আবিরাসীৎ।
তস্মিংশ্চতুর্নবতিভাজি তদীয় লীলা-
গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ।"

অর্থাৎ "১৪০৭ শকে গৌরহরি ধরণীমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১৪৯৪ শকাব্দে কাহারও বদন হইতে তাঁহার লীলাবর্ণনাত্মক এই গ্রন্থ আবির্ভূত হইল।" প্রেমদাস বাঙ্গালা পদ্যে এই নাটকের অনুবাদ করিয়াছেন।

নাটক রচয়িতার নাম কর্ণপূর। ইহার অপর নাম পরমানন্দ দাস সেন। ইহার পিতার নাম শিবানন্দ সেন। শিবানন্দ চৈতন্যদেবের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। গঙ্গাতীরে কাঞ্চনপাড়ায় ইহার বসতি ছিল। প্রেমদাস চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ের নবমাঙ্কের ভাবানুবাদে লিখিয়াছেন—

"কাঞ্চনপাড়া বলি গ্রাম আছে গঙ্গাতীরে।
শিবানন্দ সেন তথা প্রভু সেবা করে॥
সেই শিবানন্দ হন অতি ভাগ্যবান্।
সর্ব্বকালে কায়মনে চৈতন্যের ধ্যান॥"

এক সময়ে চৈতন্যদেব শিবানন্দকে বলিয়াছিলেন এবার তোমার যে পুত্র হইবে তাহার নাম পরমানন্দ দাস রাখিবে। পরে পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে শিবানন্দ তাহার ঐ নামই রাখেন। চৈতন্যদেব যখন নীলাচলে তখন শিবানন্দ পুত্রসহ চৈতন্যদেবকে দর্শন করিতে উপস্থিত হন। চৈতন্যদেব বালকের নাম

জিজ্ঞাসা করাতে শিবানন্দ বলিলেন "আপনার আজ্ঞানুসারে ইঁহার পরমানন্দ দাস নাম রাখিয়াছি।" চৈতন্যদেব উপহাস করিয়া বলিলেন "পরমানন্দ দাস না পুরীদাস?" এই বলিয়া চৈতন্যদেব নিজ দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠ বালকের মুখে প্রদান করিলেন। বালক সাগ্রহে তাহা লেহন করিতে লাগিল। শিবানন্দও আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কর্ণপুরের শৈশবজীবনের এই একটিমাত্র কাহিনীই প্রচলিত আছে। নিম্নলিখিত বচনগুলি উক্ত কাহিনীর প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইল।

"শিবানন্দ তিন পুত্র গোঁসাইকে মিলাইল।
শিবানন্দ সম্বন্ধে সবার বহু কৃপা কৈল॥
ছোট পুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল।
পরমানন্দ দাস সেন নাম জানাইল॥
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভুস্থানে আইল।
তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিল॥
এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
পুরীদাস বলি নাম ধরিহ তাহার॥
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেইত কুমার।
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হইল তার॥
প্রভু আজ্ঞা ধরিল নাম পরমানন্দ দাস।
পুরীদাস করি প্রভু করে উপহাস॥
শিবানন্দ যবে সেই বালক মিলাইলা।
মহাপ্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা॥"

[চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১২শ পরিচ্ছেদ]

"শ্রীকান্ত বলেন প্রভু এই সমাচার।
পরমানন্দ দাস নাম রাখিয়াছ যার॥
গর্ভে যবে ছিলা এই মাতুল-নন্দন।
শ্রীমুখে আপনে তবে কহিলা বচন॥
শিবানন্দ এবার তোমার পুত্র হবে।
পরমানন্দ দাস নাম তাহার রাখিবে॥"

[চৈতন্যচন্দ্রোদয় ভাষানুবাদ, ১০ম অঙ্ক]

"অজ্ঞান তিমির শূর মহা কবি কর্ণপুর
অতি শিশু যখন আছিলা।
প্রভু স্থানে নীলাচলে গেলা চাপি পিতৃকোলে
নেত্র ভরি চৈতন্য দেখিলা॥
গতি হস্ত জানু যুগে, প্রভু পাদ পদ্ম আগে
আনন্দেতে করিল প্রণাম।
দেখি প্রভু হইলা তুষ্ট, দক্ষিণ চরণাঙ্গুষ্ঠ
তার মুখে দিলা ভগবান॥
হস্তে ধরি শ্রীচরণ, অঙ্গুলি চোষেন ঘন
প্রভুর পার্ষদগণ হাসে।
নিজপুত্রে কৃপা দেখি, শিবানন্দ হইয়া সুখী
ঊর্দ্ধবাহু নাচেন হরিষে॥
উচ্ছিষ্ট চরণামৃত শ্রীচৈতন্য কদাচিত
নিজেচ্ছায় না দেন কাহারে।
সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া নিজোচ্ছিষ্ট আনাইয়া
আপনি দিলেন কর্ণপুরে॥"

[প্রেমদাস কৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের ভাষানুবাদ]

কর্ণপুরের বাল্যজীবনের দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একদিন চৈতন্যদেব তাহাকে বারবার "কৃষ্ণ বল" বলিয়াও "কৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করাইতে পারেন

নাই। তখন স্বরূপ চৈতন্যদেবকে বুঝাইলেন "বালক আপনার নিকট কৃষ্ণ-মন্ত্র পাইয়া মনে মনে জপ করিতেছে। ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করা অকর্ত্তব্য বলিয়া মুখ ফুটিয়া বলিতেছে না।"

"সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লঞা আইল।
পুরীদাস ছোট পুত্রে সঙ্গেতে আনিল॥
পুত্রে সঙ্গে লঞা তেহোঁ আইল প্রভুর স্থানে।
পুত্রেরে করাইল প্রভুর চরণবন্দনে॥
'কৃষ্ণ কহ' বলি প্রভু বলে বার বার।
তবু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার॥
শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন কৈল।
তবু সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিল॥
প্রভু কহে 'আমি নাম জগৎ লওয়াইল।
স্থাবর পর্য্যন্ত কৃষ্ণ নাম করাইল॥
ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম কহাইতে।'
শুনিয়া স্বরূপ গোঁসাই লাগিলা কহিতে॥
'তুমি কৃষ্ণনাম মন্ত্র কৈল উপদেশে।
মন্ত্র পাঞা কারো আগে না করে প্রকাশে॥
মনে মনে জপে মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মনোকথা করি অনুমান॥"

[চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা ১৬শ পরিচ্ছেদ]

এই কৃষ্ণমন্ত্র পাইয়া কর্ণপুর 'কৃষ্ণরায়' নামক এক ঠাকুর গৃহে স্থাপন করিয়া তাহার পূজা করিতে লাগিল। এজন্য পিতার সহিত কর্ণপুরের এক কৌতুক-জনক কলহও হইয়াছিল। কারণ শিবানন্দ

"অন্য দেব দেবী কিছু সেবা নাহি করে।
গৌর বিনা কৃষ্ণ নাম মুখে না উচ্চারে॥
কবিকর্ণপুর নামে তাঁর পুত্র হৈল।
কৃষ্ণ-সেবা নিজ-গৃহে প্রকাশ করিল॥
ঠাকুরের নাম রাখিলেন কৃষ্ণরায়।
শিবানন্দ সেন আসি দেখিল তাহায়॥
দেখি শিবানন্দ অতি ক্রোধাবিষ্ট হৈলা।
কর্ণপুর নিজ পুত্রে ভৎর্সিতে লাগিলা॥
অরে মূঢ় কতকাল করিয়া মার্জ্জন।
কাল বর্ণ ঘুচাইয়া কৈল গৌর বর্ণ॥
আরবার সেই কাল আনিলি মন্দিরে।
শিবানন্দ প্রেম কথা কে বুঝিতে পারে॥

[প্রেমদাস কৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের ভাষানুবাদ, ৯ম অঙ্ক]

কর্ণপুর যখন সাত বৎসর বয়স্ক তখন একদিন চৈতন্যদেবের সমক্ষে একটি শ্লোক-রচনা করিয়া উপস্থিত জনসমূহকে বিস্ময়াপন্ন করিয়াছিলেন :

"আরদিন কহে প্রভু 'পড় পুরীদাস।'
এই শ্লোক করি তেঁহো করিল প্রকাশ।
শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥*
সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে লোক চমৎকার মন॥"

[চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১৬শ পরিচ্ছেদ]

* "যিনি গোপীগণের কর্ণে কুবলয়ের ন্যায়, চক্ষুতে কজ্জলের ন্যায় ও বক্ষে ইন্দ্রনীলমণি হারের ন্যায় ভূষণ হইয়া আছেন, সেই হরি জয়যুক্ত হউন্।"—লেখক।

উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকটি কর্ণপূর রচিত ১০০ শ্লোকাত্মক আর্য্যা-শতকের প্রথম শ্লোকরূপে অধুনা বিরাজ করিতেছে।

উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের আদেশে চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক অভিনয় হয়। রথযাত্রাকালে চৈতন্যদেব পার্ষদসঙ্গে নৃত্যরঙ্গে কত আনন্দের লহরী বহাইয়া দিতেন। কিন্তু তাঁহার লীলা-সংবরণের পর সে সমস্ত আনন্দোৎসব রহিত হওয়াতে রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র গৌরাঙ্গ-লীলাভিনয় দর্শন করিতে উৎসুক হন। তাই তাঁহার আদেশে চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী-বর্ণনাত্মক চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক রচিত ও অভিনীত হয়। নাটকখানির প্রারম্ভে সূত্রধারের বাক্য হইতে এইরূপ অবগত হওয়া যায়—

"এমতি প্রতাপরুদ্র বিলাপ করিয়া।
পুনর্ব্বার কহিলেন মোরে সম্বোধিয়া ॥
সন্ন্যাসীর শিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেমরসে পরিপূর্ণ যাঁর কলেবর ॥
তাঁর গুণরস কোনই প্রয়োগেতে।
আমারে আনন্দ দেহ কহিল তোমাতে ॥
যাহার যাহাতে প্রীতিভাগ বৃদ্ধি পায়।
তাহার বিরহব্যথা সহা নাহি যায় ॥
সে ব্যথা সহিতে এক আছয়ে উপায়।
সুহৃদ্ সকল যদি চিত্ত দেন তায় ॥
সে অনুকরণ কিবা তাঁর গুণগান।
বিরহ ব্যথিত জনে দেখান [illegible]
এই রথযাত্রাকালে শ্রীগৌরাঙ্গ হায়।
নৃত্যরঙ্গ কবিতা পার্ষদ সঙ্গে করি ॥
সে আনন্দ প্রেমোৎসব দেখিতে না পাই।
কেমনে ধরিব প্রাণ রথ পানে চাই ॥
অতএব নটাচার্য্য কর উপকার।
গৌরাঙ্গ লীলায় প্রাণ রাখহ আমার ॥
এমতি প্রতাপরুদ্র করিল আদেশ।
সত্বর হইয়া তার করিল উদ্দেশ ॥"

[চৈতন্য-চন্দ্রোদয় ভাষানুবাদ প্রস্তাবনা]

নাটক-প্রারম্ভে কলি ও অধর্ম্মের কথোপকথন হইতে চৈতন্যদেবের জন্ম সূচিত হইয়াছে। পরে অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যদেবের বাল্য, যৌবন প্রভৃতি কালের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী সুপরিচিত। বঙ্গীয় রঙ্গালয়ে "চৈতন্য-লীলা" নাট্যাভিনয় হইয়াছে তাহাও এই ঘটনারই উপর গঠিত। সেইজন্য আমরা বিস্তৃতভাবে গ্রন্থের বিষয়-বর্ণনা করিতে ক্ষান্ত হইলাম। কর্ণপূর নাটকখানিতে অতীত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার সময় কিন্নর কিন্নরী প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে এই উদ্দেশ্যে বিদ্যাধর মিথুন প্রভৃতির বিষ্কম্ভকে অবতারণা আমাদের সুপরিচিত।

কর্ণপূর চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক ব্যতীত চৈতন্য-চরিত নামক কাব্য, অলঙ্কার-কৌস্তুভ নামক অলঙ্কারগ্রন্থ, আর্য্যশতক, আনন্দ বৃন্দাবন নামক চম্পূকাব্য প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন।

"সপ্ত বৎসরের যবে, কাব্য বর্ণিলেন তবে,
যার নাম চৈতন্য-চরিত ॥
পূর্ব্বে অলঙ্কার যত, অসৎ কথা সুঘটিত
দেখি শুনি ঘৃণা উপজিল।
দিয়া কৃষ্ণলীলা সার, কৈল গ্রন্থ অলঙ্কার
কৌস্তুভ তাহার নাম থুইল ॥
যে বর্ণিলা কৃষ্ণ-লীলা, কর্ণপুর গ্রন্থ কৈলা
আর্য্যাশত হইল তার নাম।
শ্রী আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ নাম গ্রন্থ আর
ব্রজলীলা বর্ণন-প্রধান।
প্রভু কৃপা গুণ দেখি, গজপতি হঞা সুখী
গৌর-লীলা বর্ণিতে কহিল।
শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক অমৃতময়
রাজার বচনে যে করিল ॥"

[চৈতন্য-চন্দ্রোদয় ভাষানুবাদ]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৪৯৪ শকাব্দে চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক বিরচিত হয়। প্রায় দেড়শত বৎসর পরে ১৬৩৪ শকাব্দে প্রেমদাস বাঙ্গলা ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন। * পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে কবিতাতেই ইহার অনুবাদ হয়। অনুবাদের ভাষা পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশগুলি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। প্রেমদাস লিখিয়াছেন, তাঁহার ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি মথুরায় গিয়াছিলেন। তথায় কাম্যকবনে গোবিন্দদেবের মন্দিরাধ্যক্ষ কৃষ্ণচরণ গোস্বামী তাঁহাকে গোবিন্দের ভোগরক্ষণের ভারপ্রদান করেন। প্রেমদাস এই কার্য্যে বহুদিন যাপন করেন। পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে ব্রজধাম হইতে গৃহে আনয়ন করেন। একদিন প্রেমদাস স্বপ্ন দেখেন যে তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈত গোস্বামীর মন্দিরে গিয়াছেন। অদ্বৈত দীর্ঘ ভাগবত পুঁথি হস্তে করিয়া বসিয়া আছেন। অদ্বৈত তাঁহাকে ভাগবত গ্রন্থ দিলেন। এই পর্য্যন্ত স্বপ্নে দেখিবার পরই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহার পর আর একদিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে তিনি যেন নবদ্বীপে গিয়াছেন। সেখানে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে বহু ভক্ত সঙ্গে নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেব বিরাজ করিতেছিলেন। নিত্যানন্দের আজ্ঞায় প্রেমদাস চৈতন্যদেবের পদসম্বাহন করিলেন। ইহার পর তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। এই স্বপ্ন দুইটি হইতেই তিনি যেন চৈতন্যের চরিত লিখিবার আদেশ পাইলেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন—

"স্বপ্ন দেখি এই মত, চৈতন্য আবিষ্ট চিত
চৈতন্য-চরিত্র লিখি সুখে।"

প্রাচীন বহু বাঙ্গলা কাব্য এইরূপ স্বপ্নাদেশে রচিত হয় তাহার প্রমাণ আমরা বিবিধ গ্রন্থে পাইয়াছি। প্রেমদাসের চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ের কাব্যাকারে অনুবাদও তাহার মধ্যে ধরা উচিত।

---

* "ষোলশত চৌত্রিশ শকে, লৌকিক ভাষাতে সুখে
প্রেমদাস করিল লিখন।"

প্রেমদাস নিজের নিম্নলিখিত পরিচয় দিয়াছেন। প্রেমদাসের বৃদ্ধ প্রপিতামহ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার নাম জগন্নাথ মিশ্র। কুলনগর গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। তিনি কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম মুকুন্দানন্দ। গঙ্গাদাস নামক মুকুন্দানন্দের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই গঙ্গাদাসের ছয় পুত্র। তন্মধ্যে তিনজন শৈশবে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। গোবিন্দরাম, রামচরণ ও পুরুষোত্তম নামক তিন পুত্র জীবিত থাকে। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরুষোত্তম মিশ্রই পরে প্রেমদাস নামে পরিচিত হন। প্রেমদাস তাঁহার গুরুদত্ত নাম। গুরু তাঁহাকে সিদ্ধান্তবাগীশ পদবীও দিয়াছিলেন।

চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকখানির ন্যায় চৈতন্যদেবের লীলাবর্ণনাত্মক আরও একখানি নাটকের উল্লেখ বৈষ্ণবগ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বঙ্গদেশীয় এক ব্রাহ্মণ চৈতন্যদেবের লীলা বর্ণনা করিয়া একখানি নাটক লিখিয়া চৈতন্যদেবকে শুনাইতে যান। চৈতন্যদেব তখন নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রথমে ভগবানাচার্য্য নাটকখানি শ্রবণ করিলেন। পরে অনেক বৈষ্ণবই তাহা শ্রবণ করিল। সকলে চৈতন্যদেবকে তাহা শুনাইতে উৎসুক হইলেন। কিন্তু নিয়ম ছিল যে যতলোকে গীত, শ্লোক প্রভৃতি রচনা করিয়া আনিত তাহারা সকলে প্রথমে স্বরূপ গোস্বামীকে তাহা পাঠ করিয়া শুনাইত। তাঁহার ভাল লাগিলে পরে চৈতন্যদেবকে তাহা শুনান হইত। কেননা

"রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্তবিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ।"

[চৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ]

ভগবানাচার্য্য স্বরূপকে এই বঙ্গদেশীয় কবির নাটক শ্রবণ করিতে বলিলে স্বরূপ প্রথমে সম্মত হইলেন না।

"স্বরূপ কহে তুমি গোপ পরম উদার। ভক্তি সিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার॥
যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার॥ ব্যাকরণ নাহি জানে না জানে অলঙ্কার।
যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে হয় রসাভাস। নাটকালঙ্কার জ্ঞান নাহিক যাহার।
সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥ কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
রস রসাভাস যার নাহি এ বিচার। বিশেষ দুর্গম এই চৈতন্য-বিহার॥"

[চৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ]

শেষে ভগবানাচার্য্যের একান্ত আগ্রহে দুই তিন দিন বলিবার পর স্বরূপ সকলকে লইয়া নাটক শুনিতে বসিলেন। কবি নাটকের নান্দীশ্লোক পাঠ করিলেন—

"বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥" *

এইটুকু শুনিয়াই স্বরূপ বলিলেন :—

"আরে মূর্খ আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
দুই ত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস॥
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁরে কৈলি জড় নশ্বর প্রাকৃতকায়॥...
আর এই করিয়াছ পরম প্রমাদ।
দেহদেহিভেদ ঈশ্বরে কৈল অপরাধ॥"

[চৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ]

এই কথা শুনিয়া কবি অধোবদন হওয়াতে স্বরূপ তাঁহাকে ভাগবত পাঠ করিতে ও ভক্তগণের সঙ্গ করিতে উপদেশ দিলেন। এবং কবির লজ্জা দূর করিবার জন্য ঐ শ্লোকেরই অপর অর্থ করিয়া তাহার দোষহীনতা প্রতিপন্ন করিলেন।

"জগন্নাথ হন কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ।
কিন্তু ইঁহ দারুব্রহ্ম স্থাবর স্বরূপ॥
তাঁহা সহ আত্মতা একরূপ হঞা।
কৃষ্ণ এক তত্ত্বরূপ দুই রূপ হঞা॥
সংসারতারণ হেতু যেই ইচ্ছাশক্তি।
তাহার মিলন কহি একেতে ঐছে প্রাপ্তি॥
সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর জঙ্গমরূপে কৈল অবতার॥
জগন্নাথের দর্শনে খণ্ডায়ে সংসার।
সব দেশের সব লোক নারে আসিবার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দেশে দেশে যাইয়া।
সব লোক নিস্তারিল জঙ্গম ব্রহ্ম হইয়া॥"

[চৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ]

এই ব্যাখ্যা শুনিয়া কবির অভিমান দূর হইল।

"তবে সেই কবি সবার চরণে পড়িয়া।
সবার শরণ লইল দন্তে তৃণ লইয়া॥"

তখন স্বরূপ তাহাকে চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন ও কবি সর্ব্বত্যাগী হইয়া নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

* "কনকবর্ণধারী যিনি পদ্মপলাশলোচন জগন্নাথদেবের সহিত একাত্মভাবপ্রাপ্ত হইয়া, অসংখ্য জড়প্রকৃতি লোকের চৈতন্য-সম্পাদন করিতে এই (নীলাচলে) আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেব তোমার মঙ্গল করুন।"—লেখক।

নববর্ষে।

কে আজ লাবণ্য-ধারা এত ধরা-অঙ্গে দিয়াছে ঢালিয়া,
শান্ত নীল আকাশের তলে স্নিগ্ধ চন্দ্র রেখেছে জ্বালিয়া!
লভিল কাহার কাছে আজি কুহু-মন্ত্রে দীক্ষা পিকবর,
সহসা শিখায়ে দিল কে বা ভ্রমরেরে উন্মাদক স্বর!
কাহার পরশে অকস্মাৎ শস্য-শীর্ষ শিহরি' উঠিল,
কা'র অর্চ্চনার তরে আজ বন-মাঝে কুসুম ফুটিল!
আম্র-মুকুলের গন্ধে কে বা সমীরে করিল অন্ধ আজ,
কা'র প্রেরণায় প্রীতি-ভরে প্রকৃতি পরিল নব সাজ!
অনিন্দ্য সুন্দর যিনি এই অভিনব আনন্দের মূল,
বিরাজ করিছে বিশ্ব-মাঝে যাঁর এত ঐশ্বর্য্য অতুল!
লভিয়া এ নববর্ষে সেই দেবতার আশীর্ব্বাদ-বর,
মোদের এ সাধের 'অর্চ্চনা' সিদ্ধি-পথে হ'ক অগ্রসর!

শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য।

বোপদেব।

যে দেশে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের মধ্যে কাহার সহিত কাহার কন্যার শুভ-পরিণয় হইয়াছে, কুলজ্ঞ ঘটকেরা লিখিয়া রাখিয়াছেন, যে দেশের রাজাদিগের ইতিবৃত্ত চারণের মুখে নিত্য উদ্‌গীত হইত, যে দেশের অন্যতম আইন-কর্ত্তা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য দান-পত্রে পর্য্যন্ত দানকর্ত্তার পূর্ব্বপুরুষের ও নিজের গুণগাথার উল্লেখ করিতে হইবে আইনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, যে দেশের বিবাহে কন্যা ও বরের গোত্র প্রবরের সহিত তিন তিন পুরুষের উল্লেখের ব্যবস্থা, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে, সপিণ্ডীকরণে ও পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধে ষট্‌পুরুষ উল্লেখের শাস্ত্রীয় আদেশ, সে দেশে লিখিত ইতিহাস ছিল না, বিশ্বাস করিতে পারি না। ভারতের ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে গৌরব করিবার যেমন অন্য অনেক নিদর্শনই আজ বিলুপ্ত বা অদৃশ্য, ইতিহাসেরও হয়ত সেইরূপ দশা ঘটিয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের বহু গবেষণায় তাম্রশাসন, শিলালিপি, স্তম্ভ ও পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধারে একান্ততঃ বিশুদ্ধ না হইলেও ভারতীয় রাজন্যবর্গের ইতি-

াসের অরণ্যাচ্ছন্ন ঘণ্টাপথ লোকলোচনের সমীপে প্রদর্শিত হইয়াছে। বরেন্দ্র ানুসন্ধান-সমিতির দৃষ্টান্তে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের আয়াস-লব্ধ বলবৎ প্রমাণ দ্বারা কালে সেই প্রশস্ত রাজমার্গ অরণ্যোন্মুক্ত ও আবর্জ্জনা-শূন্য হইবে,—আশা করা যায়। কিন্তু যাঁহারা ভারত-গগনে এক একটী উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় সমুদিত হইয়া নিজের কিরণ-ধারায় আসমুদ্র ভারতভূমিকে আলোকিত করিয়াছিলেন, অস্তমিত হইয়াও অদ্যাপি যাঁহারা শুধু ভারতের নয়, সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি-আকর্ষণে সমর্থ রহিয়াছেন, সেই সকল মহর্ষিকল্প মনীষীদিগের জীবনচরিত দূরের কথা, কে কোন্ দেশে, কে কোন্ বংশে বা কে কোন্ বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও আমাদিগের জানিবার উপায় নাই। শিলালিপি, তাম্রফলক অচেতন হইয়াও পিতামহীর ন্যায় দানের প্রসঙ্গ তুলিয়া যুদ্ধবিগ্রহের উল্লেখ করিয়া পুরাতন প্রসঙ্গ, রাজচরিত আমাদিগকে শুনাইতেছে। আর যাঁহারা ক্রয়বিক্রয়ের অনুপযোগী অমূল্য রত্নরাজি সমস্ত ভূমণ্ডলে বিকিরণ করিয়া গিয়াছেন, অজস্র দান করিয়া সমস্ত মানবমণ্ডলীকে কৃতার্থ করিয়াছেন, চৈতন্যবিশিষ্ট হইয়াও আজ মানব তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না।

আজ বঙ্গদেশ হইতে কলাপ পাণিনীয়ের প্রায় তিরোধান হইয়াছে, দেখিতে দেখিতে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছে। সেই মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের রচয়িতা কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও কোন্ বর্ণ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন—এই প্রশ্নদ্বয়ের প্রকৃত প্রত্যুত্তর দিতে কি কেহ সমর্থ রহিয়াছেন? এ প্রশ্নের উত্তর প্রবাদে নাই, তাম্র-শাসনে নাই, শিলাগাত্রে নাই, তাঁহার কৃত ব্যাকরণ পুস্তকেও নাই। পুস্তকে স্পর্দ্ধার কথা অনেক আছে, প্রকৃত ইতিবৃত্তটুকু নাই। একমাত্র বৃহস্পতি যেমন নাকনগরীকে, একমাত্র নাগরাজ অনন্ত যেমন পাতালপুরীকে জ্ঞানচ্ছটায় পণ্ডিত-নিবাস-ভূমি বলিয়া উদ্ভাসিত করিতেছেন, একমাত্র বোপদেবও তেমনই এই পৃথিবীমণ্ডলীকে পণ্ডিতের লীলানিকেতন বলিয়া অলঙ্কৃত ও উদ্ভাসিত করিতেছেন, পণ্ডিতের গর্ব্ব-পর্ব্বতের বজ্র বোপদেব জয়যুক্ত হউন—ইত্যাদি আছে, (১) নাই তাঁহার প্রকৃত পরিচয়। আমরা

(১) "দ্যৌর্বাচম্পতিনেব পন্নগপুরী শেষাহিনেবাভবৎ
যেনৈকেন বিদুষ্মতী বসুমতী মুখ্যেন সংখ্যাবতাম্।
সোঽয়ং ব্যাকরণার্ণবৈতরণিশ্চাতুর্য্যচিন্তামণি
র্জীয়াৎ কোবিদগর্ব্বপর্ব্বতপবিঃ শ্রীবোপদেবঃ কবিঃ॥"

আর তাঁহার পরিচয়ের জন্য যৎকিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিব ও তাহা দ্বারা পাঠক পাঠিকার সরস হৃদয় ও সরস সময়ের সহিত একটী নীরস বিষয়ের যোজনা করিবার জন্য যত্ন চেষ্টা করিব।

কল্যাণভাজন শ্রীমান্ পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন, মুগ্ধবোধকার বোপদেবকে বৈদ্যজাতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রীতিভাজন স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর, তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বোপদেবকে দক্ষিণাপথবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপাদনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। দেউস্কর মহাশয়ের প্রধান যুক্তি, অদ্যাপি মহারাষ্ট্রে বোপদেবের বংশধর ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ও যখন কুলাচার্য্যের লিখিত বোপদেবের বংশতালিকা দিয়াছিলেন, তখন আমরা এই উভয়ের মধ্যে কোনটীকেই বলবৎ প্রমাণ বলিতে পারি না। তবে একটী লিখিত, অপরটী মৌখিক—এইজন্য যদি উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ তারতম্য থাকে, সে বিচার আমি করিতে প্রস্তুত নই, পাঠক পাঠিকা করিবেন।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পরিশেষে বোপদেব আত্ম-পরিচয় দিতে যাইয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও সেইরূপ আপত্তিই উদ্ভাবিত হয়। বোপদেবের সেই শ্লোকটী এই,—

"বিদ্বদ্ধনেশ্বরছাত্রো ভিষক্‌কেশবনন্দনঃ।
মুগ্ধবোধং চকারেদং বিপ্রো বেদপদাস্পদম্॥"

ইহার বাঙ্গালা অর্থ এই যে, পণ্ডিত ধনেশ্বরের ছাত্র, ভিষক্ (বৈদ্য) কেশবের পুত্র, বেদপদের আশ্রয় বিপ্র বোপদেব, এই মুগ্ধবোধ রচনা করিয়াছিলেন। "ভিষক্" পদটী কেশবেরও বিশেষণ হইতে পারে, "বেদপদাস্পদ" পদটী বোপদেবেরও বিশেষণ হইতে পারে, মুগ্ধবোধেরও বিশেষণ হইতে পারে।

এই উদ্ধৃত শ্লোক দেখিলে সকলেরই সন্দেহ হইবে যে, তিনি বৈদ্য হইলে কি করিয়া "বেদপদাস্পদ" বলিয়া ও "বিপ্র" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন? সর্ব্বত্র সকলেরই অবগতি আছে যে, ব্রাহ্মণেরই বেদবিদ্যা অধিকৃত ও বিপ্র শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ। আবার বেদপদাস্পদ ও বিপ্র শব্দ দেখিয়াই বা কি করিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়? তিনি নিজের বা পিতার "ভিষক্" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ভিষক্ চিকিৎসকেরই নামান্তর। এই সন্দেহ নিবারণের জন্য বোপদেবের লিখিত অন্য কোন পুস্তকেও যখন সুস্পষ্ট কোনও পদ প্রদত্ত হয় নাই, তখন এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়াই ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের আশ্রয়ে সিদ্ধান্তের অবতারণা করিতে হইবে।

বৈদ্যজাতীয়েরা নিজেকে অম্বষ্ঠ জাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের ঊঢ়া ভার্য্যা বৈশ্য-কন্যার গর্ভজাত; সুতরাং তাহার বেদে অধিকার আছে। বিশেষতঃ "অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং" শাস্ত্রে অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট। চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ নামে আখ্যাত, সুতরাং বেদের অন্তর্গত। এজন্য চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ যে, অম্বষ্ঠের অধিকৃত ও আয়ত্ত, সে সম্বন্ধে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। বৈদ্যমাত্রেরই যখন নিজেরা অম্বষ্ঠ —এই বিশ্বাস, তখন বোপদেবেরও যে সে বিশ্বাস ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। সুতরাং "বেদপদাস্পদং" এই মাত্র দেখিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিতে পারা যায় না। তিনি "বেদাস্পদং" (বেদের আশ্রয়—বেদের স্থান) না বলিয়া "বেদ-পদাস্পদং" কেন বলিলেন, সে বিষয়েও চিন্তা করা কর্ত্তব্য। তিনি বেদে মহাপণ্ডিত ছিলেন, একথা বলেন নাই, বেদে ব্যবহৃত সমস্ত পদগুলি বেদোক্ত প্রয়োগগুলি জানিতেন, এই মাত্র বলিয়াছেন। পাণিনীয় বৈদিক প্রক্রিয়া ও যাস্কের নিরুক্ত জানিলেই ত বৈদিক শব্দগুলি জানা যায়, আর বেদ অধ্যয়নের প্রয়োজন করে না। মহর্ষি কলাপীর ন্যায় বোপদেবও নিজের ব্যাকরণ মুগ্ধবোধে বৈদিক প্রক্রিয়ার জন্য সূত্র রচনা করিয়া পাণিনির ন্যায় পৃথক্ একটি প্রকরণের সৃষ্টি করেন নাই। এজন্য কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, বোপদেব বৈদিক প্রক্রিয়া জানিতেন না, তাই তিনি বলিয়াছেন,—আমি সমস্ত বৈদিক প্রক্রিয়াই জানি, প্রয়োজন নাই বলিয়া এস্থানে সেরূপ প্রকরণ নিবদ্ধ করি নাই।—এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে কোনওরূপ দোষ হয় না।

তন্ত্র, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য—সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ অর্থে বিপ্রশব্দের ব্যবহার আছে। বৃহস্পতি ও নাগরাজের ন্যায় মহাপণ্ডিত বেদপদজ্ঞ বোপদেব, কোন্ অর্থে "বিপ্র" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, বিচার করা কর্ত্তব্য। বেদে "বিপ্র" শব্দের প্রয়োগ আছে; যাস্ক, নিরুক্তে সেই "বিপ্র" শব্দের অর্থ করিয়াছেন, "মেধাবী"। পৃথিবীর বৃহস্পতি, পৃথিবীর নাগপতি বোপদেব যে যাস্কের নিরুক্ত জানিতেন না, একথা বলিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ তিনি "বিপ্রঃ" বলিয়াই তাহার অব্যবহিত পরেই "বেদপদাস্পদং" এই বিশেষণ পদটীর কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহা দ্বারা তিনি সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইতেছেন, —আমি লৌকিক "বিপ্র" শব্দের উল্লেখ করি নাই, "মেধাবী" অর্থে ব্যবহৃত বৈদিক "বিপ্র" শব্দের কীর্ত্তন করিয়াছি। এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেই বা কিরূপ দোষ হয়, বুঝি না।

যদি প্রমাণান্তর দ্বারা বোপদেবকে বৈদ্য বলিয়া অবধারণ করা যায়, তাহা হইলে উপরি উক্ত প্রতিকূল পদদ্বয়ের ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সামঞ্জস্য স্থাপন করা যাইতে পারে। কিন্তু বোপদেব বৈদ্য ছিলেন, তাহার প্রমাণান্তর কি? মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ পৃথক্ পৃথক্ জাতির জন্য পৃথক্ পৃথক্ জীবিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সেই জীবিকার নামেও সেই সেই জাতির নাম হইয়াছে, সেই সেই জাতির নামেও সেই সেই জীবিকার নাম হইয়াছে। এই জন্যই ক্ষত্রিয়ের নাম রাজা, বৈশ্যের নাম বণিক্ হইয়াছে। এই জন্যই তন্তুবায়, মালাকার, কুম্ভকার, সূত, স্থপতি, তৈলিক, তাম্বূলিক প্রভৃতি শব্দগুলি সেই সেই ব্যবসায়ী বিশেষ বিশেষ জাতিকে বুঝাইতেছে। সেইরূপ চিকিৎসাব্যবসায়ী জাতিবিশেষকে "বৈদ্য," "ভিষক্" ও "চিকিৎসক" শব্দেও বুঝা যায়। অন্য জাতি সেইরূপ ব্যবসায় করিলে সেই সকল শব্দ তাহাতে প্রযুক্ত হইত কি না, সন্দেহ। ব্রাহ্মণের চিকিৎসা ব্যবসায় গর্হিত। ভগবান্ মনু, তুল্যরূপে চিকিৎসা ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণকে অপাঙ্‌ক্তেয় করিবার জন্য ব্যবস্থা দিয়াছেন ও ব্রাহ্মণ চিকিৎসকের অন্ন অভোজ্য মধ্যে পরিগণিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেবল বঙ্গদেশ নয়, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশেও মনুর ব্যবস্থা বেদবৎ আদৃত, পূজিত ও আচরণীয় হইয়া আসিতেছে। এই অনাচারের দিনেও কেহ শাস্ত্রগর্হিত আচারের সমর্থন করিতে সাহস করে না, নিজে অনাচার করিলেও অম্লানমুখে তাহা প্রচার করে না, প্রচারিত হইলেও লজ্জিত হয়। আর যে সময়ে সমাজে শাস্ত্রে বিশ্বাস ছিল, শাস্ত্রের বিধি নিষেধগুলি কঠোরতার সহিত সমাজে প্রতিপালিত হইত, শাস্ত্রজ্ঞ বোপদেব ব্রাহ্মণ হইয়া সেই সময়ে ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রতিষিদ্ধ শাস্ত্রগর্হিত তাৎকালিক সমাজে অবশ্য অতিনিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কি করিয়া করিলেন, বুঝিতে পারি না। ধার্ম্মিক রাজসঙ্কুল সেই স্বাধীন দেশে বাস করিয়া অন্নাভাবের তাড়নায় ভূবৃহস্পতি ও ভূনাগেন্দ্র বোপদেবের যে এইরূপ কুৎসিত জীবিকা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল,—এ সিদ্ধান্তের সাধক কোনওরূপ প্রমাণ আমরা পাই না। আবার তিনি সেইরূপ জীবিকার অনুষ্ঠানে লজ্জিত না হইয়া দুন্দুভিনিনাদে তাহা জগতে শুধু তৎকালের জন্য নয়, অনন্ত কালের জন্য অক্ষয়রূপে বিঘোষিত করিয়া গিয়াছেন। সেই সঙ্গে পূজনীয় পিতৃদেবের, পূজনীয় গুরুদেবেরও সেই দুরপনেয় কলঙ্ক রাষ্ট্র করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, এ সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে আমরা একান্ত অসমর্থ। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের শেষে লিখিত কবিতা কয়েকটী বোপদেবের নিজের রচিত কি না,

নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না, তাঁহার পুত্রের হইতে পারে, শিষ্যের হইতে পারে, বন্ধুর হইতে পারে, বা অন্যের ও হইতে পারে। তাৎকালিক বিদ্বৎসমাজ তাঁহাকে এই বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন,—ইহাও হইতে পারে। বোপ-দেবের না হইলেও বোপদেব যখন বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সময়ে এই কবিতা রচিত; কারণ, কবিতায় "জীয়াৎ" পদ আছে। সুতরাং বোপদেবের পুত্র হউক, ছাত্র হউক, বন্ধু হউক, বা আর কেহ হউক, অথবা বিদ্বৎসমাজ হউক, যাহারই রচিত এই কবিতা হউক, বোপদেব ব্রাহ্মণ হইলে উল্লিখিত ব্যক্তি অনুসারে কেহই তাঁহার চিকিৎসাবৃত্তিরূপ কলঙ্কের উল্লেখ করিতে অগ্রসর হইতেন না।

বিদ্বৎসমাজে বোপদেবের খ্যাতিপ্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। সে সময়ের সমস্ত বিদ্বৎসমাজ একবাক্যে তাঁহাকে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতেন। কেবল এই কবিতা দেখিয়াই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই নাই। মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বিরচিত পুস্তকরাজ শ্রীমদ্ভাগবত যে বোপদেবের নির্ম্মিত বলিয়া একটা কিংবদন্তীর প্রচার আছে, তাহার মূলে—সেইরূপ কল্পনার মূলেও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জ্যোতিঃস্ফুরণ আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। আমি ব্রাহ্মণ হইয়াও এইরূপ মহাপ্রতিভাশালী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বোপদেবকে ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত করিয়া ব্রাহ্মণসমাজের গৌরব-ঘোষণায় অসমর্থ হইতেছি। সত্যের অনুরোধে নিরতিশয় দুঃখের সহিত বলিতেছি,—তিনি ব্রাহ্মণ নহেন—জাতিতে বৈদ্য ছিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

ন্যায়রত্নের জীবন-কথা

আমি "অর্চ্চনা"র পরমপূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা লিখিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের জীবনে এমন কোনও ঘটনা-বৈচিত্র্য নাই, যাহার সমাবেশে সে জীবনী বেশ সরস হইয়া উঠিবে। জগদীশ্বরের ব্যবস্থিত স্বভাবসিদ্ধ সুখে দুঃখেই ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতের পবিত্র জীবন অতিপাতিত হয়। ন্যায়রত্ন মহাশয় অতি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলেও তাঁহার জীবনের কোনও অংশে ঘটনা-পরম্পরার কোনও ঘাত প্রতিঘাত উৎপন্ন হয় নাই যে, তাহার আকর্ষণে পাঠক পাঠিকার চিত্তে সবিশেষ একাগ্রতা আনিতে সমর্থ হইব। সুতরাং সে বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইলে "অর্চনা"র পাঠক পাঠিকার নিকটে যেন ক্ষমার্হ হই, এই জন্যই এ ক্ষুদ্র ভূমিকার অবতারণা।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জন্মস্থান। যে বংশ 'ভাটপাড়ার ঠাকুর' বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই বশিষ্ঠ-বংশে ৺সীতানাথ বিদ্যাভূষণের ঔরসে ১২৩৬ সালের ২৮শে ভাদ্র অনন্ত চতুর্দ্দশীর দিন ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পিতা বিদ্যাভূষণ মহাশয়, স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার দুই বিবাহ ছিল, জ্যেষ্ঠা পত্নীর নাম বিমলা, কনিষ্ঠা পত্নীর নাম হরমোহিনী। বিমলাদেবীর গর্ভে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জন্ম। ৺তারাচরণ তর্করত্ন ও ৺অন্নদাচরণ তর্কভূষণ নামে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের আরও দুই কনিষ্ঠ সহোদর ইহাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হরমোহিনী দেবীর গর্ভে ৺অভয়াচরণ বিদ্যারত্নের জন্ম হয়। ৺তারাচরণ তর্করত্ন, জ্যেষ্ঠ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট নব্য প্রাচীন সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইনি কাশীনরেশ মহারাজ ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ সিংহের সভাপণ্ডিত-পদ লাভ করিয়া জীবনের মধ্যদশাতেই কাশীবাস করিতে বাধ্য হয়েন। ৺তারাচরণ তর্করত্ন মহাশয়, পরমহংস বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকটে পূর্ব্বোত্তর মীমাংসা প্রভৃতি অন্যান্য দর্শন শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহাঁর অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল; ইনি প্রশ্নমাত্রেই সমস্যাপূরণ করিতে পারিতেন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয় এতদিন কাশীনরেশের সভাপণ্ডিতরূপে কাশীতেই ছিলেন, অল্পদিন হইল, বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজের সাগ্রহ অনুরোধে তাঁহার প্রধান সভাসদের পদ গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধমানে বাস করিতেছেন। তর্করত্ন মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক, সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ। ৺তারাচরণ তর্করত্ন মহাশয়, পাণ্ডিত্য-গৌরবে কাশীর তাৎকালিক বিদ্বৎসমাজে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, ৺সীতারাম শাস্ত্রী প্রমুখ কাশীর অনেক খ্যাতনামা অধ্যাপক তর্করত্ন মহাশয়ের ছাত্র।

সিদ্ধপুরুষ ৺নারায়ণ ঠাকুরের বংশে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জন্ম। কান্যকুব্জবাসী যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ গদাধর ঠাকুর বঙ্গদেশে বাস করেন। ইনি ন্যায়রত্ন মহাশয় হইতে একাদশ পুরুষ উর্দ্ধতন। বঙ্গীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশে ন্যায়-রত্ন মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষের আদি-নিবাস স্থাপিত হয়।

৺গদাধর ঠাকুর প্রথমে বকদ্বীপ বা বগ্‌ড়ী নামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জনার্দ্দন ঠাকুর, পাঠান অত্যাচারে বকদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া প্রতাপাদিত্যের নিরুপদ্রব রাজ্যের অন্তর্গত ধূলিপুর নামক স্থানে উঠিয়া আইসেন। ধূলিপুর, বর্ত্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা সব্‌ডিভিসনের অধীন। ৺নারায়ণ ঠাকুর, জনার্দ্দন ঠাকুরের পুত্র। ৺নারায়ণ ঠাকুর তপস্যায় এতদূর সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি ধূলিপুর হইতে প্রত্যহ ভট্টপল্লীতে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। ভাটপাড়ার ভূম্যধিকারী হালদার বংশীয়গণ তাঁহার এই অলৌকিক তপঃপ্রভাব অবগত হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার পরে অন্যান্য ব্রাহ্মণ সন্তানেরাও তাঁহার শিষ্য হন। শিষ্যগণ ভট্টপল্লীর গঙ্গাতীরে গুরুর একটী তপস্যাস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেন। নারায়ণ ঠাকুর তখন্ হইতে অধিক সময় সেইস্থানেই থাকিতেন, কচিৎ ধূলিপুরে যাইতেন। পরে ভট্টপল্লীতে তাঁহার গঙ্গালাভ হইলে তাঁহার পুত্র রামনাথ ঠাকুর, ধূলিপুর হইতে সপরিবারে ভাটপাড়ায় বাস করিতে আসিলেন। ন্যায়-রত্ন মহাশয় হইতে অষ্টম পুরুষ পূর্ব্বে যজুর্ব্বেদী বশিষ্ঠগোত্রীয়দিগের ভট্টপল্লীতে বাসস্থান স্থাপিত হয়।

ন্যায়রত্ন মহাশয় যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তখন ভট্টপল্লীর বাশিষ্ঠগণ, প্রত্যেকেই অশূদ্র প্রতিগ্রহ, মৎস্য মাংস বর্জ্জন, সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপন প্রভৃতি নানা সাত্ত্বিক আচারে বিভূষিত ছিলেন। এখন অবশ্য এই সকল নিয়ম অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া আসিতেছে।

পঞ্চম বর্ষ বয়সে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের হাতে-খড়ি হয়। বিদ্যারম্ভ দিনে বালকের হাত ধরিয়া প্রথমতঃ "শ্রীদুর্গা"—এই ত্র্যক্ষরী মহামন্ত্র লেখান হয়; তদবধি ন্যায়রত্ন মহাশয়, "শ্রীদুর্গা" না লিখিয়া কখনও এক অক্ষর লেখেন নাই। দলিল পত্রাদিতে নাম স্বাক্ষর কালে অন্য কাগজে "শ্রীদুর্গা" লিখিয়া পরে যথা-স্থানে নাম লিখিতেন।

অক্ষর পরিচয়াদির পর ন্যায়রত্ন মহাশয়, ভট্টপল্লীর তাৎকালিক সর্ব্বপ্রধান বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিক ৺জয়রাম ন্যায়ভূষণের নিকট সুপদ্ম ব্যাকরণ পড়িতে

আরম্ভ করেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত হইলে ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকটেই তিনি সাহিত্য ও অলঙ্কার অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত নানা কাব্যের বহু শ্লোক তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয়, কাব্যের মধ্যে "নৈষধচরিতে"'র অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। "নৈষধের" অধিকাংশ কবিতা তিনি মুখে বলিতে পারিতেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিতেন, "নৈষধীয় রীতি অবলম্বন না করিলে খণ্ড কবিতা শ্রুতিমধুর হয় না; এইজন্য পরবর্ত্তী অধিকাংশ গ্রন্থকারের কবিতাতে নৈষধীয় পদ্ধতিই অবলম্বিত হইয়াছে। আমি নিজেও নৈষধকার শ্রীহর্ষের অনুকরণেই সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়া থাকি।"

গৌতম গোত্রীয় ৺কৃষ্ণধন ভট্টাচার্য্যের অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা ৺সুপ্রভা দেবীর সহিত চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিবাহ হয়। পত্নী সুপ্রভা দেবী রূপে গুণে লক্ষ্মী ছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ৭০ বৎসর বয়সের সময় ভট্টপল্লীতে তাঁহার পত্নীর গঙ্গালাভ হয়। ন্যায়রত্ন মহাশয় তখন কাশীতে ছিলেন।

ভট্টপল্লীর তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ৺যদুরাম সার্ব্বভৌমের নিকটে ১৯ বৎসর বয়সের সময়ে ন্যায়রত্ন মহাশয়, ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। বাল্যকালে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কোষ্ঠী দেখিয়া তাঁহার পিতাকে একজন জ্যোতিষী বলিয়াছিলেন যে, "আপনার পুত্রকে ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে দিবেন না, ইহার স্থূলবুদ্ধি-যোগ আছে।" ইহা শুনিয়া অবধি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেই অধিক আগ্রহ হয়। এইজন্য ব্যাকরণাদি পাঠের পর শাস্ত্রান্তর না পড়িয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়, ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নেই অবহিত হইয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিতেন, "ন্যায়শাস্ত্র আরম্ভ করিয়াই আমি ভাবিতাম, 'আমিও শ্রীরাম শিরোমণি, রামদাস তর্কবাচস্পতি, হলধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতির ন্যায় দেশমান্য শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক হইব। সমুচিত পরিশ্রম করিলে কেন সেরূপ হইতে পারিব না?—তাঁহারাও ত এক সময়ে আমারই মতন বালক ছিলেন, একনিষ্ঠতার প্রভাবেই ত ন্যায়শাস্ত্রে এইরূপ কৃতবিদ্য হইয়াছেন।"

বাল্যকাল হইতেই হৃদয়ে এইরূপ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল বলিয়াই তদনুরূপ কার্য্য করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়, দেশের বরণীয় হইয়া গিয়াছেন। পাঠাবস্থা হইতেই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বুদ্ধি প্রতিভা দর্শনে তাৎকালিক অধ্যাপকবৃন্দ বিস্মিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে ৺হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ভট্টপল্লীসমাজের প্রাধান্য-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এক সময়ে নিমন্ত্রিত হইয়া বাকুলায়

গিয়াছিলেন। সেই স্থানের সভায় সমাগত পণ্ডিতবৃন্দ নানা সম্ভাষণের পর তর্কচূড়ামণিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "আপনার অভাবে ভট্টপল্লী সমাজের এই প্রাধান্য অন্য কাহারও দ্বারা রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি?" তর্কচূড়ামণি মহাশয় উত্তরে বলিয়াছিলেন, "তিন বৎসর হইল রাখালদাস নামক একটী বালক ন্যায়শাস্ত্র আরম্ভ করিয়াছে, তাহার যদি নির্ব্বিঘ্নে পাঠ শেষ হয়, তবে সে ভট্টপল্লীর প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিবে।"

এই সময় ভট্টপল্লীতে বহু কৃতবিদ্য ছাত্র ও খ্যাতনামা অনেক অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু তর্কচূড়ামণি মহাশয় বালক রাখালদাসের প্রতিভায় এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি অসঙ্কোচে উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিলেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয়, পাঠাবস্থা হইতেই শাস্ত্রীয় বিচারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিয়াছেন। অধ্যয়ন সমাপ্ত না হইতেই তিনি কমল সার্ব্বভৌম, শ্রীরাম শিরোমণি, রামদাস তর্কবাচস্পতি, গোলোক ন্যায়রত্ন প্রমুখ তাৎকালিক নৈয়ায়িক-কেশরীদিগের সহিত সোৎসাহে বিচার করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বিচারে বিজয়-যশোমাল্যে ভূষিত হইয়াছেন। কাশীর সংস্কৃত কলেজের প্রধান নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত জীবনাথ মিশ্র, গঙ্গাতীরে ন্যায়রত্ন মহাশয়কে দেখিতে আসিয়া বলিলেন, "কি মহাপণ্ডিতই দেশ ছাড়িয়া চলিলেন। ৩০।৪০ বৎসর কাল ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেছি, বঙ্গদেশেও বহুদিন ছিলাম। কখনও শুনি নাই যে, ন্যায়রত্ন মহাশয় কোনও শাস্ত্রীয় সভায় বিচারে পরাজিত হইয়াছেন। এখন ত যেন দেশ নৈয়ায়িক শূন্য হইতে বসিয়াছে, যখন রামধন তর্কপঞ্চানন, ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন প্রমুখ সিংহবিক্রমশালী নৈয়ায়িকেরা ছিলেন, তখনও দেখিয়াছি, রাখালদাস ন্যায়রত্ন সভায় আসিতেছেন শুনিলে সকলেরই একটা হৃৎকম্প উপস্থিত হইত।"

২৯ বৎসর বয়সের সময়ে ন্যায়রত্ন মহাশয় অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন। প্রায় ৬০ বৎসর কাল তিনি অধ্যাপনা-ব্রত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। যে কালব্যাধিতে তাঁহার দেহান্ত হইল, সেই ব্যাধির পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তিনি যথানিয়মে অধ্যাপনা করিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত অধ্যাপনা-কার্য্যে এরূপ অদম্য অধ্যবসায়, অন্য কোনও অধ্যাপকের দেখি নাই।

বঙ্গের প্রধান নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম প্রমুখ ভারতের বরণীয় অধ্যাপকগণ, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাত্র। ন্যায়রত্ন মহাশয়, একাধিক ছাত্রের ছাত্রকেও 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত দেখিয়া গিয়া-

ছেন। বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ নৈয়ায়িকই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাত্র-সম্প্রদায়।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ভারতেশ্বরীর 'জুবিলী' মহোৎসবকালে ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রমুখ দেশের ৮ জন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক, সর্ব্বপ্রথম 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। মহামহোপাধ্যায় ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের দেহান্তের পর একমাত্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ই প্রথম মহামহোপাধ্যায় ছিলেন; এইবার প্রথম মহামহো-পাধ্যায়ের অবসান হইল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় যে কেবল অলৌকিক প্রতিভাশালী নৈয়ায়িক ছিলেন, তাহা নহে,—তাঁহার কবিত্বশক্তিও অসাধারণ ছিল। তাঁহার সংস্কৃত কবিতা-রচনার কথা শিক্ষিত-সমাজে সুবিদিত, কিন্তু তিনি যে বাঙ্গালা ভাষাতেও সুন্দর কবিতা ও গান লিখিতে পারিতেন, তাহা হয় ত অনেকেই জানেন না। ন্যায়-রত্ন মহাশয়, দাশরথি রায়ের অনুকরণে 'আগমনী' নামক পাঁচালী গান রচনা করেন। তাহার সর্ব্বাংশ এখন পাওয়া যায় না, কয়েকটী ছড়া ও গান মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌমের সঙ্কলিত "কাশীবাস" নামক পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। নিম্নে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের রচিত একটী বাঙ্গালা গান লিখিত হইল,—

ললিত ঝিঁঝিট—একতালা।

বিচারিয়ে মন, লওরে শরণ,
কল্যাণকারিণী কালী চরণে।
বৃথা গেল কাল, কালী কালী বল,
কালের বন্ধন নইলে কাটবি কেমনে।
অন্য সুরের কৃপা শুদ্ধাচারী পান,
সুরাপান শুদ্ধাচার দুই সমান,
বাঞ্ছা কল্পতরু কালী সন্নিধান
ভেদ নাই রে;
কৃপাদানে কৃপণতা নাই কোনও জনে
শুচি স্থানে অন্যের পূজার অধিকার,
শৌচাশৌচ কালীপূজার নাই বিচার,
যথায় ইচ্ছা হয়, পূজলে কালিকার
কৃপা পায় রে;
ব'সে বিল্বতরু মূলে কিম্বা শ্মশানে॥

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাঙ্গালা গদ্যও সুন্দর হইত। তাঁহার কথিত বাঙ্গালা চিঠিপত্রের ভাষা শুনিলে কেহই বলিতে পারিত না যে, ইহা একজন নবতিবর্ষ-দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের লেখা। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বেশ বন্ধুত্ব ছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় নূতন অধ্যাপনা আরম্ভ করিলে বঙ্কিমবাবু প্রায়ই তাঁহার টোলে আসিয়া নানারূপ তর্ক করিতেন।

৺রামধন তর্কপঞ্চানন, ৺ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, ৺প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ৺গঙ্গা-

ধর বিস্তারত্ন প্রভৃতি বন্ধুগণ ক্রমে ক্রমে পরলোকে প্রস্থান করায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চিত্তে একটা বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। বঙ্গীয় ১৩০০ সালের ফাল্গুন মাসে ৬৪ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ন্যায়রত্ন মহাশয় কাশীবাসার্থ বারাণসীধামে আগমন করেন। কাশীতে যাহাতে তিনি বিনা প্রতিগ্রহে বাস করিতে পারেন, হাতুয়ার বিদ্যোৎসাহী মহারাজ ৺কৃষ্ণপ্রতাপসাহী বাহাদুর, পূর্ব্ব হইতেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয় কাশীযাত্রাকালে জন্মভূমির দুশ্ছেদ্য মমতার উল্লেখ করিয়া অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেন। সে গুলি তৎকালে 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বদেশভক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়, 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জননী বঙ্গভূমির কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন;—

"আবাল্যং জননীব জীবয়সি মামারোপ্য হৃৎপঞ্জরং
স্বচ্ছন্দং বশবর্ত্তিনীব মধুরৈমূ লৈঃ পয়োভিঃ ফলৈঃ।
বিণ্মূত্রাদিপরিগ্রহেণ চ কদা বাধাপি জাতা ন তে
ক্রোড়ে ক্রীড়নমদ্য বঙ্গবসুধে মুঞ্চাম্যনুজ্ঞায়তাম্।"

"বাল্য হ'তে দাসে তুমি পালিতেছ বঙ্গভূমি
স্নেহময়ী জননীর প্রায়,
হৃদয়-পিঞ্জরে রাখ, সদা যেন বশে থাক,
তব ঋণ শোধা কি মা যায়।
দিয়াছ মা অনিবার ফলমূল পয়োধার
হ'লে আমি ক্ষুধায় কাতর,
মাগো ওই কোলে কত মলমূত্র অবিরত
ঢালিয়াছি, বাধা নাই তোর।
আজি হ'তে তোর ছেলে স্নেহময়ি, তোর কোলে
ধূলাখেলা করে সমাপন,
সন্তানেরে ওমা তুমি আজ্ঞা দাও বঙ্গভূমি
কাশীবাসে চ'লেছি এখন।" (১)

সভাক্ষেত্রে বিচার-প্রসঙ্গে বঙ্গীয় পণ্ডিতগণের সহিত ন্যায়রত্ন মহাশয়কে অনেক সময়ে বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে হইয়াছে। যদি সেই সকল অপরাধে পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ অসন্তুষ্ট থাকেন, এই আশঙ্কায় ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বদেশ

---

(১) এই প্রবন্ধে সংস্কৃত শ্লোকের যে সকল পদ্যানুবাদ প্রদত্ত হইবে, সেগুলি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র ৺হরকুমার শাস্ত্রীর রচিত।

পরিত্যাগ কালে নিম্নলিখিত শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহাদিগের নিকটে সবিনয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন।—

"বঙ্গাবাসমপাস্য বাসকৃতয়ে যাস্যামি কাশ্যামহং
মন্দোবাদিহ কেঽপি সন্তি বিদুষাং মধ্যে চ মদ্দ্বেষিণঃ।
অন্বেষেণ ভজন্তু তোষমধুনা সাধুষিমাং প্রার্থনাং
কুর্ব্বেঽহং বিহিতাঞ্জলিঃ সবিনয়ং রাখালদাসঃ স্বয়ম্॥"

"আজি কাশীবাস-তরে দীন হীন যাত্রা করে,
উঠিবে গো বঙ্গের বসতি,
যদি এই বঙ্গদেশে থাকেন আমার দোষে
বুধ-মাঝে কেহ রুষ্টমতি—
এ সময়ে সাধুকুলে সমুদয় দ্বেষ ভুলে
তুষ্ট হোন অধীনের প্রতি,
গল-লগ্নীকৃত-বাস করিছে রাখালদাস
করযোড়ে সবারে মিনতি।"

বঙ্গবাসীর চির-বন্ধুত্ব-বন্ধন ছিন্ন করিয়া কাশীতে বিশ্বনাথের আশ্রয়ে যাইবার সময়ে ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—

"বঙ্গস্থলস্থৈঃ সমমৈহিকানি বন্ধুত্বপাশৈঃ সুখবন্ধনানি।
ছিত্বাদ্য বিশ্বেশ্বরমাশ্রয়ে ত্বাং যস্মাৎ ত্বমেবাত্র পরত্র বন্ধুঃ॥"

"বন্ধুত্ব-বন্ধনে আছি বঙ্গবাসি-সনে
আশৈশব বদ্ধ আমি ঐহিক জীবনে।
ছিন্ন করি বিশ্বনাথ সে সুখ-বন্ধন,
সকল মমতা মায়া দিয়া বিসর্জ্জন,
তোমার আশ্রয়ে আজ দীন হীন চলে,
যে হেতু তুমিই বন্ধু ইহ পরকালে।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় কাশীতে আসিয়া নানা দেবদেবীর বহু স্তোত্র রচনা করেন। তাঁহার প্রণীত "কবিতাবলী"র প্রথমাংশে তাহার কতকগুলি মুদ্রিত হইয়াছে। এই "কবিতাবলী" গ্রন্থে 'ব্রাহ্মাভাসানাং ভ্রমখণ্ডনং' অধ্যায়ে ব্রাহ্মসমাজের নিরাকারোপাসনার বিপক্ষে অনেক শ্লোক লিখিত হইয়াছে; একটী কবিতা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।—

"মূর্ত্তিং মোক্ষসমাগমায় বিপদাং মোক্ষায় সধ্যেয় যা
ভাবেনোদ্ভবতো হৃদা ভগবতো যাং ভাবয়ামো বয়ম্।
যদ্ধে যাঃ বিলোক্য জন্মমনসাং মন্তামহে ধন্যতা
মন্যন্তো হতচেতনস্য কথয় তাং বিস্ময়াদঃ কথম্॥"

"যে মূর্ত্তি ভাবি গো কভু মোক্ষ পাব ব'লে,
যে মূর্ত্তি পড়ে গো মনে বিপদের কালে,
কখন' বা ভক্তভাবে
অন্তর যে মূর্ত্তি ভাবে,
যে মূর্ত্তি স্বপ্নেও কভু নিরখিতে পেলে—
জনম সার্থক জ্ঞান
ধন্য হয় মন প্রাণ;
আমাদের চেয়ে যারা হীনবুদ্ধি কত
সে মূর্ত্তি তা'দের বাক্যে হ'ব কি বিস্মৃত?"

"কবিতাবলী" ভিন্ন ন্যায়রত্ন মহাশয়-প্রণীত "রসরত্ন" নামক আর একখানি খণ্ডকাব্য মুদ্রিত হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অন্যান্য কবিতাসমূহ সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তক মুদ্রিত করা হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা হইয়া উঠে নাই। কাব্যগ্রন্থ ব্যতীত ন্যায়রত্ন মহাশয়, 'অদ্বৈতবাদখণ্ডনম্' "মায়াবাদনিরাসঃ", "তত্ত্বসারঃ", "শক্তিবাদরহস্যপ্রকাশঃ", "দীধিতিক্রম্যানতাবাদঃ", "গদাধরন্যূনতাবাদঃ", "অদ্বৈতবাদখণ্ডনপরিশিষ্টম্", "বিবিধবিচারঃ", "বিধবোদ্বাহখণ্ডনম্", "জীবতত্ত্বনিরূপণম্" প্রভৃতি সুচিন্তিত সন্দর্ভ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে 'জীবতত্ত্বনিরূপণ' ভিন্ন আর সমস্ত পুস্তকই মুদ্রিত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদের কেন্দ্রভূমি বারাণসীতে বসিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় অদ্বৈতবাদখণ্ডনের রচনা ও প্রচার করিয়াছেন বলিয়া মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সাহসের অসীম প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। শৃঙ্গেরীমঠের শঙ্করাচার্য্যের নিকট মাধ্বসমাজের পণ্ডিতমণ্ডলী "অদ্বৈতবাদখণ্ডন" প্রেরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, 'এখনও কাশীতে গ্রন্থকার জীবিত আছেন, আপনি স্বয়ং বা আপনার পক্ষীয় পণ্ডিত সমাজের দ্বারা এই গ্রন্থের কোনও প্রতিবাদ করাইতে পারেন ত এই সময়ে করান; গ্রন্থকর্ত্তার দেহান্তে এই পুস্তকের কোনও প্রতিবাদ প্রচারিত করিয়া গর্ব্ব করিলে তাহা শ্লাঘনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না।' ৺কালীবর বেদান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত চন্দ্রধর কাব্যসাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত বাণীশ ঝা প্রভৃতি অনেকে এই অদ্বৈতবাদখণ্ডনের প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হন নাই।

এই "অদ্বৈতবাদখণ্ডন" দর্শনশাস্ত্রের রাজকীয় উপাধি-পরীক্ষার পাঠ্য-

তালিকা-ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু কাশীর অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ ও দণ্ডি-সম্প্রদায়ের বহু চেষ্টায় তাহা পাঠ্য তালিকা হইতে উঠিয়া যায় (১)।

আচার্য্য শঙ্কর, বেদব্যাস-প্রণীত ব্রহ্মসূত্র, ভগবদ্‌গীতা ও উপনিষদাদিকে প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করিয়া জগতের সহিত ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার মতে একমাত্র ব্রহ্মই অবিদ্যোপহিত হইয়া ঘটপটাদিরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। মধুসূদন সরস্বতী, চিৎসুখাচার্য্যপ্রমুখ পরবর্ত্তী মনীষিগণ, "অদ্বৈতসিদ্ধি", "চিৎসুখী" প্রভৃতি গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের পোষকরূপে বিবিধ অনুমান বাক্যেরও অবতারণা করিয়াছেন। প্রতিভাবতার ন্যায়রত্ন মহাশয়, এই মতের বিরুদ্ধে 'অদ্বৈতবাদখণ্ডন' ও 'মায়াবাদনিরাস' নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়াছেন। তিনি এই দুইখানি গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্র, ভগবদ্‌গীতা ও উপনিষদাদির শঙ্করাচার্য্যকৃত অদ্বৈতব্যাখ্যায় দোষ প্রদর্শন করিয়া ন্যায়মতানুসারে স্বারসিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই উভয় গ্রন্থে অদ্বৈতবাদীদিগের দর্শিত সমস্ত অনুমান বাক্যে দোষোদ্ভাবন করিবার নূতন পদ্ধতিও অভিহিত হইয়াছে। সময়ান্তরে এই সকল বিচার অবলম্বন করিয়া বঙ্গভাষায় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

---

(১) "মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় 'অদ্বৈতবাদখণ্ডন' নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ঐ পুস্তকখানি কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত-উপাধি পরীক্ষার বেদান্তদর্শনের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। কাশীর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতগণ কাশীনরেশকে জানান যে, "ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুস্তকে অসংযত ভাষায় বৈদান্তিকদিগকে গালি দেওয়া হইয়াছে। আমরা অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক, ঐ পুস্তকের পঠন পাঠন আমাদের সম্প্রদায়ের লোকের ধর্ম্মহানিকর। অতএব বঙ্গেশ্বরকে অনুরোধ করিয়া ঐ পুস্তক বেদান্তের পাঠ্যতালিকা হইতে তুলিয়া দেওয়া হউক। ঐ পুস্তকের রচয়িতা নৈয়ায়িক, তাঁহার পুস্তক কেন বেদান্তের পাঠ্য তালিকায় স্থান পাইবে?" কাশীনরেশ বঙ্গেশ্বরকে পত্র লেখেন। বঙ্গদেশের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা, সংস্কৃত বোর্ডের সভাপতি সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের প্রতি ইহার মীমাংসার ভার অর্পণ করেন। এই সময় কাশীস্থ নৈয়ায়িকগণের পক্ষ হইতে ও বৈদান্তিকগণের পক্ষ হইতে মত সংগ্রহ করা হয়। মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী বৈদান্তিক হইয়াও ভট্টাচার্য্যের (রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের) অনুরোধে নৈয়ায়িকগণের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। এদিকে কলিকাতা সংস্কৃত বোর্ডে এ বিষয় লইয়া বহু তর্ক বিতর্কের পর, ফল-কথা বেদান্তের পাঠ্যতালিকা হইতে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "অদ্বৈতবাদখণ্ডন" নামক গ্রন্থ উঠিয়া যায়।"—প্রবাসী ১৩শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৭০৫ পৃষ্ঠা।

প্রাচীন দার্শনিকগণ, চেতন জীবাত্মা হইতে মনকে পৃথক্ পদার্থ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি যেমন বহিরিন্দ্রিয়, মন তেমনই অন্তরিন্দ্রিয়। ন্যায়রত্ন মহাশয়, "তত্ত্বসার" নামক গ্রন্থে এই মত খণ্ডন করিয়া জীবাত্মা ও মন যে এক—ইহাই সিদ্ধ করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থে জীবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয় "তত্ত্বসারে"র প্রথম কারিকায় লিখিয়াছেন,—

"মনসামেব চৈতন্যং তত্রৈবেচ্ছাদিকা গুণাঃ।
অহং প্রতীতিস্তত্রৈব ন তু জীবাত্মনস্থিতিঃ॥"

এই পুস্তক ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রণীত ইহাই প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। জয়পুর ষ্টেটের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ৺হরিদাস শাস্ত্রী এম, এ, এই পুস্তকের প্রতিবাদ করিয়া 'তত্ত্বসারবিচারঃ'—এই নামে এক গ্রন্থ প্রচারিত করেন। শুনিয়াছি, মহামহোপাধ্যায় ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, এই গ্রন্থের লেখক।

ক্রমশঃ।

শ্রীহরিহর শাস্ত্রী ভট্টাচার্য্য।

কথকতা।

ভারতবর্ষে এক সময়ে কথকতার সমাদর হইয়াছিল, প্রাচীন গ্রন্থে ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে কথকগণ নানাপ্রকার অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া বিচিত্র কথার দ্বারা শ্রোতৃবর্গের চিত্তরঞ্জন করিয়া থাকেন, খেয়া পার হইবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া দাঁড়টানার হাইল ধরার অভিনয় করেন, হনুমানের সমুদ্রপার হওয়ার বৃত্তান্ত উপস্থিত হইলে লম্ফ-প্রদানের অভিনয়ও যথাশক্তি দেখাইয়া থাকেন, এইরূপ অতীতের অনেক বৃত্তান্তই কথকের কথন-কৌশলে বর্ত্তমান ঘটনা মনে করিয়া মানুষ হাসিকান্না প্রভৃতি করিয়া থাকে। সংসারে সকল লোকের মনোবৃত্তি এক প্রকার হয় না, কাজেই কেহ অভিনয়ে রামের পক্ষপাতী, কেহ বা রাবণের পক্ষপাতী হইয়া, তাহাদের উন্নতি-অবনতি-দর্শনে হর্ষবিষাদের চিহ্ন ধারণ করে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এই বিষয়ের একটা সুস্পষ্ট উদাহরণ দেখা যায়।

সেকালে কথকগণ গ্রন্থিক নামেও পরিচিত ছিল। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে গ্রন্থিকদিগের মধ্যে দেখা যায়, তাঁহারা কংস কৃষ্ণ প্রভৃতির উৎপত্তি হইতে বিনাশ পর্য্যন্ত বুদ্ধিস্থ যাবদ্ব্যাপার ব্যাখ্যা করিয়া, শ্রোতার বোধগম্যরূপে প্রকাশ করেন। এই ব্যাপারে দেখা যায়, কেহ কংসভক্ত হয়, কেহ বা বাসুদেবভক্ত হয়। বর্ণেরও পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও মুখ কাল হয়, কাহারও মুখ রক্ত হয়, অর্থাৎ কংসের দুর্দ্দশা দর্শনে কংসভক্তের মুখ কাল হয়, কৃষ্ণভক্তের মুখ হর্ষে উৎফুল্ল হয়। কথকের আরব্ধ প্রসঙ্গে লোক মুগ্ধ হইয়া বৃত্তান্তটিকে উপস্থিত ঘটনা মনে করে, এবং ত্রৈকালিক প্রয়োগও করিয়া থাকে। কেহ বলে যাও কংসবধ হইতেছে, (ইহাতে বর্ত্তমান কাল প্রকাশ পায়) কেহ বলে যাও কংসবধ হইবে (ইহাতে ভবিষ্যৎ কাল) কেহ বলে যেয়ে আর ফল কি? কংস হত হইয়া গিয়াছে *।

কাতন্ত্রবৃত্তির পঞ্জিকাকার ত্রিলোচন দাসের উক্তিতে কথকের অভিনয়ের প্রণালী আরও অধিকতর স্পষ্ট হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, এই কথক এমন অভিনয় করিয়া কথা বলে, তাহাতে যেন কালভেদেও লোকের প্রতীতি হইতেছে যে কংসকে হত্যা করিবার জন্য নারায়ণকে কথকই প্রেরণ করিতেছেন †।

যে কথক আজ সাধারণের নিকট সম্মানিত, সেই কথকই পূর্ব্বকালে ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের মতে বিশেষরূপে নিন্দিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন—"জ্যোতির্ব্বিদ্, অথর্ব্ববেদোক্ত অভিচারাদিক্রিয়া-নিরত, কীর, পৌরাণপাঠক, এই সকল ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ-যজ্ঞ-মহাদানে কদাপি বরণীয় নহে" ‡। এই পৌরাণপাঠকই প্রজাপতি কর্ত্তৃক বিচিত্র কথোপজীবি কথক

---

* গ্রন্থিকেষু কথং। যত্র শব্দপ্রবন্ধমাত্রং লক্ষ্যতে। তেঽপিহি তেষামুৎপত্তিপ্রভৃত্যা বিনাশাদ্ বৃত্তীর্ব্যাচক্ষাণাঃ সতো বুদ্ধিবিষয়ান্ প্রকাশয়ন্তি।.........ব্যামিশ্রিতাশ্চ দৃশ্যন্তে। কেচিৎ কংসভক্তা ভবন্তি কেচিদ্বাসুদেবভক্তাঃ। বর্ণান্যত্বং খল্বপি পুষ্যন্তি। কেচিৎ কালমুখা ভবন্তি কেচিদ্রক্তমুখাঃ। ত্রৈকাল্যং খল্বপি লোকে লক্ষ্যতে, গচ্ছ হন্যতে কংসঃ গচ্ছ ঘানিষ্যতে কংসঃ কিং গতেন হতঃ কংস ইতি। ৩।১।২ গ্রন্থিকেষু কথকেষু। কৈয়টঃ।

† এবমভিনয়েনাসৌ কথকঃ কথাং কথয়তি, যেন কাল-ভেদেঽপি পরেষাং প্রতীতি র্ভবতি কংসং হন্তুং নারায়ণং কথকএব প্রযুঙ্‌ক্তে।

‡ জ্যোতির্ব্বিদোহ্যথর্ব্বাণঃ কীরপৌরাণ-পাঠকাঃ।
শ্রাদ্ধে যজ্ঞে মহাদানে বরণীয়াঃ কদাচ ন॥

বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এমত মনে হয়। তাড়াটিয়া ধর্ম্মপ্রচারকও ইহারই প্রকারান্তর মাত্র। প্রজাপতির বচনটি এইরূপ—

"মূল্যেশ্চিকিৎসাং কুরুতে কথাং চিত্রাং তথোক্তি যঃ।
গীতং গায়তি ভৃত্যর্থং বিপ্রঃ সন্ প্লবগোহি সঃ।"

যে ব্রাহ্মণ মূল্যগ্রহণ পূর্ব্বক চিকিৎসা করে, অথবা বিচিত্র কথা প্রয়োগ করে, অথবা বেতন পাইবার জন্য গান করে, সে বিপ্র হইয়াও প্লবগনামে অভিহিত হইবার যোগ্য। এই স্থলে একটা কথা বলা আবশ্যক যে পৌরাণপাঠককে পুরাণ-পাঠক মনে করিলে বড়ই ভুল হইবে। পুরাণ-পাঠক শাস্ত্রে নিন্দিত নহে, প্রত্যুত প্রশংসিত, এবং বাচক নামে কথিত হইয়াছে। কি ভাবে পুরাণাদি পাঠ করিতে হইবে, এবং কেমন লোক পাঠক হইবে শাস্ত্রে তাহারও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহারা পুরাণের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া লোকের মনস্তুষ্টি সাধনার্থ অবান্তর কথার অবতারণা করে, তাহারাই শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। ইহাতে লোকরঞ্জনের খাতিরে পুরাণের বৃত্তান্ত বিকৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়, সুতরাং পুরাণের যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহারই অন্যথা ঘটিয়া থাকে। এই শ্রেণীর ব্যাখ্যাকর্ত্তার মুখে শুনিয়া শুনিয়া যাহারা পুরাণবৃত্তান্তের ভাষান্তর করিয়াছে, তাহাদের অবিমৃষ্যকারিতার ফলেই রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির বৃত্তান্তগুলির অনেক প্রকার বিপর্য্যয় দেখা যাইতেছে।

শাস্ত্রে বিচিত্র কথোপজীবীর যে নিন্দা দেখা যায়, সেই নিন্দা ভাঁড় কথক প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াই আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বৈদিকধর্ম্মের সমুপবৃংহণে অর্থাৎ বিস্তৃতীকরণে পুরাণেতিহাসের উপযোগ দেখা যায় *। সুতরাং যাহা ধর্ম্মের বিস্তারার্থ উদ্‌ভাবিত হইয়াছে, তাহাই যদি ব্যাখ্যার ফলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কেবল লোকচিত্তরঞ্জনেই পর্য্যবসিত হয়, তবে ইহা বিশেষ বিপদ্‌জনক বলিয়াই মনে হয়।

হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র স্মৃতিনামে পরিচিত। সুতরাং পুরাণের ব্যাখ্যা করিতে হইলে, অথবা বক্তৃতা করিতে হইলে, স্মৃতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা আবশ্যক। স্মৃতিশাস্ত্রে সর্ব্বতোভাবে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পুরাণ-ব্যাখ্যায় ও বক্তৃতায় ফলে বর্ত্তমান যুগে হিন্দুসমাজে এক অভিনব ধর্ম্মের সূত্রপাত হইয়াছে। পুরাণ

---

* ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতা বেদো মা মরং প্রহরিষ্যতি।

ব্যাখ্যার ফলে আজ একটি কুৎসিত ভজন দেখা দিয়াছে। বক্তৃতার ফলে হিন্দুধর্ম্মের বিধিনিষেধ ঐহিক সর্ব্বস্বতায় পর্য্যবসিত হইতেছে। ধর্ম্ম না জানিলে, তাহার বিস্তার হইতে পারে না; সুতরাং অনভিজ্ঞের প্রচার আজ প্রতারণা রূপে পর্য্যবসিত হইয়া, বর্ণব্যত্যয় সঙ্ঘটন পূর্ব্বক, প্রচারককেই প্রতারক করিয়া তুলিয়াছে। অবশ্য যে সকল কথক শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যথার্থরূপে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ, সেই সকল কথক যে সমাজের হিতকর, এবং শাস্ত্রে অনিন্দিত একথা বলাই বাহুল্য।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

সন্ধ্যায়।

সন্ধ্যায় ফিরিছে পাখী আপন কুলায়,
কি আশায় কি আনন্দে উচ্ছ্বসিত প্রাণ,
দূর দূরান্তর হ'তে গৃহমুখে ধায়,
দ্রুত আন্দোলিত পাখা, কলকণ্ঠে গান।
ফলে ফুলে সুশোভিত ঘন বনছায়,
নাচিয়া গাহিয়া হ'ল দিবা অবসান,
মন্দিরে জ্বলিছে আলো, মঙ্গল প্রভায়,
দিগন্তে গোধূলি ধীরে করিছে প্রয়াণ।
জীবনে গোধূলি শেষে দেখি এ সন্ধ্যায়,
তুচ্ছ ধূলা খেলা লয়ে গেছে দিনমান,
কেন মূঢ় মন মম ফিরিতে না চায়,
পশিছে শ্রবণে কার আকুল আহ্বান।
সঙ্গী সব গেছে ফিরে গৃহপানে, হায়!
এখন ভাসিয়া আসে তাহাদের গান।

শ্রীসতীশচন্দ্র বর্ম্মণ।

পাঠক-সম্প্রদায়।

আমি আজ পাঠকের শ্রেণীবিভাগ করিয়া পাঠককে একটু তৃপ্তি দিবার অভিলাষী হইয়াছি। অভিলাষ পূর্ণ হইলে কৃতার্থ হইব। আমি অনেকদিন ধরিয়া কত 'প্যাটার্ণের' পাঠক আছে, লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। কোন পাঠক কি পড়িতেছেন, কি বুঝিতেছেন, কি না পড়িতেছেন, কি বুঝিতে পারিতেছেন না, এ সমস্ত মহা কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করিতাম। পাঠকের পড়া-শুনা, ভাব-ভঙ্গী বেশ করিয়া লক্ষ্য করিয়া আমার যতটুকু অন্তর্দৃষ্টির স্ফুরণ হইয়াছে, তাহা আজ এই প্রবন্ধে পাঠককে অবগত করাইব। আমি শুধু শ্রেণীবিভাগ করিব, কিন্তু গুণানুসারে প্রথমাদি শ্রেণীগঠন করিতে প্রয়াস করিব না।

(১) এক শ্রেণীর পাঠক আছেন, যাঁহারা কোনও পুস্তক পাইলে তড়্ তড়্ করিয়া পড়িয়া যান; কতক কতক বুঝিলেন, কতক বা শব্দ-সম্পত্তির অভাবে ভালরূপ বুঝিলেন না (অথচ অভিধান দেখিবার জন্য কষ্ট-স্বীকারও করিতে চাহেন না)। মোটের উপর, পড়িয়া শুনিয়া 'মোদ্দাটা' বুঝিতে পারিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। এরূপ পাঠক কেবল সহজ ভাষায় লিখিত গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি পড়িতে ভালবাসেন।

(২) কোন কোন পাঠক আছেন, যাঁহারা তাড়াতাড়ি পড়িতে ভালবাসেন না, বেশ ভাল করিয়া পড়েন, পড়িবার সময় সকল কথার অর্থ বুঝিয়া যান (না জানা থাকিলে অভিধান দেখেন), সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যবিষয়টির মর্ম্ম বুঝিতে থাকেন, কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি বা অসামঞ্জস্য দেখিলে তৎক্ষণাৎ পেন্সিল্ দিয়া দাগ দেন। এ শ্রেণীর পাঠক একাধারে পাঠক ও সমালোচক।

(৩) আর এক শ্রেণীর পাঠক আছেন, তাহারা যে বিষয় পাঠ করিতে ভালবাসেন, তাহা ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারের গ্রন্থে তাহাদের বিতৃষ্ণা। নাটক-নভেল-প্রিয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় যে, তাহারা অন্য কোন পুস্তক পাইলে যদি সবটা পড়িয়া কোন প্রেমচরিত্র না পায়, তাহা হইলে তাহাদের সমক্ষে সেই পুস্তকের সবটাই অসুন্দর এবং ওরূপ পুস্তককে "ভাল

রস" বলিতেও শুনা গিয়াছে। অবশ্য যিনি যে রস ভালবাসেন, তিনি সেই রস পান করুন না তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই, কিন্তু অন্য রস "ভাল নয়" বলা ভাল নয়।

(৪) আর এক রকম পাঠক আছে। নাম-জাদা লেখক না হইলে, ইহারা অমনি নাক সিট্‌কাইয়া বসেন। এই সব মৌলিকত্ববিহীন পাঠক যতক্ষণ কোনও অপ্রথিতনামা ব্যক্তির লেখা পাঠ করেন, ততক্ষণ বড়ই ঘৃণার সহিত পড়েন। পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে আর কিছুই তিনি ভাল দেখিতে পান না। একবার আমি বড় রগড় করিয়াছিলাম। ঐ ধরণের একটী পাঠককে একবার একটী প্রবন্ধ দেখাইয়াছিলাম। প্রবন্ধটি একজন খ্যাতনামা লেখকের লেখা। ঐ ব্যক্তির কিন্তু তাহা জানা ছিল না। আমি ঐ সারগর্ভ প্রবন্ধটি কাগজে লিখিয়া নাম-সহি করিবার স্থানে একটী শিক্ষিত অথচ সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত লোকের নাম বসাইয়া দিয়াছিলাম। পাঠক পটাপট্ করিয়া সব পাতা উল্টাইয়া শেষ পাতার নামটি আগে দেখিল। তারপর প্রত্যেক স্থানেই দোষ দেখিতে পাইল—এখানটা কি না যুক্তিহীন, ওখানটা কি না ফাজলামি, সেখানটা কি না অবিশ্বাস্য, অন্যত্র স্বকপোলকল্পিত ইত্যাদি। আর একবার, আমার মনে পড়ে, কোনও গম্ভীরনিনাদী মাসিক-পত্রের লেখক (ইনি সমালোচক) আমার নিকট এইরূপে হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন।

(৫) এক রকম পাঠক আছে, যাহারা কিছু বুঝিতে না পারিলেও, ভাবে গদ্‌গদ হইয়া যান। এই সকল পাঠক পরের মুখে ঝাল খায়। দশজনে যার প্রশংসায় ঢাক বাজায়, তার লেখা পড়িবার সময় (বা পূর্ব্বে) ঘনঘন চোখ ঠারিয়া দেয়—'ভাল'। একদিন মাসিকপত্র পড়িতে পড়িতে সত্যেন্দ্র দত্তের ও রবিবাবুর কয়েকটি কবিতা বাহির হয়। জনৈক পাঠক পড়িবার সময় ভাবে গদ্‌গদ হইয়া পড়িল। দেখিয়া আমার বড় কৌতূহল জন্মিল। আমি পাঠ করিলাম; কিন্তু কিছু অর্থভেদ করিতে পারিলাম না। ভাবের গভীরতায় তলাইয়া যাইতে হয়। সমীপস্থ পাঠকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই এর অর্থ কি বুঝেছ?" সে বলিল "অতি উচ্চ, অতি উচ্চ"। কিন্তু 'কি' তাহা বুঝাইতে পারিল না। বলা বাহুল্য, আমি সে উচ্চতার নাগাল পাইলাম না। অন্য পাঁচজন শিক্ষিত লোককে দেখাইলাম, তাঁহারা বলিলেন "ও হিঁয়ালী"। আমি নিরস্ত হইলাম। পাঠক পাছে কিছু মনে করেন,

সেইজন্য আমি সত্যেন্দ্র দত্তের "সাগরের গান" নামক কবিতার প্রথম চারি পঙ্‌ক্তি তুলিয়া দিলাম। কবিতাটি গত বৎসর শ্রাবণ মাসের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।—

"জোয়ার ভাঁটার নাটাই নাটার
নাটায়ের নাট ভুবন জুড়ি
জোয়ার ভাঁটার নাট্যে মাতিয়া,
দিকে দিগন্তে বাজাই তুড়ি।"

পাঠকদিগকে আমি উপরিউক্ত কবিতাটির অর্থভেদ করিতে অনুরোধ করি। এবং সত্যেন্দ্র বাবুকে আমার এই কবিতাটির অর্থ করিতে অনুরোধ—

কোয়ার তাটার কাটাই কাটার
কাটায়ের কাট কেমন খুড়ি,
কোয়ার তাটার হট্টে ভাতিয়া
শিকে শিগন্তে লাজা ও মুড়ি।

রবিবাবুর ও সত্যেন্দ্র দত্তের অন্যান্য কবিতা তুলিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই।

(৬) এবার এক অদ্ভুত রকমের পাঠকের উল্লেখ করিতেছি। ইহারা কোনও পুস্তক বা দীর্ঘ বিষয় সবটা পড়িয়া উঠিতে পারেন না। এখানটা পড়িলেন; সেখানটা পড়িলেন; শেষ পাতাটা দেখিলেন; বহিখানির ভিতরে কোনও ছবি থাকে তো দেখিলেন; বাঁধা কেমন, ছাপা কেমন দেখিলেন; বহিখানির দাম দেখিলেন; ব্যস! সব হইয়া গেল। এ ধরণের পাঠককে যদি জিজ্ঞাসা করেন, "অমুক বহি পড়িয়াছ কি?" উত্তর পাইবেন "হাঁ পড়িছি; কিন্তু বিশেষ তেমন কিছু নাই"। না হয় বলিবেন "বেশ বই, সুন্দর লিখেছে"। গ্রন্থের ভিতরের কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেই চক্ষুঃস্থির। মূর্খ পাছে ধরা পড়ে, তাই সে সবই বলে "বেশ"। কখনও "ঢেঁকির আঁকশাল" সাজিয়া বসে।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ জ্যোতির্ময়।

দলাদলি।

(১)

"মামাবাবু, নমস্কার।"

অধরবাবু চমকিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গীও বিস্মিত হইল। তাহারা পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল—একটি গৌরবর্ণ বালক, বয়স আন্দাজ চতুর্দ্দশ বৎসর, বেশ হাসিমাখা মুখ।

অধরবাবু গম্ভীর প্রকৃতির লোক। সহরের নাম করিব না তাহা হইলে অধরবাবুকে অনেকে চিনিবেন। আমরা এই আখ্যায়িকায় পশ্চিমের সেই সুপরিচিত সহরটিকে মামুদপুর বলিয়া বর্ণিত করিব। মামুদপুরের বাঙ্গালী-সমাজের একদল তাঁহার বিপক্ষ হইলেও কোন বালক তাঁহাকে পরিহাস করিতে সাহস করিত না। এই অপরিচিত বালকের সম্ভাষণে গম্ভীর অধরবাবু বড় বিস্মিত হইলেন। তিনি নাসিকার উপর চশমা স্থাপন করিয়া বালককে একবার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন। একটু কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেহে ছোকরা? কাকে চাও?

ঠিক সেই সময় তাঁহার বিপক্ষ দলের একজন নিকর্ম্মা সেই স্থলে আসিয়া অধরবাবুকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

বালক সপ্রতিভভাবে একটু অভিমানের স্বরে বলিল—সে কি মামাবাবু আমায় চিন্‌তে পারলেন না?

অধরবাবু আরও বিস্মিত হইয়া বলিলেন—তুমি ভুল করছ ছোকরা। কাকে বলছ বল দেখি?

বিপক্ষ পক্ষের দূত মনীর বড় রহস্য বোধ হইল। অধরবাবু অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। সে উপর-পড়া হইয়া বলিল—কার সঙ্গে কথা ক'চ্চ ছোকরা জান? বাবু অধরচন্দ্র বোস, উকীল, এলাহাবাদ হাইকোটের উকীল—

ছোকরা একটু রাগতস্বরে বলিল—আঃ থামুন না মশায়। আমার মামার পরিচয় আমি জানি না তো কি আপনি জানেন?

অধরবাবুর সঙ্গী নবীনবাবু বলিলেন—এতো বড় মজা দেখছি। এ ছোকরা কে? তোমার ভগ্নীপতি সতিশ বিশ্বাসের কি এত বড় ছেলে—

বালক বলিল—মশায়দের কে দালালি করতে বলছে? আমার বাবার কত বড় ছেলে আছে না আছে সে তর্ক তো আপনাদের কেউ করতে বলেনি।

ননী বলিল—তুমি কি সতিশ বাবুর ছেলে?

বালক বলিল—মামা সব জানেন। আমার বাবার যদি পয়সা থাকত মামা জুড়ি গাড়ি পাঠিয়ে ষ্টেসন থেকে আমায়—

অধরবাবু ক্রোধে ফুলিতেছিলেন। একটা সামান্য বালকের মুখে এই সব কথা! বিশেষ ননীর সম্মুখে। আধ ঘণ্টার মধ্যে পল্লবিত হইয়া এই সামান্য ঘটনা সহরময় রাষ্ট্র হইবে। তাহার শত্রুপক্ষ এরূপ একটা গল্প পাইলে কালী-বাড়ীতে শনিবার রাত্রে দুইটা অঞ্জলি দিবে সে বিষয়ে আর তাঁহার অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তাঁহার পক্ষে আর আত্মসংযম করা কঠিন হইয়া উঠিতেছিল।

বালক বলিল—মামাবাবুর না চেনবারই কথা। অনেকদিন দেখেন নি। মামীমা ভাল আছেন?

এবার অধরবাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি বিরক্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—বদমায়েস পাজি আমি কি জানিনি তোকে কে শিখিয়ে পাঠিয়েছে। এখনি পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দ'ব জানিস। হতভাগা, কলকাতার ছোঁড়া।

ননীর দিকে কটাক্ষ করিয়া অধরবাবু কথাগুলি বলিলেন? ননী বলিল—তা' আর মশায় আমার দিকে কটাক্ষ করলে কি হ'বে? লোকের নিজের ঘর ঠিক না রাখতে পারলে—

অধরবাবু ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিয়া উঠিলেন—আমাদের আত্মীয়-স্বজন অমন পথে পথে ঘুরে বেড়ায় না। কে সাজিয়ে পাঠিয়েছে—

বালক বলিল—মামাবাবু! ও মামাবাবু! মামাবাবু!

"তবে রে পাজি! বদমায়েস"—বলিয়া গম্ভীর প্রকৃতির বয়ঃবৃদ্ধ উকীল অধরবাবু যুবককে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। বালক ছুটিয়া পলাইল। দূর হইতে বলিল—"আচ্ছা কাল্‌নিমে মামা! বেশ মামা কিন্তু।"

পশ্চাদ্দিকে না চাহিয়া প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি অধরবাবু বন্ধু সমভিব্যাহারে অপর দিকে চলিয়া গেলেন। ননী সেই স্থলে দাঁড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া প্রাণভরে হাসিল। শেষে বালককে দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল।

(২)

ননী দ্রুত পাদবিক্ষেপে বালকের নিকট আসিয়া বলিল—কিহে ছোকরা ব্যাপার কি ?

বালক বলিল—ব্যাপার তো বুঝলেন। হঠাৎ বড়লোক হ'লে যা হয়। আমার বাবার আজ অবস্থা খারাপ হ'য়েছে ব'লে তাই।

ননীর আনন্দের সীমা রহিল না। সে আজ অধরবাবুর বিপক্ষ দলের নিকট রাজসম্মান লাভের প্রত্যাশা করিতেছিল। যতদিন মামুদপুরে সখের থিয়েটারের দল ছিল না ততদিন বাঙ্গালী অধিবাসীদের ভিতর খুব হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু আজ দুই বৎসর ধরিয়া মামুদপুরে বাঙ্গালীদের মধ্যে দুইটি দল হইয়াছিল। এক দলের নেতা অধরবাবু, অপর পক্ষের পৃষ্ঠপোষক সুরেন্দ্রবাবু। সুরেন্দ্রবাবুও উকীল—আদালতে বাহিরে অধরবাবুর ঘোরতর প্রতিযোগী। ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে কতকগুলা অজ্ঞ লোক প্রতিপালিত হইতেছিল। ননী সেই শ্রেণীর একজন। অধরবাবুর ভাগিনেয়কে সুরেন্দ্রবাবুর নিকট লইয়া যাইতে পারিলে তাঁহার হস্তে ব্রহ্মাস্ত্র সমর্পণ করা হইবে ইহা ভাবিয়া ননী সর্ব্বাঙ্গে পুলক অনুভব করিল। সে বালককে বলিল—তোমার নাম কি ভাই ?

বালক বলিল—আমার নাম মন্মথনাথ সরকার।

ননী বলিল—তুমি এখন কি করবে ?

মন্মথ বলিল—কি আর করব মশায়, গুটি গুটি ষ্টেসনের দিকে যাব, তা'র পর কলিকাতায় রওনা হ'ব। সহরটা দেখা হ'ল না এই দুঃখ।

ননী বলিল—সে কি হয় ? তোমার মামা তোমায় স্থান দিলেন না ব'লে কি তুমি চলে যাবে ? তাহ'লে বাঙ্গালী-সমাজের একটা নিন্দে হবে।

বালক মাকে মুখে কথা কহিতেছিল। সে বাঙ্গালী-সমাজ সম্বন্ধে দুই চারিটা বেশ মনোরম মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যাইতে কৃতসংকল্প হইল। ননীও ছাড়িবার পাত্র নয়। এমন চালাক চতুর ছেলে, মাকে মুখে কথা, ছোট বড় চুলছাঁটা, ফুটফুটে মধুর চেহারা। এক দিনে দুইটা পাখি বধ হইবে। অধরের অধরে বিরক্তির রেখা পড়িবে, ললাটে কলঙ্কের কালিমা লেপিত হইবে, আর থিয়েটারেরও একটা মস্ত লাভ হইবে। এমন ছেলে—বিবমঙ্গল ঠাকুরের চিন্তামণি সাজাইলে মানাইবে—তাহাকে কি ননী ছাড়িতে পারে ! সে বলিল—ভাই মামার মত এক গুঁয়েমি করতে আছে কি ? দিন-

কতক আমাদের অতিথি হ'য়ে থাক, দেখবে মামুদপুরে বাঙ্গালীদের মধ্যে মানুষ আছে কি না।

মন্মথ বলিল—না মশায় মাপ করুন। এখানে থাকলে কেবল সবাই আমাকে নিজের কথা জিজ্ঞেস করবে, মামার কথা জিজ্ঞেস করবে, কেবল জ্বালাতন করবে। আমাকে নিয়ে প্রশ্ন ক'রে আমার হাড়কালি ক'রে দেবে।

ননী প্রতিশ্রুত হইল কেহ তাহাকে 'ব্যক্তিগত' প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে না। অগত্যা বাধ্য হইয়া মন্মথকে মামুদপুরে সুরেন্দ্রবাবুর আতিথ্যগ্রহণ করিতে হইল।

(৩)

সহরময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অধরবাবু নিজের ভাগিনেয়কে গৃহে স্থান দেন নাই, তাহাকে সুরেন্দ্রবাবু আপনার গৃহে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রবাবুর দলের লোকেরা বলিল—"বাবুর কি মেজাজ, বাবুর কি দয়ার শরীর! অধরবাবু রাত্রি দিন ওঁর অনিষ্ট চিন্তা করেন, বাবু কিন্তু তাঁরই আত্মীয় স্বজনকে নিজের ঘরে পোষেন।"

একদিন আদালতে অধরবাবুর মুহুরি দেখিল সুরেন্দ্রবাবুর ঘোড়ার জের-বন্দের এক টুকরা চামড়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ক্যোচমান সেস্থলে দড়ি বাঁধিয়াছে। লোকটার ভারি আনন্দ হইল। সে সুরেন্দ্রবাবুর মুহুরিকে শুনাইয়া তৃতীয় ব্যক্তিকে বলিল—আজকাল লোকের গাড়ি ঘোড়া চড়াই চাই। তা' ঘোড়ার সাজই থাক আর ঘোড়ার গলায় দড়িই বাঁধা থাক।

সুরেন্দ্রবাবুর মুহুরি জেরবন্দের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছিল। সে বুঝিল যে তাহার প্রভুর প্রতি কটাক্ষ করিয়া অধরবাবুর মুহুরি ঐ কথাগুলা বলিতেছে। সে প্রত্যুত্তরে তৃতীয় ব্যক্তিকে বলিল—কি জান ভাই, যখন বাবুকে দয়া ক'রে অপরের জ্ঞাতিগোষ্ঠী পুষতে হয় তখন নিজে সৌখীন হ'লে কি আর চলে? নিজের ঘাড়ে অপরের—

অধরবাবুর মুহুরী রণে ভঙ্গ দিয়া সেস্থল হইতে পলায়ন করিল। সাতদিন [illegible]রিয়া সুরেন্দ্রবাবুর দল বড়ই বিজয়দন্তে মেদিনী কাঁপাইতেছিল। বাস্তবিক [illegible]ধরবাবুর ভাগিনেয় রহস্যটা কি তাহা অধরবাবুর পক্ষের লোক কিছু বুঝিল [illegible]। সেই দিন সন্ধ্যার সময় মুহুরী অধরবাবুকে একাকী পাইয়া বলিল—[illegible]জ্ঞে বলছিলাম কি, একটা কথা নিয়ে ওরা বড় লাফালাফি করছে, সহরে [illegible] আর বাস করবার উপায় নেই!

অধরবাবু ক্রোধে ফুলিতেছিলেন। তিনি বলিলেন—সেই ছোঁড়ার কথা বুঝি।

মুহুরী মাথা চুলকাইয়া বলিল—আজ্ঞে হাঁ।

অধরবাবু বলিলেন—বদমায়েস জুয়োচোর কলিকাতার ছেলে।

মুহুরী বলিল—হাঁ তা' বেশ বোঝা যাচ্চে। তবে ওকে ধরে নিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলে হয় না?

অধরবাবু ক্রোধ-কম্পিত-স্বরে বলিলেন—কাকে ধরে নেবে? সাপের বাচ্ছা কি বাঘের বাচ্ছা জানা নেই, যাকে তাকে ধরে নেবে?

মুহুরী অভ্যাস মত শির কণ্ডূয়ন করিয়া বলিল—আজ্ঞে ওরা বলে। কথায় কথায় টিট্‌কিরি মারে তাই বলছিলাম।

অধরবাবু বলিলেন—বলে, টিট্‌কারী মারে তোমরা ব'ল ও আমার কেহ নয়। সুরেন্দ্র ওকে জামাই করবে ব'লে পুষছে। যদি ওরা বলে ছোকরা অধর বাবুর ভাগিনেয়, তোমরা ব'ল ও সুরেনবাবুর জামাই।

ব্যবহারজীবির সহিত তর্ক নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া মুহুরী স্বস্থানে প্রস্থান করিল। কিন্তু রহস্যটা কি তাহা সে বুঝিল না।

অধরবাবুর দলের লোক একে একে সকলে ঐ কথা বলিতে শিখিল, কিন্তু তাহাতে সুরেন্দ্রবাবুর দলের লোক নতশির হইল না। তাহারা বিজয়ডঙ্কা বাজাইয়া মামুদপুরে স্বপক্ষের প্রাধান্য প্রচার করিল।

(৪)

প্রায় একমাস কাল মন্মথ মামুদপুরে বাস করিতেছিল। সে গান গাহিতে পারিত। সুরেন্দ্রবাবুর দলে চিন্তামণির ভূমিকায় মহলা দিয়া বেশ নাম কিনিতেছিল। অপর পক্ষেরও মহলা চলিতেছিল, কিন্তু তাহাদের সেই একঘেঁয়ে মামুলি রকম বন্দোবস্ত। এবার সুরেন্দ্রবাবুর দলের জয় জয়কার। ননী এবার বিজয়ী বীর।

মামুদপুরের অধরবাবু ও সুরেন্দ্রবাবুর মধ্যে অপর একটা বিষয়ের রেষারিশি ছিল। তাঁহারা সহরের একই বিভাগে বাস করিতেন। মিউনিসিপাল বোর্ডের কমিশনার হইবার জন্য উভয়েই দুই বৎসর চেষ্টা করিতেছিলেন। সমস্ত বাঙ্গালী সম্মিলিত হইলে অবশ্য একজন বাঙ্গালী নিশ্চয় কমিশনার হইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহাদের দলাদলির ফলে চতুর্ভুজ প্রসাদ লাল নামক একজন অপেক্ষাকৃত নবীন উকীল দুইবারই কমিশনার হইয়াছিলেন। দুই একজন

নিরপেক্ষ বাঙ্গালী এবার দুই দলকে সম্মিলিত করিয়া একটা দল গঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। বোধ হয় তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইত। কিন্তু মন্মথর শুভাগমনের দিন হইতে ইহাদিগের প্রাণের আগুন শত গুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। দুই দলেরই ক্যানভাস্ চলিতেছিল, দুই দলেরই নিষ্কর্ম্মার দল বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া লইতেছিল, চব্যচূষ্যলেহ্যপেয় আস্বাদন করিতেছিল।

একদিন সুরেন্দ্রবাবুর দল একটি সভা আহ্বান করিল। সহরের সেই বিভাগের সকল বর্দ্ধিষ্ণু হিন্দু মুসলমানকে একত্র করিয়া তাহারা সুরেন্দ্রবাবুর দাবী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্ভুজ প্রসাদ বাবুর দল সভা তাহার পূর্ব্ব সপ্তাহে আহূত হইয়াছিল। আগামী সপ্তাহে অধরবাবুর সভার দিন ধার্য্য ছিল। সভায় সকল পক্ষের গুপ্তচর আসিল। দুই একজন সভায় গোলযোগ করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু ভয়ে কেহ সভাভঙ্গ করিতে পারিল না।

একজন বক্তা বলিলেন—আপনারা কমিশনারের হস্তে কি গুরুভার অর্পণ করিতেছেন তাহা বোধ হয় অবগত আছেন। এক কথায় মনে করুন, এই বিভাগের সমস্ত অধিবাসী একটি বৃহৎ পরিবারভুক্ত। কমিশনার সেই পরিবারের কর্ত্তা। যে লোক নিজের সংসারপালন করিতে পারে না, যাহার আপনার পরিবারের লোক অপরের কৃপাকণায় বর্দ্ধিত হয়, যাহার নিজের আত্মীয়ের ভার অপরকে লইতে হয়—

সুরেন্দ্রবাবুর দলস্থ লোক ঘন ঘন করতালির শব্দে সভামণ্ডপ ধ্বনিত করিতে লাগিল। অবশ্য বক্তৃতা হিন্দুস্থানী ভাষায় হইতেছিল। হিন্দুস্থানীরাও মন্মথর কথা কতকটা শুনিয়াছিল। তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ হাসিল। বক্তা নলিনবাবু উৎসাহ পাইয়া আবার বলিতে লাগিলেন—যে আপনার সংসারে কর্তৃত্ব করিতে পারে না সে এই বৃহৎ পরিবারের নেতৃত্ব কিরূপে বহন করিবে তাহা আপনারা বিচার করুন। (হাস্যধ্বনি) আমি কাহারও নামে কিছু বলিতেছি না, মানহানির আইন বড় কড়া (হাস্যধ্বনি) তবে আপনাদের একবার জিজ্ঞাসা করি, ঐ যে ফুট ফুটে ছেলেটি সভামণ্ডপে বসিয়া আছে—উহার সহিত কাহার রক্তের সম্পর্ক তাহা কি আপনারা জানেন? কিন্তু একবার যদি সন্ধান লয়েন তো বুঝিবেন উহার অঙ্গের বহুমূল্য শাল, উহার পায়ের বিলাতী পম্পশু জুতা, উহার বহুমূল্য কোট, এমন কি উহার মণিবন্ধের রূপার ঘড়ি—এ সকল কি উহার মাতুলের স্নেহের উপহার, না—

সুরেন্দ্রবাবুর দলের লোক আনন্দে করতালি দিল। অধরবাবুর গুপ্তচরদিগের পক্ষে সভাস্থলে অপেক্ষা করা অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠিল। বক্তা বলিল—ইংরাজের আইন বড় কড়া। আমি নিজে আইনজীবী। চোরকে চোর বলিলে মানহানি করা হয়। তাই আপনাদিগকে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেছি না। কেবল জিজ্ঞাসা করিতেছি—মনে মনে বুঝুন এ সকল কাহার উপহার ?

অধরবাবুর দলের অবিনাশের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। সে চিৎকার করিয়া বলিল—ও ছোকরার শ্বশুরের দান।

এত বড় সাহসের কথা শুনিয়া অধরবাবুর দলের লোক উত্তেজিত হইল। একজন বলিল—ওরে বেটা কানায়ে ভাগনেকে ঘর থেকে কেন তাড়িয়েছে জানিস—সে সব কুলের কথায় কাজ নেই।

অবিনাশ বলিল—জানিরে বেটা জানি। জামাই পুষেছে কেন তাও জানি।

এক্ষেত্রে অপরাধীর শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। একজন অবিনাশকে একটা ঘুষা মারিল। অবিনাশও তাহাকে প্রহার করিল। প্রত্যেক দলের দুই একজন করিয়া জুটিল। খুব ঘুষাঘুষি লাঠালাঠি চলিল—শেষে অধরবাবুর দলের তিন চারিজন লোক রক্তাক্ত দেহে সভাস্থল ছাড়িয়া পলায়ন করিল। সভা পণ্ড হইল।

মন্মথ হাসিতেছিল। সে প্রাণে বেশ বিমল আনন্দ ভোগ করিতেছিল। মামুদপুরের প্রত্যেক বাঙ্গালী যে মূর্খ ও নির্ব্বোধ সে বিষয়ে তাহার আর কোনও সন্দেহ রহিল না।

হিন্দুস্থানীদিগের প্রাণে বড় আনন্দ হইল। বাঙ্গালীরা দিন দিন উচ্চস্থান ভ্রষ্ট হইয়া মূর্খের মত ব্যবহার করিতেছিল, তাহাদের গর্ব্বিত জাতির অধঃপতন হইতেছিল, ইহা দেখিয়া জনকতক হিন্দুস্থানী উকীল বড় তৃপ্তি অনুভব করিল। সহর হইতে বাঙ্গালীগুলা বিদায় না হইলে তাহাদের জাতীয় অভ্যুদয়ের কোন উপায় নাই এই অদূরদর্শী হিন্দুস্থানীর দল তাহা দিব্য চক্ষে দেখিতেছিল। বাঙ্গালীর নিকট তাহাদের সমাজ অশেষ প্রকারে ঋণী একথা তাহারা আদৌ স্বীকার করিত না।

(৫)

সহরে আরও হুলস্থুল পড়িয়া গেল। শেষে কলঙ্ক-কাহিনী আদালত অবধি গড়াইল। অধরবাবু নলিন বাবু উকীলের নামে মানহানির মোকদ্দমা উপ-

স্থাপিত করিলেন। দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়াছে বলিয়া পুলিস প্রতি পক্ষের ছয় জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিল। বাঙ্গালীকে গ্রেপ্তার করিবার সুখ হিন্দুস্থানী মুসলমান দারোগা অদ্যাবধি পায় নাই। সে মহা দম্ভে মহোল্লাসে এ কার্য্য সমাধা করিল। সহরময় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বাঙ্গালী যে একটা উচ্চশ্রেণীর জাত হিন্দুস্থানী মুদি, গোয়ালা, ধোবা, নাপিত, কুলি, মজুর সে বিষয়ে সন্দিহান হইল। ইহারাও দাঙ্গা হাঙ্গামা করিতে পারে এবং পুলিস ইহাদিগকেও ধরিতে পারে মামুদপুরের নিরীহ অজ্ঞ অধিবাসীর মস্তিষ্কে সে কথাটা প্রবেশ লাভ করিল। শিক্ষিত হিন্দুস্থানী সমাজ ঈর্ষাবিষে জর্জ্জরিত ছিল। তাহারা মনের আনন্দে হাসিল। তাহাদের পরস্পরের বাঁধনটা আরও দৃঢ় হইল। কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ দলাদলি রেষারেশি, মানসিক সঙ্কীর্ণতা ব্যক্তিগত ঈর্ষার প্রভাবে ছিন্ন ভিন্ন হইল—আদর্শ-বিচ্যুত হইয়া গৌরবের উচ্চ-শিখর হইতে নিপতিত হইল। জ্ঞানবান যশস্বী প্রবীণ উকীলগণ পরস্পরের অধঃপতন কামনা করিয়া নিজেদের শক্তির অপচয় ঘটাইতে লাগিল। উভয় দলই রণবাদ্য বাজাইয়া মোকদ্দমার জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিল। প্রতি পক্ষে অনেক অর্থব্যয় হইল। মন্মথ শিক্ষিত না হইলেও কলিকাতার ছেলে—স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান। সে ভাবিল—আবাগের বেটারা কি মূর্খ! কি নীচ! এদেশে এসে মজাটা মন্দ হল না। বেশ আগুন জ্বলে উঠেছে। এবার পলায়ন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সে মুখ ভার করিয়া, প্রাণের মধ্যে হাসি লুকাইয়া ধীরে ধীরে সুরেন্দ্র বাবুর নিকট উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন—এস বাবা!

সে গদগদ কণ্ঠে বলিল—দেখুন আপনার দেনা আমি শোধ দিতে পারব না। কিন্তু আমার জন্যে আপনাকে এতটা সহ্য করতে হ'চ্চে এটা বড়ই কষ্টের কথা। আমার মামা বড় নীচ, বড় খারাপ লোক। আমাকে বিদেয় দিন।

সে সুরেন্দ্র বাবু প্রদত্ত রেশমের রুমাল চক্ষে দিয়া ক্রন্দনের ভাণ করিল। সুরেন্দ্র বাবুর প্রাণ গলিয়া গেল। সে বলিল—ছিঃ বাবা ওরকম মনে করতে আছে। মামলায় আমাদের নিশ্চয় জয়লাভ হ'বে। নলিনের বিরুদ্ধে অধর যে মামলা করেছে সে তো তোমার সাক্ষীতে একেবারে উড়ে যাবে। আর মারপিটের মামলাতেও আমাদের জয় হ'বে। বেল্লিকদের এবার শিক্ষা দিতে হ'বে।

মন্মথ আবার হইল। আরও খানিকটা ভণ্ডামির অভিনয় করিয়া প্রস্থান করিল। মামুদপুরে বাস করিয়া তাহার শরীর বেশ সবল ও লাবণ্যময় হইয়াছি

মেজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং উভয় পক্ষকে মামলা রফা করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। নিরপেক্ষ বাঙ্গালীর দল উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দের নিকট ছুটাছুটি করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও সুফল ফলে নাই। উভয় পক্ষ উন্মত্ত হইয়াছিল উভয় পক্ষ রক্তলোলুপ হইয়াছিল। প্রত্তিপক্ষ ভাবিতেছিল বিজয়-লক্ষ্মী তাহাদের দিকে।

মামলার শুনানি আরম্ভ হইয়াছিল। অধর বাবু শপথ করিয়া কাঠগড়ায় উঠিয়া বলিয়াছিলেন মন্মথের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। সুরেন্দ্র বাবুর বাটীতে মজলিস হইয়াছিল। নলিন বাবুর মনে মনে একটু ভয় হইয়াছিল। কি জানি যদি শাস্তি হয়। আইন আদালতের কথা তো কিছু বলা যায় না। মন্মথের উপর তাহার সন্দেহ হইতেছিল। কলিকাতার ফাজিল ছেলে! সে বলিল—কি হে মন্মথ?

মন্মথ বলিল—মশায়, কলিকাল! ঘোর কলিকাল! বেটা মহা কালনিমে বাবা, সব প্রমাণ করে দ'ব।

সুরেন্দ্র বাবু উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—বাবা পুকুর চুরি। একেবারে অস্বীকার! কি হে মন্মথ ঠিক প্রমাণ করে দিতে পারবে তো?

মন্মথ বলিল—আজ্ঞে ঠিক্ পারবো বেটার সাত পুরুষের ইতিহাস বলে দব। আমার দাদা মশায় ছেলেবেলায় মামাকে হাঁদা বলতেন।

একটা হাসির রোল উঠিল। একজন বলিল—সত্যিই হাঁদা। হাঁদা নয় হোঁৎকা। বয়াতের জোরে ক'রে খাচ্ছে।

এইরূপ বাদানুবাদ চলিতেছিল এমন সময় একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ি সুরেন্দ্র বাবুর দ্বারে আসিল। দুইটি ভদ্রলোক মোটঘাট লইয়া নামিলেন। একজন গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—মশায় এটা কি সুরেন্দ্র বাবু উকীলের বাড়ী।

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন—আজ্ঞে হাঁ কোথা থেকে আসছেন?

অপর ভদ্রলোক গাড়ির ভাড়া দিয়া গৃহে আসিলেন। তিনি বলিলেন—মশায় আমরা কলকাতা থেকে আসছি। এঁর নাম হরিশচন্দ্র মিত্র। ইনি হাইকোর্টের উকীল। আমি ইঁহার বন্ধু। আমিও হাইকোর্টের উকীল।

সকলে আগন্তুকদ্বয়কে অভ্যর্থনা করিল। সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন—মহাশয়দের শুভাগমনের উদ্দেশ্য।

হরিশ বাবু বলিলেন—মশায় ছ'মাস ধরে আমার একমাত্র ছেলের জন্যে বড় ভুগছি। ছেলেটা একটু ব'কে গেছে। সামান্য টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে পালায়। ছ'মাস ধরে নানা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি, অনেক জায়গায় লোক পাঠিয়েছি কিন্তু কোন সন্ধান পাইনি। কাল এই পত্র পেয়েছি।

সকলে বিস্মিতভাবে হরিশ বাবুর মুখের দিকে চাহিল। সুরেন্দ্র বাবু পত্র পাঠ করিয়া ক্ষিপ্তের মত দাঁড়াইয়া উঠিল। উচ্চৈঃস্বরে বলিল—হাঁ! জুয়াচোর ছেলে! বদমায়েস! মন্মথ! মন্মথ!

মন্মথ কক্ষান্তরে পলাইয়াছিল। তাহার প্রকৃত নাম সুকুমার মিত্র। সকলে আগ্রহে পত্র লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল। সাধারণের অবগতির জন্য নলিনবাবু পত্রখানি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিল। পত্রে লেখা ছিল—

"বাবা, আমি এই দেশে আসিয়া পড়িয়াছি। প্রথম দিন পথে একটি মোটা লোক দেখিয়া মজা করিবার জন্য এবং একটু আশ্রয় পাইবার জন্য তাহাকে 'মামা' বলিয়া ডাকিয়াছিলাম। লোকটা বিরক্ত হল কিন্তু অপর একজন লোক আমাকে যত্ন করে সুরেন্দ্র বাবু বলে একজন উকীলের কাছে নিয়ে এল। এরা আমাকে খুব আদর যত্ন করছেন এত সুখে রেখেছেন যে বলবার কথা নয়। ভাল ভাল জামা কাপড় জুতা মোজা কিনে দিয়েছেন। কিন্তু আমার উপর দয়া ক'রে না—সে 'মামা' লোকটার ওপর দ্বেষ ক'রে। লোকগুলা পাগল। আমি সেই মামা উকীলটার ভাগ্‌নে এই রকম ভুল ক'রে এরা সব দাঙ্গা হাঙ্গামা করেছে, মামলা মোকদ্দমা করেছে। এরা সব উকীল—কিন্তু ভারি মুর্খ। কাকে কাণ নিয়ে গেলে এরা কাকের উদ্দেশে দৌড়ায় কাণে হাত দিয়ে দেখে না। আমি আর এদের দেশে থাকব না। এবার মন দিয়ে লেখাপড়া করব। আপনার পায়ে পড়ি। আমায় নিয়ে যান। আমি আর পালাব না। এদের কাছ থেকে পালাবার উপায় নাই। সদা সর্ব্বদা সঙ্গে লোক থাকে। বাবা পায়ে পড়ি নিয়ে যান অপরাধ মাপ করুন। বাবা মাপ্ করুন। মাপ করুন। মাকে প্রণাম দেবেন।

হতভাগ্য পুত্র

সুকুমার মিত্র।

সকলেই কৃতবিদ্য। সকলেরই শিক্ষা হইল। নিরপেক্ষ দল উভয়পক্ষের মিলন ঘটাইল, সকলে বুঝিল একটা সামান্য 'বকাটে' ছেলের যে বুদ্ধি আছে তাহাদের পাকা মাথায় সে বুদ্ধি নাই। সুকুমারের পত্রে সকলের চমক ভাঙ্গিল। মামলা মোকদ্দমা রফা হইয়া গেল।

মামুদপুরে বাঙ্গালী সমাজ আবার প্রতিষ্ঠালাভ করিল।

বিদায় লইবার দিন হরিশ বাবু সলজ্জভাবে বলিলেন—মশায় ক্ষমা করবেন। আমার এই হতভাগা ছেলের জন্যে আপনাদের যথেষ্ট কষ্টভোগ করতে হ'য়েছে।

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন—সে কি হরিশ বাবু! আপনার ছেলে আমাদের যে শিক্ষা দিলে তার দাম ক্রোর টাকা। আমরা ঝগড়া আপনার ছেলের জন্যে করিনি ঝগড়া করেছিলেম স্বভাবে।

অধর বাবু বলিলেন—আপনার ছেলে না এলে আমরা কুকুর শেয়াল নিয়ে কামড়া কামড়ি করতাম।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

তন্ত্রসাহিত্যে রসায়ন।

তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত রসায়ন সাহিত্যিক সমাজে এখন আর অপরিচিত নহে। স্বর্ণসিন্দুর, রসসিন্দুর প্রভৃতি সর্ব্বজনপরিচিত বিষয়ের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। অদ্য মাতৃকাভেদতন্ত্রোক্ত দুইটি বিরলপ্রচার বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। এই সকল প্রক্রিয়ায় পূজা, হোম, জপ প্রভৃতি শান্তি স্বস্ত্যয়নের বিধান আছে; আমি তাহার উল্লেখ না করিয়া কেবল বস্তুসংযোগ প্রণালীর উল্লেখ করিব। পাঠকগণের মধ্যে কাহারও ঔৎসুক্য থাকিলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। আমি রসায়নবিৎ নহি, কাজেই ইহাদের সংযোগফল কিরূপ হইবে জানি না; নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিবারও অবসর পাই না।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে পারদদ্বারা শিবলিঙ্গনির্ম্মাণ অভিহিত হইয়াছে;— প্রস্তরনির্ম্মিত খলে স্থাপিত পারদে নির্জ্জল ঝিণ্টী পত্ররস মিশ্রিত করিয়া (ঝিণ্টী অনেক প্রকার, কোন ঝিণ্টীর রস দিতে হইবে তাহার উল্লেখ নাই) উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে কর্দ্দমবৎ হইবে। এই কর্দ্দমবৎ পারদ নির্ম্মাণোপযোগী না হইলে পুনঃ পুনঃ ঝিণ্টী পত্ররস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ঘন কর্দ্দমবৎ হইলে তাহা দ্বারা শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিবে। পরে ইহাকে ঝিণ্টী পুষ্প ও বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া ঘুঁটের আগুনে ঈষৎ উত্তপ্ত করিলে দৃঢ়তর হইবে।

তাম্রকে রৌপ্যে পরিণত করিবার প্রণালী :—কোন পাত্রে (পাত্রের বিষয় বিশেষরূপে উল্লিখিত হয় নাই, সম্ভবতঃ মৃৎপাত্রে) আশিতোলা কৃষ্ণাধেনুর দুগ্ধ রাখিয়া তাহাতে দুইতোলা বিশুদ্ধ সখল (আর্সেনিক) বস্ত্রাবৃত করিয়া সূত্রদ্বারা ঝুলাইয়া রাখিয়া অগ্নিদ্বারা মন্দ মন্দ তাপ দিবে। দুগ্ধ অর্দ্ধাবশেষ হইলে নামাইয়া তাহা হইতে সখল তুলিয়া জলে রাখিবে। পরে শীতল সখল অগ্নির উপর ধরিলে যদি ধূম নির্গত না হয় তবেই কার্য্যোপযোগী হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পরে দেড়তোলা বিশুদ্ধ তাম্র আগুনে পোড়াইয়া অগ্নিবর্ণ করিয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বিশোধিত সখল একরত্তি নিক্ষেপ করিলে তাম্র রৌপ্যাকারে পরিণত হইবে। ইহাতে রূপালী গিল্টী হইবে কি?

শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

সাহিত্য-সমাচার।

নারায়ণ।—মাঘ, ১৩২১। সাগর সঙ্গীতের কবি, সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, এই নূতন মাসিক পত্রের সম্পাদক। ছাপা কাগজ, অতি উৎকৃষ্ট। "নারায়ণ" নূতন প্রকাশিত হইলেও ইহাতে চিত্রের উৎপাত নাই দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। স্বদেশীয় চিত্র-শিল্পের উন্নতির চেষ্টা আকাঙ্ক্ষণীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ কালকার মাসিক পত্রে ছবি নামে যাহা ছাপা হয়, তাহার সার্থকতা কোথায়, জানি না। প্রথমেই শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরীর কবিতা—"রাসলীলা"। কবিতাটির শেষ অংশ মন্দ নয়। কিন্তু আরম্ভের—

"প্রেমের পরশ আজি অতনু কনক রূপে
মিকুঞ্জ-হৃদয়ে পশি' ঢালে মধু চুপে চুপে।"

এই 'ভাগবতী' আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা, সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত না করিলেই ভাল হইত। 'মলয়' পর্ব্বত বিশেষের নাম, তাহার ত প্রকাণ্ড তনু; কবির লেখনীরূপ মহাস্ত্রের আঘাতে পাহাড়ও 'অতনু' হইল! শ্রীযুক্ত সুরেশ সমাজপতি লিখিত "সে কালের স্মৃতি" চিত্তাকর্ষক। এ স্মৃতি, সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের। "ভাষার কথা"—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসুর রচনা। লেখক বলিতেছেন, "কথাটা হ'চ্ছে এই, যে ভাষাবিজ্ঞানেই—Philologyতেই বলুন বা সাহিত্যেই Literature এতেই বলুন, কোনও খানেতেই এক বাঁধা নিয়ম, চিরকাল খাট্‌বে না। যখন যেটার চেষ্টার সাহায্যে ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হবে, প্রতিভাশালী লেখক তখনই তাহার সাহায্যে অগ্রসর হবেন। যেখানে একটা চল্‌তি কথায় ভাবটা ঠিক প্রকাশ করা যায়, সেখানে ঘুরিয়ে সংস্কৃত (?) শব্দ ব্যবহার কর্‌তে কেহই রাজী হবেন না। এটা মানসিক শৈথিল্যের জন্য নয়, ভাবের স্ফূর্ত্তির জন্য। ভাষার ধারা দেশ-দেশান্তর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে; অনেক নূতন শাখানদী অনেক নূতন সম্পদ্ এনে যোগ দিচ্ছে—পর্ব্বত-বন্ধুর হিমাচল ক্রোড় থেকে শস্য-শ্যামলা বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত,

বিভিন্নরূপে একই নদী দ্বারা পুষ্ট হচ্ছে।" প্রতিভাশালী লেখক 'ভাবটা ঠিক প্রকাশ' করিবার জন্ত 'শস্য শ্যামলা বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত' লিখিতে 'অগ্রসর' হইয়াছেন। "পর্ব্বত-বন্ধুর হিমাচল ক্রোড় থেকে—" ইত্যাদি 'সংস্কৃত' (যাহাকে সং করা হইয়াছে) ভাষার ছটা দেখিয়া বিশারদের সেই "শকটচড়া গাড়ারোহণ পড়িব সমাস ক'রে"—মনে পড়িয়া যায়। "চিরকিশোর"—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের কবিতা। প্রায় সকল মাসিক পত্রেই ইহার কবিতা দেখিতে পাই। কল্পনা-রাণী বহুপ্রজ হইলে যে দোষ হয় এই কবিতাটী তাহা হইতে অব্যাহতিলাভ করিতে পারে নাই। শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পৌরাণিকী কথা'য় ভগবানের অবতার-তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। 'বৌদ্ধ-ধর্ম'—শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লিখিত ধারাবাহিক প্রবন্ধ। শাস্ত্রী মহাশয়, বহুদিন পরে আবার বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন দেখিয়া সুখী হইলাম। "দান"—শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর একটী কবিতা। 'মাকে থাকা'—শ্রীমতী সরযূবালা দাসগুপ্তার ভগবানের প্রতি মানসিক উচ্ছ্বাস। "কল্যাণী" শ্রীযুক্ত হরিদাস ভারতীর লিখিত একটী গল্প। ইহাতে কোনও শিল্প কৌশলের পরিচয় পাইলাম না। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষালের "প্রাচীন বাঙ্গালা নাটক", সুলিখিত প্রবন্ধ। লেখক, এই প্রবন্ধে বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রথম নাটক "ভদ্রার্জ্জুনের" পরিচয় দিয়াছেন। 'বিরহে' শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাসের কবিতা। "নারায়ণ"র একটী কবিতাতেও কোনও বিশেষত্বের আভাস পাইলাম না। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব" প্রবন্ধে ভক্তি সম্বন্ধে মহাপ্রভুর মত লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। ইদানীং এইরূপ প্রবন্ধ-প্রচারের আবশ্যকতা আছে। বিপিন বাবু এই সকল তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিলে অনেক নূতন কথা শুনিতে পাইব বলিয়া আশা করি। সম্পাদক মহাশয়ের "নারায়ণ"-সেবা সার্থক হউক।

বিজয়া।—অগ্রহায়ণ, ১৩২১। "বিজয়া"র নিয়মিত প্রকাশের ব্যতিক্রম দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। প্রথমেই কালীঘাটের পটের মতন ইউ নাগের একখানি ছবি। "মহালয়া" শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের লিখিত একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ। লেখক, পিতৃতর্পণের মাহাত্ম্যসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এরূপ ভাবের সন্দর্ভ যতই প্রকাশিত হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। 'ব্যর্থ প্রণয়' শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত গল্প। ইহা একটী ইংরাজী গল্পের মাবিশ অনুবাদ। লেখক, বেওয়ারিশ বাঙ্গালা ভাষার মাসিক-সপিণ্ডনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। "শুভ্রবেণী ব্যারণেসের উপর দৃষ্টি—" "তাহার বন জঙ্গল মনোহর তাহার সূর্য্যোদয়, গোধূলির ছায়ালোকের মধুর মিলন আর তাহার চাঁদিমা!" 'জোছনা সিঞ্চন করিয়া' "রমণীর মনটী বড় ভাল; সহানুভূতির দোলায় তাহা সর্ব্বদা দোদুল্যমানা বর্ষীয়সী কুমারী সুলভ আত্মদমনের অক্ষমতা তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যমান ছিল।" "মূর্ত্তি দুইটী যেন রূপসী পথে চলিয়া আসিতেছিল।" "সে পঞ্চদশীরও যেমন পঞ্চাশত্তীরও তেমনি" "তাহার স্বাগত চিন্তা আবার কর্ণগোচর হইল" (রঙ্গালয়ের অভিনেতার 'স্বগত চিন্তা কর্ণগোচর' হইতে পারে বটে, রঙ্গালয়ের বাহিরে বাস্তব জগতেও কি 'চিন্তা' এইরূপ 'কর্ণগোচর' হয়?) ইত্যাদি অদ্ভুত ভাষায় রচিত গল্পটী পড়িয়া মনে হইল, এই সকল দুর্দান্ত লেখকের হস্ত হইতে জননী

বোপদেব।

[লেখক—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন।]

(২)

আপত্তি উঠিতে পারে, মহারাষ্ট্রে বৈদ্য বলিয়া কোনও জাতি নাই, মহারাষ্ট্র দেশ যখন বোপদেবের জন্মভূমি ও লীলা-নিকেতন তখন বোপদেবকে কি করিয়া বৈদ্য বলা যায়? প্রথম উত্তরে বলিতে পারি, মহারাষ্ট্রে এক্ষণে বৈদ্য নাই, তাহা দ্বারা কি বলিতে পারি, অতীতকালেও মহারাষ্ট্রে বৈদ্য ছিল না? আমাদিগের গ্রামে একটি করণ-পল্লী ছিল, সেই পল্লীবাসী করণেরা কুঁদের কাজ করিত। আমাদিগের গ্রাম বলিয়া নয়, রঙ্গপুরে অন্যত্রও এই জাতির বাস ছিল, কুঁদের কাজ তাহাদিগের একচেটিয়া ছিল। এক্ষণে রঙ্গপুরের কুত্রাপি এই জাতির সদ্ভাব নাই, দেখিতে দেখিতে কালের অমোঘ শাসনে এই জাতিটি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কুম্ভকারের উপরে যেরূপ কালের তীব্রদৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহা দ্বারা রঙ্গপুরে এ জাতিরও বংশবিলোপের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। কি করিয়া বলিব, বাঙ্গলায় করণের ন্যায় মহারাষ্ট্রেও এই ভাবে সম্প্রতি বৈদ্যের সত্তা বিলুপ্ত হয় নাই?

বোপদেবের জন্মভূমি মহারাষ্ট্র, ইহার প্রমাণ কি? মনীষী ভাণ্ডারকর যে প্রমাণের বলে বোপদেবকে মহারাষ্ট্রবাসী বলিতেছেন, সে প্রমাণের বলে তাঁহার জন্মভূমি মহারাষ্ট্র প্রতিপন্ন হয় নাই, বরং তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। সেই প্রমাণটি বোপদেবের রচিত "শতশ্লোকী" নামক কবিতা পুস্তক হইতে উদ্ধৃত। সেই প্রমাণটি উদ্ধৃত করিয়া পরে আলোচনা করিব। প্রথমতঃ তদ্ভিন্ন অন্য ২।১টি প্রমাণের বলে যে তাঁহাকে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বলা হয়, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

বোপদেবের একমাত্র "মুগ্ধবোধ" ব্যাকরণ রচিত নয়। তিনি একজীবনে যতগুলি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, সংস্কৃত সাহিত্যে এতগুলি পুস্তকের রচয়িতা অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, কবিকল্পদ্রুম, কাব্যকামধেনু, ত্রিংশচ্ছ্লোকী, অশৌচসংগ্রহ, ধাতুবোধ, ধাতুপাঠ, পরমহংসপ্রিয়া, পরশুরামপ্রতাপ টীকা (শ্রাদ্ধকাণ্ড)

শ্রাদ্ধকাণ্ডদীপিকা, ভাগবতপুরাণদ্বাদশস্কন্ধানুক্রম, মহিম্নঃ স্তবের টীকা, মুক্তাফল, রামব্যাকরণ, শতশ্লোকী, শতশ্লোকীচন্দ্রকলা, শার্ঙ্গধরসংহিতা গূঢ়ার্থদীপিকা, সিদ্ধমন্ত্রপ্রকাশ, হরিলীলা, হৃদয়দীপনিঘণ্টু, বোপদেবশতক, শীঘ্রবোধ ব্যাকরণ— এই সমস্ত পুস্তকগুলি বোপদেবের রচিত। এতগুলি পুস্তক লিখিয়া বোপদেব তাৎকালিক বিদ্বৎসমাজে ভূবৃহস্পতি ও ভূনাগেন্দ্র নামে সম্মানিত হইয়াছিলেন। এতদ্‌ভিন্ন হয় ত আরও তাঁহার প্রণীত অনেক পুস্তক আছে, আমরা তাহার অনুসন্ধান পাই নাই। দেবরাজ গিরিরাজ রামচন্দ্রের প্রধান মন্ত্রী ও প্রসিদ্ধ স্মৃতিসংগ্রহ চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণির রচয়িতা হেমাদ্রির অনুরোধে বোপদেব হরিলীলা ও মুক্তাফল এই গ্রন্থদ্বয় লিখিয়াছিলেন। সেই মুক্তাফল গ্রন্থে—"বিদ্বদ্ধনেশশিষ্যেণ ভিষক্‌কেশবসূনুনা। হেমাদ্রির্ব্বোপদেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ"॥ এই কবিতাটি আছে। আবার হরিলীলা গ্রন্থেও আছে,—

"শ্রীমদ্‌ভাগবতস্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে।
বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রিহেমাদ্রিতুষ্টয়ে"।

দেবগিরি (দৌলতাবাদ) দক্ষিণাপথে অবস্থিত; সুতরাং তাহার রাজা ও মন্ত্রী মহারাষ্ট্রীয়। সেই মন্ত্রীর আদেশে বোপদেব যখন পুস্তক লিখিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে, বোপদেবও সেই রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। দেশের উপরে, দেশবাসীর উপরে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ আসক্তি; স্বদেশবাসী পণ্ডিতকে ত্যাগ করিয়া বিদেশী পণ্ডিতকে দেবগিরিরাজ কখনই সভাপণ্ডিত করেন নাই। বিশেষতঃ এক্ষণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রভাবে ও সুশাসনে পথঘাট যেরূপ নিরাপদ হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। এক্ষণে যেরূপ সর্ব্বত্র রেলওয়ের বিস্তার হইয়াছে, পূর্ব্বে তাহা ছিল না, সুতরাং সুদূর বঙ্গদেশ হইতে কাহারও পক্ষে পদব্রজে সেই আপৎসঙ্কুল দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া দূরবর্ত্তী দেবগিরি যাওয়া সম্ভব ছিল না; সুতরাং বোপদেবকে বাঙ্গালী প্রমাণিত করা অসম্ভব।

আমরা এই আপত্তিটির উত্তরে এইমাত্র বলিতে চাই যে, বোপদেব দেবগিরি-রাজ রামচন্দ্রের সভাপণ্ডিত হইলে তাঁহার কোন না কোন পুস্তকে দেবগিরিরাজ রামচন্দ্রের অন্ততঃ যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ থাকিত; তাহা নাই কেন? হেমাদ্রি কিন্তু তাহার চতুর্ব্বর্গচিন্তামণিতে রাজার যথেষ্ট গুণগাথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। বোপ-দেবের পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে হেমাদ্রির অনুরোধে যে দুইখানি পুস্তক লিখিত হইয়াছিল, সেই পুস্তক দুইখানির (হরিলীলা ও মুক্তাফলের) হেমাদ্রি স্বয়ং টীকা করিয়াছেন। সেই টীকাদ্বয়ে দুইটি শ্লোক আছে, শ্লোক দুইটি এই—

হরিলীলাবিবেকোঽয়ং কামরাজস্য বেশ্মনি।
কটকে রচয়াঞ্চক্রে তুষ্ট্যৈ হেমাদ্রিণা সতাম্॥
টীকাং মুক্তাফলস্যেমাং নাম্না কৈবল্যদীপিকাম্।
হেমাদ্রিঃ কটকে চক্রে কামরাজস্য বেশ্মনি॥

এই শ্লোক দুইটি দেখিয়া বুঝা যায়, দেবগিরিরাজ রামচন্দ্রের প্রাসাদে বা দেবগিরিতে এই টীকা দুইখানি লিখিত হয় নাই; কটকে কামরাজের গৃহে হেমাদ্রি এই টীকা দুইখানি লিখিয়াছিলেন। এই কামরাজ কটকের রাজাও হইতে পারেন বা কামরাজ নামধেয় অন্য কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও হইতে পারেন। দেবগিরিরাজের প্রধান মন্ত্রী হেমাদ্রির পক্ষে তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে শ্রীপুরুষোত্তম দর্শনের উদ্দেশে পুরী যাওয়া অসম্ভব নয় এবং সে স্থান হইতে অন্যান্য দেবদর্শন মানসে ভুবনেশ্বর ও কটক যাওয়া অসম্ভব নয়। সে সময়ের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে দীর্ঘপথ ও সেই পথক্লেশ অনুভব করিতে অসমর্থ ছিলেন। সে সময়ে দলে দলে বঙ্গের নরনারী জগন্নাথ দর্শন লালসায় অনায়াসে পদব্রজে বঙ্গের সন্নিহিত পুরীধামে নিয়ত গমন করিতেন। কে বলিবে,—বৈষ্ণব চূড়ামণি বোপদেবের পক্ষে তাহা ঘটে নাই? মহাপ্রভু চৈতন্যদেব মহানদী পার হইয়া ভূতলে পতিত হয়েন ও গড়াইতে গড়াইতে কটকে উঠিয়া মহাদেবের অনাদি লিঙ্গ দর্শন করেন সেই অবধি সেই অনাদি লিঙ্গের নাম গড়-গড়েশ্বর হইয়াছে। বোপদেবও সেই দেব-দর্শনের উদ্দেশে কটক যাইতে পারেন। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বোপদেবের সেই প্রসঙ্গে গুণজ্ঞ হেমাদ্রির সহিত সাক্ষাৎও হইতে পারে। পরে উভয়ের গুণে উভয়ের মুগ্ধ হওয়া ও পরস্পর পরস্পরের সৌহার্দ্দ হওয়া অসম্ভব নয়। হেমাদ্রির অনুরোধে কিয়দ্দিনের জন্য সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া হয় ত আবার তাঁহারই অনুরোধে বোপদেব মুক্তাফল ও হরিলীলা লিখিয়াছেন। গুণমুগ্ধ হেমাদ্রিও আবার সেইখানে বসিয়া বোপদেবের অবস্থিতির সময়েই পুস্তকদ্বয়ের টীকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিশ্ববিখ্যাত চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি পাঠ করিলে জানা যায় যে, মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ হেমাদ্রি কেবল রাজকার্য্য পরিচালনায় সুদক্ষ ছিলেন এরূপ নয়, পাণ্ডিত্য ও কবিত্বেও তিনি অসাধারণ ছিলেন। কিন্তু যাঁহার অনুরোধে মুক্তাফল ও হরিলীলা লিখিত হইয়াছিল, প্রাগুক্ত কবিতাদ্বয়ে বোপদেব কেবল সেই হেমাদ্রির নামমাত্র উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার কীর্ত্তিগাথা বা পাণ্ডিত্য-গাথার কিঞ্চিন্মাত্রও কীর্ত্তন করেন নাই। বোপদেব কি প্রকৃতির

ছিলেন, ইহা দ্বারা আমরা অনুমান করিতে পারি। তিনি ধনীর গুণগাথা পাইয়া চাটুকার সাজিয়া পণ্ডিত ও কবির উচ্চাসন কলঙ্কিত করিতে একান্ত অসম্মত ছিলেন। এইরূপ আত্মমর্য্যাদার পক্ষপাতী—এইরূপ নির্লোভ প্রকৃতির বর শিষ্য বোপদেব যে ধনগন্ধে লুব্ধ হইয়া সুদূর দেবগিরিতে গমন করিবেন ও সহস্র লোকের উপসর্পণা দ্বারা রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া ব্যঞ্জনাবৃত্তির সহায়তায় প্রতিপদে দেবগিরিরাজ রামচন্দ্রের কর্ণসুখকর চাটুবাদের উদ্‌বমন করিবেন—এবিষয়ে একান্ত সন্দেহ।

এই জন্য অনুমান করিতে পারি, বোপদেবের সৌভাগ্যে দেবগিরি দর্শন পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। যে শতশ্লোকীর বলে মহাত্মা ভাণ্ডারকর বোপদেবকে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া অবধারণ করিতেছেন, সেই শ্লোকটির আলোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি; সেইজন্য সেই শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে, শ্লোকটি এই,—

"দেশানাং বরদাতটং বরমতঃ সার্থাভিধানং মহা-
স্থানং বেদপদং সদগ্রজগণাগ্রণ্যং সহস্রং দ্বিজাঃ।
তত্রামীষু ধনেশকেশববিদৌ বৈদ্যৌ বরিষ্ঠৌ ক্রমা
চ্চক্রে শিষ্যসুতস্তয়োঃ কৃতিমিতি শ্রীবোপদেব কবিঃ॥"

ইহার বাঙ্গালা অর্থ—বহুদেশের মধ্যে বরদাতট মহাস্থান শ্রেষ্ঠ, এইজন্য তাহার মহাস্থান এই নামটি সার্থক হইয়াছে। সেই স্থানে (অত্র) শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ (অগ্রজ) গণের আদরণীয় বেদপদ সহস্র দ্বিজ বাস করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে (অমীষু) বৈদ্য ধনেশপণ্ডিত ও কেশবপণ্ডিত ক্রমে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাদিগের শিষ্য ও পুত্র (ধনেশের শিষ্য ও কেশবের পুত্র) শ্রীবোপদেব এই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

এই শ্লোকের ব্রাহ্মণ ও দ্বিজের পৃথক কীর্ত্তন করাতে এই শ্লোকোক্ত দ্বিজ ব্রাহ্মণ নহেন, স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে। আবার তাঁহাদিগের মধ্যে বলাতে নিকটবর্ত্তি-দ্বিজপদেরই প্রাপ্তি হইতেছে। অগ্রজ (ব্রাহ্মণ) পদ দ্বিজ পদ দ্বারা ব্যবহিত, বিশেষতঃ বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া একান্ত গুণীভূত। সুতরাং কোন প্রকারেই "অমীষু" এই পদ দ্বারা "অগ্রজ" (ব্রাহ্মণ) পদের উপস্থিতি হইতে পারে না। আমরা এই পূর্ব্বোক্ত বোপদেবকে বৈদ্য বলিয়া অনুমান করিয়াছি; বলিতে হইবে,—এই শ্লোকটি সেই অনুমানটিকে আরও সুদৃঢ় ও বলবৎ করিতেছে। এই স্থলে আরও বক্তব্য যে, বাঙ্গালী ভিন্ন ভারতের অন্য

কোন প্রদেশবাসীই নিজের নামের পূর্ব্বে কদাপি "শ্রী" শব্দের কীর্ত্তন করে না"; এ জন্যও আমরা বোপদেবকে বাঙ্গালী বলিতে বাধ্য। এক্ষণে বোপদেবের জন্মভূমি ও নিবাসভূমির অবধারণ করিতে পারিলেই বোপদেব বাঙ্গালী কি মহারাষ্ট্রীয়, নিশ্চয় করা যাইতে পারে। বোপদেব প্রাগুক্ত শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে যে নিজের জন্মভূমির নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা আমরা কি বুঝিতেছি? বুঝিতেছি,—যেমন ভারতের রাজধানী বলিয়া বা সমৃদ্ধিশালিনী বলিয়া কলিকাতাকে অনেক সময়ে যে ভাবে মহানগরী বলা হয়; শুধু সে ভাবে তাঁহার জন্মভূমিকে মহাস্থান বলা হইতেছে না, সে স্থানেরই নাম মহাস্থান। আবার বরদাতটে অবস্থিত এবং সদ্‌ব্রাহ্মণ ও বেদপদ সহস্র দ্বিজাতি সেইস্থানে বাস করিতেছেন বলিয়া তাহার সেই মহাস্থান এই নামটি সার্থক হইয়াছে। এক্ষণে দেখা আবশ্যক মহারাষ্ট্র প্রদেশের মধ্যে কোন নগর গ্রাম বা পল্লী মহাস্থান নামে এক্ষণে অভিহিত হইতেছে কি না, বা পূর্ব্বে কীর্ত্তিত হইত কি না? আমরা বহু অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছি, মহারাষ্ট্রে মহাস্থান নামে কোন নগর, গ্রাম বা পল্লী এক্ষণে নাই, পূর্ব্বেও ছিল না। থাকিলে মহাত্মা ভাণ্ডারকর ও দেওস্কর মহাশয় নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ করিতেন। দেওস্কর মহাশয় মহারাষ্ট্রের যে স্থানে বোপদেবের বাস ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও অদ্যাপি যে স্থানে বোপদেবের বংশধরগণ অবস্থিতি করিতেছেন বলিয়াছেন, সে স্থানেও বরদানাম্নে বা অন্য নামে কোন নদী আছে দেখাইতে পারেন নাই। উত্তরবঙ্গে বগুড়া জেলার অন্তর্গত পুণ্যসলিলা করতোয়ার যে অংশে নারায়ণী যোগে সুদূর দেশের পর্য্যন্ত নরনারী আসিয়া নারায়ণী স্নান করিয়া ত্রিকোটী কুলের উদ্ধার সাধন করিলাম বলিয়া আত্মাকে চরিতার্থ মনে করে; করতোয়ার সেই তীরভূমির নাম মহাস্থান। এক্ষণেও এই স্থান মহাস্থান নামে পরিচিত, স্মরণাতীত কালে পৌরাণিক যুগেও মহাস্থান এই নামে আখ্যাত ও কীর্ত্তিত। যাঁহারা নারায়ণী স্নানের ব্যপদেশে, ঐতিহাসিক তত্ত্বের গবেষণায় অথবা অন্য কোন প্রয়োজনের বশে এই স্থানে শুভাগমন করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদিগের সঙ্গে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, বিপুল-সলিলা করতোয়ায় এই তীরভূমিতে মেঘচুম্বী প্রাসাদে বাস করিয়া বংশানুক্রমে কোন নৃপতি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে এক সময় ভারত বা বঙ্গ শাসন করিতেন। একদিন এই স্থানের শতপণ্যবীথিকা বহুমূল্য দুর্লভ পণ্যসম্ভারে লোকলোচনের প্রীতি ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়া জগতের সমক্ষে আত্মগৌরব ঘোষণা করিত। একদিন এই নগর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-

সহস্রের পবিত্র মুখমণ্ডল হইতে পবিত্র সামগানে সুশিক্ষিত বাদকদিগের অনবরত অঙ্গুলী-তাড়নে মুখরিত মৃদঙ্গের জলদগম্ভীর নিনাদে ও রাগ-রাগিণীতে সুপণ্ডিত কিন্নরকণ্ঠ গায়কদিগের স্বরমূর্চ্ছনায় মুখরিত হইত। একদিন বিপুল-কায়া সদানীরার ফেনিল তরঙ্গের সিন্ধুবৎ গর্জ্জনে ও সাহযাত্রিকদিগের পোতা-গমন-বার্ত্তার বিজ্ঞাপক গভীর ভেরী-নিনাদে নগরবাসীর কর্ণযুগল নিয়ত আহত ও বিক্ষিপ্ত হইত।

এক্ষণে এস্থানে আসিয়া অনুসন্ধানে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর না হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে সকল পুরাতত্ত্বের উপকরণ লাভ করিতে পারা যায়, অন্যত্র তাহা দুর্লভ। এজন্য আমরা এই পবিত্র স্থানকেই—এই মহাস্থানকেই মহাপুরুষ বোপদেবের জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্ধারণ করি। পূতসলিলা করতোয়ার বরদা নাম অসম্ভব নয়, গঙ্গা, ত্রিস্রোতা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদীর যে বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ নাম আছে তাহা অনেকেই অবগত। পৌরাণিক যুগেও ঘর্ঘরনদ অযোধ্যার নিকটে আসিয়া সরযূ নাম ধারণ করিয়াছে, সুতরাং যে স্থানে করতোয়াতে নারায়ণী যোগে স্নান হইয়া থাকে, বোপদেবের সময়ে করতোয়ার সেই অংশ-বিশেষের নাম বরদা হইতে পারে। গঙ্গার ন্যায় দেবনদীও শ্রাবণ মাসের তিন দিন রজস্বলা হইয়া সকলের অস্পৃশ্যা ও অপেয়সলিলা হয়েন; কিন্তু করতোয়া "পূতাম্বুবাহিনী"ই থাকেন, অপবিত্রা হয়েন না,—শাস্ত্রের নির্দ্দেশ; তখন সদানীরার ন্যায় করতোয়া নদীর বরদা নামটিও সার্থক বলিতে পারি।

অমরসিংহ তাঁহার নাম লিঙ্গানুশাসন নামক প্রসিদ্ধ অভিধান গ্রন্থে "কর-তোয়া সদানীরা" বলিয়া "বাহুদা সৈতবাহিনী" বলিয়াছেন। যদিও কোন টীকা-কার মহাভারতাদি গ্রন্থে বাহুদা নদী পৃথক্ উল্লেখ আছে দেখিয়া বাহুদা ও সৈতবাহিনী করতোয়ার নামান্তর নয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তথাপি আমরা অমরসিংহের মতে অমরসিংহের নিগদিত এই বাহুদা করতোয়া হইতে ভিন্ন নদী বলিয়া অবধারণ করিতে পারিতেছি না। বাহুদার ন্যায় আমরা সদানীরা নামেও এই পুণ্যভূমি ভারতে করতোয়া ভিন্ন আর একটি নদী পাই-তেছি। পূর্ব্বোক্ত যুক্তির বশে যদি অবধারণ করি যে, অমরসিংহ এই স্থলে সেই সদানীরারই নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, করতোয়ার এই করতোয়া একটি মাত্র নামই কীর্ত্তিত হইয়াছে; তাহা হইলে যে সকল নদীর দুই তিনটি নাম আছে, সেই নদীর মধ্যে অমরসিংহ করতোয়ার নামকীর্ত্তন না করিয়া যে স্থলে এক একটি নদীর নাম আছে সেইস্থলে নামকীর্ত্তন করিতেন। অমরসিংহ 'তু'

'অন্তে' 'বা' 'অথ' আদিতে দিয়া প্রায়ঃই অন্য পর্য্যায়ের আরম্ভ করিয়াছেন; এস্থলে বাহুদার নির্দ্দেশে সেই 'তু' 'বা' 'অথ' দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ নামলিঙ্গানুশাসনে কৌশিকী, গণ্ডকী, আত্রেয়ী, সরযূ প্রভৃতি বেদ, তন্ত্র, স্মৃতি, পুরাণ প্রসিদ্ধ পুণ্যসলিলা অন্য কোন নদীরই নাম নাই; এমন কি নামলিঙ্গানুশাসনে সর্ব্বজন-পরিচিত সুদীর্ঘকায় সিন্ধু ব্রহ্মপুত্রের ন্যায় মহানদের পর্য্যন্ত নামোল্লেখ হয় নাই। এইরূপ অবস্থায় পুরাণ খুঁজিয়া যাহার নাম বাহির করিতে হয়; অমরসিংহ যে সেই বাহুদার নাম বলিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন, বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

পুণ্যশ্লোক মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নামান্তর ছিল, বহুদ। তিনি বাহুদাকে অবতারিত করিয়াছিলেন বলিয়া এই নদীর নাম বাহুদা। কিন্তু বহুদ শব্দের পরে অণ বা ষ্ণ প্রত্যয় করিলে স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয় না হইয়া ঈপ্ হইবারই ব্যাকরণের বিধান; সুতরাং বাহুদা না হইয়া বাহুদী হইবারই কথা। তবে যদি অণের লোপ করা যায়, তাহা হইলে স্ত্রীলিঙ্গে আ হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে বাহুদা হয় না, বহুদা শব্দ হয়। পুরাণে আর একটি আখ্যায়িকা আছে, কোন ছিন্ন-বাহু ঋষি একটি নদীতে স্নান করিয়া বাহু পাইয়াছিলেন; তদবধি সেই নদীর বাহুদা নাম হইয়াছে। আমরা পুরাণোক্ত এই দুইপ্রকার আখ্যান দেখিয়া স্পষ্টতঃ দুইটি নদীর উপলব্ধি করিতে পারি। তন্মধ্যে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের অবতারিত নদীকে আমরা করতোয়া বলিতে চাই; তাহার নাম বাহুদা নয়, বহুদা, ইহাও বলিতে চাই। লিপিকর প্রমাদে বহুদা হইয়াছে, টীকাকারের অসাবধানতায় পরে আবার বাহুদাই অবধারিত হইয়াছে।

হস্তলিখিত দেবনাগর অক্ষরের হু এবং র এ ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে; সেই সাদৃশ্যে "বহুদাতটং" হয়ত "বরদাতটং" হইয়া গিয়াছে। সকল ভাষায় বিশেষতঃ হিন্দী ও বাঙ্গলায় মূলশব্দস্থিত তবর্গ টবর্গ অনেকস্থলে পরস্পর পরিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং বহুদার দা, ডা হইতে পারে। আবার মুগ্ধ, দুগ্ধ, দগ্ধ, দিগ্ধ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের মূল মুহ, দুহ, দহ, দিহ প্রভৃতি ধাতুর হকারের গকারে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রহ ধাতু হইতে বাঙ্গলায় প্রচলিত ক্রোধবাচক রাগ, দহ হইতে দাগ, হোড় হইতে গোড়া, হণ্ডে বা হন্তা হইতে গুণ্ডা, মহ হইতে মাগা, চহ হইতে চাগান প্রভৃতি শব্দ দেখিয়া ও বাঙ্গলার বিভিন্ন প্রদেশে একরূপ অর্থেই হমহম, গমগম হনহন, গনগন, হীন ঘীন প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখিয়া আমরা হকারের গকারে পরিবর্ত্তন হইতে পারে,—অনুমান করি। আমাদিগের এই অনুমানে যদি ভ্রম

প্রমাদ না থাকে, তবে বলিতে পারি, এই প্রচলিত বগুড়া শব্দের অন্তরালে বহুদা শব্দ মোটা কম্বলের অপভ্রংশ আবরণে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া কেবল মুখখানি বাহির করিয়া রহিয়াছে।

আমরা কবিশ্রেষ্ঠ বোপদেবের পরিচয় প্রসঙ্গ লইয়া অনেক নীরস কথার অবতারণ করিয়া পাঠক পাঠিকার অনেকটা সময়ের ক্ষতি ও ধৈর্য্যচ্যুতি করিয়াছি; উপসংহারে আর কিছু বলিতে চাই না, এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সন্দিগ্ধ রাম শব্দে পরশুরামকে বুঝায়, বলরামকে বুঝায়, দাশরথি রামকেও বুঝায়; রামলক্ষ্মণ বলিলে আর সে সন্দেহ আসে না, নিঃসন্দিগ্ধ লক্ষ্মণই রামকে নিয়মিত করিয়া দেয়। সেরূপ আমরা যখন যুগ যুগান্তর হইতে মহাস্থান নামে পরিচিত একটি পুণ্যস্থানকে পাঠক পাঠিকার সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারিয়াছি, তখন বলিতে হইবে, করতোয়া বা সেই প্রদেশের সেই নগরের সেই গ্রামের সেই পল্লীর অথবা সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী অন্য কোন নদীর সুবিস্মৃত বরদাই হউক, বা সুবিস্মৃত বহুদাই হউক বা অন্য কিছু হউক, নাম ছিল;—নিঃসন্দেহে আমরা এতটুকু প্রতিপন্ন করিতে পারি। সুতরাং বরদা বহুদা লইয়া নাড়াচাড়া না করিয়াও এক মহাস্থানবাসী বলিয়াই বোপদেবকে বাঙ্গালী বলিয়া অবধারণ করিতেছি। যতক্ষণ ইহার বিরুদ্ধে অন্য কোন বলবৎ প্রমাণ না পাইব, তৎক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদিগের এই সিদ্ধান্তই আমাদিগের মনে আধিপত্য করিবে।

অন্ধের গান।

[লেখক—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার এম্, আর্, এ, এস্।]

আঁধার ঘরের মাঝে আমার সাঁঝের বাতি জ্বেলে দাও।
ভেঙ্গে গেছে মাটির গড়া
পুরাণ সেই দেল্‌থ সরা;
আন কিরণ হিরণ-রুচি খোলাম কুচি ফেলে দাও।
কুলগ্নে আজ কি কালরাত্রি
আস্‌চে, মাগো জগদ্ধাত্রী!
তোমার অভয় হাস্য আমার অমাবস্যায় ঢেলে দাও।
বিশ্বজনে করে সাথী,
চলব আমি, জ্বল্‌বে বাতি;
পথের বাধা আঁধার রাতি পিছন পানে ঠেলে দাও।

ন্যায়রত্নের জীবন-কথা।

[লেখক—শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী।]

'শক্তিবাদরহস্যপ্রকাশ', ন্যায়শাস্ত্রের শেষ গ্রন্থকার গদাধর ভট্টাচার্য্যের রচিত 'শক্তিবাদ' নামক দুরূহ গ্রন্থের ব্যাখ্যা পুস্তক। কাশী প্রভৃতি বিদ্যাকেন্দ্রের হিন্দুস্থানী অধ্যাপকগণও ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রণীত এই 'শক্তিবাদরহস্যপ্রকাশে'র অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।

'দীধিতিকৃন্ন্যূনতাবাদে' 'ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব' গ্রন্থে রঘুনাথ শিরোমণির ভ্রান্তি ও 'গদাধর ন্যূনতাবাদে' 'সৎপ্রতিপক্ষ' গ্রন্থে গদাধর ভট্টাচার্য্যের ভ্রান্তি অতি স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়, এই দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া নৈয়ায়িক সমাজে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। এই দুইখানি গ্রন্থের অদ্যাপি কেহ খণ্ডন করিতে পারেন নাই। 'দীধিতিকৃন্ন্যূনতাবাদ' নব্যন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

'অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন-পরিশিষ্টে' অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে অবশিষ্ট যুক্তিতর্ক প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথমে আর একটী নূতন বিচার আছে। "খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য", শ্রীহর্ষ-প্রণীত এক দুরূহ দার্শনিক গ্রন্থ। আনন্দপূর্ণ, 'বিদ্যাসাগরী' নামে এই পুস্তকের টীকা রচনা করিয়াছেন। "সবিকল্পবিষয় একঃ স্থাণুঃ পুরুষঃ শ্রুতোঽস্তি যঃ শ্রুতিষু। ঈশ্বরমুময়া ন পরং বন্দেঽমুময়াপি তমধিগতম্॥" এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকের ব্যাখ্যাবসরে টীকাকার একটী অনুমানবাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ৫০ বৎসরের মধ্যে কোনও দেশের কোনও অধ্যাপক, এই অনুমান-বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। অবশেষে পণ্ডিত-সমাজে ইহা অশুদ্ধ পাঠ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় এই পুঁথির সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাখ্যা-প্রণালী তৎকৃত "খণ্ডন-পরিশিষ্টে"র প্রথমাংশে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গত ৮ই অগ্রহায়ণ কাশীধামে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিয়োগে যে বিরাট্ শোকসভা হইয়াছিল, সেই সভায় সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণের এক স্থানে বলেন যে, "পূজ্যপাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, যদি 'বিদ্যাসাগরী' টীকার ব্যাখ্যা লিখিয়া না যাইতেন, তবে চিরদিনই টীকার ঐ স্থান অসংলগ্ন থাকিত,—আমাদিগের আর ভ্রম দূর হইত না।"

"বিবিধ-বিচার" গ্রন্থে ন্যায়রত্ন মহাশয়,ন্যায়শাস্ত্রের অনুমোদিত নানা বিষয়ের বিচার করিয়াছেন। পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ, ন্যায়শাস্ত্রের যে সকল পদার্থ খণ্ডন করিয়াছেন, ন্যায়রত্ন মহাশয় যুক্তিপূর্ণ বিচারের সাহায্যে এই গ্রন্থে তাহা সংস্থাপন করিয়াছেন।

"বিধবোদ্বাহখণ্ডন" গ্রন্থে ন্যায়রত্ন মহাশয় নানারূপ সূক্ষ্ম বিচারের অবতারণা করিয়া বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ যে শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"—এই পরাশর-বাক্যে যখন "নারীণাং পতিঃ—এইরূপ ষষ্ঠ্যন্ত-সাকাঙ্ক্ষ পতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন এখানে পতিশব্দের অর্থ প্রতিপালয়িতা। পালনার্থক 'পা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন পতিশব্দ, পঙ্কজাদি শব্দের ন্যায় যোগরূঢ়। ষষ্ঠ্যন্ত সাকাঙ্ক্ষ না হইলে পতি শব্দে বিবাহিত স্বামীকে বুঝায়। আর পতি শব্দ ষষ্ঠ্যন্ত-সাকাঙ্ক্ষরূপে ব্যবহৃত হইলে তখন তাহার কেবল 'প্রতিপালয়িতা'রূপ যোগলভ্য অর্থই গৃহীত হইয়া থাকে। যেমন 'নরাণাং পতিঃ' বলিলে রাজাকে বুঝায়। সুতরাং মহর্ষি পরাশর যখন এই বচনে "নারীণাং পতিঃ"—এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন এই বচনের দ্বারা কখনই বিধবা-বিবাহ প্রমাণসিদ্ধ হয় না। কেন না, তাহা হইলে "নারীণাং"—এই অংশের ব্যর্থতাপত্তি হয়। প্রকৃতপক্ষে উক্ত পরাশরের বাক্যের অর্থ এই যে, স্ত্রীলোকের বৈধব্যাদি বিপদ্ উপস্থিত হইলে একজন অভিভাবকের অধীনে থাকিবে; কেন না স্ত্রীজাতির স্বতন্ত্রতা, শাস্ত্রে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।—"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে। বার্দ্ধক্যে চ সুতো রক্ষেৎ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥" অর্থাৎ স্ত্রীলোক, বাল্যকালে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকিবে, কোনও অবস্থাতেই তাহার স্বাধীনতা বিধেয় নহে। ন্যায়রত্ন মহাশয় এইভাবে গ্রন্থারম্ভ করিয়া "বিধবোদ্বাহখণ্ডন" পুস্তকে অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন।

এই সকল পুস্তক ভিন্ন, ন্যায়রত্ন মহাশয় নব্যন্যায়ের পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ রূপে আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। "ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব", "সিদ্ধান্তলক্ষণ", "অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তি" "পক্ষতা" "সামান্যনিরুক্তি" "শব্দশক্তি-প্রকাশিকা" প্রভৃতি গ্রন্থের উপর ন্যায়রত্ন মহাশয়ের লিখিত বিচারাবলী,তাঁহার ছাত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যেই হস্তলিখিত ভাবে প্রচারিত আছে, তাহা এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই।

ন্যায়রত্ন মহাশয়, এই সকল পুস্তক প্রথমে নিজেই স্বহস্তে লিখিতেন; পরে অন্য লোক কাপি করিয়া দিলে ছাপা হইত। জীবনে তাঁহার কখনও চশমার প্রয়োজন হয় নাই; মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বেও রাত্রিতে দীপালোকে তিনি নগ্ন চক্ষে পুঁথি লিখিয়াছেন।

বার্দ্ধক্যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কোনও ইন্দ্রিয়কেই শিথিল করিতে পারে নাই। চক্ষুর ন্যায় কর্ণও তাঁহার নির্দ্দোষ ছিল। এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তিনি আখ চিবাইয়া খাইতে পারিতেন। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার মনের বলই উল্লেখযোগ্য। রোগে, শোকে কখনও তাঁহার চিত্ত অবসন্ন হইত না। জীবনে তিনি যত শোক পাইয়াছেন, অন্য লোক হইলে ইহাতে পাগল হইয়া যাইত। জ্যেষ্ঠা কন্যা নবম বর্ষে বিধবা হইয়া এখনও তাঁহার সংসারে প্রতিপালিতা হইতেছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সর্ব্বপ্রথম সন্তানের উপনয়ন হওয়ার পর মৃত্যু হয়। আর একটী পুত্রও অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। চারিটী কন্যা ও উপযুক্ত আরও দুইটী জামাতা তাঁহার সম্মুখে লোকান্তরিত হন। সহোদর তিনটীও তাঁহার জীবদ্দশাতেই পরলোকে প্রস্থান করেন। শৈশব-সঙ্গিনী পত্নীর বিয়োগ-দুঃখও তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ছাত্র, আত্মীয়, বন্ধুবর্গ প্রভৃতি অনেকের মৃত্যু-শোক তিনি পাইয়াছেন। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় সকল শোক দুঃখের সময়েই হিমাচলের ন্যায় ধৈর্য্য স্থৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতেন,—কিছুতেই তিনি কাতর হইয়া পড়িতেন না। সকলের সহিত সমান আমোদ প্রমোদে কথাবার্ত্তা কহিতেন;—শোক দুঃখের সময়ে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে শাস্ত্রালোচনা করিতেন।

পূজনীয়-চরিত পুণ্যশ্লোক ন্যায়রত্ন মহাশয়, একমাত্র গুণবান্ পুত্র হরকুমার শাস্ত্রীকে লইয়া একরূপ সুখে দুঃখে জীবনের অপরাহ্ন অতিপাতিত করিতেছিলেন। কিন্তু নিদারুণ ভাগ্য-বিধাতার তাহাও সহ্য হইল না। ১৩১৩ সালের ৫ই বৈশাখ তাঁহার এই শেষ বংশধরটীরও অভাব হইল। এই ভীষণ অশনি-সম্পাতেও ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চিত্ত-চাঞ্চল্য লক্ষ্য করি নাই। পুত্রের অন্তিম কালে নিজে উদ্যোগী হইয়া তিনি তাহার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বুকে পাষাণ বাঁধিয়া সেই ক্রন্দন-কোলাহলের মধ্যে তিনি সিংহ-গর্জ্জনে পুত্রকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। একমাত্র বংশরক্ষককে মৃত্যুর ক্রোড়ে পাঠাইয়া তিনি ঠাকুরঘরে পূজা করিতে গেলেন। "তরতি শোকমাত্মবিৎ"—কি দৃঢ়চিত্ত আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ !! সেই অবধি একদিনও

তাঁহাকে পুত্রের জন্য শোক করিতে দেখি নাই। তিনি বলিতেন, "কাশীতে গঙ্গাগর্ভে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়া হরকুমার ইন্দ্রেরও অধিক সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়াছে, এজন্য আমি তাহার হিতৈষী পিতা হইয়া শোক প্রকাশ করিব কেন? তাহাকে শুধু দেখিতে পাইব না, এজন্য শোকার্ত্ত হওয়া অনুচিত। যদি কোনও অতিদূর দেশে গিয়া আমার পুত্র অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিত, কেবল তাহার সহিত দেখা হইবে না বলিয়া তাহাতে দুঃখিত হইতাম কি?"

শোককে যেমন ন্যায়রত্ন মহাশয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন,রোগ-যন্ত্রণাতেও তেমনই তিনি ব্যাকুল হইতেন না। গত ১৫ই আশ্বিন তিনি জ্বরাক্রান্ত হন, ৩০শে কার্ত্তিক কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর প্রদোষে দেহত্যাগ করেন। এই দেড় মাস কাল রোগভোগের সময়ে একদিনও তিনি কাহাকেও কোনরূপ শুশ্রূষা করিবার অনুমতি করেন নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পীড়ারম্ভ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্তের বিস্তৃত বিবরণ প্রবন্ধান্তরে লিপিবদ্ধ করিয়াছি (১), সুতরাং এস্থলে তাহার আর পুনরুল্লেখ করিলাম না।

কালের অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রভাবে আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়কে হারাইয়াছি—এতদিনে প্রাচীন জ্ঞান-মন্দিরের স্বর্ণচূড়া খসিয়া পড়িল। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিয়োগে আর আমরা সে কালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অনাবিল সরল চরিত্রের উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাইব না। সত্য সত্যই এতদিনে অতীত যুগের শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকু লুপ্ত হইল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় যে কেবল বিদ্যা বা বুদ্ধি-প্রতিভার গৌরবে দেশের পূজার পাত্র ছিলেন, তাহা নহে। গোপীরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বলিয়াছিল,—"রাধারমণসমানং কমপি যুবানং ন পশ্যামি।" আমরাও চারিদিকে চাহিয়া দেখি, কই তেমন মানুষটী ত আর দেখিতে পাই না। অত বড় একজন জগদ্-বিখ্যাত মনীষী, সকলের সহিত কেমন প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতেন। তাঁহার অভিমানের লেশমাত্র ছিল না। যাঁহারা দেখা করিতে আসিয়াছেন, সকলকেই যথাযোগ্য আদর, আপ্যায়ন ও আশীর্ব্বাদে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় লোককে খাওয়াইতে বড় ভাল বাসিতেন। নানা কার্য্য উপলক্ষ করিয়া প্রায়ই তিনি প্রীতিভোজনের ব্যবস্থা করিতেন। বিদেশীয় স্নেহভাজনগণ দেখা করিতে আসিলে সকলকেই তিনি পরিপাটীরূপে ভোজন করাইতেন। মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন

(১) "বিজয়া", ১৩২১, অগ্রহায়ণ-সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব প্রভৃতি কাশীতে আসিলে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাড়ীতে একদিন প্রসাদ না পাইয়া যাইতে পারিতেন না। লোককে খাওয়াই-বার সময়ে তিনি নিজে সম্মুখে বসিয়া থাকিতেন—'এটা খাও' 'ওটা খাও'—করিয়া কত অনুরোধ করিতেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত এমন পবিত্র স্নেহ-প্রবণ হৃদয় অন্যত্র দেখি নাই।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মৃত্যুতে কাশীর অনেক নরনারী অনাথ হইল। বহু লোককে তিনি নিয়মিত মাসিক সাহায্য করিতেন এবং তাঁহার কৃপায় অন্য স্থান হইতেও তাহারা অর্থোপার্জ্জন করিত। প্রতিবর্ষে দুইবার তিনি কাশীস্থ হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিতেন। পুত্রের মৃত্যুর পর হইতে তিনি বহু ভাল ভাল শাল, গরদের কাপড়, রূপার ও শ্বেত পাথরের থালা, গেলাস, বাটী প্রভৃতি পণ্ডিতদিগকে বিতরণ করিয়াছেন। এই পীড়ার সময়ে একখানি মাত্র ভাল কম্বল রাখিয়া অবশিষ্ট আর সমস্ত গাত্রবস্ত্র ও গরদের কাপড় প্রভৃতি বিলাইয়া দিয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় এই সময়ে একজন বিপন্ন ব্রাহ্মণকে ২০০৲ শত টাকা ও একটী আত্মীয়া বিধবাকে ৬০০৲ শত টাকা দান করেন। স্ববৃত্তিতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় যেরূপ দানশীল ছিলেন, তাহা প্রায়শঃ দেখা যায় না। বাড়ী ঘর ও অন্যান্য বিষয় সম্পত্তিও তিনি নিজের গৃহদেবতা নারায়ণ ও শিবকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা ভবতারিণী দেবী ও কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র কল্যাণভাজন সুকবি শ্রীমান্ সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এই দেবোত্তর ষ্টেটের সেবাইত নিযুক্ত আছেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয় বড় গুণগ্রাহী ছিলেন। যাহার যে গুণ, তাহা তিনি অকপটে ব্যক্ত করিয়া প্রশংসা করিতেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবি-সম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পীড়ার সময়ে প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। মৃত্যুর ৫।৬ দিন পূর্ব্বে পণ্ডিতরাজ আসিলে ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাকে বলিলেন, "ভায়ার সেই সুন্দর কবিতাটী একবার পড় ত।" সেই পীড়ার অত্যধিক আক্রমণের সময়েও ন্যায়রত্ন মহাশয়, পণ্ডিত-রাজের কবিতাটীর প্রথম চরণ স্খলিতস্বরে আবৃত্তি করিলেন। তিনি এইরূপ গুণমুগ্ধ ছিলেন। অসাধারণ প্রতিভা ও অলৌকিক কবিত্বশক্তির জন্য তিনি পণ্ডিতরাজকে কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়,

একজন অল্পপাঠী ছাত্রেরও যৎকিঞ্চিৎ বুদ্ধি-প্রতিভার পরিচয় পাইলে শতমুখে তাহার প্রশংসা করিতেন। ভোলা উমেশের বিদ্যাসুন্দর ও দাশুরায়ের পাঁচালী শুনিয়া আনন্দের আবেগে ন্যায়রত্ন মহাশয় কতবার সভামধ্যে গায়ককে আলিঙ্গন করিয়াছেন। তিনি সঙ্গীতের একজন সমজ্‌দার শ্রোতা ছিলেন। ভোলা, উমেশ, তিনকড়ি রায়, মতিরায়, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি তাঁহাকে গান শুনাইতে পারিলে কৃতার্থম্মন্য হইতেন। পণ্ডিত-সমাজের মধ্যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায় সুরসিক লোক প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। আলাপ-প্রসঙ্গে তিনি নানাবিধ সরস কথার অবতারণা করিতেন। এবারকার পীড়ার সূচনা হইতেই তাঁহার অত্যন্ত অরুচি দেখা দিয়াছিল,—কোনও বস্তু আহারে রুচি ছিল না। একদিন আমরা তাঁহাকে আহারের জন্য পুনঃ পুনঃ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলে তিনি একটু হাসিয়া নিম্নলিখিত প্রাচীন ছড়াটী আবৃত্তি করিলেন ;—

"আমার কুলে শীলে কি সই তোমার যতন বেশী ?
সাধে কি প্রমাদ-সাধ করি গো রূপসি !"

আনন্দময় মহাপুরুষ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এইরূপ আনন্দকল্লোলের মধ্যে থাকিয়া আনন্দকাননে চিরসমাধি লাভ করিলেন।

এই প্রতিভাবতারের বিয়োগে বাঙ্গালীর যে ক্ষতি হইল, আর তাহার পূরণ হইবে কি না, জানি না। বিজ্ঞান, রসায়নের জন্য বাঙ্গালার গৌরব নয় ; পাশ্চাত্য প্রদেশে এখনও সে সকল বিষয়ে বাঙ্গালীর গুরুর গুরু আছে। এক নব্য ন্যায়ের প্রভাবে সর্ব্বদেশের বুধমণ্ডলী বাঙ্গালীর নিকটে হেঁটমুণ্ড হইতেন। ক্ষণজন্মা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দেহের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালীর এই সার্ব্বভৌম প্রতিপত্তি অন্তর্হিত হইল।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক আছে, পারি ত, সময়ান্তরে সে সকল পুণ্যকাহিনী "অর্চ্চনা"র পাঠক পাঠিকার সমীপে উপস্থাপিত করিব।

"বাঙ্গালা সাহিত্য ও দ্বিজেন্দ্রলাল।"

[লেখক—শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ।]

সেদিন সন্ধ্যার বৈঠকে, মাঘ মাসের "অর্চ্চনা"য় প্রকাশিত "বাঙ্গালা সাহিত্য ও দ্বিজেন্দ্রলাল" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়া হইতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমালোচনা ও টীকা হইতেছিল। তারই দু'চারটী কথা লিপিবদ্ধ করা গেল :—

কথাটা ঠিক,—গান, নাট্যশালা ও সংবাদ পত্রের সাহায্যে দেশের কাজ অনেকটা এগিয়ে যায়। লোকের শিক্ষায় সমাজের মঙ্গল হয়। তবে আধিপত্যের প্রতিপত্তিটা মোদ্দাখানা আগে সাব্যস্ত হওয়া চাই।

গান, নাটক বা প্রহসন যদি স্বাধীনতার, অর্থাৎ পরিচ্ছদের আড়ম্বর না দেখিয়ে সটান সত্য কথার তেজে আপনি দাঁড়িয়ে উঠিবার মত প্রাণবান হয়, তা হ'লে তাতে কাজ হয়।

গানের ভাষার সঙ্গে সুর যদি ভাবের সঙ্গে ঐক্য রেখে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে, তা হ'লে সব ক'টী তারে ঘা মেরে ঝঙ্কার দেয়।

নাটক ও প্রহসন তেমনি অন্ততঃ ছয়টা রসের উৎপত্তি করে, শ্লেষ, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের কশাঘাত করে, সে আঘাতে শুধু নুনছাল ছেঁড়ে না, ঘাটা দগ্‌দগিয়ে ওঠে, তাতে কাজ হয়। আবার একটু মাত্রা বেশী হ'লে রসের আধিক্য হেতু পিত্তাধিক্য হ'য়ে পড়ে। সম্পাদকীয় মন্তব্যটাও ঠিক ঐরূপ দেশের বা সমাজের মনের ভাবের সঙ্গে ঐক্য হ'লে, ইতিহাসের মধ্যে আপনার স্থান করে নেয়।

বেশী দিনের কথা নয়। এই তীতুমীরের পর থেকে বিধবা বিবাহের আমল পর্য্যন্ত দেশের মনের ভাব গানের কথার মধ্যে দিয়ে বেশ ফুটে উঠেছিল, মোদ্দা টেঁকসই হ'ল না। সে হাস্যরসের মধ্যে করুণের স্বল্প বিকাশ ছিল বটে, তবে তাতে প্রাণের ভাষা ছিল না। প্রাণটা আগে দরকার। তবে ত হাত পায়ের জোর হবে, নৈলে তলওয়ার খেলে কে? শুধু পাঁয়তাড়া ক'ল্লেত খেলা দেখান হয় না, আসর জমে না, দর্শক ব্যাজার হ'য়ে চলে যায়। সময় আসে, থাকে না, ফিরে যায়।

নাট্যকার ও কবির ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থাকা চাই। তাঁদের ভাবের অভিব্যক্তির ভিতর ভবিষ্যদ্বাণী প্রচ্ছন্ন বা প্রকট থাকে। সময় সেগুলি শুনিয়ে দেয় বা

খুলে দেখায়। তখন "রূপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনার" মত ভাবের লোকে তা দেখ্‌তে পায়। তখন ভাবুকে ভাব ধরে ও বিলায়। তখন আনন্দ বাজারে আনন্দ মঠের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই মঠে ভবানন্দ উচ্চকণ্ঠে বন্দেমাতরম্‌ ব'লে মলয়জ শীতল শস্য শ্যামলা মার বিরাট মূর্ত্তি দেখে আনন্দে অধীর হ'য়ে গেয়ে ওঠে। সন্তান সমবেত কণ্ঠে জয়গান করে। শিক্ষিতে গায় অশিক্ষিতে শোনে, শুনে শেখে। কি রকমটা শেখে জান, বোঁ করে গেয়ে ফেলে, তাকে Chorus বলে। এই কোরাসটী একটু প্রণিধান করে দেখলে, পাওয়া যায় অনেক জিনিষে।

শিক্ষার আগ্রহে যখন, আবেগের পর্য্যায় পৌছায়, তখন যেখানে যা নূতন পায় তাই কোলে তুলে নেয়। তারপর ভালমন্দের বিচারশক্তি যখন আসে, তখন বিবেকের সঙ্গে একটা রফা ক'রে, র‍্যাঙ্গাটে বা উন্‌ছো ভাবগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বিশৃঙ্খলা বিদায় নেয়, শৃঙ্খলা স্থাপনা হয়।

যখন দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মাননি, তখন ও তার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়গুলো যা অনেকদিন হ'ল চলে গেছে, তারই মধ্যে যাত্রার জুড়ী দোয়ারকী, রামায়ণের গান, চণ্ডীর গান কীর্ত্তন, তরজা ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে।

এখন একটা ধুয়া হয়েছে যে, পাশ্চাত্য রসে রসিক না হ'লে আর রস-বোধের বা ছড়াবার উপায় নেই। বলিহারি পাশ্চাত্য প্রীতি। এখন সব কাজেই প্রাচ্য পেছিয়ে পড়েছে, এমন কি সঙ্গীতটা পর্য্যন্তও। আর এমনি কাজের মজা, নুড়ী কেউ থাকতে চায় না, সবাই শালগ্রাম হ'তে চায়। বাংলার সঙ্গীতের এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে ন পিতা ন'মাতা ন বন্ধু গোছের। যার যা ইচ্ছা তাই ক'রছে ও ব'ল্‌ছে।

আগে শুনেছি একটা নিয়ম ছিল যে, অধিকারী ভেদে গুরু উপদেশ দিতেন। এখন গুরুকে উপদেশ নিতে হয় অনধিকারীর কাছ থেকে। কারণ আর কিছুই নয়, এখন মাসিকের সম্পাদকেরা ঠাট্টা ক'রে গাঁট্টা মারেন তাই অবাক জলপান সাড়ে আঠার ভাজা ত্যালাকুচো হ'য়ে দেখা দেয় সাহিত্যের শ্রীঅঙ্গে। রাম গেছেন, অযোধ্যা আছেন শুধু মানচিত্রে। বঙ্কিমবাবু বেঁচে থাকলে, এখন বড় ট্যাঁ ফোঁ করে উঠ্‌তে পাত্তেন না। সাহিত্য মালঞ্চের অঞ্চল থেকে চঞ্চল হ'য়ে সরে পড়তে হ'ত। তাই বুঝি মনে হয়, গিরিশবাবুও গতিক দেখে অধিক দিন আর রইলেন না। এখন সব কেটে জোড়া-দেনেওয়ালার দিন পড়ে গেছে কিনা! এই কোরাস (Chorus) গিরিশবাবু অনেক দিন দেখিয়ে

গেছেন। আবার ওদিকে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর "মিলে সবে ভারত সন্তান" বেঁধে গেয়ে এক সময় মাৎ করে দেছেন। বলি, কোনও ইস্কুলে বোধ করি কোন প্রাইজ দেবার দিন—যাওয়া হয়নি, তা হ'লে কোরাস কাকে বলে, একটা ধারণা হয়ে যেতে পার্ত। এই ২৫।৩০ বৎসর আগেকার কথা বৈত নয়। আরও আগের কথা আছে।

বাংলার গান বাঁধবার ভাষা ও ভাবের জন্যে এমন কি দুর্ভিক্ষ হয়েছে যে, বাউটী ভেঙ্গে রতন চুড় হয় না, বা সিঁতি ভেঙ্গে টায়রা হয় না। তবে সে একটা তাথৎ বা এলেমের প্রয়োজন। শোরীর টপ্পা ভেঙ্গে নিধুবাবু প্রেম-সঙ্গীত রচে গেছেন, পাঞ্জাবের জিনিষ বাংলায় রয়ে গেছে। "বন্দে মাতরম্" ভেঙ্গে অনেক গান, প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখা হয়ে গেছে।

শিক্ষার একটা সৌষ্ঠব আছে, যদি তা ধারাবাহিক হয়। বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের পর একেবারে বোধোদয় ধর্‌লে, ভাষা নির্ভুল লেখবার পক্ষে ঘোরতর সন্দেহ থেকে যায়। কেন না, দ্বিতীয় ভাগের বানানগুলো শেখা হয়নি বলে। সেইরূপ সা রে গা মা পা ধা নি শিখে অলঙ্কার তান ইত্যাদি না শিখ্‌লে রাগ রাগিণীর হিসেব বড় একটা মাথায় আসে না। তাই সারেগামার পর অনেকেই একেবারে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সাধনা করেন তাতে বড় বেশী মেহনত কর্‌তে হয় না। গমক্, গিট্‌কিরী, তান, অলঙ্কার উপজের বড় প্রয়োজন হয় না। শৃগাল বলেছিল আঙ্গুরগুলো টক্। তা বলে কি আঙ্গুরগুলো টক্ হ'য়ে গেল? কোথাকার কোন্ পাশ্চাত্য নগণ্য বা সগণ্য সবজান্‌তেওয়ালা কোন্ দিন একটা করুণরসের রাগিণী শুনে সারা আর্য্য সঙ্গীতটার উপর বিরাগ হয়ে কি বলে গেছে, তাই নিয়ে ঘরের ভাত বেশী করে খাওয়া চলে কি? কত রকম রাগ রাগিণী আছে তার এক একটা সময়ের এক একটা করে শিখ্‌লে, একটা জীবনে কুলায় না। গলার Gymnastic সব সঙ্গীতেই আছে। গাইতে গেলে Gymnastic দেখাতেই হবে। সেটা কেউ রোধ কর্‌তে পার্‌বে না। শুধু সাধা সিধে ঠেকাটী যেমন একঘেয়ে হয়ে পড়ে, সেইরূপ সব কাজেই এক-ঘেয়েত্ব বর্জ্জন করাটা সকলেরই ইচ্ছে। যার তাল লয় বোধ হয়েছে সে রাগের বিস্তার, বাট ও তান করবেই। নিরাভরণা সঙ্গীত পাঠশালার বালক বালিকারা গাইবে। তারপর যখন তারা পাশ কর্‌তে কর্‌তে Academical degree গুলো সব দখল কর্‌বে তখন তারা কি আবার First Bookএ কেঁচে গণ্ডুষ কর্‌বে! সেই রকম শুধু সারা জীবনটা একতালা গেয়ে কেউ সন্তুষ্ট থাক্‌তে

পারে না। তাতে অবসাদ আসবেই, সুতরাং "দেশীয় সঙ্গীত থেকে অপবাদ দূর করবার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল যে বাঙ্গালা সুরের সহিত পাশ্চাত্য সুরের বহুল সংযোগ ঘটাইয়াছেন, Chorus ঢুকাইয়াছেন" বলিয়া, প্রবন্ধলেখক স্পর্দ্ধা করে বলেছেন, যে "খোলা ভরাট পুরুষোচিত স্বরে গান গাইবার রাস্তা দেখাইয়া দেশীয় সংগীতে এক নবশক্তি সঞ্চার করিয়াছেন" সেটা কদ্দিন টেঁকবে? বড় জোর হালি ছেলে ক'টীর ছেলে পিলে না হওয়া পর্য্যন্ত। লেখাপড়া শিখতে শিখতে গান বাজনাটা শিখে ওঠা যার বরাতে হয়, তার জন্ম এদেশে হয়নি বল্লে অত্যুক্তি হয় না। ইউরোপের লেখাপড়া ও সঙ্গীত এক সঙ্গে হতে পারে বটে, কেন না সেখানে তার চাল চলন আছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতে অসাধারণত্ব আমি স্বীকার কত্তে পারি না। তাঁর গান ক'খানার সুরের ঢংয়ে বোধ হয় তিনি সবে সুরু করেছিলেন। বিলাতী ২।৪ খানা Waltz, Quadrille, Polka শিখলেই যে সুরের পাণ্ডিত্য পৌঁছে যাবে, তার কোন মানে নেই। আমাদের যেমন রাগ রাগিণীর সালঙ্কারা আলাপ আছে, ওদেরও সেই রকম নিরাভরণা Introduction, Variation এবং Overture আছে, তাতে ব্যুৎপন্ন হ'তে গেলে অন্ততঃ ২।৫ বৎসর কোন College এ গিয়ে শিক্ষানবীশি কর্ত্তে হয়।

মনে কর কোন একটা সঙ্গীতের জল্‌সা বা মায় ফেলে তিনি নিজে তাঁর বাঁধা গান গেয়ে গেছেন, আর তারিফ পেয়েছেন। বল্লেই স্কুল কলেজের সুকুমারমতি ছেলেরা, যারা Football আর Lawn Tennis, Cricket আর Cycling ছাড়া, দুনিয়ার কোন্ বনে কি বাঘ আছে তা জানে না, তারাই তারিফ করবে।

ধর্ম্ম ও জাতীয় আদর্শ মাথায় থাক্, সে কথা সুযোগ্যের আলোচনাসাপেক্ষ। ন্যাকামি, জ্যাঠামি, ভণ্ডামি, বোকামি এই কথাগুলোর সন্ধিবিচ্ছেদ করেই, দেশ থেকে কি সে সব তাড়িয়েছেন?

আজকাল একটা কথা উঠেছে, "শিক্ষিত সমাজ" ও "শিক্ষিত লোক" এ দুটোর মানে বড় একটা বুঝে ওঠা যায় না। লেখাপড়া শেখা, না লেখা পড়্‌তে শেখা, কোন্‌টা? কলারটাই এঁটে সঙ সেজে সমাজে গোঁজামিল দেনেওয়ালা নাকি? আঠারখানা বকালের একটা জবরদস্ত বকাল হ'চ্ছে হিঁদুদের গাল দেওয়া, এই মার্কা-মারা বকালখানি যাঁর দখলে তিনি হচ্ছেন, একের নম্বর শিক্ষিত লোক, সেইরূপ শিক্ষিত লোকে যদি তাঁর হাস্যরসাত্মক গানের ভেতর

দাঁতের খেলা দেখাবার দরকার বলে বসে থাকেন, তা বেশ! এতে ক্ষতি নাই। তারপর সমাজের সব লোক যেদিন সত্যিকারের শিক্ষিত হবে, অবিশ্যি গান টানগুলো না বাঁধতে শিখুক বা পারুক, সে দিন ব্যঙ্গ হাস্যটা যে কোন্ বখরায় পড়বে এখন থেকে তার কথা বলা বড় সহজ নয়, তবে তখন নিন্দায় কর্ণপাত কর্ত্তে হবে না, মুণ্ডপাত হয়ে যাবে, এটা ঠিক।

বিদেশী জ্ঞানের সঙ্গে দেশী বিশ্বাসের বিবাহ হ'লে সব সময় যে সত্য, শুভ ও সুন্দর সন্তান হবে তার কি কিছু দলীল দস্তাবেজ আছে? যদি থাকে, তাতে দস্তখৎ নেই।

ভাল মন্দ ঘটনা এক রাগের মুখে বেরিয়ে পড়ে, তবে যার যেমন সাধনা। দুখানা তেরেলাখ-পাঁচুর গান বাঁধলেই যে সীতাভোগ পাবে এমন কোন কথা নেই, তবে বড় জোর পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত গেলেও যেতে পার। তবু বোম্বায়ের অনেক দূর বাকী। একটা সুবিধের কথা, এখন হাঁটা-পাড়ী জমাতে হয় না, রেল হ'য়েছে। যখন তা ছিল না, তখন যাঁরা কাজ করে গেছেন, তাঁদের সঙ্গে যদি লড়িয়ে দাও ত বুঝতে পার, ব্যাপার গুরুতর কি না!

নাটকের কথাটা বল্‌তে গেলে বলা যায় তাঁর নাটকের ভাষা বড়ই রগড়দার। বাংলায় এই প্রথম Vini Vidi Vici। এসেই ঘর আলো করে বসেছে, আর গায়ে এত গহনা যে চোখ ঝল্‌সে যায়, প্রায় সবাই কানা হ'য়ে গেছে। স্বাদের রস গড়িয়ে পড়ছে, মক্ষিকারা সন্ধান পেলেই মুস্কিল। তেজ ঠিক্‌রে পড়ছে, ধরে চেপে রাখা দায়। অনেকে খুলে বলেছে, কেউ কেউ জাঁক করে বলছে "হালী ভারতের একের নম্বর নাটুকে"। বাস্!

গিরিশ ঘোষ, ম'রে বেঁচে গেলে কিন্তু! "Long live the Girish Ghose" হে বাংলার তথা ভারতের গৌরব, বাগবাজারের সেই ছোট্ট ঘরখানিতে আড্ডা গেড়ে বসে থাক্‌নেওয়ালা, হে বাঙ্গালীর বাংলায় নাটক লিখনেওয়ালা, হে বাঙ্গালীর হাব-ভাব-খচিত-ভূষিত কোমলতাময় হিন্দুপ্রাণ-পুলকিত কর্‌নেওয়ালা নাট্য সম্রাট! বাংলা কাঁদছে, হাড়ে হাড়ে বুঝেছে, যে transplantation এখানে চল্‌তে পারে না। চল্‌বে না। অনেক অভাবের পূরণ হবে, কিন্তু তোমার অভাবে যে ক্ষতি, তার পূরণ হবে না!

মনে পড়ে সেই দিন—সেই রামনারায়ণ,—মাইকেল—দীনবন্ধুর যুগ—সে দিন গেছে, সে দিনের দ্যায়লা আর নেই। তার পরই অভাব। অভাবের তড়িত্তাড়নায় যখন বাংলা ভাল নাটকাদি, দৈনিক ব্যবহার্য্যের মত অনুভব

কর্‌তে শিখলে, যখন অভাবে উদ্‌ভ্রান্ত, তখন তোমারই প্রথম ঘুম ভাঙ্গে, প্রাতর্ভ্রমণে তুমিই আগে বেরিয়ে পড়, তার পর কত ঝড় ঝাপ্‌টা সয়ে, তুমিই সাম্রাজ্য স্থাপনা করে অপ্রতিহত প্রভাবে একাধিপত্য কর্‌তে থাক। অনেকে শিখ্‌লে তোমার শিক্ষায়, অনেকে দেখলে, অনেকে বুঝলে। তবে যার যেমন হেকমৎ, সে সেই অনুপাতে কাজ গোছালে। সুতরাং তুমিই এ যুগের আদিগুরু। সেই প্রকার যে কোন নাট্যকার হোক না কেন, তোমার কাছ থেকে কিছু না কিছু ঋণ গ্রহণ করেছে। এ কথা যে অস্বীকার কর্‌বে, সে সত্যকে অস্বীকার করবে।

ঘুরিয়ে বলা নয় সাদা কথায় একটু ইসারায় বলি। দেশী বিদেশী সকলেই একদিন দেখেছে, বুঝেছে, মজেছে। সেই যখন Plague রাক্ষসী এসে মহা দাপটে রাজধানী আক্রমণ কর্‌লে, তখন তাকে তাড়াবার জন্তে পাড়ায় পাড়ায় কি রকম বিরাট বন্দোবস্ত হ'ল জান কি? কোন রকম প্রতীকারই যখন মানলে না, তখন হিঁদুর শেষ সম্বল হরিনাম, সেই মহানাম সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হ'ল, দেখেছত মজা, সোনার চশমা থেকে বই শ্লেট হাতে ছেলেরা পর্য্যন্ত সলাজ সম্ভ্রম ও সঙ্কোচ ত্যাগ করে কি উদ্দাম তাণ্ডবে মেতে গেল। Plague তখন পালাতে পথ পেলে না কেন? কেন এমনটা হ'ল বুঝেছিলে কি? কোন রকম আমদানী এখানে চল্‌বে না, টেঁকসই হবে না। যাদের বোঝবার তারা বুঝেছে, যে যতই চমকানো আলো এদের চখের সামনে ধরি না কেন, এদের মোলায়েম চাউনীর উপর কিছুরই ভর সইবে না। বড় বড় academical degree holder থেকে আরম্ভ করে নেহাৎ নাবালক যারা তারা পর্য্যন্ত হরিনামের আখর বাড়িয়ে কি রকম নাচ্‌টা নেচে ছিল, দেখেছিলে কি? যদি না দেখে থাক ত' পাড়ার পাঁচজনকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখ।

তার পর শ্লেষ, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, রঙ্গ করবার একটা পন্থা আছে, ভাব আছে, ভাষা আছে, ভঙ্গী আছে; তবে সেটা মধুর বাংলা ভাষার অঙ্গে অঙ্গীভূত হ'য়ে থাকবার মত যদি হয়, এস যাদু মাথায় করে রাখি, নইলে রাম রাম ভেইয়া। সব জিনিষের একটা সামঞ্জস্য আছে, সেটাকে বলে Sense of decorum. সংযত সীমার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হ'য়ে থাকবার মত যদি কিছু হয়, তার মার নেই।

মনে পড়ে কি "আনন্দ বিদায়"এর প্রথম অভিনয় রজনী? কেন সে রকমটা হল? শেষ রইল না যে করুণাময়! ভগবান নারাজ হন যে

কাজে,সে কাজ করতে নেই। আস্পর্দ্ধাকে বাড়তে দিলেই মস্ত গাছ হয়ে দাঁড়ায়। পাখির বিষ্ঠায় ছাদের পাঁচীলে যে বটগাছের জন্ম হয় তাকে অঙ্কুরেই কেটে চুন না দিলে পাঁচীল ত পড়বেই, শেষে মস্ত বাড়ীখানার যে দশা হয় তা অনেকেই দেখে থাকবেন।

বাঙ্গালী যতদিন বেঁচে থাকবে গিরিশ ঘোষ ততদিন বাঁচবে। শুধু বাঁচবে না পূজা পাবে, আর নূতন অভিধান যদি লেখা হয়, তা হ'লে "গিরিশ ঘোষ" কথা বলে অভিহিত হবে, তার মানে হবে কি জান? ভরত+কালিদাস =নাট্য সম্রাট বা নাট্য মহাসাগর। সেখানে ইন্দির চন্দর থেকে বিক্রম পর্য্যন্ত মাথা নোয়াবে। এ সব কথার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে, আবশ্যক হয় ত ব'লব'।

হাসি অনেক রকমের আছে:—যাত্রা থিয়েটার ও সার্কাসের সং আসরে আসা থেকে শেষ পর্য্যন্ত হাসায়, সে হাসির ঝলক বাড়ীতে আসা পর্য্যন্ত টেঁকে না, গাড়ীতেই উথ্‌লে অবসান হয়। তবে গোড়ার কথা স্বতন্ত্র, তারা সব সময় প্রাণ কেড়ে নেয়। মাএফেল বা মজলিসে গান শুন্‌তে শুন্‌তে গান বাজনা বেরাগ বেতালা হ'লে প্রাণের ভেতর থেকে যে হাসির মোচড় ওঠে, সেটা মর্ম্মান্তিক মুচ্‌কে হাসি, কেন না চেঁচিয়ে হাসাটা দস্তুর নয়, বড়জোর বলা চলে "বহুৎ আচ্ছা"।

হাসির গানের সৃষ্টি হালী আমলের বহুপূর্ব্বে হ'য়েছে, সে হাসির ডোক্‌রাণী বহুদিন থাকুতো। তার ভেতর ন্যাকামি জ্যাঠামি ভণ্ডামি বোকামি দল বাঁধতে পারত না। এখনকার গানে ঐ চারটী গুণ ছিনিমিনি খেল্‌ছে, আর জটলা বেঁধে দল পাকাচ্ছে। ফলে বিতাড়নের বদলে আবাহন হ'চ্ছে।

একটী ইসারায় বলি ;—দীনবন্ধুর নীলদর্পণে দুজন I. I. Wood সেজেছেন, একজন আমাদের (স্বর্গীয়) অর্দ্ধেন্দুবাবু, অপর জন অমৃত বা ভুনি বাবু (এখনকার চক্যোবত্তি) একজনে মোলায়েম পুল্‌টিস দিয়ে গেছেন, অপরে (Wood তো Wood) একেবারে কড়া, তবে দুজনেই মূর্ত্তি দেখিয়েছে (saw dust) না বিশ্বাস করতো যিনি বেঁচে আছেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করে এস। তিনি ছাড়া একথা বড় একটা কেউ জানেন বলে আমার বোধ হয় না। তারপর গিরিশ বাবুর 'জনা'র ঐ হাস্যরসের মালিক সীতারাম অর্দ্ধেন্দুবাবু ও খোদ স্বয়ং দুজনেই বিদূষক সেজেছেন, দুজনেই তালের উপর তাল নিয়েছেন, তালে একচুলও কেউ হটেন নি, তবে রাগের কথা আলাদা। এখানে হনুমান ও ভরত মত প্রচলিত কি না। যাঁর যেমন সাধনা।

কথার পিঠে অনেক কথা আসে। আলালী ছানা ও সাগরী চিনির মিশ্রণে বঙ্কিমি তাড়ুর তাড়নে সে সন্দেশ কাঁঠালপাড়ার হাট থেকে V. P.তে দেশ বিদেশে গেছে, তার একটী parcelও ফেরেনি। কেন? সে খবর কারুর হয়নি। তাকি ভাষাঙ্গে, কি গল্পাঙ্গে।

আর কেউ পারেন নি বা পারবেন্ না, একথা বলা বড় শক্ত। কেন না মাথাটা খুব শক্ত না হ'লে একথা বলা চলে না। চাঁটির subscription ও donationএর ভয় যার আছে সে পারে না। তবে সন্দেশের Columbus বল্লে বলা যায়। এক খামচা মাটীর উপর দাঁড়িয়ে দুনিয়াকে নখদর্পণে যাঁরা রাখেন, তাঁদের ব্যবসা অন্যরূপ।

আজ দ্বিজেন্দ্রলাল বাঁচিয়া থাকিলে, বোধ হয় এই কথাই শোনা যেত'। আর শ্রীমান বারিদবরণ যে তাঁকে পোড়ার গড়ন ক'রে তুলেছেন, তার জন্য একটা কৈফিয়ৎ তাঁর বন্ধু বান্ধবে চাইতো।

ব্যবধান।

[লেখক—শ্রীশিশুরঞ্জন পূততুণ্ড।]

সুখী বলে—'সুখময় হত যদি ধরা
না রহিত রোগ শোক দুঃখ মৃত্যু জরা'!
জ্ঞানী বলে—'চুপ্ চুপ্! সুখী হলে সবে
সুখে দুঃখে ব্যবধান কে বুঝিত তবে'?

অগস্ট্ কোমতের প্রত্যক্ষবাদ।

[লেখক—শ্রীসুখরঞ্জন সেন শর্ম্মা।]

ফরাসী দার্শনিক অগস্ট্ কোমৎ ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ৬৩ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে Positivism—প্রত্যক্ষ নিসর্গবাদ বলে। ইংরাজীতে ইহার নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে:—

"A system of philosophy, which, rejecting all inquiry into causes whether efficient or final, deals only with what is *positive* or simply seeks to discover the laws of phenomena."

কোমৎ বলেন, "তুমি তোমার নিজের বস্তু নহ, তুমি তোমার আপনাকে যথা ইচ্ছা বিনিয়োগ করিতে পার না, তাহা করিলে তোমার অধর্ম্ম হয়। তোমার পিতামাতা তোমাকে সংসারে আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের কৃপায় তুমি বিস্তর আনন্দ, বিস্তর স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছ, তাঁহারা তোমার জন্য বিস্তর ক্লেশ ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাদিগের মনে দুঃখ দিয়া তুমি যদি নিজের পরকালের চিন্তায় রত হও, তবে তোমার বড়ই অসঙ্গত কার্য্য করা হয়।" অর্থাৎ মানব! তুমি যাঁহার যত্নে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত, শক্তি সামর্থ্য যুক্ত হইলে; পরিণামে তাঁহাদের বিপদের সময় একবার ফিরিয়াও চাহিলে না; কেবলমাত্র আপনার স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যে, সুখপ্রাপ্তি আশায় বা পরকালের চিন্তায় কালাতিপাত করা, তোমার পক্ষে বড়ই গর্হিত কার্য্য। মনুষ্য-জীবনের প্রত্যেক আচরণের বিষয় কোমৎ এইরূপই বিবেচনা করিয়াছেন।

অতএব ইহা হইতে বেশ সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, হিন্দুশাস্ত্রে যে পুণ্যময় সন্ন্যাসব্রত পালনের বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে,—যদ্দারা মানব ভবকারা-গারের [illegible] জ্বালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে;—যাহা পুণ্যময় হিন্দুশাস্ত্রীয় আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে একতম;—কেবলমাত্র জনক জননীর কষ্ট লাঘব হেতু সংসারের অসার মায়ার মোহিনী জালে আবদ্ধ থাকিয়া সত্যাশ্রয় ত্যাগ পূর্ব্বক মিথ্যার আশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত করাই কোমতের অভিপ্রায় সিদ্ধ এবং তাহাই তাঁহার মতে প্রকৃত ধর্ম্ম!

ধর্ম্ম বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি যে, ঈশ্বরে কর্ম্মফলের সন্ন্যাস পূর্ব্বক কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করাই প্রকৃত ধর্ম্ম। মানুষ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, অথবা স্বার্থের উদ্দেশে, কিম্বা পরমার্থ তত্ত্বলাভেচ্ছায় কর্ম্ম করিয়া থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া, যে নিজের স্বার্থ পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়া থাকে, সেইগুলিকেই প্রবৃত্তির অধীনে কার্য্য করা বলা যায়। লোভী ব্যক্তির কার্য্য সমূহের কেন্দ্র বা প্রধান প্রবর্ত্তক লোভ। ক্রোধী ব্যক্তির কার্য্যের প্রধান প্রবর্ত্তক তাহার ক্রোধ ইত্যাদি।

তৎপর স্বার্থের কথা। যখন মানব-হৃদয়ে স্বার্থ আসিয়া উপস্থিত হয়,

তখন আর তাহার মনোমধ্যে প্রবৃত্তি স্থান লাভ করিতে পারে না—দমিত হইয়া যায়। যেমন, তুমি আমার বিশেষ অধীনস্থ—আজ্ঞাবহ ; তোমার দ্বারা আমার বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে, কিন্তু আজি তোমার কোন একটি কার্য্যে আমার মনে বিশেষ ক্রোধের উদয় হইলেও কেবল মাত্র স্বার্থের জন্য তোমাকে কিছু বলিলাম না। প্রবৃত্তিমূলক কার্য্যের কেন্দ্র যেমন উপস্থিত প্রবৃত্তির উত্তেজক ; স্বার্থেরও তেমনি প্রবৃত্তির সামঞ্জস্যসাধন,—আপনার ভাল।

এক্ষণে পরমার্থের কথা বলিব ; বিষয়টী কিছু জটিল। প্রবৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যসাধন পক্ষে বিষয় বুদ্ধি ; প্রবৃত্তি ভালমন্দ, দোষ গুণ বিচার শক্তিহীন। প্রবৃত্তি যে অজ্ঞাত ভাবে কার্য্য করে এবং তাহাতে চরিতার্থ লাভ করে, তাহা স্বার্থসাধন নহে, জগৎ সংসার উৎসন্নে যাউক তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই, চির জীবন আপন মনে সুখে অতিবাহিত করিয়া যাইতে পারিলেই হইল, এই যে ভাব তাহাই প্রকৃত স্বার্থ। এই পরস্পর বিরোধী প্রবৃত্তি সকলের মধ্যে স্বার্থের একটা সামঞ্জস্য আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু সামঞ্জস্য আসে কোথা হইতে এবং সে জিনিষটাই বা কি ? তাহাই ধর্ম্মবুদ্ধি ; স্বার্থ-সিদ্ধির অনুরোধে যাহারা সৎ হয়, তাহারা প্রকৃত পক্ষে সজ্জন নয়। আত্মপর নির্ব্বিশেষে যে স্বার্থ পরিচালিত হয়, তাহাই অবিরুদ্ধ মঙ্গল, তাহাই ধর্ম্ম এবং তাহাই শ্রেষ্ঠ পরমার্থ।

তাহা হইলে দেখা গেল, অন্ধ উত্তেজনার দ্বারা যে কার্য্য সংঘটিত হয়, তাহা প্রবৃত্তির কার্য্য, আপনার ভাবে আপনি মত্ত থাকিয়া যে কার্য্য কৃত হয়, তাহা স্বার্থের কার্য্য ; আর পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যে কার্য্য করা হয়, তাহাই পরমার্থ। আত্ম মঙ্গল সাধনোদ্দেশ্যে সজ্ঞান-মূলাধার যেমন আমরা আপনারা, তেমনি সমস্ত জগতের মঙ্গল অভিপ্রায়ের সজ্ঞান একমেব ভাণ্ডার পরমাত্মা।

সাধারণতঃ আমরা বলি যে, অমুক কাজ করা কর্ত্তব্য, তাই কর্ত্তব্যের অনুরোধে করিতেছি। এই যে কর্ত্তব্য, ইহা আসে কোথা হইতে ? যে পারমার্থিক ধ্রুবমঙ্গল, যাহার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধাই ধর্ম্মবুদ্ধির কারণ ;—সেই শ্রদ্ধার ভিতর দিয়া আমরা ঐ কর্ত্তব্যকে পাই। এই কর্ত্তব্য উদ্দেশ্যবিহীন নয়, ইহারও আবার একটা কর্ত্তব্য হেতু আছে—একটা উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় বিস্তৃত আছে। কর্ত্তব্যভার বায়ুমণ্ডলের চাপের ন্যায় প্রতিনিয়ত আমাদিগকে চাপিয়া বসিয়া আছে সত্য, কিন্তু তার অনুভব করিতে পারি না—

অথবা অনুভব করিবার চেষ্টা করি না। প্রবৃত্তির অতীত নিষ্কাম কর্ম্ম ও স্বার্থের অতীত নিঃস্বার্থ কার্য্য করিলে তাহাতেই ব্যক্ত করিয়া দেয় যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণ সাধনার্থ, পরমার্থের জন্য, কর্ম্মময় কর্ত্তব্যময় জগতে কার্য্য করিতেছি। এ কার্য্যে সময় সময় দেখিতে পাই, যেন আমাদের কর্ম্ম বিফল হইল, কিন্তু সেইটা ভ্রান্তি মাত্র। কেন না, যাহার মূলে ধ্রুবমঙ্গল বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা কখনও নিষ্ফল হইবার নয়। এস্থলে হয়ত কোমৎ-বাদীরা বলিবেন যে, এই যে তোমার ধ্রুবমঙ্গলের প্রতি বিশ্বাস, উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিময়—অসত্য। কিন্তু তাঁহারা কি জানেন না যে আপেক্ষিক সত্য ও মঙ্গলের মূলে পূর্ণসত্য এবং পূর্ণ মঙ্গল চির বিরাজমান আছেই আছে, ইহা ভ্রান্ত ধারণা নয়; ইহা একটি গভীর নিগূঢ় সত্যতত্ত্ব; ইহাই প্রকৃত দর্শন অর্থাৎ হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের জ্ঞানমূলক নিত্য সত্য সিদ্ধান্ত। বিজ্ঞানশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হারবার্ট স্পেনসারের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিও স্বীকার করিয়াছেন যে, সকল আপেক্ষিক সত্যের মূলে একমাত্র সত্যই বর্ত্তমান, ইহা ধ্রুব, অভ্রান্ত এবং অকাট্য সত্য।

উপসংহারে আমরা বলি যে জগতের মূল উদ্দেশ্য জগতের মঙ্গল এবং সে উদ্দেশ্য মূল সত্যময় ভাবে বিরাজমান রহিয়াছে—সেই সত্যই ধর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক।

বর্ত্তমান ভারতশিল্প।

(চিত্রবিদ্যা)

[লেখক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।]

কলিকাতা আর্ট স্কুলের চিত্র লইয়া কিছুদিন হইতেই যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে। যুরোপখণ্ডে ও ভারতবর্ষে ভারতীয় চিত্রগুলির সমালোচনার ফলে দুইটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে; একটি দল এই চিত্রগুলির একান্ত পক্ষপাতী, তাঁহারা ইহাদিগের সুখ্যাতিতে আকাশ ফাটাইয়া তুলিতেছেন; অপরপক্ষে আবার বিখ্যাত শিল্প-সমালোচকগণ ইহাদের নিন্দায় কর্ণপটহ ভেদ করিতে চাহিতেছেন। যুরোপের বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক মিঃ রজার ফ্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর অগ্রণী। তিনি এই জাতীয় চিত্রের সম্বন্ধে বলেন, "এই চিত্রগুলি আমেরিকার

অল্প দামের সাময়িকপত্রে প্রকাশিত নিকৃষ্ট চিত্র অপেক্ষা উচ্চ অঙ্গের নহে।" এই উক্তির সমালোচনা করিবার কালে উক্ত চিত্রগুলির একনিষ্ঠ সাধক ও তাহাদিগের একান্ত পক্ষপাতী মিঃ কুমারস্বামী বলেন, "This criticism is, so far as it goes, fairly justified. Most of the Calcutta paintings are graceful, but they are too often sentimental in conception, weak in drawing and tamasic (gloomy) in colouring." সুতরাং তাহাদিগের কি এমন গুণ ও বিশেষত্ব আছে যাহার জন্য তাহারা জগতের চিত্রশালায় স্থান পাইবার যোগ্য, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

এই নবচিত্রের উৎপত্তির ইতিহাস অতি সামান্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন পরিবর্ত্তন-প্রিয়তার নেশায় ভারতবাসী ভারতবর্ষকে একেবারে য়ুরোপের আদর্শে নব্যভারতরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল, সেই সময়েই ভারত হইতে প্রাচীন ভারতচিত্রসমূহ আবর্জ্জনাস্বরূপে পরিত্যাগ করা হয়, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্প লাঞ্ছিত হইয়া পড়ে। এই সময়ে য়ুরোপীয় শিল্প ভারতের সর্ব্বত্র অনুসৃত হইতে থাকে। ভারতশিল্পী রবিবর্ম্মাকর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র সেই নব সাধনার প্রথম উল্লেখযোগ্য ফল। তখন তাঁহার পারদর্শিতা দেখিয়া প্রত্যেক ভারত-বাসীই গর্ব্ববোধ করিয়াছিল। কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন-প্রিয়তার নেশা যখন আপনা হইতেই কতক পরিমাণে কমিয়া আসিল, তখন য়ুরোপীয় চিত্রের সহিত ভারতের প্রধান শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রের তুলনামূলক সমালোচনা করিবার সময় আসিল। পরীক্ষায় ভারতের প্রধান শিল্পী য়ুরোপীয় দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পিগণের সহিতও একাসনে দাঁড়াইতে পারিলেন না।* ভারত কোন দিনই কাহারও পিছনে পড়িয়া থাকে নাই। যে শিল্পের অনুশীলনে ভারতবাসী কত শতাব্দী ধরিয়া প্রাণপাত করিয়া আসিয়াছে, যে গরীয়সী বিদ্যার উন্নতিকল্পে রাজা মুক্তহস্তে অর্থব্যয় ও শিল্পিগণ প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন, আজ পরীক্ষার দিনে সেই বিদ্যার জন্য ভারতকে পরের মুখাপেক্ষ হইতে হইবে ভাবিয়া বোধ হয় ভারতবাসীর মনে একটা ক্ষোভ ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়া থাকিবে।† ইহার ফলে কলিকাতার দুই চারিজন শিল্পী ভারতীয় প্রাচীন চিত্রের প্রাণ-

---

* ডাক্তার কুমারস্বামী।

† নিবেদিতা।

প্রতিষ্ঠা করিতে এবং প্রাচীন আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটু আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। সৌভাগ্যক্রমে হাভেল সাহেব সেই আন্দোলনে বাধা না দিয়া আন্দোলনকারীদিগকে নানাপ্রকারে উৎসাহ দেন। সরকারী আর্ট স্কুলে রক্ষিত য়ুরোপীয় নিকৃষ্ট চিত্রগুলি বিক্রয় করিয়া, তাহাদিগের স্থান সপ্তদশ শতাব্দীর মোগলচিত্রে পূর্ণ করিয়া, হাভেল সাহেব দেশীয় চিত্রের প্রতি আবার সাধারণের অনুরাগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন। সেই হইতেই ভারতচিত্রের সূত্রপাত।

ভারতশিল্পের বিশেষত্ব কি? এ সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলেন, "In the East,men have ever set the emotional above the practical life, and the artists have excelled in expressing the very essence of material things, because they expressed what they felt, instead of representing what the ordinary man sees." ইহার অর্থ এই যে, ভারতবাসী ভাবপ্রবণ জাতি। ভারতবর্ষের ইতিহাস খুলিয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন, ভাবের নিকট বাস্তব চিরদিনই পরাভূত। এইজন্য পুরাণ আজ গল্প ও অর্থহীন। ভারত-শিল্পেও এই দোষ বা গুণ প্রবেশ করিয়াছে। কোন একটি বিষয়কে দেখিয়া ভারতবাসীর মনে যে সহস্র ভাবের তরঙ্গ উঠে, নূতন স্কুলের শিল্পিগণ সেই ভাবকে অবলম্বন করিয়াই চিত্র অঙ্কিত করেন; ইহাতে তাঁহাদিগের চিত্রগুলি প্রকৃতিসঙ্গত না হউক, মানসপটে অঙ্কিত ভাবের চিত্রের ঠিক অনুরূপ হইয়া থাকে। বিচারের মাপ-কাটিতে এই জাতীয় শিল্প কোথায় দাঁড়াইতে পারে, দেখা যাউক।

সাহিত্য-জগতের ন্যায় শিল্প-জগতেও গোড়াতে Realism ও Idealism নামক দুই জাতীয় শিল্প দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য একদল সমালোচক মনে করেন, সমস্ত ললিতকলার (Figurative art) মূলে Realism থাকিবেই থাকিবে। চিত্রের উদ্দেশ্য—আমরা জীবজগতে ও প্রকৃতিমধ্যে যাহা দেখিতে পাই তাহারই অনুরূপ চিত্র বর্ণে ও তুলিকায় ফুটাইয়া তুলিয়া দর্শন-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষের তৃপ্তি বিধান করা।* এই জন্যই গ্রীসের শিল্পিগণ একটি প্রতিমূর্ত্তির একখানি ছোট হাতের একটি ছোট শিরা কতটুকু ফুটাইয়া তুলিলে তাহাকে হুবহু আসল মানুষের হাতের মত করিয়া তুলিতে পারিবে, তাহারই

* Their object is to give delight to the mind through the organ of vision.

চিন্তায় কত বিনিদ্র রজনী যাপন করে। কিন্তু যাঁহারা য়ুরোপীয় মাপকাটিতে ভারতীয় শিল্পকে মাপিতে চান, তাঁহারা ভারত-শিল্পকে য়ুরোপীয় শিল্পের প্রোটোটাইপ রূপে দেখিতে আশা করিয়া যদি হতাশ হন, তাহা হইলেই ভারতীয় শিল্পের তীব্র সমালোচনা করিলে, তাহার আদ্যশ্রাদ্ধের আয়োজন করা হইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রকৃতি বুঝিবার কোনই সুযোগ হয় না। যাঁহারা মনে করেন প্রকৃতির (Nature) অনুকরণ, নিয়মের বাঁধাবাঁধি ও "দস্তুরের" আঁটাআঁটি না থাকিলে, সত্য শিল্পের সৃষ্টি হইতেই পারে না, তাহারা সত্য শিল্পের আলোচনা করেন নাই, অধিকন্তু যাঁহাদিগের দোহাই দিয়া ভারতীয় শিল্পের মুণ্ডচ্ছেদ করেন, সেই বিদেশীয় শিল্পসমালোচকদিগেরও সব গ্রন্থ ভাল করিয়া পড়েন নাই। কারণ এই যে Realism ও Idealismর বাঁধাবাঁধি, ইহা গোড়ার কথা। কিন্তু উচ্চ অঙ্গের শিল্পের মধ্যে এত বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকিতে পারে না, য়ুরোপীয় শিল্পসমালোচকগণও একথা স্বীকার করেন। একটি সুন্দর চিত্রে একটি সুন্দর ফুল বা একটি মনুষ্য মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন হইতে পারে; কিন্তু সেইখানেই ত শিল্পের সমস্ত কার্য্য শেষ হয় না। যে শিল্প চিন্তা (Thought) ও অনুভূতির (Feeling) ভিতর দিয়া, মানব-মনের তৃপ্তিসাধন করে, তাহাই শ্রেষ্ঠ ও সত্য শিল্প। এই হিসাবে যথার্থ কবিতার সহিত সত্য শিল্পের তুলনা করা যাইতে পারে। শব্দযোজনায় কবির কৃতিত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু কবিতার সমস্ত রস সেইখানেই শেষ হয় না; মানব-মনকে স্পর্শ করিয়া তাহাকে অনন্তের দিকে উন্মুখ করিয়া তোলাই যথার্থ কবিতার কাজ। সেইরূপ সত্যশিল্প ইন্দ্রিয়-সুখ দিয়াই চলিয়া যায় না, তাহা মানব মনকে জাগাইয়া দিয়া যায়। সুন্দর চিত্র বা বর্ণবৈচিত্র্যই সেই সত্যশিল্পের সমস্ত নয়, বরং সত্য কথা বলিতে কি, তাহার সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই বলিলেও চলে!*

---

* There is a beauty which is never found in nature, but which requires the working of human thought to elicit it from nature; a beauty not of parts and single persons but of complex totalities; a beauty not of flesh and blood but of mind, imagination, feeling. * * * We advance a step further and admit that the mind reflecting upon nature and generalising the various suggestions of beauty which it has received from nature, becomes aware of an infinity which it can only grasp through thought and feeling which shall never be fully revealed upon this earth but which poetry and art bring nearer to our sensuous perceptions.—*John Addington Symonds.*

রস্কিন শিল্পের সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—Men who have no imagination, but have learnt merely to produce spurious resemblance of its results by the recepis of composition are apt to value themselves mightily on their concoctive science but the man whose mind a thousand living imagination haunt, every hour, is apt to care too little for them and too long for the perfect birth which he finds, is not to become at so easily. ইহারই জন্য শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "সত্য শিল্পে নিয়মের বন্ধন, দস্তুরের সঙ্কীর্ণতা না থাকাই শ্রেয়" সে কথাটা য়ুরোপীয় সমালোচকদিগেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। সুতরাং আমরা কোন্ সাহসে তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিব? এই জন্যই বলিয়াছিলাম, শিল্প বলিতে যে প্রকৃতির অনুকরণ মাত্র বুঝায়, তাহা অতি নীচ শ্রেণীর শিল্পের সম্বন্ধেই সত্য। সত্যও উচ্চ শ্রেণীর শিল্প প্রকৃতির হুবহু নকল হইতে পারে না; তাহা প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া যাইবেই। সুতরাং যদি মানবমনকে উচ্চভাবে ভরিয়া তুলিবার জন্যই ভারত-শিল্প প্রকৃতির অনুকরণ না করিয়া থাকে তবে তাহা নিরবচ্ছিন্ন নিন্দার ভাগী মাত্র হইবে কেন?

ভারতীয় শিল্পের প্রকৃতি কি? ইহার এক কথায় উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয় প্রকৃতির অনুকরণ না করাই ভারতীয় শিল্পের বিশেষত্ব।* হিন্দুদর্শনের পৃষ্ঠা উল্টাইলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দুসাধকগণ প্রকৃতির অতীত কি এক গভীর রহস্যের সন্ধানে ঘুরিয়াছেন। প্রকৃতির মধ্যে সে সত্য দেখিতে পাওয়া যায় না; বরং প্রকৃতির আবরণে তাহা ঢাকা রহিয়াছে। মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া, প্রকৃতির ভিতর দিয়া, যাঁহার চক্ষু অন্তর্জগতের দিকে ধাবিত হয়, তিনিই সেই গভীর রহস্যময় তত্ত্বের সন্ধান পান। একথা যে ইংরাজ দার্শনিক স্বীকার করেন না, তাহা নয়। তাঁহারাও স্বীকার করেন যে, প্রকৃত সৌন্দর্য্য প্রকৃতির অতীত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাহার নিকট তুচ্ছ, তাহা সেই অসীম সৌন্দর্য্যের আভাষ পর্য্যন্ত দিতে পারে না। অথচ সেই অন্তর্জগতের পরিচয় দেওয়াই সমস্ত কাব্য ও শিল্পের চরম সার্থকতা। য়ুরোপীয়গণ প্রকৃতির তিল তিল সৌন্দর্য্য সংগ্রহ করিয়া সেই জগতের চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন,

* It cannot be too clearly understood that the mere representation of nature is never the aim of Indian art.—National Idealism.

আর ভারতীয় শিল্পী তাহা না করিয়া শুধু অন্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে বাতুল বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

প্রাচীন শিল্পগ্রন্থ পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি ঋষিগণ ধ্যানই সমস্ত শিল্পের আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যে শিল্পী একাগ্রতা,তন্ময়তা প্রভৃতি গুণে বিভূষিত, তিনিই যে শ্রেষ্ঠ শিল্পী, একথা প্রাচীন শিল্পাচার্য্যগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, শিল্পিগণের এ সকল গুণগুলি ত থাকিবেই, তাহার উপর তিনি যে চিত্র অঙ্কিত করিতে চান, তাহার মধ্যে অব্যক্তের সন্ধান দেওয়া চাই। এইজন্য শিল্পীকেও ধ্যানী হইতে হয়। এই ধ্যানের ঠিক ইংরাজি প্রতিশব্দ কি বলিতে পারি না; তবে ইংরাজি "Vision" কথাটায় ইহার অনেকটা ভাব প্রকাশ পায়। ইংরাজ কবি সেলী ইহাকে Intellectual beauty বলিয়াছেন, Wordsworth ইহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "The gleam, the light that never was on sea or land." দার্শনিক প্লেটো বলিয়াছেন, এই ধ্যানের দ্বারাই মন প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া, "Beauty in Essence"এর সন্ধান পায়। এক কথায় বলিতে হইলে Beautyই আমাদিগের শিল্পিগণের আঁকিবার বিষয় নয়, Beauty in Essence চিত্রিত করাই তাঁহাদিগের কার্য্য। এই কার্য্যে তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহার সমালোচনা করিলে তাঁহাদিগের চিত্রের যথার্থ সমালোচনা করা হয়, এবং তাহার দোষ-গুণ-বিচারেরও সুবিধাও হয়। নতুবা দুই চারিটি চটকদার বুলি ছাপার হরপে ছাপিয়া মাসিকের পসরায় মাসে মাসে ব্যগ্র পাঠকের দ্বারে ফেরী করিয়া বেড়াইলে সাহিত্য বাজারে দুই চারি দিন মেছোহাটার গণ্ডগোল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সাহিত্য বা শিল্প কাহারও এক ছটাকও উপকার হয় না।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, জাতীয় সাধনার পীঠস্থান যেখানে, সেইখানে বসিয়া বিনীতভাবে এতদ্দেশীয় চিত্রকরগণের চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করা উচিত। দেশীয় জীবনের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, বিদেশের ছবি হইতে কল্পনার উদ্বোধন প্রত্যাশা করিলে চিত্রকর ও চিত্রের উভয়েরই বিড়ম্বনার একশেষ হইবার সম্ভাবনা। ছবির প্রতিলিপি লইয়া কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের মর্য্যাদা পাইতে পারে না।

আসল কথা হইতেছে, "ধর্ম্মভাবই কলা-বিদ্যাকে পূর্ণ উৎকর্ষ দান করিতে সমর্থ। জড়বিজ্ঞান চালচিত্র করিবার উপকরণ প্রদান করিতে পারে, কিন্তু

উচ্চভাবই চিত্রকরকে চিত্রের দেবতার চরণ প্রান্তে পৌঁছাইতে সমর্থ?" * এই উক্তির উদাহরণস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, এসিয়ার নানাস্থান হইতে সংগৃহীত বৌদ্ধমূর্ত্তি অনেক স্থলেই বিশ্রী। কোথাও মোঙ্গলিয়ন জাতি স্থূল অধর, কুটিল চক্ষু, বিসদৃশ গণ্ড রচনা করিয়াছে, অন্যত্র বুদ্ধদেবের কর্ণদ্বয় অমানুষিক-ভাবে দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক মূর্ত্তিই প্রশান্ত ও পরম শান্তির ভাবে মণ্ডিত। ইহাতেই মহাপুরুষের আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। কামনা নির্ব্বাপিত হইলে, ইন্দ্রিয় নিশ্চল হইলে, যে শান্তি দীপ্যমান হইয়া উঠে, প্রত্যেক মূর্ত্তির মধ্যে সেই ভাব পরিস্ফুট—সমস্ত য়ুরোপীয় চিত্রশালার কোথাও এই ভাবের একটি মূর্ত্তিও পাওয়া যাইবে না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশুদ্ধি সহজেই চিত্রকরের তূলির আয়ত্ত হইতে পারে, কিন্তু একটি মহৎভাব তূলির অগ্রে উৎপাদন করা তত সহজ নয়। তাই দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, "প্রাগুক্ত চিত্রে দেশীয় ভক্তের চিরাগত সংস্কারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিত্রকর অঙ্গ-বিশুদ্ধির নিয়মের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন নাই! দেবমন্দিরের পবিত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করা চিত্রকরের পক্ষেও অনুচিত। গণেশ আঁকিতে যাইয়া, সুন্দর নরমুখ প্রদান করিলে, দেবতা আর মন্দিরে স্থান পান না, মূষিকের পক্ষে একটি বিপুল দেবদেহের ভার বহন করা জড়জগতের নিয়মানুসারে অসাধ্য হইলেও, চিত্রকর গণেশ ঠাকুরকে হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় করিয়া আঁকিতে পারেন না।" ইহা অতি সত্য কথা।

ধর্ম্মবন্ধন-বিচ্যুত বিদেশী চিত্রকলাকে বর্ত্তমান শিল্পিগণ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। ভারতবর্ষে ধর্ম্মের কথা কখনও ব্যর্থ হয় নাই। শতাব্দী-সঞ্চিত সহস্র ধর্ম্ম-উপাখ্যান ও বিরাট জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে যে অফুরন্ত আদর্শ রহিয়াছে, সেই আদর্শকে আশ্রয় করিবার একান্ত চেষ্টাই অবনীন্দ্র-প্রমুখ শিল্পি-গণের বিশেষত্ব। সুখের বিষয় যে, তাঁহারা মাতৃমূর্ত্তি আঁকিতে গিয়া মেম সাহেব আঁকিয়া বসেন নাই, তাপস কুমারীগণের চিত্রে 'বল্'-নৃত্যপরায়ণা বিবি-গণের প্রগলভার সৃষ্টি করেন নাই। দেশীয় চিত্রশালা হইতে প্রকাশিত নব চিত্রপটসমূহ যেন জাতীয় আদর্শে মণ্ডিত হইয়া প্রকাশিত হয়, আর দেশবাসী শিবের চিত্রে জন্ বুলের গ্রীবাভঙ্গ অপেক্ষা প্রশান্ত ভাবের প্রতিই সমধিক আদর দেখাইতে শিক্ষা করে, ইহাই আমাদিগের একমাত্র কামনা।

---

* ভারতী বৈশাখ ১৩১৩ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন লিখিত চিত্রবিদ্যা।

হীরক-অঙ্গুরী।

[লেখক—শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।]

(১)

আনন্দমোহনের অপরাধ সে দরিদ্র; নহিলে সেও আজ শ্বশুরবাড়ীতে যথেষ্ট যত্ন ও সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিত। কিন্তু বিধাতা ভিন্ন কাহাকেও এজন্য দোষী করা যায় না। ধনী শ্বশুরের জামাতা হইবে অদৃষ্টফলকে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া কেন তিনি তাহাকে দরিদ্রের ঘরে পাঠাইলেন,—কে এ প্রশ্নের সমাধান করিবে?

বিধিলিপিতেই আনন্দমোহন নলিনীর স্বামী। এমনই এক ফাল্গুন মাসে মসগুলপুরের কীর্ত্তিমান জমিদার-তনয়ের সহিত নলিনীর উদ্বাহ হইবার কথা। বিবাহ-রাত্রিতে প্রবল ঝড়বৃষ্টির প্রকোপে চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে পাত্র আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিল না! শেষ লগ্নও যায় যায় এমন সময় আনন্দ-মোহনের শ্বশুর ও গ্রাম্য-জমিদার গিরীন্দ্রনারায়ণ আসিয়া তাহার পিতার দ্বারস্থ হইল। আনন্দমোহনের পিতার ইচ্ছা ছিল,—পুত্র ওকালতী করিয়া দু'পয়সা আনিতে পারিলে তাহার বিবাহ দিবেন। একদিকে তাহার বাসনা, অন্যদিকে গ্রামের প্রবল পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত জমিদার গিরীন্দ্রনারায়ণের অনুনয় বিনয় প্রার্থনা ও সামাজিক ভদ্রতা। ফলে আনন্দমোহনের পিতার মনের অভিলাষ মনোমধ্যেই রাখিতে হইল। ঘুমন্ত পুত্রকে লইয়া গিয়া পাত্রস্থ করিতে বাধ্য হইলেন। সেই অবধি আনন্দমোহন গিরীন্দ্রনারায়ণের জামাতা। সে আজ চারি বৎসরের কথা।

গিরীন্দ্রনারায়ণের তিনটী মাত্র কন্যা। প্রথম দুইটীর বনিয়াদী ঘরে মনোমত কমলার প্রিয়পুত্রদ্বয়ের সহিত দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে মনে গৌরব অনুভব করিতেন। তাঁর যত কিছু কষ্টের কারণ তাহার কনিষ্ঠা কন্যা নলিনী। পুত্রস্থানীয় হইলেও, ভিক্ষালব্ধ আনন্দমোহনকে তিনি প্রীতি-নেত্রে দেখিতে পারিতেন না। প্রথম ও দ্বিতীয়ের সহিত তিনি যেরূপ ব্যবহার করিতেন, তৃতীয়ের নিকট তাহা সম্পূর্ণ পৃথক হইত। দরিদ্র বলিয়া তিনি তাহাকে 'গ্রাহ্য' করিতে চাহিতেন না। এগুলি যে একেবারে অকারণে হইত তাহা নহে। যে আনন্দমোহনের পিতা চিরদিন তাহার আজ্ঞা-

বাহক প্রজা, আর কোন্ গুণে সে তাঁহার সমান আসন পাইবার যোগ্য! তাই তিনি প্রথম দুই জামাইকে যেরূপ "তত্ত্ব" করিতেন, তাহার সিকির সিকি অংশ আনন্দমোহনের অংশে পড়িত না। এক গ্রামে বাস করিয়া আনন্দমোহনের পিতা হরিশবাবু তাহার বৈবাহিকের প্রত্যেক কার্য্যকলাপ ভাল করিয়া দেখিতে শুনিতে পাইতেন। তাহার মন এ জন্য ক্ষুণ্ণ হইলেও কোনও দিন তিনি মুখ ফুটিয়া কাহারও নিকট সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেন না। নলিনীর মাতা সে সম্বন্ধে কোনও কথা উত্থাপন করিলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, পাছে পিতৃনিন্দায় তাঁহার একমাত্র আদরের বৌমার কষ্ট হয়! মনের আগুন চাপিলেও তিনি ভ্রমক্রমেও বৈবাহিকের পল্লীতে পদস্পর্শ করিতেন না, তাঁহার বাটীর প্রাঙ্গণ ত পরের কথা। পিতার উপযুক্ত সন্তান আনন্দমোহন আত্মসম্মান-জ্ঞানে পিতার অনুরূপ বা অধিক ছিল।

(২)

আনন্দমোহন এখন জুনিয়ার উকীল। মাসে কষ্টে সামান্য উপার্জ্জন করেন। যে দিন ১৲ টাকা হইল, সেই মনে মনে হিসাব হইয়া গেল মাসিক আয় ৩০৲ টাকা—যে দিন ২৲ টাকা হইল সে দিন ৬০৲—যেদিন ৫৲ টাকা হইল সেদিন হিসাব হইল ১৫০৲; ফলে মাসিক আয় ৬০৲।৭০৲ টাকার অধিক আয় হইত না। সুতরাং দিনরাত আকাশ-পাতাল জুড়িয়া একটা আদিঅন্তহীন সীমাশূন্য ভাবনা তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত,—কি করিয়া বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা করিবে! কি করিয়া আজন্ম সুখের ক্রোড়ে পালিতা নলিনীর ভরণপোষণ করিবে! তাঁহার প্রাণ একদণ্ডও পরমুখাপেক্ষী হইতে চাহিত না। এইরূপে অনেক কষ্টে তাহার দিনাতিপাত হইত।

বর্ষ পরে হর্ষভরে যখন সে পূজাবকাশে গৃহে ফিরিতে লাগিল, তখন তাহার মন উচ্ছ্বসিত, আনন্দে উদ্বেলিত। সে কত সুখ কল্পনা করিয়াই রেলে চড়িল এবং গাড়ীর "হুস্ হাস" শব্দের মধ্যে আত্মবিস্মৃত ও চিন্তায় বিভোর হইয়া পড়িল। ইহা জন্মভূমির আকর্ষণ, পিতামাতার চরণ দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা, বাল্যবন্ধু-বর্গের সহিত প্রাণ ভরিয়া গল্প করিবার আশা, বিরহ বিধুর নলিনীর পদ্মফোটা মুখখানি দেখিবার সাধ, আত্মীয়-স্বজনের সহিত প্রীতি-সম্ভাষণ ইত্যাদির সমন্বয়-চিন্তা। রেলগাড়ী যদি 'চিন্তা'র ন্যায় দ্রুতগামী হইত, তাহা হইলে ত তাহাকে এত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় আপ্লুত থাকিতে হইত না! তাহা হইলে ত এমন করিয়া মিনিটে মিনিটে পথপানে চাহিয়া দেখিতে হইত না, কতখানি আসিলাম।

অবশেষে গাড়ী গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল—আনন্দমোহন খুব ব্যস্ততার সহিত ব্যাগ ট্রাঙ্ক তুলিয়া লইয়া বাটী-অভিমুখে প্রধাবিত হইল।

(৩)

যে আনন্দে, যে উল্লাসে, আনন্দমোহন বাড়ী ফিরিতেছিল, তাহা সহস্রাধিক পরিমাণে বিষাদে, ক্রোধে, ভয়ে, বিস্ময়ে পরিণত হইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। যাহা দেখিল, তাহাতে সে ভাবিবার অবকাশ পাইল না, কাঁদিতে অবসর পাইল না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

তাহাদের বাস্তুভিটাটুকু অগ্নিদেবী বিকট বিশাল বদন ব্যাদন করিয়া গ্রাস করিতে নিমগ্ন। গ্রামস্থ ২০।২৫ জন লোক আসিয়া পুষ্করিণী হইতে জল উত্তোলন, জল-সেচনে নিযুক্ত, কিন্তু তাহাতে ফল পাওয়া যাইতেছে না। অনেককষ্টে আনন্দমোহনের পিতামাতাকে অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় বাহির করা হইয়াছে—তাঁহাদের জীবনের আশা নাই।

পাঁচজনের চেষ্টায় আনন্দমোহনের চেতনা ফিরিল। কিন্তু তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবী পিতামাতা চিরদিনের জন্য বুঝি নয়ন মুদিলেন!

রাত্রি বারটার পরে বাটীতে আগুন লাগে। ইহা কোনও শত্রুর কার্য্য কিনা এখনও তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই, তবে ইহার মূলে গ্রাম্যজমিদার যে প্রচ্ছন্ন-ভাবে আছেন, সকলেরই ধারণা এইরূপ। পূজার সময় গিরীন্দ্রনারায়ণ তিন জামাতাকেই তত্ত্ব করেন, কন্যাত্রয়কে একরকমের কাপড় জামা পাঠান, তবে জামাতাদিগের ব্যবস্থা কিঞ্চিৎ পৃথক হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয়ের জন্য বিখ্যাত মণিলাল কোংর নিকট হইতে হীরার আংটী ইন্সিওর পার্শেলে আনীত হইয়াছিল এবং কনিষ্ঠ আনন্দমোহনের জন্য গ্রামের "হরে স্যাকরা" একটা সোণার আংটী তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিল। যখন জমিদার-গৃহিণী গিরীন্দ্রনারায়ণকে বলেন—'তোমার এরূপ দুই দুই করা উচিত হয় নাই। আনন্দমোহনও ত জামাই বটে! তার পর নলিনী মনে দুঃখ করবে যে!' এ কথার উত্তরে গিরীন্দ্রনারায়ণ বলেন—"আনন্দ ত আর বড় দুজনের মত জমি-দারের ছেলে নয়, ঘুঁটে কুড়ানীর বেটা—ওকে পেতলের আংটী দিলেও মাথায় তুলে নাচবে। তারপর ওরা আমাদের প্রজা, বেশী রাগ করে ঘরের ভাত বেশী ক'রে খাবে।" গৃহিণী বলেন—"তুমি যাই বল কাজটা ভাল হচ্ছে না। মনে করে দেখ দেখি ছোট জামাই আমাদের কতটা উপকার করেছে—আমাদের জাত রক্ষে করেছে—নইলে কি হ'ত বল দেখি! আর গরীব হলেও আমাদের মা

লক্ষ্মী নলিনী ত একদিনের জন্য অসুখী নয়। সে দুঃখের ভাত সুখ করেই ত খাচ্ছে।" জমিদারের সহিত গৃহিণীর এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে আনন্দমোহনের ভৃত্য রামচরণ জমিদার-প্রদত্ত স্বর্ণাঙ্গুরীয়টী ফেরৎ আনিল।

গিরীন্দ্রনারায়ণ গুরুগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে ?"

রামচরণ নমস্কার করিয়া সপ্রতিভভাবে বস্ত্রপ্রান্ত হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া দিল। গিরীন্দ্রনারায়ণ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া পাঠ করিলেন—
"মান্যবর বৈবাহিক মহাশয়,

আমার ছেলে দুঃখী, বৌমা আপনার ঘরের মেয়ে হইলেও এখন দুঃখীর ঘরের। আপনি যে স্বর্ণাঙ্গুরীয়টী পাঠাইয়াছেন আমাদের ন্যায় অযোগ্য পাত্রে না দেওয়াই কর্ত্তব্য বিবেচনায় প্রত্যর্পণ করিলাম। অন্য সৎপাত্রে দিলেই সঙ্গত হইবে। দয়া করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।" ইতি

অনুগত—হরিশ"

* * * * *

ক্রোধে জ্ঞানহীন গিরীন্দ্রনারায়ণ আনন্দমোহনের সর্ব্বনাশ করিবে এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। ধূর্ত্ত রামচরণ অধিকক্ষণ অবস্থান অসমীচীন বিবেচনায় সেস্থান পরিত্যাগ করে এবং সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক হরিশচন্দ্রকে জ্ঞাপন করেন, অল্পভাষী হরিশচন্দ্র কেবলমাত্র বলেন—"রাগের মাথায় আঙটিটা ফেরত না দিলেই ভাল হ'ত।"

বাটীর অভ্যন্তরে ভীতা নলিনী শ্বাশুড়ীকে বলিল—"মা, বাবা যে রকম রেগেছেন তাতে কি কর্ত্তে হয়ত কি করে বস্‌বেন। আমাকে একবার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিন আমি তাঁকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে আসি।"

শ্বাশুড়ী বলিলেন—"তাকি হয় মা, এখন পাঠালে নানা কথা উঠ্‌বে। বল্‌বে খেতে দিতে পারেনি তাই পাঠিয়ে দিয়েছে। আর—কর্ত্তাও যেরূপ নিজের মান বজায় রেখে চলেন তাতে উনি অতটা মাথা হেঁট করবেন না।"

নলিনী ক্ষুণ্নমনে স্থানান্তরে গমন করিল! প্রাতে স্বামী আসিবেন, তাঁহার আগমন-আশায় উৎফুল্ল নলিনী হঠাৎ যেন শুষ্ক মলিন হইয়া গেল। একটা দারুণ আঘাতে তাহার হৃৎপিণ্ডটা যেন নিষ্পেষিত হইল!

(৪)

রাত্রি বারটার পর ১০।১৫ জন ডাকাতী করিতে হরিশচন্দ্রের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে। কক্ষদ্বার ভগ্ন করিয়া হরিশচন্দ্রকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিয়া

এবং বাটী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক গোশালায় নলিনীকে রাখিয়া প্রত্যাগমন করিল। তাহাদের গমনের সঙ্গে সঙ্গেই বাটীতে আগুন লাগিল। নলিনী তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে 'আমাদের সর্ব্বনাশ হল রক্ষা কর রক্ষা কর' এই বলিতে বলিতে পিত্রালয় অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। পিতাকে বলিয়া লোকজনের যোগাড় করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবে এই ইচ্ছা। কিন্তু তাহার শত চেষ্টাও ফলবতী হইল না। তাহার বাপের বাড়ীর দ্বারবান প্রভৃতি আজ ঘুমে অচেতন। সুতরাং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া নলিনী লজ্জাসরম বিসর্জ্জন দিয়া পুনরায় শ্বশুরবাটী-অভিমুখে ছুটিল!

নলিনীর ক্রন্দনে জাগরিত হইয়া গ্রামের কয়জন মিলিয়া অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় হরিশচন্দ্র ও তাহার স্ত্রীকে বাহির করিয়াছে এবং অগ্নি-নির্ব্বাণকার্য্যে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

সকলেরই এমন কি নলিনীরও দৃঢ়বিশ্বাস এই দুর্ঘটনার মূলে গিরীন্দ্র-নারায়ণের বিকট পিশাচমূর্ত্তি অবস্থিত!

(৫)

গিরীন্দ্রনারায়ণের কতকগুলি বিশ্বস্ত পাইক ছিল। 'ধরে আন্‌তে বল্‌লে বেঁধে আনাই' তাহাদের অভ্যাস। তাহারা এইরূপেই কর্ত্তব্য-সম্পাদন করে। গিরীন্দ্রনারায়ণ তাহার বৈবাহিকের অহঙ্কার ভাঙ্গিবার জন্য, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাদিগকে হরিশের বাটী লুণ্ঠন করিতে হুকুম দিয়াছিল। তাহার মনে বিশ্বাস ছিল, বৈবাহিককে একবারে নিঃস্ব করিতে পারিলে গোলামের মত তাহাকে আয়ত্ত করা কঠিন হইবে না। কিন্তু বিধিচক্র অন্যরূপে ঘুরিল! পাইকদের মশালের আগুণে বাড়ীর ধানের 'মরায়ে' অগ্নিসংযুক্ত হইল! বাটীতে আগুণ লাগিল! ফলে আনন্দমোহন পিতৃমাতৃহীন হইল! নিতান্ত পিশাচ হইলেও তাহার মনে কখনও বৈবাহিককে 'প্রাণে মারিবার' সঙ্কল্প ছিল না! যখন লোকমুখে তাহার কর্ণগোচর হইল যে আনন্দমোহনের বাড়ী পুড়িয়াছে, তাহার পিতামাতার মৃত্যু হইয়াছে—তাহার কন্যা পাগলিনীপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। স্বয়ং পদব্রজে তাহাদের বাটীতে উপস্থিত হইল।

অনুতাপক্লিষ্ট কণ্ঠে মৃদুস্বরে গিরীন্দ্রনারায়ণ ডাকিল—'আনন্দ'

আনন্দমোহন উত্তর দিল না।

গিরীন্দ্রনারায়ণ পুনরায় ডাকিল—'আনন্দমোহন'।

আনন্দমোহন রোষকষায়িত নেত্রে তাহার দিকে চাহিল মাত্র।

গিরীন্দ্রনারায়ণ বলিতে আরম্ভ করিল—'বাবা, বিধিচক্রের উপর কাহারও হাত নাই। নিজেকে সংযত কর। সংসারে এরূপ দুর্ঘটনা বিরল নহে।'

আনন্দমোহন উত্তর করিল—'পিতৃহন্তার নিকট উপদেশগ্রহণ অনাবশ্যক!'

'আমি তোমার পিতৃহন্তা!'—রোষকষায়িত নেত্রে বজ্রনিনাদে গিরীন্দ্রনারায়ণ কহিল—'তবে আমিই তোমার পিতৃহন্তা!'

"তুই-ই আমার পিতৃহন্তা নরাধম—ঈশ্বর যদি থাকেন তোর পরমায়ু যেন দ্বিগুণ হয়—তাতেই আমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ।"

* * * *

যথারীতি পিতৃমাতৃকার্য্য সমাপনান্তে বস্ত্রাঞ্চলে তাঁহাদের পবিত্র ভস্ম বাঁধিয়া আনন্দমোহন গৃহত্যাগ করিল।

(৬)

দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, আনন্দমোহনের কোনও সংবাদ নাই। নলিনীও পিতৃভবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিলাসের মধ্যে থাকিয়াও যেন দিন দিন শুকাইয়া পড়িতেছে। তাহার দেহে যত্ন নাই, আহারে রুচি নাই, মন উদাস, দৃষ্টি স্থির।

গিরীন্দ্রনারায়ণের মনেও স্ফূর্ত্তি নাই—কন্যার মুখপানে চাহিলে তাহার পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হয়—নিজের কৃতকর্ম্মের জন্য তাহার অনুশোচনা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমে সে মনে করিয়াছিল, অমন সকলেই গৃহত্যাগ করিয়া যায়, দিনকত পরে আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফেরে। কিন্তু যখন একমাস দুইমাস করিয়া এক বৎসর অতীত হইল, সহস্র অনুসন্ধান করিয়াও যখন আনন্দমোহনের কোনও সংবাদ পাইল না, তখন তাহার হৃদয় তমসাচ্ছন্ন হইল, মন চঞ্চল হইয়া পড়িল! সর্ব্বোপরি যখন কন্যার মলিন মুখ নয়নগোচর হইত, তখন অনুতাপে শত বৃশ্চিক-দংশনের মত তাহার হৃদয় জর্জ্জরিত করিয়া দিত। সে এখন ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছে আনন্দমোহন মিথ্যা বলে নাই। বাস্তবিকই সে তাহার পিতৃহন্তা! পরলোকের ভাবনা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিত! পৃথিবীতেও যে পাপের শাস্তি আছে তাহা সে হৃদয়ঙ্গম করিল। সর্ব্বোপরি আনন্দমোহন যে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য স্বয়ং উকীল হইয়াও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই, পরন্তু তাহার দীর্ঘজীবনের কামনা করিয়া গিয়াছে ইহাতে সে প্রথমে বিস্মিত হইলেও

এখন বুঝিতে পারিয়াছে, সে যে শাস্তির প্রার্থনা করেছে তার চেয়ে ফাঁসি যাওয়া বুঝি সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ ছিল। দুর্দ্দান্ত জমিদার গিরীন্দ্রনারায়ণ এখন কাজকর্ম্ম দেখেন না, সমস্তই বিশ্বাসী কর্ম্মচারিবৃন্দের হস্তে ন্যস্ত। সাধারণতঃ ইহার যে বিষময় ফল হয় তাহাই হইল—নায়েব ও অন্যান্য কর্ম্মচারী ইতিপূর্ব্বে যাহারা মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিত না, একটী পয়সারও হিসাব গোলমাল করিতে পারিত না তাহারা এখন সময় বুঝিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করিতে লাগিল। গিরীন্দ্রনারায়ণ এ সব দেখিয়াও দেখিত না—তাহার দেখিবার অবসরও ছিল না, সে মানসিক বিকারগ্রস্ত। ইহার ফলে তাহার প্রকাণ্ড জমিদারীর আশ্বিন কিস্তী ঠিক দিনে জমা দেওয়া হইল না, নায়েব মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক জমিদারিটী বেনামি করিয়া ক্রয় করিয়া লইলেন!

গিরীন্দ্রনারায়ণ যখন এই সমাচার পাইল, তখন ক্রোধে ঘৃণায় তাহার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইল। তৈজসপত্র-অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া পত্নী ও নলিনীকে লইয়া গিরীন্দ্রনারায়ণ কাশীবাসী হইল, নায়েবকে কোনও কথা বলাও সঙ্গত বিবেচনা করিল না। জামাতা আনন্দমোহনের প্রদর্শিত নীরব প্রতিশোধ লইবার পন্থাটুকু সে ইতিমধ্যে বেশ করিয়া চিনিয়া লইয়াছে।

* * *

নলিনী একদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিয়া ইষ্টদেবকে স্মরণ করিতেছে, এমন সময় মানস-নয়নে দেখিল তাহার দেবতা যেন মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান! চর্ম্মচক্ষু উন্মোচন করিয়া দেখিল সম্মুখে তাহার প্রিয় দেবতা—আনন্দে অস্ফুট শব্দ করিয়া জলমধ্যে সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। তাহার দেবতাও চকিতে তাহাকে উদ্ধার করিতে জলে ঝম্পপ্রদান করিলেন। জাহ্নবীর শান্তিময় ক্রোড় হইতে এই দম্পতীকে উত্থান করিতে আর কেহ দেখে নাই!

গিরীন্দ্রনারায়ণ যখন কন্যার জলমগ্ন হইবার সমাচার পাইল তখন সে একেবারে উন্মাদ হইয়া উঠিল—হস্তের বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয়টী জাহ্নবীর জলে নিক্ষেপ করিল! অঙ্গুরীই যে তাহার এই সর্ব্বনাশের মূল!

সাহিত্য-সমাচার।

ব্রাহ্মণ সমাজ।—মাঘ, ১৩২১। প্রথমেই শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থের সংস্কৃত কবিতা—"সরস্বত্যষ্টকম্"। কবিতাটীতে ছন্দঃ ও ব্যাকরণের শ্রাদ্ধ করা হইয়াছে। জানি না, কি গুণে ইহা "ব্রাহ্মণ-সমাজে"র প্রথম স্থান অধিকার করিল। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ, "সরস্বতী" কবিতায় কতকগুলি অসম্বন্ধ শব্দযোজনা করিয়াছেন। তীর্থ-কবি লিখিতেছেন,

"ওম্" নিনাদে সামরবে ধূপের গন্ধে সঘনে
ভক্তবৃন্দ আহুতি-মন্ত্রে সূর্য্য কম্পিত গগনে।"

এ কবিতার নিনাদে শুধু গগনে কেন, ভূতলেও অনেকে কম্পিত হইবেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ব্যাকরণতীর্থের লিখিত "ব্রাহ্মণ" কবিতা, "ভারতবর্ষে"র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত "শূদ্র" কবিতার অনুকরণ। কি কুক্ষণেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "ভারতবর্ষ" কবিতা বাহির হইল; তাহার পর হইতে ক্রমাগত তাহার ব্যর্থ অনুকৃতির উৎপাতে কাণ ঝালাপালা হইতেছে। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ন্যায়রত্ন, "বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের প্রতি নিবেদন" প্রবন্ধে ব্রাহ্মণগণকে ত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন। "ব্রাহ্মণ-সভা" চিরদিন যে কথা বলিয়া আসিতেছেন, তাহার পুনরাবৃত্তি-মাত্র। ব্রাহ্মণগণ, কি উপজীবিকার উপর নির্ভর করিয়া ত্যাগশীলতা প্রকাশের অবকাশ লাভ করিবে, এ পর্য্যন্ত তাহার উপায় নির্দ্ধারণ ত কেহই করিলেন না। রাজা শশিশেখরেশ্বর প্রভৃতির ভূমিদানের ঘোষণা কি বাক্য-মাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে? এই প্রবন্ধে বর্ণাশুদ্ধির মাত্রা অত্যধিক। "সুকঠিণ" "তত্বনীর্ণয়" "মনোস্তাপ" "শতত" "ধ্বংশ" প্রভৃতি লিখিয়া ন্যায়রত্ন উপাধিমণ্ডিত পণ্ডিতগণও কি বঙ্গভাষার প্রতি অন্যায় আচরণ করিবেন? একবার কবির "মনোসাধে" ব্যাকরণ কাঁদিয়াছিল। আজ পণ্ডিতের "মনোস্তাপে" ব্যাকরণের কি দুর্দ্দশা হইবে, জানি না। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার, "উপাসনাতত্বের মুখবন্ধ" সন্দর্ভে বক্ষ্যমাণ উপাসনাতত্বের সূচনা করিয়াছেন। আমরা মূল প্রবন্ধের প্রতীক্ষায় রহিলাম। লেখক এক স্থানে বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম মায়াকে আশ্রয় করিলে সগুণ অবস্থায় আপনাকে বিবর্ত্তিত করেন। আরও, বিবর্ত্তে তিনিই অবতার, তিনিই জীবাত্মা। সর্ব্ব আর্য্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই।" রামদয়াল বাবু অনেক বিষয়ের শিক্ষাভিমান রাখেন, তাঁহার লেখনী হইতে এইরূপ লেখা বাহির হইল দেখিয়া আমরা দুঃখিত। বিবর্ত্তবাদ কি সকল দর্শনকারের সম্মত? গৌতম, কণাদ, কপিল, জৈমিনি ও পতঞ্জলি—এই পাঁচজন দর্শনকারই ত বিবর্ত্তবাদ স্বীকার করেন নাই। বেদব্যাসের ব্রহ্মসূত্রেরও রামানুজ, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধরিতে গেলে দ্বৈতবাদই অধিকাংশ আচার্য্যের অনুমত। এরূপ অবস্থায় বিবর্ত্তবাদ বা মায়াবাদ সর্ব্ব আর্য্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হইল কেমন করিয়া? প্রবন্ধের নিম্নে রামদয়াল বাবুর স্বাক্ষর দেখিয়াই এত কথা বলিতে হইল। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ, "শুদ্ধিতত্ত্বে গুরুশিষ্য সংবাদে" স্মৃতি-

শাস্ত্রোক্ত অশৌচের আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গীয় পণ্ডিতগণ বঙ্গভাষায় এই ভাবে শাস্ত্রীয় কথা বিবৃত করিলে ভাষার নূতন সম্পদ্ লাভ হয়। "দুর্দ্দিন" শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যকান্ত মুখোপাধ্যায় এম-এ লিখিত কবিতা। আজকাল কি এক হাওয়া পড়িয়াছে, এখন সবাই কবি গদ্য না হইলেই তাহা কবিতা হইয়া গেল। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, "আর্য্য ও অনার্য্য বিবাহ" প্রবন্ধে পুরুষের বিবাহের অত্যাবশ্যতার কথা বলিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন, "পরিব্রজ্যা গ্রহণ না করিলে ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিতেই হইবে।" "তান্ত্রিকী সাধনা" শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত। লেখক প্রবন্ধের উপসংহারে বলিতেছেন, "তান্ত্রিকী সাধনা বিষয়ক শাস্ত্রীয় প্রমাণ বচন দ্বারা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বীর ও দিব্য ভাবের সাধক ব্যতীত আর কাহারও মদ্যাদি পঞ্চতত্ত্ব স্পর্শ করিবার অধিকার নাই এবং সেরূপ ভাবের সাধকও বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষে অন্ততঃ গৃহস্থাশ্রমে অতীব দুর্ল্লভ। কিন্তু তদ্ভিন্ন যাহারা কেবল পানাসক্তি নিবৃত্তি বা বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য অনাচার বা কৌলাচারের ভাণ করিয়া অনধিকারে মদ্যাদি স্পর্শ করিয়া থাকে তাহারা যে মহাপাতকী ও জীবনান্তে ঘোর নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।"

শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ভট্টাচার্য্য, "তিরোধান" প্রবন্ধে পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবন-কথার আরম্ভ করিয়াছেন। এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের পবিত্র জীবন-কথা যতই আলোচিত হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। লেখক বলিয়াছেন, "ভট্টপল্লীর বশিষ্ঠবংশে ১২৩৬ সালের ২৮শে ভাদ্র অনন্ত চতুর্দ্দশীর দিন সেই মহাপুরুষের জন্ম এবং ১৩২১ সালের ৩০শে কার্ত্তিক কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে ৺কাশীলাভ হয়। তাঁহার জীবনের চতুর্দ্দশী একটা লক্ষ্যের বস্তু। জন্ম শুক্লা চতুর্দ্দশীর দিন চন্দ্রবিধৌত হাস্যময় জগতে যেন ভারত আলোকিত করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিলেন—জন্মের পর দিন পূর্ণিমা। তাঁহার জন্মের পর প্রকৃতই দার্শনিক জগতে পূর্ণিমার উদয় হইয়াছিল। আর মহাপ্রস্থান কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর দিন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর ন্যায়রাজ্যের যে দশা, বাহ্য প্রকৃতিও তাহাই প্রকাশ করিল—পরদিন অমাবস্যা ঘোর অন্ধকার দেশেও প্রকৃতই ঘোর অন্ধকার।" সত্য সত্যই পূজ্যপাদ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের তিরোভাবে দর্শনশাস্ত্রের রাজমার্গ অমাবস্যার ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। আমরা এই প্রবন্ধের শেষাংশ দেখিবার জন্য উৎসুক রহিলাম। "বৈশেষিক গ্রন্থাবলী" শ্রীযুক্ত রসিকলাল বিদ্যাভূষণ লিখিত ন্যায়শাস্ত্রের কতকগুলি গ্রন্থের সূচীপত্র। ৺গুরুনাথ কাব্যতীর্থের প্রকাশিত 'ভাষাপরিচ্ছেদে'র প্রথমেও এইরূপ সূচী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মাসিক সাহিত্যের কলেবরে এই সূচী প্রকাশের আবশ্যকতা কি, জানি না।

দ্বারবঙ্গে নিমন্ত্রণ।*

[লেখক—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন।]

রবিবার ট্রেণে ছাপরায় উঠিয়া দেখি, সেই ট্রেণে ২।৩টি ভদ্রলোক আছেন। পরে জানিলাম, তন্মধ্যে একটি নেপাল রাজের কোন এক সেনাদলের নায়ক। নেপালের প্রধান মন্ত্রী মহারাজ শিকারে আসিয়াছেন; ইনিও তাঁহার সহিত মিলিত হইতে যাইতেছেন। শ্রীমান্ ন্যায়াচার্য্যের নিকটে যে নেপাল-রাজগুরু অধ্যয়ন করেন, তিনিও আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া আমাকে দেখিয়া খুব হর্ষ প্রকাশ করিলেন। ট্রেণে তিনি আমার সঙ্গে যতটা সময় ছিলেন, কেবলই নেপালের গল্প করিয়াছেন। তাঁহার মতে নেপালের তুল্য স্থান জগতে কম আছে। জল বায়ু ভাল, খাদ্য জিনিস পত্র সমস্ত অতি সস্তা। ন্যায়-অধ্যয়ন শেষ না হইলে তিনি নেপালে যাইবেন না; কিন্তু আমি যদি নেপাল দেখিতে যাই তবে আমাকে লইয়া তিনি আনন্দ সহকারে একবার যাইতে পারেন; আমার কোনরূপ কষ্ট হইবে না, এরূপ বন্দোবস্ত তিনি করিবেন। নেপালে ইংরেজিনবিশ অল্প আছে। তিনি বলিলেন,—"আপনার পুত্র এম, এ পাস করিলে নেপালে তাঁহাকে আমি কাজ দিব, তিনি অল্প দিনে অনেক টাকা করিয়া আসিতে পারিবেন।" তিনি নামিয়া গেলে সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম,—রাজগুরু সত্য সত্য কোটি মুদ্রার অধিপতি। সেই ট্রেণে একটি জমীদার ও দিল্লী হইতে প্রকাশিত হিন্দী-সমাচার-পত্রিকার সম্পাদকও দ্বারবঙ্গাধিপতির আহ্বানে যাইতেছিলেন। দেখিলাম, দিল্লীবাসী এক্ষণে কলিকাতাবাসীর মত ফাজিল হইয়াছে। সে লোকটা যে কত বড়,—তাহারই গল্পে আসর জমাইতেছিল; সে আসিতে আসিতে যান বাহনের জন্য মহারাজকে নাকি টেলিগ্রাফ করিয়াছে; সুতরাং ষ্টেসনে ত প্রকাণ্ড গাড়ী আসিবেই। আমা-

---

* বিগত ৪ঠা মাঘ দ্বারবঙ্গাধিপতির কুমারদ্বয়ের শুভ উপনয়ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে নানাদেশের গণ্যমান্য অধ্যাপকগণ দ্বারবঙ্গে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় তর্করত্ন মহাশয়, সে স্থান হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রবন্ধাকারে "অর্চ্চনা"য় প্রকাশিত হইল।

দিগেরও বিশেষ কষ্ট হইবে না,—তিনিই অনুগ্রহ করিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া যাইবেন ইত্যাদি ইত্যাদি মর্ম্মের কথা। ফলে হইল উল্‌টো, তাঁহারই যাইতে হইল আমার গাড়ীতে। একটি প্রধান পণ্ডিত গাড়ী লইয়া ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। বিহার-সঞ্জীবনী-সভার সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দনও সঙ্গে ছিলেন। একটি পুষ্করিণী ও ইন্দিরার নিকটে একটি বৃহৎ বাড়ী মহামহোপাধ্যায়দিগের জন্য বাসা দেওয়া হইয়াছিল। আমার পৃথক্ পাকের ঘর, পৃথক্ শয়ন গৃহ ও একটি সুন্দর বাগান পায়খানার জন্য দিয়াছিলেন; অন্যের তাহাতে প্রবেশাধিকার ছিল না।

৪ঠা মাঘ সোমবারেই রাজকুমারদ্বয়ের উপনয়ন। সেই দিনেই প্রত্যুষে দ্বারভাঙ্গায় পঁহুছিয়াছি। রেল ষ্টেসনের নিকটে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা; অত বড় দীর্ঘিকা সত্যঃ পুষ্করিণীও নহে। উহারই একদিকে কতিপয় রাজতরি-সমবায়ে জলাশয়ের উপর প্রাসাদের সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাতেও তোরণ আছে, ঝাড় লণ্ঠন, পুষ্পমাল্য ও পত্রমাল্যে সেই প্রাসাদকেও সজ্জিত করা হইয়াছে। আমি বাসায় পঁহুছিবার একটু পরেই শ্রীযুক্ত সোমনাথ বাবুর প্রেরিত একটী ঐ দেশী ভদ্রলোক একখানি রাজশকট লইয়া উপস্থিত। আসিয়া বলিল, "আপনার জন্য ষ্টেসনে গিয়াছিলাম; সেখানে না পাইয়া এখানে আসিয়াছি। আপনি শীঘ্র হাত, মুখ প্রক্ষালন ও স্নানাদি করিয়া রেশমি বস্ত্র মাত্র পরিধান করিয়া গাড়ীতে আসিয়া উঠুন। উপনয়ন-মণ্ডপে যাইতে হইবে; সেখানে সুতোর কাপড়ে কাহারও যাইবার অধিকার নাই। আর টিকিট্ লউন; টিকিট্ ভিন্ন কাহাকেও দৌবারিক যাইতে দিবে না"। যাহা হউক, আমি আর স্নান করিলাম না, হাত মুখ ধুইয়া গরদ পরিলাম, গরদের পঞ্জাবি গায়ে দিয়া তদুপরি শালে আবৃত হইলাম। গাড়ীতে কেশবও সঙ্গে চলিল, পথে সোমনাথ বাবুও আসিয়া মিশিলেন। তাঁহারও চোগা, চাপকান, পেণ্টুলন সমস্তই রেসমে নির্ম্মিত। দেখিলাম, দ্বারভাঙ্গায় অর্দ্ধেকের অধিক রাজপ্রাসাদের অন্তর্নিবিষ্ট। প্রাচীরের উপরিভাগ ও গেট সুন্দর সুরুচি-সম্পন্ন কারুকার্য্য-খচিত। রাজপ্রাসাদে প্রবিষ্ট হইয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। দেখিলাম, একটু দূরে ছত্রধারীর করধৃত সুবর্ণ দণ্ড-লম্বিত মুক্তাজাল-শ্বেতাতপত্রের নীচে দ্বারবঙ্গাধিপতি দাঁড়াইয়া উষ্ণীষ কঞ্চুকে বিভূষিত পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা আবৃত হইয়া পদস্থ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। আমরা অগ্রসর হইতে না হইতে তিনি যেন কোথায় অন্তর্ধান করিলেন; রাজার

নিকটে কয়েকখানি জরির ঘেরাটোপে আবৃত পাল্কীও ছিল। সেগুলি আমাদিগের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। চামরধারিণী ঘেরাটোপের বাহির হইতেই চামর আন্দোলন করিতে করিতে পাল্কীর সঙ্গে চলিয়া গেল।

পথে মহামহোপাধ্যায় চিত্রধর মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি অন্যান্য মিথিলার মহামহোপাধ্যায়ের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। দ্বারবঙ্গে অনেক মহামহোপাধ্যায় আছেন; আমরা পূর্ব্বে সংবাদ জানিতাম না। নৈয়ায়িক এখনও অনেক আছেন। চিত্রধর মিশ্র অন্য একটি গৃহে আমাকে লইয়া গেলেন। সেইখানে রাজদত্ত বেণারসি জোড় পরিধান করিয়া রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হইল। প্রাঙ্গণ যেন একখানি মাঠ; তাহারই মধ্যে পারমেনেণ্ট যাগমণ্ডপ রহিয়াছে। একদিকের গৃহের রকে বৈদিক পণ্ডিতেরা বসিয়াছেন; তাহারা উপযুক্ত সময়ে সামগান, ঋক্ আবৃত্তি ও যজুর্মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। বলা বাহুল্য যে, ইঁহারা কাশীধামের বেদপাঠীর মত কেবল গান আবৃত্তিতে পণ্ডিত নহেন; ইঁহারা বেদের অর্থও জানেন। আমি আলাপ করিয়া এ তত্ত্ব অবগত হইয়াছি। আসন লইয়া এখানে বড় গোলমাল। রাজার আত্মীয় কুটুম্বই এখানে ফরাসের উপরে পাতিত পৃথক্ আসনে উপবিষ্ট হয়েন। পণ্ডিতেরা ফরাসে বসেন। আলোচনায় জানিলাম,—শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের এ দেশে সম্মান অধিক, রাজা নিজেও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ; তিনিও আবার উচ্চসিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েন। যাগমণ্ডপের অন্যদিকে বালিকারা সংস্কৃত গান গাইতেছে; তাহাদিগের প্রত্যেকের হস্তে এক একখানি পুস্তক রহিয়াছে। অন্যদিকে পর্দ্দার মধ্য হইতে পুরনারীরা গান গাইতেছেন। মহারাজ আসিয়া পণ্ডিতদিগের অনুমতি লইয়া হোম আরম্ভ করিলেন। দেখিলাম, কুমারদ্বয়ের পাঁচ বৎসরের অধিক বয়ঃক্রম হইবে না। মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিক বস্ত্র ও যজ্ঞোপবীতে সুন্দর দেখাইতে লাগিল। পণ্ডিতেরাও ব্রতভিক্ষা দিলেন; দিল্লীর মহামহোপাধ্যায়দ্বয় অতি চতুর। তাঁহারা এক এক বালককে ৫৲ টাকা করিয়া ব্রতভিক্ষা দিলেন। আমি আর পুরীর পণ্ডিতের সঙ্গে টাকা ছিল না, সোমনাথ বাবুকেও অনুসন্ধানে পাইলাম না। পুরীর পণ্ডিত বলিলেন,—"বাঙ্গালী ও উড়িয়া এক, আমরা হিন্দুস্থানীর অনুবর্ত্তন কেন করিব? আমার কর্পূরের মালা আছে, আপনি দুই গাছি লউন, আমি দুই গাছি দিব"। ফলে আমরা তাহাই করিলাম। রাজা আমার হস্ত হইতে মালা দুইগাছি নিজেই লইলেন, বলিলেন,—"ব্রহ্মচারী গন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারে না"! প্রায় ৩টা বাজিয়া গেল। বাসায় আসিয়া

সন্ধ্যা পূজা আহারাদিতে ৫টা হইল। সেই সময়ে রাজোদ্যানে সান্ধ্য সম্মিলন। সান্ধ্যসম্মিলন সাহেবি-ভাবে সম্পন্ন হইল। রাজার সঙ্গে সেই সময়ে ২।৪ কথা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পরে সভা হইবার কথা ছিল, হইল না। বালকদ্বয়কে হ্বারবঙ্গে স্থাপিত ঋষিকুলে দেওয়া হইল, সেইখানে ব্রহ্মচারী থাকিয়া বেদ-অধ্যয়ন ও সংস্কৃত শিক্ষা করিবে, পরে ইংরেজিশিক্ষা হইবে। পর দিবস দিবা ২ ঘটিকার সময়ে সভা। আজ রাজা রাজবেশে সিংহাসনে আসীন। ফরাসের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রথমে মহামহোপাধ্যায়ের শ্রেণী, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতিতে অন্যান্য পণ্ডিত, বামে কর্ম্মচারিবৃন্দ, রাজার নিকটে ফরাসের উপরে আবার আসন; তাহাতে রাজগণ ও কুটুম্ব। যাউক, আমি অত্যন্ত বিরক্ত। প্রথমে অতিবৃদ্ধ একটি মৈথিল পণ্ডিত (বোধ হয়, মহামহোপাধ্যায়) লিখিত একটি সংস্কৃত কবিতা পাঠ করিলেন। রাজা তাঁহার বার্দ্ধক্যেও এত উৎসাহ বলিয়া প্রশংসা করিলেন। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম মহামণ্ডলের শ্রেষ্ঠ বক্তা দীনদয়াল নাম ধরিয়া অমুকে বলিবেন, ইত্যাদি প্রত্যেক বারে বলিতে লাগিলেন। প্রথমে দিল্লীর একটি পণ্ডিতকে ডাকিলেন; তিনি উঠিয়া "মেঘৈর্মে্দুরমম্বরং" ইত্যাদি শ্লোকটি তানলয়ের সহিত গাইয়া বলিলেন, "আমি মঙ্গলাচরণ করিলাম"। দিল্লীর ২য় পণ্ডিত উঠিয়া শঙ্করাচার্য্যের সরস্বতীস্তোত্র ও দুর্গাস্তোত্র ধ্রুপদের স্বরে গাইয়া আসর মাতাইয়া দিলেন। পরে রাজার রহস্যমন্ত্রী উঠিয়া একটি বক্তৃতা করিলেন। দীনদয়াল উঠিয়া সম্রাটের জয়-কামনায় আজ উপনয়ন-কৃত্য সম্পন্ন হইল, এইরূপ রিজলিউসন করা হউক ও সম্রাট্‌কে জানান হউক ইত্যাদি বক্তৃতা করিলেন; প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিতে গৃহীত হইল। তারপর কে কি বলিলেন; সমস্তই দীনদয়ালের অনুজ্ঞায়। আমাদিগের নাম তিনি করিলেন না। সভাভঙ্গ হয় আর কি। তখন আমি রাজার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "আমি ২।১টি কবিতা লিখিয়াছি, পড়িব কি ?" রাজা বলিলেন, "হাঁ, পড়িবেন বৈকি।" পুরীর পণ্ডিত উঠিয়া কম্পিত দেহে কম্পিত স্বরে জড়িতকণ্ঠে তাঁহার লিখিত আশীর্ব্বাদি কবিতা পাঠ করিলেন। রাজা বলিলেন, "উড়িষ্যার উচ্চারণ বড় মিষ্ট"। পরে আমি উঠিয়া তোমার সেই নোটবুকে লিখিত ও হরেন্দ্রের প্রতি প্রেরিত কবিতা কয়েকটি সংস্কৃত ব্যাখ্যার সহিত পাঠ করিলাম। "আমি হিন্দী বলিতে পারি না", বলিলাম। রাজা বলিলেন, "সংস্কৃত সকলে বুঝিবে না, আপনার হিন্দী বুঝা যায়, না হয়, আপনি বাঙ্গলায় বলুন"। আমি কখনও সংস্কৃত কখনও বাঙ্গলায় ব্যাখ্যা করিয়াছি। মুহুর্মুহু করতালী পড়িয়াছে। রাজা

বলিলেন—"এ কবিতা কে লিখিলেন? একালে কি এরূপ কবিতা কেহ লিখিতে পারে?" সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী ও চিত্রধর মিশ্র যুগপৎ উভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "উনি মহাকবি"। লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি,—দিল্লীর পণ্ডিত উপসংহারে বলিয়াছিলেন, "আপনি ত ব্রহ্মর্ষি, আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া নিবৃত্ত হই"। রাজার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি উপসংহারে বলিলাম, "দিল্লীর পণ্ডিত প্রণাম করিয়াছেন; আমি প্রণাম করিতে পারি না, রাজা ব্রাহ্মণ হইলেও ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন; আমরা ঋষিবৃত্তিতেই আছি; সুতরাং দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি"। রাজা হাসিয়া বলিলেন, "আমিও দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্ষত্রিয়" বলিয়া প্রণাম করিলেন। করতালী পড়িয়া গেল।

ফলে রাত্রিতে ধুতী দেওয়ার সময়ে আমাদিগকে কম্বলের আসন দিলেন।

সেই দিন রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়ে সভা হইল। আমাদিগের (মহামহোপাধ্যায়দের) জন্য পৃথক পৃথক বৃহৎ কম্বল ভাজ করিয়া এক একটী আসন পাতিত ছিল, তাহাতে 'সিনিয়রিটি' অনুসারে আমরা উপবিষ্ট হইলাম। রাজা রাজবেশে আসিয়া সভায় উপবিষ্ট হইলেন, তাঁহার মস্তকের মুকুট-সংলগ্ন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হীরক চুনীপান্না ও মুক্তার উজ্জ্বল জ্যোতিতে সভা উদ্ভাসিত হইয়া পড়িল। ইতিপূর্ব্বে আমি কখনও অত বড় মুক্তা দেখি নাই। মহারাজের আদেশে মহামহোপাধ্যায় চিত্রধর মিশ্র দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এই রাজ্যের আরম্ভ হইতে এই রাজ্যের অধিষ্ঠাতা মিথিলেশ্বর লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত দ্বারা পণ্ডিতদিগের শাস্ত্রীয় পরীক্ষা করেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে উত্তীর্ণ পণ্ডিতকে একজোড়া ধৌত বস্ত্র প্রদান করেন এবং রাজ সেরেস্তায় সেই উত্তীর্ণ পণ্ডিতের নাম লিপিবদ্ধ হয়। সেই অবধি সমাজে সেই ব্যক্তি পণ্ডিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়েন। রাজসরকারে এ প্রদেশে সর্ব্বত্র তিনি নিমন্ত্রণ পান ও তাঁহার ব্যবস্থা সমাজে গৃহীত হয়। অনুত্তীর্ণ পণ্ডিত কখনই এ প্রদেশে পণ্ডিত—মহাপণ্ডিত হইলেও পণ্ডিত বলিয়া গণনীয় হয়েন না। শ্রীমান্ মহারাজ বাহাদুরও সেই পূর্ব্বপুরুষের আবিষ্কৃত পথের অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। আজ মিথিলার সৌভাগ্য এবং দ্বারবঙ্গেশ্বরের সৌভাগ্য যে, আপনারা এক এক দেশের এক একটী উজ্জ্বল রত্ন মিথিলায় শুভাগমন করিয়া মিথিলেশ্বরের প্রদত্ত সেই ধৌত বস্ত্রদ্বয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিতেছেন। ধরিতে গেলে রাজর্ষি জনক ক্ষত্রিয় হইলেও এই নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহর্ষি শুকদেব তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপনিষদে

অন্যত্রও ক্ষত্রিয় জ্ঞানী রাজার নিকটে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার কথা আছে” ইত্যাদি।

পরে মহারাজ বলিলেন “লোভে পড়িয়া ব্রাহ্মণত্ব অবজ্ঞা করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এক্ষণে ঠিক ক্ষত্রিয়ত্ব রক্ষা করিতে পারিতেছি না। জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠান বজায় রাখিতে হয়, আবার সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব রক্ষা করিতে হয়; ফল দুইটী রক্ষা করিতে যাইয়া একটীও রক্ষা করিতে পারিতেছি না। এ জন্য নিয়ত অনুতপ্ত হইতেছি। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আজীবন যাহাতে ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিতে পারি। আমি প্রকৃত মনের কথা বলিতেছি, ইহাতে বিনয় নাই। আশীর্ব্বাদ করুন, আমার পুত্রদ্বয় যেন ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করিতে পারে। এবং আপনাদের দাস হইতে পারে ইত্যাদি” বলিয়া সেই ধৌতবস্ত্র ‘সিনিয়রিটি’ অনুসারে প্রত্যেককে দান করিলেন। আমার মনে হয় ধৌত বস্ত্র প্রকৃত নয়, সংস্কৃতে যে আহত বস্ত্র আছে, তাহারই অপভ্রংশে হয়ত ধুতি হইয়াছে। ধৌত ও ধুতি হয় ত কাছাকাছি শব্দ বলিয়া ইহারা শুদ্ধ ভাষায় ধৌত শব্দের ব্যবহার করিতেছে। অন্যান্য মহামহোপাধ্যায়েরা ক্রমে উঠিয়া বলিলেন, “আমরা আজ কৃতার্থ হইলাম।” আমি উঠিয়া বলিলাম, “আপৎকালে ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানী না পাইলে ক্ষত্রিয়ের নিকটেও অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ যেমন গুরু তেমনই থাকিবেন, ব্রাহ্মণ কখনও ক্ষত্রিয়ের শিষ্য বলিয়া পরিচিত হইবেন না, ইহাই মহর্ষি মনুর ব্যবস্থা। মহারাজ যে ক্ষত্রিয়-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, আমি মুক্তকণ্ঠে এক শত বার এই কথা বলিব। ক্ষত্রিয় রাজাই চিরদিন ধর্ম্মের রক্ষক ছিলেন—ব্রাহ্মণ্যের রক্ষক ছিলেন। আজ মহারাজ বাহাদুর ‘হিন্দু ইউনিভারসিটি’র প্রতিষ্ঠা করিয়া ও ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের পরিচালক হইয়া এবং অন্যান্য প্রতিনিয়ত বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যের পরিত্রাণ করিতেছেন, তখন ক্ষতকে ত্রাণ করেন বলিয়া ইনি ক্ষত্রিয়। “ক্ষতাৎ কিল ত্রায়তে”।

পরে যতটুকু সময় আমি দ্বারবঙ্গে ছিলাম, সেই টুকুর ভিতরে সেই দীনদয়াল প্রভৃতি সকলে আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। প্রধান ম্যানেজার দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ বাঙ্গালী বাবু আমাকে বলিয়াছেন, “আপনি রাজাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের তেজস্বিতা রক্ষা করিয়াছেন, সকলে তাহাই বলিয়াছে।”

৺সরস্বতী পূজার দিন বৈকালে দ্বারবঙ্গেশ্বর সমহিষীক রাজনগর গিয়াছে।

৺লক্ষ্মীশ্বরসিংহের জীবদ্দশায় বর্ত্তমান মহারাজ রাজনগরে পৃথক্ প্রাসাদে থাকিতেন। সেইজন্য রাজনগরে অদ্যাপি আসক্তি আছে। তাহার ফলে ২৫ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া সেইখানে মর্ম্মর প্রস্তরে দেবী-মন্দির ও বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিগত ২রা ফেব্রুয়ারী সেই প্রাসাদে ঐ দেশের লেঃ গবর্ণরের আসিবার কথা ছিল। বোধ করি আসিয়াছিলেন। দিল্লীর অধ্যাপক-দ্বয়, বক্তা দীনদয়াল, দিল্লীর এঞ্জিনিয়ার রাজনগরে রাজার নিকটে গিয়াছিলেন। সোমনাথবাবু আমায় লিখিয়াছিলেন,—"যদি প্রাসাদ দেখিতে আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আপনি যাইতে পারেন; এল-জি আসা পর্য্যন্ত আপনার সেখানে থাকিতে হইবে কি না আমি জানি না"। আমার ঘরবাড়ী দেখিতে যেরূপ অভিলাষ আছে, তা তুমি জান; আমি যাই নাই। সোমনাথবাবুর সঙ্গে ষ্টেসনে সাক্ষাৎ ছিল; সোমনাথবাবু বলিলেন, "আপনার যাওয়া উচিত ছিল, রাজার ইচ্ছা ছিল বলিয়া আপনাকে লিখিয়াছিলাম।" তখন টিকিট কেনা হইয়াছে।

রসতত্ত্ব।

[লেখক—শ্রীপ্রভাকর কাব্য-স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ।]

অলঙ্কার শাস্ত্রের 'রস' নামক পদার্থটী এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু, আজ পর্য্যন্ত এই রসের তত্ত্ব কোনও গ্রন্থকারই এক কথায় বুঝাইতে পারেন নাই। আলঙ্কারিকেরা এই রসকে কাব্যের আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যেমন করচরণাদিবিশিষ্ট দেহ বিদ্যমান থাকিলেও একমাত্র আত্মার অভাবে প্রাণীগণ মৃত বলিয়া বিবেচিত হয়; তদ্রূপ কাব্যের আত্মস্থানীয় এই রসের অভাব হইলে গদ্যপদ্য বিশিষ্ট কাব্যশরীর বিদ্যমান থাকিলেও তাহা কাব্য বলিয়াই গণ্য হয় না। এই রসতত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। কাব্য প্রকাশকার পণ্ডিতাগ্রগণ্য মম্মটভট্ট বলিয়াছেন—এই 'রস' বিকল্প জ্ঞানবেদ্য নহে, আবার নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ স্বলক্ষণ জ্ঞানবেদ্যও নহে; ইহা জাতি স্বরূপও নহে, ব্যক্তি স্বরূপও নহে। ইহা বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্বও নহে অথচ তাহা হইতে একান্ত বিভিন্নও নহে। ইহা বিকল্প নির্ব্বিকল্প ও জাতি ব্যক্তি ভিন্নাভিন্ন বিলক্ষণাত্মক। তিনি বলেন, জাতি পক্ষ আশ্রয় করিলে ব্যক্তিকে ও ব্যক্তি পক্ষ আশ্রয় করিলে জাতিকে এবং সবিকল্প জ্ঞানের আশ্রয় করিলে নির্ব্বিকল্প জ্ঞানকে

ও নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের আশ্রয় করিলে সবিকল্প জ্ঞানকে যে ভাবে বুঝা যায়, এই রসতত্বও সেইরূপেই বেদ্য। এতদতিরিক্ত ভাবে বুঝাইবার উপায় নাই। যেমন জ্ঞানিগণ ও যোগিগণ আত্মতত্ব জ্ঞানে সমর্থ হন, অন্যে নহে, তদ্রূপ কাব্যামোদী সহৃদয় রসিকবৃন্দই এই 'রসতত্ব' সম্যকরূপে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন। আত্মার স্বরূপ এক কথায় বুঝাইতে না পারিলেও অন্য হইতে পৃথক্ করিয়া দেখাইতে না পারিলেও প্রতি ব্যক্তি যেমন স্বীয় স্বীয় আত্মাকে অবশ্যই জানে, সেইরূপ কাব্য-শরীর হইতে এই রস পদার্থকে পৃথক্ করিতে না পারিলেও, এক কথায় বুঝাইতে না পারিলেও কাব্যশাস্ত্রানুশীলী সহৃদয়গণ "অন্বয় ব্যতিরেক" দ্বারা অবশ্যই এই রসের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকেন। যাহার অস্তিত্ব প্রভাবে কাব্য-জগতে অতি হৃদয়বিদারক করুণরস বর্ণনা পাঠ করিয়া কিম্বা দৃশ্য কাব্যে পাত্রাদিতে প্রতিফলিত দেখিয়া নয়ন জলপাত কালেও অন্তরে অন্তরে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে। সাহিত্যদর্পণকার পরম প্রজ্ঞাবান বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন,—এই রস স্বপ্রকাশ, কাহারও সাহায্য ব্যতি-রেকেই এই রস রসিকবৃন্দের জ্ঞানগোচর হয়। অন্ধকার গৃহের অভ্যন্তরস্থিত ঘটাদি বস্তু প্রকাশের নিমিত্ত যেমন দীপাদির প্রয়োজন, তদ্রূপ এই রসতত্ব প্রকাশের নিমিত্ত অন্য ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। যেমন দুগ্ধ, অম্লযোগে দধিরূপে পরিণত হয় তদ্রূপ বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারি ভাব প্রভৃতি দ্বারা পরিস্ফুট হইয়া 'রত্যাদি স্থায়ী ভাব', সহৃদয় হৃদয়ে রসরূপে আবির্ভাব হয়। রস বলিয়া ঘটাদির ন্যায় জগতে কোনও স্থায়ী পদার্থের অস্তিত্ব নাই। ইহা তত্তৎকালে সামাজিক হৃদয়ে বিভাবাদির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। এই রসজ্ঞান সকলের হয় না। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিফলে কেবলমাত্র মনুষ্য হৃদয়েই ইহার আবির্ভাব হয়। লোকে বলে যে রসানভিজ্ঞ ব্যক্তি, তৃণ ভক্ষণ বর্জ্জিত পশুতুল্য। তাই কোনও কবি খেদ করিয়া বলিয়াছেন—

"ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া,
বিতরতানি সহে চতুরাণন।
অরসিকেষুরসস্যনিবেদনম্
শিরসি মালিখ মালিখ মালিখ।"

অর্থাৎ হে বিধাত অন্য শত শত দুঃখ আমার অদৃষ্টে লিখুন তাহা অম্লানবদনে সহ্য করিব, কিন্তু অরসিকের নিকট রসতত্ব বর্ণন যেন আমার অদৃষ্টে না লিখেন।

শ্রীমদ্ভাগবত এই রসতত্ত্বের উপর সম্যক প্রতিষ্ঠিত। এই গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী স্বীয় টীকায় শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রসতত্ত্ব বিস্তৃত ভাবে প্রস্ফুট করিয়াছেন! আবার মহাপুরুষ চৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম্ম, মূলতঃ এই রসতত্ত্বের উপরই সংস্থাপিত।

বারান্তরে এই বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

গান

[লেখক—শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।]

কি ঔষধে মন বাঁধে, বল রে শপথ তোর!
মুছে যায় স্মৃতি-ক্ষত, ঘুচে যায় আশা-ঘোর!
অপমান, অবহেলা,
যন্ত্রণা, কল্পনা-খেলা,
অশ্রুজল, দীর্ঘশ্বাস, কি কুহকে হয় ভোর ?

সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ।*

ভারতের শোণিতের মধ্যে সঙ্গীতের বীজাণু বর্ত্তমান, একথা অস্বীকার করিবার যো নাই, তবে প্রাকৃতিক বিধানে শক্তির ন্যূনাধিক্য হ'য়ে পড়ে।

সেই আদ্দিকালের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া কল্লে দেখা যায়, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি, সবই গান। দুনিয়ার দৌলতখানায় অফুরন্ত রত্নরাজি সঞ্চিত, গোড়া থেকে যেমন লোকে দেখ্‌চে, নিচ্চে ব্যবহার কচ্চে, সেই রকম আমাদের ঐ সব পুরানো জ্ঞান সমুদ্রের অসীম গভীরতার মধ্যে থেকে অনন্ত রত্নরাজি, কত কত যুগ যুগান্তর ধরে আমরা দেখ্‌ছি তুলে নিচ্চি, বিলোচ্চি, তবুও ফুরুচ্চেনা, নিতুই নূতন বলে বোধ হচ্ছে। এমনিই মজা। আবার ওই ওপারের তাঁরা, যাঁরা "বেদ"কে চাষার গান বলে নাক তোলেন, ও যাঁরা খুঁটে খেতে শিখেই, ধরাকে মধুপর্কের বাটী বলে ভুরু কুঁচকে

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

নজরকে সীমাবদ্ধ ক'রে, কেবল দিগ্বলয়-রেখায় জরিপ কচ্ছেন, এই তাঁদেরই মধ্যে ২।৪ জন ভারতের সঙ্গীতটাকে কি রকম চোখে দেখেন, তারই দুএকটা উদাহরণ দিচ্ছি।

"বন থেকে বেরুলো টিয়ে, সোণার টোপর মাথায় দিয়ে" সেই রকম থামকা ১৩২০র এক বাদ্‌লার দিনে, Royal Asiatic Societyর Bengal Branchএ কৃপাপরবশ হয়ে Westharp সাহেব, (তিনি আবার Mus. Doc.) বলে গেছেন, যে, ভারতীয় সঙ্গীতটা ফ্লুট বা বাঁশী আর ঢাক, ঢোল বা খোলের সঙ্গতে গড়ে তোলা একটা বিতিকিচ্ছি কাণ্ড। আবার বলেছেন, প্রাচ্যের সঙ্গীতটা তাদের পবিত্র দেবস্থানের প্রাচীরের গণ্ডীমধ্যে অবস্থিত, সেখানে বিদেশী বা বিধর্ম্মীর প্রবেশ নিষেধ; সুতরাং এটা কোলাহল না হ'য়ে যেতে পারে না। তবে কথা হ'চ্ছে এই যে, এইরূপ ধারণার মূলে সত্যিকারের মূর্ত্তি, জাপান সম্রাটের মত ক' পুরু পর্দ্দার আড়ালে দেখা দেন, সেটা দেখ্‌তে হবে। এই অকাট্য ধারণার কুণ্ডু, ক'টা ঝরণার জল পেয়ে টৈটুম্বুর হয়েছে, সেটা অনেকেই বোধ হয় জানেন। Capt. Willard ও Capt. Dayর কেতাবাদি, জাহাজে চড়বার আগে, এক প্রস্থ প্রায় কণ্ঠস্থ ত' করেছেনই, তার উপর সত্যবালা দেবী প্রভৃতির গান-বাজ্‌না এখানে এসে শুনেছেন। চীন, জাপান ঘুরে যে মোস্‌ড়ানী প্রাণে নিয়ে বোম্বাই থেকে সটান এখানে এসে (লাইবেল হবার ভয় ত নেই) সুতরাং নিরপরাধ ভারত-সঙ্গীতের্ বেওয়ারিশ দেহে যে রকম চোব্‌লানটা চুব্‌লেছেন, সে বিষ ঝাড়্‌তে গেলে, সংযম হারিয়ে ফেল্‌তে হয়। তাঁর মতে, ইউরোপের বিশ্বাস, ভারত-সঙ্গীত আরম্ভ হয়েছে সেইখানে, যেখানে ওদের আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ শেষ হ'য়েছে। প্রথমে শুন্‌তে গেলে, একটু বিচঞ্চল হ'তে হয় বটে, তবে একটু তলিয়ে দেখ্‌লে, কথাটা ঠিক বলেই বোধ হয়। কেন না হাঁটি হাঁটি পা পা কর্‌তে কর্‌তে তবে ত চুরে র‍্যাং চাং।

গোলাম পালোয়ান যখন Paris Exhibitionএ কুস্তি লড়্‌তে গেছ্‌লো তখন অনেকেই তার গা টিপে সরে পড়েছিল,—এই বলে যে, ভারতের কুস্তি ও ইউরোপের কুস্তি অনেক তফাৎ, তাথৎ থাক্‌লে কি হয়? টাং ওড়ানো বড় শক্ত কাজ। তোড় জানা না থাক্‌লে প্যাঁচ সাফ হয় না।

Capt. Day যিনি মওলাবক্‌সের গান বাজ্‌না শুনে,আর দক্ষিণী সঙ্গীত শুনে বই লিখেছেন, উত্তরের সঙ্গীত বড় একটা বেশী শোনেননি, Capt. Willard ও

তথৈবচ, যিনি এই কোলাহলরূপ হলাহল আকণ্ঠ পান ক'রে বিলাতী নীলকণ্ঠ হ'য়ে কেতাবাদি লিখে গেছেন, তিনিও এ ভ্রম-সংশোধনের চেষ্টা করেননি। কেন না ইউরোপ যতদিন না গুরু অশৌচে শুধু পায়ে হবিষ্যি খেয়ে হত্যাক মুখে দেন, ততদিন ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীত, তাঁরা ধারণায় আনতে পার্‌বেন না। ভারতের সঙ্গীতের অন্দরমহলে যাঁহাদের প্রবেশাধিকার নাই, তাঁদের পক্ষে আমাদের সঙ্গীতের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার, বিভ্রাটের পর্য্যায় স্থান পায় না কি? আমরা সেটীকে উৎপাত বলি। তবে উৎপাত ত্রিবিধ; দৈব, আন্তরীক্ষ ও পার্থিব। এটা কোন্ জাতীয়, সেটা আপনারা সবাই বুঝ্‌তে পাচ্ছেন।

আওয়াজ সব প্রাণীরই গলা থেকে বেরোয়। বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব। সেই মানবের কণ্ঠের গঠন-প্রণালী অনুশীলন কল্লে, বেজায় আশ্চর্য্য হতে হয়, আর তাই বোধ হয় মানবকণ্ঠ থেকে সব রকম স্বর উৎপন্ন হয়; কখন কোন্ অবস্থায়, কি ভাবে কি শব্দ উচ্চারণ হয়, যা শুনে সব প্রাণীই মোহিত হয়, পোষ মানে, ভয় করে, ভালবাসে ও ভক্তি করে। তাই বোধ হয় আমরা মন্ত্রের শক্তি মান্‌তে বাধ্য।

তবে উত্তরে ও শীতপ্রধান দেশে, যেখানে লোকে কম কথা কয়, কম হাসে, সেখানে পেশীর ক্রিয়া প্রচুর হয় না বলে, কথা কইতে কইতে দম বন্ধ হ'বার উপক্রম হয়। ডচ্ ও আফ্‌গানদের প্রতি দৃষ্টিপাত কল্লে এটা বেশ বোঝা যায়। সুতরাং তাদের ভাষাও সেইরূপ আড়মাদ্‌রাটে গোছের গড়ে উঠেছে। আবার এদিকে ভারতবর্ষ, গ্রীস, ইতালী ও অন্যান্য দক্ষিণ দেশে, যেখানে প্রকৃতি পেলবতার রমণীয়তায় প্রসিদ্ধ, সেখানে ভাষায় মোলায়েমত্ব ও কোমলতা অবশ্যম্ভাবী।

মানবের আকৃতি-প্রকৃতি যেমন এক রকম হয় না, সেইরূপ তাহাদের স্বাভাবিক পাদবিক্ষেপও একরূপ হয় না. তবে দেখা যায় শিক্ষা ও অভ্যাসের সৌষ্ঠবে, পাহারাওয়ালাদের কুচকাওয়াজের সময় প্রায় (খুঁতযুক্ত) একরূপ হয়। মানুষের ও ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ থেকে বেশ বোঝা যায়, একটা জোর ও একটা মৃদু। তবে মানুষ ও ঘোড়া অনেক রকমের আছে বলে, ছন্দও ঠিক সেই অনুপাতে অনেক রকম। হিসাবে ৭২৫ রকম পাওয়া গেছে। ছন্দে যতি ও বিরাম আছে ব'লে সঙ্গীতের অঙ্গে স্থান পেয়েছে। ছন্দের গঠন-প্রণালী নানারকম পাদবিক্ষেপ থেকে প্রণিধান করা যেতে পারে।

ভারতের বিভিন্ন জাতির আভ্যন্তরিক ও বাহ্য বাসনা থেকে তাদের

ছন্দপ্রিয়তা উপলব্ধি করা যায়। মাঝিরা দাঁড় টান্‌তে টান্‌তে তালে তালে যে গান গায়, মজুরেরা ছাদ পিট্‌তে পিট্‌তে যে গান গায়, ভুনোওয়ালারা যাঁতা ঘোরাতে ঘোরাতে যে গান গায়, ইত্যাদি,—তা থেকে বোধ হয় ছন্দই তাদের গানের ভিত্তি।

গাছের ফল আর মানুষের দেহ, দাতাকর্ণের মত করাতে চিরে ফেল্লে, দেখা যায় যে দুটো ভাগ কেমন সমান হয়ে পড়ে।

সঙ্গীত ও কবিতা মা সরস্বতীর দুটী দয়া, যাকে সুকুমার ললিত কলা ব'লে অভিহিত করা যায়। তার দুটো দিক, একটা আনন্দ ও অপরটা শিক্ষা দেয়। এখন সেটা খাবার জিনিষ হয়ে পড়েছে। তবে তাতে বড় একটা তেউড় গজায় না।

পুরাণাদি কবিতায় লিখে স্মৃতির উন্মেষ ও রক্ষাকল্পে সাহায্য করেছে। যাঁরা রচে গেছেন, তাঁরা যে কতটা বেশী মস্তিষ্ক নিয়ে ঘরকন্না করতেন, এখন বেশ বোঝা যাচ্চে। তাই প্লুটার্ক বলে গেছেন,—আগের লোকেরা ছন্দে শিক্ষা দিতো, হেরোডোটাসের পূর্ব্বে গ্রীকেরা ছন্দে ইতিহাস লিখতো। ইজিপ্‌-সিয়ানদের কাছ থেকে এটা তারা শিখেছিল, আর ইজিপ্‌সিয়ানরা বলে, এটা তারা ধার করেছিল হিন্দুদের কাছ থেকে।

ভারতের শ্যামকোমলতার মধ্যে থেকে প্রাণের ভাব যখন গানের মুখে বেরিয়ে পড়ে, তখন সে ছন্দের ছকে কথা সাজিয়ে বসায় ও গায়, তখন পা তালে তালে আপনি নেচে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গও সুদশুদ্ধ পুষিয়ে দেয়। আবার এই ছন্দ, কবি ও গায়ক বা বাদককে, ভ্রাতৃ-সম্বোধনে এক পরিবারভুক্ত করে, তবে মাস্‌তুতো, পিস্‌তুতো, মামাতো, খুড়তুতো হিসাবে।

সকল জাতির, সকল ধর্ম্মের, সকল বর্ণের জাতীয় সঙ্গীতাদির গতি পর্য্য-বেক্ষণ কল্লে দেখা যায়, সেই সেই জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্মের ও সেই সেই দেশের আবহাওয়া, খাদ্য, ব্যবসা ও অভ্যাস রীতিমত সাহায্য করেছে।

সভ্য ও অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতির, জাতীয় সঙ্গীত হ'তে, তাদের স্বাভাবিক ছন্দ ও সঙ্গীতপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া যায় এবং কোন্ কোন্ বাদ্যযন্ত্র তাহারা ভালবাসে তাহা হতে ভাল মন্দের মীমাংসা করা যায়। কামাস্‌কাট্‌কা থেকে বর্ম্মা পর্য্যন্ত সকল জাতি যে সঙ্গীত ভালবাসে, তার ধারাবাহিক হিসাব আছে।

ত্রিপুরাসুর নিহত হ'লে, মহাদেব আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে "শঙ্করবিজয়" বলে

একটী নূতন রাগ সৃষ্টি কল্লেন, তখন ব্রহ্মা দেখ্‌লেন তাণ্ডব সুরু হয় বলে, অমনি ধাঁ করে তিরপুরোর ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে মৃদঙ্গের দুমুখ ছেয়ে বোঁ করে গণেশের কোলে তুলে দিলেন, তখন "তাদিংথুন্না চতুঃবর্ণা বিধিবক্ত্রাৎ বিনির্গতাঃ" ভরাট বোল শুনে মহাদেবের শ্রীচরণ তাণ্ডবে মেতে গেল। ক্রমে ছটী রাগ সৃষ্টি হল। শিষ্যও জুটে গেল। তার মধ্যে নারদ মহতী বীণা কাঁধে তুলে নিলেন, ভরত নাটক সৃষ্টি কল্লেন, হুহু আর তুম্বুরু (যিনি তান্‌পুরা সৃজন করেন) এঁরা যন্ত্র-বাদনে শ্রেষ্ঠ হলেন, রম্ভা যিনি পার্ব্বতীর কাছে নৃত্য শিখে, লাস্য নাম দিয়ে, যৌবত আর ছুরিত শেখাতে লাগলেন, এই রকম ১৮ জন সংহিতা-কার, এঁরা সঙ্গীতের বিজ্ঞান লিখ্‌তে লাগলেন। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিখাদ এই ক'টীর পর আর কোন মিঞার দেখা নেই, সেই কত দিনের কথা হ'য়ে গেল, সেই বিজ্ঞান আজও চলে আস্‌ছে। সেই গমক, সেই মূর্চ্ছনা, সেই তান, সেই অলঙ্কার। সেই ছত্রিশ রাগিণী, তারা হ'ল স্ত্রী, আর ভরতের ৪৮টী তারা হ'ল পুত্র। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে পূর্ণাবতার তখন ১৬০০ গোপী এক একটী করে রাগিণী সৃজন কল্লেন। ইন্দ্রসভায় গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরারা ভরতের নাটক, দেবতাদের নিমন্ত্রণ ক'রে এনে অভিনয় দেখিয়ে দিতেন, তার পর সকলকে জলযোগরূপ অনুযোগ করিয়ে বিশ্রাম রতে পাঠিয়ে দিতেন। এখনকার মত সকালে সকালে অভিনয় শেষ হোত না।

সভ্যতায় নাটকের চার অঙ্ক, শেষ হ'য়ে ৫ অঙ্কে পড়েছে, কত রকম সোসাইটী হয়েছে, কেবল বাকী Society for the prevention of cruelty to mankind, এটা যতদিন না হ'চ্ছে ততদিন আমাদের ছেলেপুলেদের চশমা নেওয়া কম্‌বে না, দেহের সৌষ্ঠবও বাড়্‌বে না। অভিনয়ের ভাগা দেওয়াও রদ হবে না। আজকাল রঙ্গতালিকা দেখ্‌লে আঁৎকে উঠ্‌তে হয়। ডাক্তার আর ডিস্পেন্সারী, জুতোর দোকানের মত কি রকমটা বেড়ে গেছে, কলিকাতার চিৎপুর থেকে ধর্ম্মতলার মোড়, আর বৌবাজার থেকে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত ঘুরে এলে বেশ মালুম হয়। সময়ের পের্‌মাই কম, অনেক কথা বলা রয়ে গেল।

তারপর ব্রহ্মা চারখানি বেদ ও চারখানি উপবেদ রচনা করেন, তার মধ্যে গন্ধর্ব্ববেদ অর্থাৎ সঙ্গীতশাস্ত্র (যাকে আমরা গন্ধর্ব্ববিদ্যা বলে থাকি) সামবেদ থেকে চুনে নিলেন। মা সরস্বতী, সুকুমারকলা একচেটে ক'রে দখলে রাখলেন। তাঁর কৃপা না হ'লে আর 'ডবল প্রমোশন' পাবার উপায় নেই।

ভগীরথ শাঁক বাজিয়ে গঙ্গা আনেন, লব কুশ বীণার তারে ঘা মেরে সুর ছেড়ে বাল্মিকীর শিক্ষায় রামের সামনে রামায়ণ গান করেন। রাবণ রাবণাস্ত্রম ব'লে বেহালার মত যন্ত্র সৃষ্টি করেন, তবে সেটা কার সময়ে, টপ্‌কে ওপারে গিয়ে নাম পাল্‌টালে, তার কিছু হিসেব যদি কারুর জানা থাকে তাহ'লে বলবেন।

মহাভারতে লেখে শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য, যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয়, ভীমের পৌণ্ড্র, অর্জ্জুনের দেবদত্ত যা শুনে শত্রুরা স্তব্ধ হ'য়ে যেত, নকুলের সুঘোষ আর সহদেবের মণিপুষ্প ও অন্যান্য যন্ত্র এসব যুদ্ধের সময় বাজ্‌তো। শ্রীকৃষ্ণের মুরলী যা শুনে যমুনা নেচে উঠতো, গোপীরা গৃহকাজ ভুলে যেত। দেবরাজের দেখাদেখি ভারতের রাজাদের নাট্যশালা যে ছিল, মৃচ্ছকটীক ও মালবিকাগ্নিমিত্রে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

তারপর অনেকটা সময় বাদ দিয়ে ১২৯৪এ ঢাকা যখন আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয় ও তারপর যখন ১৩১০এ সৈন্যাধ্যক্ষ মালিক কাফুর এদিকটা জয় করতে আর বাকী রাখলে না, তখন এখানে গান-বাজ্‌নাটী উন্নতির চরম সীমায় উঠেছে। কতকটা লুটে পুটে নিয়ে যখন কাফুর ঘরে ফিরে যায়, তখন রাস্তার এত সুবিধা ছিল না, রেলও ছিল না, কাজেই সৈন্যাদির কষ্ট লাঘব করবার জন্য অনেক গাইয়েগুনী ও হিন্দু সঙ্গীতের আচার্য্যদের সঙ্গে নিয়ে চলে যায়, তবে তাদের ফেরবার খপর আর পাওয়া যায়নি। ১৪৮৬—১৫১৬এ গোয়ালিয়রে রাজা মান সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ও সৌখীন সমজদার ছিলেন, ধ্রুপদ যে ঢংয়ে চলে এসে আজও পর্য্যন্ত গাওয়া হ'চ্ছে, এটা তিনিই সৃষ্টি করবার প্রধান উদ্যোগী। ১৫৫০—১৬০৫এ আকবরের সময় সঙ্গীতের খুব উন্নতি হয়। অদৃষ্ট যখন সুপ্রসন্ন হয়, তখন প্রতাপ দাপ্‌টে বেড়ায়, ভয়, ভক্তি, ভালবাসাকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে দলে আনে। হরিদাস স্বামীর শিষ্য তানসেন, আকবরের নবরত্নের মধ্যে একটী রত্ন, যার জলুষ এখনো বর্ত্তমান আছে, তবে কি পরিমাণে, তা বোঝবার আবশ্যক হলে, টোড়রমলকে এসে হলফ করতে হয়। তবুও যা পাচ্চি তাইতেই প্রাণ ভরে আছে।

কাশ্মীরের রাজা জইনউল আবিদিন, ইরান ও তুরান থেকে ওস্তাদ আনিয়ে, সভা আলো করে বসতেন।

গোয়ালীয়রের রাজা মান ও তাঁর পুত্র বিক্রমজিতের সময়ে ছিলেন বকসু, যিনি নায়ক উপাধিটী পান, যেটী তানসেনের ভাগ্যেও ঘটেনি।

পারস্যের বিখ্যাত কবি খসরু যিনি আলাউদ্দিনের সময় ভারতে এসে পড়েন, একদিন দিল্লীতে মাহফেলে দক্ষিণী ওস্তাদ নায়ক গোপালকে সঙ্গীত-সংগ্রামে হারিয়ে দেন। হিন্দুদের ৭২ রকম বীণের মধ্যে ত্রিতন্ত্রী বীণাকে সেতার নাম দিয়ে বাজাতে সুরু করেন, আর রাগাদির ১২ মোকাম ধার্য্য করেন, তারপর পরবর্ত্তী ওস্তাদেরা ২৪ শোভা আর ৪৮ শুস্তায় ভাগ করেন, তাঁরই চেষ্টায় ত্রেবট, তেরাণা, গজল, রেক্তা কওল, কোলবানা, গুল্ নক্স প্রভৃতির চলন হয়। একবার তানসেনের সঙ্গে বাদশার মনোমালিন্ত হওয়ায়, তিনি রেওয়ার অধিপতি রাজারামের কাছে চলে যান, ফের আকবরের হুকুমে, চলে আস্‌তে হয়, তবে রাজারামের কাছে যে যত্ন-খাতির পেয়েছিলেন, সে রকমটী কোন ওস্তাদের বরাতে কখনও ঘটেনি। (একক্রোর টাকা বকসীস্ তার উপর খানিকটা পথ রাজারামের কাঁধের পাল্কীতে চড়ে) সেই পর্য্যন্ত তানসেন ডান হাতে আর বাদশাকে সেলাম করেননি। এমনি মনের তেজ, তার কারণও ছিল। গোয়ালিয়র, মশাদ, তাব্রিজ, আর কাশ্মীরের প্রায় ৩৬ জন ওস্তাদ, আকবরের সভায় ঝাড়-লণ্ঠনের মত শোভা পেতেন। তার মধ্যে তানসেন ও তাঁর পুত্র তানতরঙ্গ। মালোয়ার রাজা বাজবাহাদুর ইনি বাজখাঁই ঢংয়ের সৃষ্টি করেন। বীরমণ্ডল খাঁ, ইনি সুরমণ্ডল বাজাতেন। কাসিম, ইনি কুবুজ ও রবাবের মাঝামাঝি একটী যন্ত্র সৃষ্টি ক'রে বাজাতে আরম্ভ করেন। আকবরের সময়ে কত যন্ত্র বাজ্‌ত আইনীতে তার উল্লেখ আছে। রাজা মানের পুত্র বিক্রমজিৎ সিংহাসনচ্যুত হ'লে বকৃস্থ কনৌজরের রাজা কিরাতের কাছে চলে যান, তারপর আবার (১৫২৬—১৫৩৬) গুজরাটের সুলতান বাহাদুরের নিকট থাকেন। রামদাস ও মহাপাত্র দুজনেই লক্ষ্ণৌতে ইসলেমসার কাছে ছিলেন, পরে আকবরের সভায় যান।

বিহার ত্রিহুটের রাজা শিবসিংহের সময়ের বিদ্যাপতির গানও আকবর শুনে কান পবিত্র করেছেন। এই সময়েই মীরার গানের প্রসিদ্ধি ছিল। ইতিহাস বলে, আকবর তাও কোন সুযোগে শুনেছেন। রামদাসের পুত্র সুরদাসের ১,২৫,০০০ বিষ্ণুপদী এই সময়ে রচিত হয়। তারপর জাঁহাগীরের সময়ে (১৬০৫—১৬২৭) জাঁহাগীরদাদ, ছত্র খাঁ, পারউইজদাদ, খুরমদাদ, মাখু, হামজান, (তুলসীদাস কবি এই সময় মারা যান) এই সব ওস্তাদের নাম পাওয়া যায়। তারপর সাজাহানের সময়ে জগন্নাথ কারবাই উপাধি লাভ করেন ও তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁর জামাতা লাল খাঁ "গানসমুন্দর"

উপাধি পেয়েছিলেন। জগন্নাথ ও দইরাংকে ওজন করে রূপা, ও ৪৫০০ ক'রে টাকা বকসীস দেওয়া হয়েছিল।

তারপর গান বাজনার হিরণ্যকশিপু আওরংজেবের হুকুমে দরবারে গাইয়ে বাজিয়ের দুর্ভিক্ষ হল। একদিন সব ওস্তাদে মিলে মতলব করে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে একটা কফিন কাঁধে করে বাদসার বার দেওয়ার জানালার সাম্‌নে এসে দাঁড়াতে, তিনি জিজ্ঞাসা করায়, শুনলেন যে "রাগরাগিণী মরেছে", "আমরা তাকে গোর দিতে নিয়ে যাচ্চি", এই কথা শুনে বাদ্‌সা খুসী হয়ে বল্লেন, "বেশ, খুব গভীর করে গোর খুঁড়ো, খরচা যত লাগে আমি দেব, দেখো যেন ধ্বনি বা প্রতিধ্বনি কানে না পৌছায়, তা হ'লে বড় ভাল হবে না কিন্তু"।

আওরংজেবের পর (১৭০৭—১৭৫৭) ১০ জন সম্রাটের সময়টা বড় মন্দ ছিল না। শেষ সম্রাট মহম্মদ শা খুব সৌখীন ছিলেন, তাঁর সময়েও ভাল ভাল গুণীরা দেখা দিয়েছিলেন, তাঁর নামের সঙ্গে জড়ানো অনেক গান আমরা শুন্‌তে পাই। এই সময়ে শোরীর ভনিতা দেওয়া গান হোসেন গোলাম নবী রচনা ক'রে গাইতে সুরু করেন। তবে একটা সুখের কথা মুসলমানেরা সঙ্গীতের পুস্তক কেউ বড় একটা লেখেননি, কেবল মির্জা খাঁ "তোফতুল হিন্দ" লেখেন। তখনকার সঙ্গীত এখনও পর্য্যন্ত উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত ব'লে চলে আস্‌ছে। মুসলমান রাজত্বের সময় হতে বহু ধর্ম্মসংস্কারক গীতিসাহিত্যের মধ্যে আপনার স্থান করে নিয়েছেন, তার মধ্যে কবীর ১৩৮০—১৪২০ সেকেন্দর লোদীর সময়ে হিন্দিতে ধর্ম্মতত্বের অনেক গান রচনা করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলার বীরভূমে জয়দেব সংস্কৃতে গান রচনা করেন। ১৪৯৯এ শিখগুরু নানক গান রচনা করেন। ১৫৪৪এ দাদু আমেদনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬০৯এ তুকারাম মারাঠী পদ্যগীতি রচনা করেন। বিদ্যাপতির সমসাময়িক বীরভূমের ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাস বাংলা কীর্ত্তনের মূল গান রচনা ক'রে সাহিত্যের গৌরব সম্পদ বৃদ্ধি করেন। কিন্তু ১৪৮৬তে বাংলার নদীয়ায় শ্রীচৈতন্যদেব যে ভাবের বান ডাকিয়ে গেছেন, সে কথা বল্‌তে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ না হলে বলা চলে না।

আরও দুচার জন বিলাতী পণ্ডিত, যাঁরা ২।১০ দিন ভারতের গান বাজ্‌না শুনে কলম ডেলে গেছেন, তাদেরই মধ্যে একজন হচ্ছেন Capt. Willard, তিনি বলেন, পাছে ৬ রাগ ৩৬ রাগিণী ছাড়া অন্য অন্য রাগিণীর লোপ হয় বলে, পরবর্ত্তী রাগিণীরা পুত্র আখ্যায় জাতে উঠেছে, আর খাম্‌খেয়ালী নাম দেওয়া হয়েছে। রাগের সঙ্গে রাগিণীর কোন মিল নাই। ভৈরবের ছয়

পত্নী :—ভৈরবী, টোড়ী, রামকেলী, গুণকেলী, বাঙ্গালী ও সৈন্ধবী। মিল খুঁজ্‌তে গেলে ভারতের মাটীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়, একথা আগে বলেছি, তবে একটু ঘুরিয়ে। এইখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। সঙ্গীতজ্ঞ গুণীদের ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা :—

১ম। নায়ক :—যাঁর প্রাচীন (যন্ত্র ও কণ্ঠ) সঙ্গীতে পূর্ণ অধিকার আছে, যিনি ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াসিদ্ধ ক্ষমতা-সম্পন্ন। গীত, সুগীত, ছন্দ, প্রবন্ধ, ধুয়া ও মাঠা সব জানেন ও আচার্য্য বলে খ্যাত।

২য়। গন্ধর্ব্ব :—দেশী ও মার্গ দুই জানেন।

৩য়। গুণী বা গুণকার :—যিনি কেবল দেশী জানেন।

৪র্থ। কলাবন্ত :—ধ্রুপদ, ত্রিবট ইত্যাদি গায়িতে জানেন।

৫ম। কওল :—তেরাণা, খেয়ালাদি গায়িতে পারেন।

৬ষ্ঠ। পণ্ডিত :—যিনি কেবল সঙ্গীতের ঔপপত্তিক অংশ জানেন। এমন সব লোকের গান বাজ্‌না শুন্‌লে বা তাদের কাছে বসে থাকলে তবে কিছু বোধগম্য হয়, তারপর শিক্ষা না হ'লে আচার্য্যের বেদীতে বসে ব্যাখ্যা করবার ক্ষমতা পৌঁছায়। নৈলে নয়।

তখন সূর্য্যের কিরণকে বিশ্লেষণ কর্‌লে যেমন লাল, নীল আর হল্‌দে এই তিনটে রং ধরা পড়ে, সেই রকম প্রত্যেক ধ্বনি বা আওয়াজ যা আমাদের কানে পৌঁছায় তার মধ্যে প্রথম তৃতীয় ও পঞ্চম অর্থাৎ সা গা পা এই তিনটী সুর বোঝা যায় তাদের শেষ দুটীকে সম্বাদী বলে।

দেহের গঠন যেমন সাত ভাগে বিভক্ত যথা :—মেদ, মাংস, মজ্জা, অস্থি, শুক্র, বসা ও শোণিত, ওদের Alex : Macalister বলে, ৬ রকম :—Skeletal, Muscular, Nervous, Digestive, Circulatory and Genito Urinary তবুও আমরা এক ডিগ্রি ওপরে আছি। সেইরূপ সাতটী সুরের উৎপত্তি বোঝা যায়। ইউরোপে যেমন major, minor আর semi-tone বলে আমাদেরও তেমনি সামাপা ব্রাহ্মণ অর্থাৎ চার শ্রুতির সুর, রেধা ক্ষত্রিয় ৩ শ্রুতির ও গানি ২ শ্রুতির সুর বলে বৈশ্য নাম রাখা হয়েছে, বিকৃত সুরকে পতিত বা শূদ্র বলা হয়। আবার এক এক সুর থেকে এক এক রাগ সৃজন হয়েছে যথা :—সা থেকে ভৈরব, রে থেকে মালকোশ, গা থেকে হিন্দোল, মা থেকে দীপক, পা থেকে মেঘ, ধা থেকে শ্রী, কেবল নিটী ভীষ্মদেব। কোন কোন প্রাণীর আওয়াজ থেকে কি কি স্বর বা সুর নেওয়া হয়েছে সে কথারও হিসাব আছে, যথা :—

সা—ময়ূর মতান্তরে গর্দ্দভ।

রে—ষাঁড়।

গা—ছাগল „ গাভী, ভেক।

মা—শৃগাল „ ভেক।

পা—কোকিল।

ধা—ঘোড়া।

নি—হাতী।

আবার এ সাতটীরও বর্ণ আছে, যথা :—

সা—কৃষ্ণবর্ণ।

রে—ধূম্র।

গা—কনক।

মা—কুন্দফুলের মত শাদা

পা—পীত।

ধা—ধূসর।

নি—হরিৎ।

ভাল ছবিতে রকমারি রংয়ের সমাবেশ দেখলে যেমন চোখের যুৎ আসে, সেই রকম রাগাদির সুরের সমাবেশ যদি নিভুর্ল হয়, তা' হ'লে কানের ও মনের আরাম হয়, যেমন ভাল ছন্দের কবিতা বা গান। উচ্চারণের মিল থাকলে তা কি মাত্রা ছন্দে, কি অক্ষর ছন্দে, শ্রুতিমধুর না হলে ভগ্নছন্দ, ভগ্নবৃত্ত, যতিভ্রষ্ট বা ভগ্নযতি হয়ে পড়ে। লয় দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত, মোটামুটী এই তিন প্রকার, তারপর দ্রুতমধ্য, দ্রুতবিলম্বিত ও মধ্যবিলম্বিত। দীর্ঘস্বর হ'লে গুরু যথা :—(আ ঈ ঊ ৠ ৠ এ ঐ ও ঔ) আর হ্রস্বস্বর হলে লঘু যথা :— অ ই উ ঋ ৯ সঙ্গীতে অনুদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত ৫ রকম মাত্রার উচ্চারণ আছে।

কবিকল্পদ্রুম-কর্ত্তা বোপদেব বলেন, ছন্দ ধাতুর অর্থ সম্বরণ। ভাবরস অলঙ্কার যখন কবিতার ভাষায় এক পরিচ্ছেদে রচিত হয়, তখন ছন্দ নাম পায়। সঙ্গীত হলে মাত্রা তালের হিসেবে ঢক্‌কে ঢক্ বজায় থাকে। একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল বাঘ বিস্তর, ইত্যাদি ভাল গাইয়ের মুখে বাহার বাগেশ্রীতে শুনলে রাগ বজায় থাকে বটে, তবে শ্রুতিমধুর হয় কি? তবে সেই সুর যদি কোন মনোমদ ছন্দে বসে তাহলে ইষ্টদেবতার ধ্যানে বসে সোণার নূপুর

পরিয়ে দিতে পাল্লে মনে যে আনন্দ হয়, মনের ভিতর অনাহত নাদের যে ক্রিয়া হয়, ঠিক সেই রকমটা হয়।

এক একটী গান যেমন মাত্রার হিসাবে, তালটী মাথাচোথা হয়ে বসে যায়, বাজিয়ের কোন কষ্ট হয় না, যারা শুন্‌নেওয়ালা তারা বেশ বুঝতে পারে। কোনটী চৌতাল, কোনটী ধামার, কোনটী ঝাঁপতাল, তেওরা কাওয়ালী, একতাল, যৎ, ইত্যাদি।

একাক্ষরা সমানমাত্রা শ্রীছন্দ, দ্ব্যক্ষরা কন্যা ছন্দ এসব তৃতালীতে বেশ থাপ খায়। দুধারে গুরু মধ্যে লঘু মৃগীচ্ছন্দ, তিন অক্ষরা ঠিক যেন সেতারের ডেড়ি চলেছে ড়ারাড়া এও তৃতালী।

চার অক্ষরে সতীচ্ছন্দ ঝাঁপতাল (৫ মাত্রা)।

পঞ্চক্ষরা পংক্তিচ্ছন্দ সুরফাক্তা। প্রিয়াছন্দ, ত্বরিতগতি।

ছয় অক্ষরা গায়ত্রী (১০ মাত্রা) শশিবদনা, সোমরাজি।

সাত অক্ষরা উষ্ণিক মধুমতী (৮ মাত্রা)

অষ্টাক্ষরা মানবক, গজগতি, সমানিকা, বিদ্যুন্মালা।

নয় অক্ষরা বৃহতীচ্ছন্দঃ।

১০ „ পঙক্তিচ্ছন্দঃ, ত্বরিতগতিচ্ছন্দ।

১১ „ উপেন্দ্রবজ্রা, ইন্দ্রবজ্রা।

১২ „ তোটক, ভুজঙ্গপ্রয়াতঃ, কুসুমবিচিত্রাচ্ছন্দঃ।

১৩ „ চণ্ডীচ্ছন্দঃ।

১৪ „ বসন্ততিলক, প্রহরণকলিকা।

১৫ „ শশিবদনা, মালিনীচ্ছন্দঃ, তূণক।

১৬ „ পঞ্চচামরচ্ছন্দঃ।

১৭ „ শিখরিণী, পৃথ্বী, মন্দাক্রান্তা, হরিণীচ্ছন্দঃ।

১৯ „ শার্দ্দুল বিক্রীড়িত।

২০ „ গীতিকাচ্ছন্দঃ।

২১ „ স্রগ্ধরাচ্ছন্দঃ।

উক্ত ছন্দগুলির তালবিন্যাসের ধারা স্বতন্ত্র প্রকারে হইয়া থাকে। কেহবা প্রথম তালে, কেহবা দ্বিতীয় তালে, কেহবা তৃতীয় তালে, কেহবা ফাঁকে ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষায় কবিতার অঙ্গে পাকা হাত না হ'লে এসব ছন্দ বসান বড়

শক্ত কাজ, তবে গানে কতক বসে। এইরূপ ক্রমে অনেক দীর্ঘ ছন্দ আছে তবে আমাদের সঙ্গীতে তার বড় অধিক ব্যবহার নাই।

ছন্দোগ্রন্থে নন্দোৎসব আছে। আবার প্রথম চরণের সঙ্গে তৃতীয় ও দ্বিতীয় চরণের সঙ্গে চতুর্থের মিল আছে, তাকে অর্দ্ধসমবৃত্ত বলে, আর যেরূপ ছন্দে প্রত্যেক চরণে লঘু, গুরু এবং বর্ণসংখ্যা নানা রকমে ব্যবহার হয় তাকে বিষমবৃত্ত বলে তা সঙ্গীতে চলে না।

ভাল ভাল যন্ত্রীর রাগালাপের পর জোড় যখন চলে বা তাল পরণ বাজে তখন ছন্দের নানা প্রকার কায়দা শোনা যায়। মৃদঙ্গের সঙ্গতে, অর্থাৎ যখন ধ্রুপদ গাওয়া হয় তখন যাঁরা ভাল সঙ্গত জানেন, তাঁরা আস্থায়ীতে এক ছন্দের বোল, অন্তরাতে অন্য ছন্দের বোল, সঞ্চারীতে ডেড়ী ও আভোগে তার দুনের বোল বাজান, তখন ছন্দের নানারকম বোল কানে পৌঁছায়।

সেইরূপ উৎকৃষ্ট দক্ষ অভিনেতার এক এক পংক্তির অবৃত্তিতে এক এক রাগে এক এক পরিচ্ছেদের কথা ভাব ও তার অর্থবোধ হ'য়ে যায়। গিরীশ-বাবুর মুখে যাঁরা "আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল আহাহা" শুনেছেন তাঁরা আমার কথা বেশ বুঝ্‌তে পারবেন। অর্দ্ধেন্দু বাবুর মুখে "I am sorry রাজা"ও ঠিক সেই রকম। কবি প্রাণের ভাষায় মনের আবেগে যখন গেয়ে ওঠেন "ব্যথাহারী বলে হরি ভালবাস কিহে ব্যথা দিতে" * আর সঙ্গীতা-চার্য্য † যখন জয়জয়ন্তীর দুখানা গান্ধার পাশাপাশি বসিয়ে প্রাণের করুণ তন্ত্রীর কোমলতা নিঙড়ে টেনে বার করেন তখন যে শোনে সেই মুগ্ধ হয়। সেখানে "সাজান বাগান", "sorry" আর "ব্যথাহারী" নয়টী রসের করুণটী এক চেটে ক'রে বসে থাকেন। তবে শোন্‌বার মত করে শুন্‌তে হয়, বল্‌বার মত করে বল্‌তে হয়, আর যিনি লিখ্‌তে জানেন তিনি লেখ্‌বার মত করে লিখ্‌তে পারেন। প্রাণ ঢেলে লিখ্‌লে, তাতে কথা যাঁর কৃপায় বসে, তাঁরই কৃপায় চারি পাশের সমাবেশ উৎকৃষ্ট রকম হয়ে যায়। তবে যেখানে নিছক ভাষার কারদানি ভাব ও চিন্তা সেখানে বাড়ন্ত। আবার দেখা যায় ভাব ও চিন্তা ভাষার মুখা-পেক্ষী। ভাব ও চিন্তাকে চলবার পথ ক'রে ভাষাকে মটরে চড়্‌তে দিতে নেই বরং ভাষাকে পথ ক'রে ভাব ও চিন্তা স্বাধীন করা উচিত। তাতে কাজ বেশী হয়। সেই রকম গানের পক্ষে বলা চলে, নাটকের পক্ষেও বলা চলে। আগে

* কবিবর শ্রীবিহারিলাল সরকার।

† সঙ্গীতাচার্য্য রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর।

পরিকল্পনা তারপর যথা সমাবেশ তাহলেই নয়ন মন পুলকিত হয়। একেই বলে অন্তর বাহ্যের সমীকরণ। তখন নকল আসলের ফারাক্ বুঝ্‌তে বিলম্ব হয় না। তখন আসলের পাশে নকলকে দাঁড় করালে পোড়ার গড়ন বলে চেনা শক্ত বোলে বোধ হয় না।

কথক ঠাকুরের মুখে গাধির তনয় শকুনির কথা শুনে এসে সাবেক যাত্রার অধিকারীরা পালা বেঁধে যখন গেয়ে গেছেন, তখন শকুনি গাধিকা বাচ্চা, আবার যখন নাট্যকার মহাভারত পড়ে শকুনির চেহারা এঁকেছেন, তখন শকুনি সৌবল, ধৃতরাষ্ট্র শ্যালক, কুরুপতি দুর্য্যোধনের মাতুল, ও কুরু সাম্রাজ্যের কর্ণধার। পাণ্ডুপুত্র ধর্ম্মরাজ-যুধিষ্ঠির-মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণের প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতির স্রষ্টা। সে শকুনি রাজনীতির অবসরে কুটনীতি শিখাইতেছে, তরল সরলতার আবরণে ধ্বংসের পথ প্রশস্ত ক'রে, প্রতিহিংসার অবসরের অপেক্ষায় উদগ্রীব। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, ধৃতরাষ্ট্র ইত্যাদি কৌরব মহাবীরগণ অন্ধের ন্যায় শকুনির অঙ্গুলি-হেলনে চালিত। গুপ্ত মন্ত্রণা-সভার অবসানে দুর্য্যোধন, কর্ণ ও দুঃশাসন চলিয়া গেলে, মনে মনে চিন্তা-তরঙ্গের অভিঘাতে শকুনির হৃদয়ের গুপ্তকথা নাট্যকার যখন বহু আয়াস-অধীত গ্রন্থের সম্যক বিচারফলে চরিত্র রচনা করিলেন, তখন শকুনি বলিয়া উঠিল—

'কৌরব কল্যাণ প্রিয় সৌবল মাতুল,
রহ স্থির কিছু দিন আর।
কঠোর দশন রহ সতর্ক প্রহরী,
লেলীহান রসনায় রাখ সাবধানে, নিগড়ে আবদ্ধ করি।
অসতর্ক মুহূর্ত্তের সুযোগ প্রয়াসী, প্রতিহিংসা সতি,
রাখ মোরে তোমার চরণতলে।
কি কহ ভামিনী ধর্ম্ম ?
সেত ভীরুতার অন্য নাম অন্য আবরণ।
কি বলিলে, পুণ্য—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ কিবা রূপ তব,
স্বার্থে নৃমণি তুমি প্রিয় সহচর।
পুণ্য, পুণ্য, এত কি গরিমা তার ?
পুণ্য প্রিয় নর সেত কাপুরুষ,
শঙ্কিত, সন্দিগ্ধমতি, স্বচ্ছন্দতা মনের কোথায় তার ?
পুণ্যের প্রতাপে, দুর্ভাগ্যের নিপীড়ন ঘোর।

মিথ্যা, মিথ্যা, শুধু উন্মাদ প্রলাপ ব্রাহ্মণের!
পুণ্য আলো, পাপ অন্ধকার, কবির কল্পনা,
কাব্যের ললিত কথা, মাধুর্য্য ভাষার ;
রাখ কবি সঞ্চিত করিয়ে তব ভাষার ভাণ্ডারে।
বিস্তৃত সাম্রাজ্য যার অঙ্গুলী-সঙ্কেতে হয় আন্দোলিত,
কর্ণধার সম্রাট তরীর,
তার কাছে দুর্ব্বল বিপ্রের ভাষা,
হ'তে পারে শ্রুতিসুখকর।
বংশধরগণ হেতু মম অভিধানে,
না রহিবে ভীরুতার প্রশ্রয় দানিতে।
পিতা, পিতা, অশরীরী ইষ্টদেব,
যদি থাক কোন লোকে, দেখ বসি বংশধর রাজনীতি।
যত দণ্ড যত পল ছিলে অনাহারে,
গণনায় তত অরি করিব নিধন।
পাণ্ডব কণ্টক করি সহায় সমরে,
কৌরব কণ্টক নাশ করিব সমূলে।
ধনঞ্জয়, শিবের ললাট-বহ্নি রাখ প্রহরণে,
বৃকোদর, গদায় বাঁধিয়ে রাখ ইন্দ্রের অশনি,
ভস্ম হবে কৌরবের চমূ।
অনুনয় কেন অন্ধরাজ ?
কি বলিলে ? ভগিনীর স্নেহ!
তাই বধিলে পিতারে তার, অনাহারে ফেলি কারাগারে!
পতিব্রতা রমণীর স্বামী তুমি,
পত্নী-ঋণ শুধিয়াছ ভাল!
গান্ধারী বেঁধেছে বাস নয়নে তাহার,
সাধ্বী সতী ভগিনী আমার,
কত দুঃখে ঢেকেছে নয়ন।
যুধিষ্ঠির যথার্থ সম্রাট তুমি,
রহ বাপু আর কিছু দিন,
কৌরবের চিতাভস্ম ধৌত করি,

স্বহস্তে মুকুট আমি পরাব তোমায়।
ভীষ্ম, কি দেখ আমার পানে কাতর নয়নে ?
চিন্তা কি গাঙ্গেয় ? করায়ত্ত মরণ তোমার।
কি বলিলে পাণ্ডবের পিতামহ তুমি ?
যুধিষ্ঠির রাখিবে তোমায় ;
আছে কেশব-সচিব,
শিখণ্ডী পাণ্ডব পক্ষে, আছে কি স্মরণে ?
কি কহ মুরারি, সহদেব বধিবে আমায় ?
তত দিনে কেহ না রহিবে,
কৌরবের বংশে বাতি দিতে।
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ মৃত্যুর অপর পারে মহাসম্মিলন।"

ইহাও ছন্দঃ ইহাও সঙ্গীত, ইহাতেও সুর তাল সব বজায় আছে, তবে বলিবার ও শুনিবার প্রকারভেদ। ধেরে কেটে ধেরে কেটে ধেধেব ধেরে কেটের গম্ভীর মৃদঙ্গের ধ্বনি লীলায়ত ছন্দের আবৃত্তি-মুখে উপগীয়মান।

'অন্ধ-প্রেম'।

[লেখক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।]

কত ভালবাসি দেব! কেমনে বুঝাই
নাহি সে ক্ষমতা।
এ হৃদয়ে নাহি হিংসা আছে অভিমান
সরল মমতা।
ভাল মন্দ যাহা হই তবু আমি তব
ভৃত্য আপনার—
বুঝিলে না তুমি মোরে এই দুঃখ বড়
বাজে এ জনার।
করিয়াছি অবিচার—অপরাধ শত
করিয়া সন্দেহ ;
ক্ষমা কর হে ব্রাহ্মণ! ভৃত্য জ্ঞানহীন
নাহি কার স্নেহ।
তুমি ধ্যান, তুমি ধ্যেয়, তুমি মোর সব
এ বিশ্ব ভিতরে ;
মানি নাই কার বিধি তুষিতে তোমায়
ক্ষণেকের তরে।

যেই দণ্ড—লঘু গুরু যাহা ইচ্ছা হয়
দিও দেব! মোরে।
দিও সেই দণ্ড নিজে—তার ভার শুধু
দিও না অপরে।
তাই মোর প্রিয় অতি, নাহি প্রিয় আর
কিছু এ জগতে ;
বঞ্চিত করনা মোরে হে দেব তোমার
সেই দান হ'তে।
ফুল-হার-ভ্রমে হায়! দেছি কণ্ঠে তব
প্রাণঘাতী ডোর,
তোমার মঙ্গল চাহি করেছি তোমার
অমঙ্গল-ঘোর।
নাহি আর কোন আশা নাহি অনুরাগ
এ জীবনে লেশ,
গড়িতে চাহি না আর ভগ্ন-দেবালয়,
পূজা যদি শেষ।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

[লেখক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।]

মাঘ মাসের ১০ই তারিখ কবিবর নবীনচন্দ্রের মৃত্যু-দিন। ঐ দিনে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে কবিবরের স্মৃতি-পূজা-উপলক্ষে এক সভা বসিয়াছিল। ইহা যে সুখের কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ দিনে বাঙ্গালার যে আর এক কবি ইহলোক হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন, বাঙ্গালীরা তাঁহার নাম-গন্ধও করিল না! সে কবিও বড় সামান্য কবি নহেন। তাঁহার নাম—ঈশ্বর গুপ্ত।

* *
*

ঈশ্বর গুপ্তকে বাঙ্গালী আজ ভুলিতে বসিয়াছে বটে, তিনি কিন্তু এ জাতিকে কখনও ভুলেন নাই। তাঁহার আজীবন চেষ্টা ছিল—বাঙ্গালী কেমন করিয়া মানুষ হইবে। দেশের লোকের কাহারও কিছু ভাল দেখিলেই তিনি তাঁহার 'প্রভাকরে' প্রশংসার উৎস খুলিয়া দিতেন, আর মর্কটামি দেখিলেই ভাষার তীব্র কশা চালাইতেন। ইহাতে তাঁহার শত্রু-মিত্র-ভেদ-জ্ঞান ছিল না। দেশবাসীকে তিনি যেমন প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতেন, তেমন বুঝি আর কোনও বাঙ্গালী লেখক পারেন নাই। তিনি বলিতেন,—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

এমন বিশুদ্ধ, এমন প্রগাঢ় দেশ-প্রীতির কথা আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার আর কোনও কবির লেখায় ফুটিয়া উঠিতে দেখি নাই। কিন্তু এমন কবির স্মৃতি-পূজা এদেশে হয় না! দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় তাঁহার নাম—তাঁহার কথা জিহ্বাগ্রেও বড় একটা আনেন না।

* *
*

বাঙ্গালায় এক সাহিত্য-পরিষৎ আছে বটে; কিন্তু নামে সে পরিষৎ—কাজে পারিষদ মাত্র। পঞ্চাশ বৎসরের বেশ দানাদার বুড়া পাইলে, তাহাকে সম্বর্দ্ধনার জন্য সে ছুটাছুটি করে। কিন্তু যেখানে কোনও লাভের প্রত্যাশা নাই—যেখানে শুধু কর্ত্তব্যের সম্বন্ধ, 'পরিষদ' সেখানে নিষ্কাম—নিষ্ক্রিয়! কিন্তু কথা হইতেছে, দেশের লোকেরাও কি আজ 'পরিষদে'র পথ অনুসরণ করিয়া চলিবেন? আমরা কাগজে-কলমে, 'বক্তৃমা'র মুখে যখন-তখন আমাদের মনুষ্যত্বের বড়াই করিয়া থাকি, অথচ যিনি আমাদের অন্যতম সাহিত্যগুরু, যিনি আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া আমরা যে কি প্রহসনের সৃষ্টি করিতেছি, সে কথা এক-বারও কেহ ভাবিয়া দেখি না।

* *
*

এবারকার 'উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে'র সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর অভিভাষণের ভাষা দেখিয়া আমাদের সেই অতি পরিচিত প্রবচনটি মনে পড়িল,—

"সেই ত মল খসালে
তবে কেন লোক হাসালে।"

চৌধুরী-সাহেব 'মল খসাইয়াছেন' ; অর্থাৎ, হুতোমী ঢংয়ের ভাষা ছাড়িয়া তিনি লিখনের ভাষায় তাঁহার অভিভাষণ রচনা করিয়াছেন।

* *
*

তবে মজার কথা এই যে, কার্য্যতঃ তিনি মত পরিবর্ত্তন করিলেও মুখে মত পরিবর্ত্তন করেন নাই। তিনি ভাঙ্গিয়াছেন বটে, কিন্তু মচ্‌কান নাই। লিখন-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। কৈফিয়তের ভাবটা এই যে, 'কাজে' পড়িয়া আমাকে 'কল্‌কাত্তাই চল্‌তি ভাষা' ছাড়িয়া সাবেক বাঙ্গালায় অভিভাষণ লিখিতে হইয়াছে,—নহিলে এ ভাষায় লেখা আমার ইচ্ছা নহে। ইহা ছাড়া, 'চল্‌তি ভাষা'র জন্য ওকালতী করিয়া অভিভাষণের প্রায় তিন ভাগ স্থানও তিনি নষ্ট করিয়াছেন। 'চল্‌তি ভাষা যে রূপে গুণে লিখিত ভাষা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ',—ইহাই হইতেছে অভিভাষণের প্রধান বোল।

সভাপতি বলিতেছেন,—"কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, এই দুই ভাষার (সাধু ভাষা ও প্রচলিত ভাষা) মিলনসূত্রেই বর্ত্তমান সাধুভাষা জন্মলাভ করিয়াছে—কিন্তু আমার ধারণা অন্যরূপ। বর্ণে ও গঠনে এই দুই ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয়, সুতরাং ইহাদের যোগাযোগে কোনরূপ নূতন পদার্থের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব।"—কেন? সভাপতি মহাশয় যে ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, সে ভাষাটা কি ঐ দুই ভাষার মিলনসূত্রেই গঠিত হইয়া উঠে নাই? বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।" শুধু এই বলা নহে। কার্য্যতঃ তিনি উহা দেখাইয়াও গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এবং তাঁহার সহচর অনুচর প্রভৃতির ভাষাই ঐ কথার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অতএব কেমন করিয়া বলিব যে, ঐ দুই ভাষার মিলন-সূত্রে বর্ত্তমান ভাষার জন্মলাভ হয় নাই?

'চল্‌তি ভাষা, লিখিত ভাষার স্থান অধিকার করিবে', কি না, সে সম্বন্ধে আমরা নিজে কিছু না বলিয়া বঙ্কিমের উপদেশ পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। পাঠকেরা সে কথার সারবত্তা বিচার করিয়া দেখুন। বঙ্কিম বলিতেছেন,—"আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখন পঠন হুতোমী ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখনও হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন, কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্ত-সঞ্চালন।

এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমী ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই, হুতোমী ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমী ভাষা অসুন্দর, এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমী ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। টেকচাঁদি ভাষা হুতোমী ভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্য ও করুণ রসের ইহা বিশেষ উপযোগী। স্কট্, কবি বার্ণস হাস্য ও করুণ রসাত্মিকা কবিতায় স্কচ্ ভাষা ব্যবহার করিতেন। গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেন না, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্ব্বল এবং অপরিমার্জ্জিত।"—লিখনের উদ্দেশ্য যে শিক্ষাদান বা চিত্ত সঞ্চালন—বঙ্কিমের এ উক্তির প্রমাণের জন্য বেশী দূর যাইতেও হইবে না। আলোচ্য অভিভাষণের ভাষাই সে কথার প্রমাণ। লেখক সহসা আজ চল্‌তি ভাষা ছাড়িয়া যে লিখনের ভাষায় অভিভাষণ কেন লিখিলেন, তাহা বঙ্কিমের ঐ উক্তি হইতেই বুঝা যায়।

বাঙ্গালার সাহিত্য-ক্ষেত্রে সম্প্রতি কতকগুলি লেখক জুটিয়াছেন, তাঁহারা লিখিবার কিছু না পাইলেই দেশের মৃত লেখক বা মৃত বড় লোকের জীবন-কথা লিখিয়া মাসিক পত্রাদির পাতা পূরণ করিয়া থাকেন। বিষয়টা যে ভাল, সন্দেহ নাই; তবে যদি সত্যের সহিত তাহার সম্পর্ক থাকে! কিন্তু প্রায়ই তাহা হয় না। এই চাষা-লেখকেরা মন-গড়া কথা লিখিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে মিথ্যার চাষ দিতেছেন। ইহার দুই একটা টাট্‌কা উদাহরণ দিতেছি।

* *
*

১৩০৮ সালের কার্ত্তিক মাসের 'ভারতী'তে এক লেখক "বঙ্কিম যুগের কথা" শীর্ষক রচনার একস্থলে লিখিয়াছিলেন,—"বঙ্কিমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'চন্দ্রশেখরে' পূর্ণচন্দ্রের লিখিত একটি পরিচ্ছেদ আছে। তাঁহার "কৃষ্ণকান্তের উইলের" তিন চারিটি পরিচ্ছেদ পূর্ণচন্দ্র লিখিয়া দিয়াছেন। আফিংএর নেশায় বুড়া কৃষ্ণকান্ত যখন ঝিমাইতে ঝিমাইতে স্বপ্ন দেখিতেছেন, সেই স্থানটি পড়িয়া সকলেই নিশ্চয় হাসিয়াছেন। সেই চমৎকার হাস্যরসোজ্জ্বল স্বপ্নকাহিনীটিও পূর্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক লিখিত।"—এই লেখার সমালোচনা-প্রসঙ্গে সমাজপতি সুরেশচন্দ্র তাঁহার "সাহিত্য" পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"বঙ্কিমচন্দ্র পরের লেখা আপনার বলিয়া ছাপাইতেন; বিনা প্রমাণে ইহা কেন বিশ্বাস করিব? বঙ্কিমচন্দ্র সহোদর পূর্ণবাবুর লেখা উপন্যাসে ছাপিয়া স্বীকার করিয়া যান নাই, অথচ আশ্চর্য্য শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের লেখা 'কমলাকান্তের' দপ্তরে সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহা 'ভূমিকায়' লিখিয়া গিয়াছেন! কে এই প্রহেলিকার রহস্যভেদ করিবে? আমরা গাল-গল্পের হিসাবেই ইহার মূল্য নির্ণয় করিব। এ বঙ্কিম প্রসঙ্গ যে inspired, তাহা দ্বিতীয় কিস্তী পড়িয়া বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। বেনামীতে এমনতর বেয়াদবী বাঙ্গালা দেশেই সম্ভবে।"—এ চাবুকে উক্ত লেখক অবশ্য চটিয়াছিলেন, এবং চটিয়া 'ভারতী'তে দুই এক কথা লিখিয়াও ছিলেন। কিন্তু এই চৈত্র মাসের 'ভারতী'তে দেখিলাম, স্বয়ং পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"১৩১৮ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় 'ভারতী'তে "বঙ্কিম যুগ" প্রবন্ধে লেখক ভ্রমবশতঃ লিখিয়াছিলেন যে রোহিণী কৃষ্ণকান্তের হাস্যরসের কথোপকথনটি আমারই লেখা। আমি

তাঁহাকে কখনও এমন কথা বলি নাই, যে ঐ অংশটুকু আমার লেখা। আমি যদি পূর্ব্ব হইতে তাঁহার নিকট পরিচিত থাকিতাম, তাহা হইলে তাঁহার এমন সাংঘাতিক ভ্রম হইত না। "উইল চুরি" পরিচ্ছেদ আমার কতটুকু লেখা আছে তাহা নিম্নে বুঝাইতেছি।

একদিন বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের উইল চুরি পরিচ্ছেদ লিখিতেছিলেন, এমত সময়ে পাঁচটার ট্রেণে কলিকাতা হইতে তাঁহার দুইটি বন্ধু আসিলেন, তিনি কাগজ কলম ফেলিয়া উঠিলেন আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম, "কি লিখিতেছিলেন বলিয়া দিন, আমি উহা লিখিব।" তিনি আমার আব্দার রক্ষা করিয়া হাসিতে হাসিতে লিখিতে অনুমতি দিয়া ঐ পরিচ্ছেদে যাহা লিখিতে হইবে বলিয়া দিলেন। আমি তখন ঐ হাসির অর্থ বুঝিতে পারি নাই, পরে লিখিতে বসিয়া বুঝিলাম—দেখিলাম "ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আসিয়া বৃষভারূঢ় মহাদেবের কাছে এক কৌটা আফিং কর্জ্জ লইয়া এই দলিল লিখিয়া দিয়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন। মহাদেব গাঁজার ঝোঁকে ফোর ক্লোজ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।" এই পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন—এই সুরে লেখা আমার অসাধ্য বুঝিয়া আমি এই স্থানে রোহিণীকে আনিয়া কৃষ্ণকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করাইলাম এবং তাঁহাদের উভয়ের কথোপকথন আমার সাধ্যমতে লিখিলাম। পরদিন বন্ধুগণ চলিয়া গেলে বঙ্কিমচন্দ্র "কৃষ্ণকান্তের উইল" লিখিতে বসিয়া ঐ পরিচ্ছেদে আমার লেখার প্রথমাংশ নূতন করিয়া লিখিলেন, আমার লেখার অবশিষ্ট অংশতে দোমেটোমো করিতে হয় নাই। তবে এক-আধ স্থানে মাটি লাগাইয়াছেন।"—বলা বাহুল্য, পূর্ণচন্দ্র জীবিত আছেন, তাই এইটার সংশোধন হইল। নহিলে, এত বড় মিথ্যাটা সত্য বলিয়া চলিয়া যাইত।

* *
*

আর একটি উদাহরণ দিতেছি। এটিও বঙ্কিম-সম্বন্ধে। গত ফাল্গুনের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত নামে একজন লেখক তাঁহার "পুরাতন প্রসঙ্গ" প্রবন্ধের একস্থলে লিখিয়াছেন,—"বঙ্কিমবাবু তখন সবে মাত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে 'এডুকেশন গেজেটে' লিখিতেন।"—কিন্তু 'এডুকেশন গেজেট' নিজে সম্প্রতি এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। লিখিয়াছেন যে,—"প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমবাবু কখনই কোন প্রবন্ধ এডুকেশন গেজেটে লেখেন নাই, লিখিয়া থাকিলে, আমরা আনন্দের সহিত সে প্রবন্ধ বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাবলী-প্রকাশককে অথবা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ অফিসে এতদিন নকল করিয়া পাঠাইতাম।" এমন কেলেঙ্কারী যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে নিত্য কত হইতেছে, তাহার ঠিকানা নাই। কে ইহার শাসন করিবে?

* *
*

বটতলার যে রসের তরঙ্গ আমরা একটু একটু করিয়া কাটাইয়া উঠিতেছিলাম, সেই তরঙ্গ দেখিতেছি তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার ফুটিয়া উঠিতেছে। মাঘ মাসের 'সবুজে' প্রকাশিত "শালী" কবিতাটি এ কথার প্রমাণ। "শালী"র কবি বলিতেছেন,—

"শালী কি মধুর নাম,
দেহ-নৌকার শালী কর্ণধার
জীবন-সেতুর থাম।

শালীর চাহনি শালীর হাসিতে
সুখনীরে প্রাণ থাকে গো ভাসিতে,
শালীর সোহাগ বেদনা নাশিতে
যেন গো সুদিং বাম।"

যে হাস্ত-রস তাড়ীর দোকানে হাসির তরঙ্গ তুলে, সেই হাস্য-রস যে এই দারুণ সভ্যতার যুগে বাঙ্গালার মাসিকেও স্থান পাইয়া থাকে, ইহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যেই ঐ লাইন কয়টা উদ্ধৃত করিয়াছি। নহিলে, উহা উদ্ধৃত করিয়া ভদ্রলোকের পাঠ্য 'অর্চ্চনা' কলুষিত করিতাম না। দিন দিন এ হইতেছে কি? রস রঙ্গ সমস্ত যে গোল্লায় যাইতে বসিয়াছে!

এরূপ জঘন্ত লেখার জন্ত আমরা শুধু লেখককে দোষ দিই না। এজন্ত সম্পাদকেরাও বিশেষ দায়ী। তাঁহারা যদি এ ছাই ভস্ম না ছাপান, তাহা হইলে এ লেখকদের সাধ্য কি যে মাসিকের আসরে নামিয়া তাঁহারা এমন বেয়াদবী করিতে পারেন। কিন্তু বলিব কাহাকে! যাহাদের মাথায় কিছু নাই—যাহাদের পেটে বোমা মারিলে কেবল বাজে বুক্‌নিই বাহির হয়—বাঙ্গালা দেশে যে তাহারাই 'সঙ্‌পাদক'।

পাপী।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

(১)

অজ্ঞাতবাস করিতেছিলাম তবু প্রাণে শান্তি ছিল না, স্মৃতিটুকু মুছিতে কত চেষ্টা করিতাম তবু সে গভীর রেখা মুছিতে পারিতাম না। প্রাণের অগ্নি নিভাইতে কত চেষ্টা করিতাম, তবু সে অগ্নির দাহিকা শক্তি যেন দিন দিন বাড়িতেছিল। জীবনে কোনও আশা ছিল না, কোনও উদ্দীপনা ছিল না, ভবিষ্যৎ জীবনের গভীর অমানিশার অন্ধকারের মধ্যে একটু তারার আলোকও লক্ষ্য হইত না। ভাবিয়াছিলাম জীবনটা কেবল প্রতীক্ষায় কাটাইব, নীরব নিশ্চেষ্ট ভাবে কেবল মরণের দিনের প্রতি উৎসুকনয়নে চাহিয়া থাকিব। কিন্তু সে সংকল্প বৃথা হইয়াছিল। অতীতের স্মৃতির অত্যাচারে প্রতিমুহূর্ত্ত জীবিত থাকিতে হইত।

এই অজ্ঞাতবাসে সামাজিকতার বাহিরে ছিলাম। সিমলার বাঙ্গালী-সমাজের অনেক গুণ আছে, কিন্তু এক বিষয়ে বাবুদের মন বড় সঙ্কীর্ণ। তাহারা ছাপাখানার কর্ম্মচারিবৃন্দকে ভদ্রসমাজের অন্তর্ভুক্ত মনে করিতে চাহে না।

ছাপাখানায় ভূত—বাবু-সমাজে, তাহার কোন প্রতিষ্ঠা নাই। তাহার সমাজ স্বতন্ত্র. তাহার জীবন-স্রোতের সহিত বাঙ্গালী বাবু সমাজের জীবন-স্রোতের মিলন নিষিদ্ধ। আমি কিন্তু এই সঙ্কীর্ণতার অনুগ্রহে আশানুরূপ ফল পাইয়াছিলাম। আমার সহিত তথা-কথিত ভদ্রসমাজের কেহ মিশিত না, কেহ আমার পূর্ব্ব জীবন-সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিত না। আমি পঁচিশ টাকা বেতনের কম্পোজিটার, ছুটীর পর কাজ করিলে উপরি পাইতাম। যতক্ষণ পারিতাম কাজ করিতাম, কর্ম্মের অবসরে নিজের ক্ষুদ্র গৃহটীতে বসিয়া চারিদিকের উচ্চ শৈলশ্রেণীর দিকে চাহিয়া থাকিতাম, উপত্যকার শোভা দেখিতাম, আর মনের মধ্যে তীক্ষ্ণ সূচিকার যন্ত্রণা ভোগ করিতাম। এইরূপে ছয়মাস কাটাইয়াছিলাম, কিন্তু ভগবান জানেন সেই ছয় মাসকে কত যুগ বলিয়া মনে হইয়াছিল। সুখের জন্য লোকে পাপ করে, তখন কে ভাবে আলোকের ছায়ার মত পাপের সঙ্গে অনুতাপ মিশ্রিত থাকে ?

(২)

ভুল অসম্ভব। সেদিন 'মলে'র উপর দিয়া বেড়াইবার সময় স্পষ্ট দেখিয়াছিলাম ফণীন্দ্র। তাহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। গাত্রের লুইখানা বেশ টানিয়া মুখ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। অন্যমনস্ক ভাবে প্রায় একটা মেমের ঘোড়ার পদতলে পড়িয়া গিয়াছিলাম। কি বিড়ম্বনা ! অতীত জীবনটার উপর যতই পর্দা টানিয়া দিতে চাহিতেছিলাম, নিষ্ঠুর পবনদেব যেন এক একটা ঝড় তুলিয়া বিধিমতে সেই যবনিকা অপসারিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। আর বায়ু সেবন করা হইল না। 'হোলি ওক' পাহাড়ের উপর বসিয়া সূর্য্যাস্ত দেখা হইল না, তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিলাম।

আবার দেখিলাম অফিস যাইবার সময়। একজন বন্ধুর সহিত হাসিতে হাসিতে ফণীন্দ্র বাজারের দিকে উঠিতেছিল। মূল্যবান পোষাক-পরিহিত, দেহে দিব্য লাবণ্য, মুখে সাফল্যের সুখচিহ্ন। আমি এবার অন্তরালে থাকিয়া তাহার দিকে দেখিলাম। আমার অজ্ঞাতে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস হৃদয়ের গভীরতার ভিতর হইতে উঠিয়া আমার চমক ভাঙ্গাইল। একটু বিষাদের হাসি—নৈরাশ্যের হাসি হাসিলাম। ইচ্ছা করিলে আমিও অমনি হইতে পারিতাম, ঐ রকম সাহেব সাজিয়া জগতের মুখের দিকে চাহিয়া ঘুরিতে পারিতাম। বাল্যের ও কৈশোরের উচ্চাশার ভগ্নস্তূপে আমার তরুণ হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল। কি ভীষণ আবর্জ্জনা, কি বিষম জঞ্জাল !

কর্ম্মস্থল হইতে সে দিন ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল। বাসায় ফিরিয়া অভ্যাস-মত ক্ষুদ্র বারান্দায় বসিয়া কেলু গাছের উপর চাঁদের আলোর খেলা দেখিতেছিলাম। হঠাৎ দরজা খুলিল। দেখিলাম অবিনাশ। সেও ছাপাখানার ভূত। কখনও কখনও সে আমার নিকট আসিত। আমি তাহাকে বসিতে বলিলাম। সে বলিল—আপনাকে একটি বড়লোক খুঁজ্‌তে এসেছিলেন।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—বড়লোক?

সে বলিল—হ্যাঁ। কলকাতার বাবু—হাইকোর্টের উকীল। নামটা বল্‌লেন—

আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া আসিতেছিল। কি সর্ব্বনাশ! জীবনের অন্ধকার যেন আরও তাল পাকাইতেছিল। আমি অন্যমনস্ক ভাবে বলিলাম—কি নামটা বল্‌লেন?

অবিনাশ বলিল—আরে গেল যা—কি বিশ্রী স্মরণ-শক্তি! এই যে ওর নামটা কি? আরে গেল।

আমার আর মন্দ খবরটা জানিবার জন্য অত আগ্রহ ছিল না। আমি বলিলাম—যাক্ ওকথা।

সে ছাড়িবার পাত্র নহে। মাথায় দুইটা ঘুষি মারিয়া বলিল—আরে গেল যা। এই যে ওর নামটা কি? সেন—সেন—নাথ সেন—ফণীন্দ্রনাথ সেন। ফণীন্দ্রনাথ সেন।

আমার মুখ শুকাইয়া আসিতেছিল। আমি বলিলাম—ওঃ! ফণীন্দ্রবাবু কি সিমলের এসেছেন নাকি?

সে বলিল—হ্যাঁ মশায়। বেশ ভদ্রলোক! ছাপাখানা ব'লে কোন তফাৎ নেই। আমার সঙ্গে অনেক কথা কইলেন। বল্‌লেন—আপনি তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু।

(৩)

আরও একদিন ফণীন্দ্র খুঁজিতে আসিয়াছিল। আমি অবসরের সময়ও কাজ করিতে লাগিলাম। অধিক রাত্রিতে বাসায় ফিরিতাম। একদিন ছাপাখানার ফিরিঙ্গি সাহেব বলিলেন—যতীন বাবু তোমার বুঝি পয়সার বড় বেশী দরকার হয়েছে? আজকাল এত বেশী কাজ করছ, মানে কি?

আমি বলিলাম—সাহেব, পয়সার দরকার কার নেই? যুবা বয়স, এই তো কাজ কর্‌বার সময়।

সাহেব বলিলেন—আচ্ছা বাবু। আপনাকে দেখে আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়। আপনি এমন ইংরাজি বল্‌তে পারেন, বেশ বিদ্যেও আছে ব'লে বোধ হয়, তবে কেন পঁচিশ টাকার জন্যে সিমলের পাহাড়ের ছাপাখানায় পড়ে আছেন?

বলা বাহুল্য, সেরূপ বিস্ময় বোধ অনেকেই করিত। আমি বলিলাম—সাহেব সিমলা আমার লাগে ভাল। আর কি জানেন, কেহ মুরুব্বি না থাকলে ভাল কাজ-কর্ম্ম জোগাড় করা সম্ভবপর নয়।

সে রাত্রিতে গৃহে বসিয়া ভাবিলাম। পূজা আসিতেছিল। আমাদের পাহাড়ের বরষা শেষ হইয়া গিয়াছিল। খুব শীত পড়িয়াছিল। সাহেবেরা ঘরে আগুন জ্বালাইত। আমাদের কঠিন প্রাণ—তুলার লেপই যথেষ্ট। লেপ মুড়ি দিয়া চারপাইয়ের উপর বসিয়া কাঁচের জানালার ভিতর দিয়া পাহাড় দেখিতেছিলাম। চতুর্থীর চাঁদ ডুবিয়াছিল—চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। ভাবিলাম ফণীন্দ্র সিমলায় আসিল কেন? আমি যে সিমলায় কাজ করিতাম সে কথা কেহ জানিত না, ফণীন্দ্র আমার সন্ধান কিরূপে পাইল—তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। একে একে জীবনের সমস্ত ঘটনা স্মরণ করিতে লাগিলাম। বাল্যের মনস্বিতা, কৈশোরের আশা! প্রত্যেক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতাম—লোকে আমাকে আদর্শ জ্ঞান করিত। বিধবা জননী আমার সুখ্যাতি শুনিয়া আত্মহারা হইতেন, শিশুর মত আমায় যত্ন করিতেন, কৈশোরেও আমাকে কেবল খোকা বলিয়া ডাকিতেন না, খোকার মত পালন করিতেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় যে দিন প্রথম বৃত্তি পাইয়া তাঁহার হস্তে টাকা দিলাম, সেদিন জননী সুখে শোকে কিরূপ উন্মত্তার মত কাঁদিয়াছিলেন, আমায় কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া কিরূপ বারম্বার চুম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমারও চক্ষু বাহিয়া কিরূপ অশ্রুপাত হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিলাম। সে স্মৃতিতে মধু মাখান ছিল, সে স্মৃতিতে অমৃত ছিল। তখনই বর্ত্তমান জীবন স্মরণ করিলাম, কি ভীষণ পার্থক্য! কি বিধি-বিড়ম্বনা!

তাহার পর স্মরণ করিলাম সেইদিন—একদিনে সুখ ও শোক—সুখের ক্ষণিক ক্ষীণ রেখা, গভীর শোকের মোহ। যেদিন এফ-এ পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইলাম, উচ্চস্থান অধিকার করিলাম, সেই দিন মাতৃবিয়োগ হইল। মাতৃবিয়োগ! বোধ হয় সকল জননীই স্নেহশীলা! কিন্তু আমার জননীর মত জননী—কি ভীষণ বেদনাভোগ করিয়াছিলাম! হৃদয়ে কি গুরু আঘাত পাইয়া-

ছিলাম, মস্তকের মধ্যে কি অন্ধকার অনুভব করিয়াছিলাম, হস্ত পদ সর্ব্ব অঙ্গে কিরূপ শৈথিল্য উপলব্ধি করিয়াছিলাম, তাহার ক্ষীণ স্মৃতিতেও সেই শীতের রাত্রিতে কপালে স্বেদোদ্গম হইতেছিল। মাতার সেই কাতর মুখ, সেই স্বর্গীয় প্রভায় দীপ্ত স্নেহের মুখ এখনও যেন আমায় আশীর্ব্বাদ করিতেছিল—স্বর্গের সেই সুখ-ঐশ্বর্য্যের ভিতর থাকিয়া নারকী সন্তানের দিকে চাহিয়াছিল—চক্ষে ক্ষমা, অধরে স্নেহের হাসি, সর্ব্বশরীরে ত্রিদিবের সুষমা।

সেই মুখ আমার কাল হইয়াছিল—সেই পবিত্র স্বর্গীয় মুখ আমায় এত বেশী বিপন্ন করিত, প্রতি মুহূর্ত্তে যম-যন্ত্রণার আস্বাদন দিত। যে সূত্রে আমার জীবন সংসারের সহিত আবদ্ধ ছিল মাতার মৃত্যুর সহিত সে সূত্রটুকু ছিঁড়িয়া গেল। যে আদর-যত্নে শিশুর মত লালিত হইতেছিলাম অকস্মাৎ সে আদরের উৎস শুষ্ক হইল। সপ্তদশ বর্ষীয় শিশুকে হঠাৎ সপ্তদশ বর্ষীয় যুবকে পরিণত হইতে হইল, মাতার ক্রোড় হইতে উঠিয়া হঠাৎ পৃথিবীর কঠোরতার মধ্যে পড়িতে হইল। কেবল পৃথিবীর কঠোর কর্ত্তব্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলেও একপ্রকার যুঝিতে পারিতাম। সম্মুখে ভীষণ শক্র, অন্তরে বলের অভাব—মাতার শোক প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে বলহীন করিত। জীবনে কিছু লক্ষ্য ছিল না, তরণীর কর্ণধার ছিল না। সেই স্নেহের জন্য প্রাণ কাঁদিত, মিষ্ট কথা শুনিবার জন্য মন ব্যাকুল হইত।

সেই প্রবৃত্তিই আমার জীবনটা নষ্ট করিয়াছিল। তখন পড়াশুনা করিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবার অপেক্ষা সুখ পাইতাম বন্ধুবান্ধবের মিষ্ট কথায়, মধুর ব্যবহারে। সে সময় ফণীন্দ্র আমায় অনেক মিষ্ট কথা বলিত, আমার প্রতি তাহার বড় অকৃত্রিম স্নেহ ছিল। তখন তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইত, তাহাকে দেখিলে বড় সুখবোধ হইত। আর আজ—তাহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিলাম, তাহার উপস্থিতিতে সমস্ত পাহাড়টা যেন আমার চক্ষে কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, মনে মনে বিচার করিতেছিলাম যতদিন সে সিমলায় বাস করিবে ততদিন আমি ছুটী লইয়া অন্যত্র যাইব কি না। সেই পাপের কথাটা স্মরণ হইলে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছিল, মতিভ্রম ঘটিতেছিল। নিশ্চয় উকীল ফণীন্দ্র সে কথাটা জানিয়াছিল। তাহা না হইলে সে আমার অনুসন্ধান করিবে কেন? আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এত উৎসুক হইবে কেন? সে নিশ্চয় গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়া আমার সন্ধান করিয়াছিল।

আবার মাতার মুখ স্মরণ করিলাম; এবার তাঁহার চক্ষে বিষাদ, মুখে লজ্জা

যেন তাঁহার অধর-কোণে একটু ঘৃণা। লেপের মধ্যে মুখ লুকাইলাম, বালিসে চোখ ঢাকিলাম, তবু মাতার সেই মুখ—মুখে ভৎর্সনা! কি ভীষণ যাতনা! নিস্তার নাই। কোথাও পলাইবার স্থান নাই। সেই মুখ মাঝে মাঝে আমায় দগ্ধ করিত, আজ সেই মুখ আমায় ভৎর্সনা করিতেছিল। বুক ফাটিলে শান্তি পাইতাম, একেবারে শ্বাসরোধ হইলে দুঃখের অবসান হইত। কিন্তু তাহা হইল না; কেবল বুক ফাটিবার উপক্রম হইল, শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল মাত্র।

(৪)

পূজা আসিল। সিমলার কালীবাড়ীতে ধূমধাম হইল। আমি সাধ্যমত সে সব গোলমালের ভিতর যাইতাম না। দূর হইতে দুই চারিদিন দেখিয়াছিলাম, ফণীন্দ্র সিমলার কয়েকজন উচ্চপদস্থ বাবুর সহিত সখ্য সংস্থাপিত করিয়াছিল। পূজার সময় কালীবাড়ীতে তাহার নিমন্ত্রণ হইবে তাহা অনুমান করিয়াছিলাম। তাই সে পথে মোটে চলি নাই।

এদিকে সাহেবের নিকট ছুটীর দরখাস্ত করিয়াছিলাম। অবসর লইয়া হরিদ্বার ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম।

সে দিন ত্রয়োদশী। মাত্র নয়টা বাজিয়াছিল। খুব শীতের প্রকোপ। বেশ গরম কাপড় পরিয়া 'মলে'র একটা নির্জ্জন স্থানে বেঞ্চের উপর বসিয়াছিলাম। ভোজনের পর জ্যোৎস্নালোকে সাহেব মেম ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পাহাড়ের মাথায় মাথায় জ্যোৎস্নার আলোক পড়িয়াছিল। সে এক অপূর্ব্ব শোভা—কথায় প্রকাশ করা যায় না। উত্তর দিকে পাহাড়ের উপর বরফ পড়িয়াছিল; জ্যোৎস্নালোক সেগুলাকে বড় উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিতেছিল। আমি তন্ময় হইয়া সেই শোভা দেখিতেছিলাম। দুই দিন পরে সিমলা ছাড়িয়া চলিয়া যাইব, কে বলিতে পারে আবার এদেশে আসিব কি না।

ফণীন্দ্র ধীরে ধীরে আসিয়া কতক্ষণ আমার পার্শ্বে বসিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি নাই; অকস্মাৎ পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলাম স্মিতমুখে বাল্যবন্ধু ফণীন্দ্র—যে ফণীন্দ্রের নিকট বিষম অপরাধী—পার্শ্বে সেই ফণীন্দ্র! বুকের রক্ত জমিতেছিল। কি বলিব কি করিব কিছু স্থির করিতে পারিলাম না।

ফণীন্দ্র হাসিয়া বলিল—কি ভাই চিন্‌তে পার? ক'দিন বাসায় গিয়ে ফিরে এসেছি।

আমি বলিলাম—ওঃ!

সে বলিল—একেবারে যেন কি রকম হ'য়ে গেছ। যতীন ভাই পুরাণো দিন মনে নেই। আমায় কেন পর ভাবছিস্ ভাই? কেন আমার কাছ থেকে স'রে থাকবার চেষ্টা করছিস্ ভাই? ছিঃ!

সে আমার হাত ধরিল। সেই পরিচিত স্বর, সেই স্নেহের ভাষা। বড় বিব্রত হইলাম। কথা কহিতে পারিলাম না। সে বলিল—সকলেরই জীবনে উন্নতি অবনতি আছে। ছিঃ! ছিঃ! এমন হ'য়ে গেলে কেন?

এমন হ'য়ে গেলাম কেন? নিজেই সে প্রশ্নের উত্তর ঠিক করিতে পারি নাই। তাহাকে উত্তর দিব কি? তাহার দয়ায় মুগ্ধ হইলাম। সে আমাকে ঘৃণা করিল না—বোধ হয় পাপী জানিয়াও আমার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার সহিত চলিলাম—হিমালয়ের উপর দিয়া চাঁদের আলোর উভয়ে পাশাপাশি চলিলাম—ধনী ও নির্ধন, আশা ও নৈরাশ্য, সাফল্য ও বিফলতা—পাশাপাশি চলিলাম। উভয়েই নিজ নিজ ভাবে মগ্ন ছিলাম। তাহার মনে কি ভাবের উদয় হইতেছিল জানি না, আমার মনে হইতেছিল তাহার সেই স্নেহের বাঁধন ছিঁড়িয়া ছুটিয়া পাহাড়ের উপর হইতে উপত্যকায় লাফাইয়া পড়ি, মোহ-মলিন মস্তকটা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাক্, আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হউক।

(৫)

তাহার সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে গল্প হইতেছিল। আমি বলিলাম—"বাড়ীতে আমাদের অংশে একেবারে একেলা থাকতাম। অপর দিকে কাকা কাকীমা থাকতেন বটে; কিন্তু একদিনের জন্যে একটা মিষ্টি কথা বলতেন না।"

"হ্যাঁ তা ত আমি জানি। সে সময় আমি প্রায় যেতাম।"

"তোমাকে সকল কথা বলতাম কিন্তু একটা কথা বলিনি।"

আমি কথাটা স্মরণ করিয়া আপনিই লজ্জিত হইতেছিলাম। প্রভাতের কুস্বপ্নের মত সেই ঘটনাটা এতদিন আমাকে নিষ্পেষিত করিয়া রাখিয়াছিল। একদিন না একদিন হিসাব-নিকাশ না করিলে, আমার হৃদয়ের বোঝাটা অপরের সম্মুখে না নামাইলে, কেবল অন্তরে অনুতাপ না করিয়া মুখ ফুটিয়া সে কথা লইয়া আলোচনা না করিলে আমার পক্ষে প্রাণধারণ করা দুরূহ হইতেছিল। বিশেষ ফণীন্দ্রের নিকট প্রকাশ্যভাবে অনুতাপ করিবার পর সে যদি আমাকে পুলিসের হস্তে—

শিহরিয়া উঠিলাম। ফণীন্দ্র নীরবে আমাকে লক্ষ্য করিতেছিল। আমি

তাহার সুসজ্জিত গৃহের দুই একটা আসবাবের দিকে চাহিয়া একটু সাহস পাইলাম। নৈরাশ্য-প্রসূত নির্ভীকতা! একটা হিসাব-নিকাশ হউক—আর প্রাণের বহ্নি লুকাইয়া রাখা অসম্ভব। আমি সাহস করিয়া বলিলাম—"ফণী তুমি সে সময় কিছু সন্দেহ করেছিলে কি?"

"সন্দেহ! কি সন্দেহ?"

আমি বলিলাম—"এফ্‌ এ পরীক্ষায় জলপানি পেয়ে কেন বি-এ ফেল হয়েছিলাম, কেন হঠাৎ কল্‌কাতা ছেড়ে কা'কেও কিছু না বলে পালিয়ে এসে নানা স্থানে ঘুরেছি—শেষে এখানে এসে ছোট কাজ করছি, অজ্ঞাতবাসে আছি তা' জান কি?"

ফণীন্দ্র বলিল—ফেল হ'বার কারণ বুঝেছিলাম তোমার মার শোক। আর তাইতে তোমার মত মেধাবী লোকের লজ্জিত হ'য়ে দেশান্তরে যাওয়া স্বাভাবিক ভেবেছিলাম।

আমি বলিলাম—আমি এখানে আছি তোমায় কে বললে?

সে বলিল—এখানে আছ আমি হঠাৎ জান্‌তে পারলাম। একদিন তোমায় রাস্তায় দেখলাম। তুমি নীচের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলে তোমার কাছে পৌঁছিবার আগে তুমি কোন্‌ দিকে গেলে দেখতে পেলাম না। সঙ্গে একজন সিমলার বাবু ছিলেন, তিনি তোমার সন্ধান বলে দিয়েছিলেন।

আমি বুঝিলাম। নিজের কথা বলিতে মনস্থ করিয়াছিলাম। তাহাকে বলিলাম—মাতার শোকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই নাই একথা প্রলাপ। মাতার মৃত্যুর পর প্রাণটা স্নেহের জন্য বড় কাতর হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাণের মধ্যে সুখের উৎসটুকু যেন একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। যখন বন্ধু-বান্ধবদের সহিত থাকিতাম, তাহাদের সহিত নিরর্থক ক্রীড়াকৌতুক করিতাম, তখন আমার স্নেহময়ী জননীর অভাবটুকু উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। কিন্তু ঘরে ফিরিয়া আসিলেই দেখিতাম প্রত্যেক পদার্থের সহিত তাঁহার স্মৃতিটুকু জড়িত ছিল। আমার খুল্লতাত কিম্বা তাঁহার পরিবারস্থ কেহ আমার সহিত বাক্যালাপও করিতেন না। যখন প্রতি পদে পদে অসুবিধা ভোগ করিতাম তখন মাতার জন্য প্রাণ কাঁদিত, দুইটা মিষ্ট কথার জন্য লালায়িত হইতাম। গৃহের প্রত্যেক সরঞ্জামটা যেন আমাকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিত। সেই সময় আমার জীবনে যে ঘটনা ঘটিল, তাহাতে আমার জীবনের স্রোত একেবারে পরিবর্ত্তিত হইল।

ফণীন্দ্র মনোযোগ দিয়া আমার আখ্যায়িকা শুনিতেছিল। সে বলিল—অত উতলা হচ্ছ কেন? এমন কি কথা যে বল্‌তে গিয়ে বলতে পারচ না। প্রাণের বোঝা বন্ধুবান্ধবদের কাছে বললে লঘু হয়।

তাহার ওকালতীর মিষ্ট কথায় আশ্বাস পাইলাম। সাহসে ভর করিয়া বলিলাম—কথা শুনে এখনি ঘরের বার করে দেবে। কাল আর দেখা হ'লে বাল্যকালের বন্ধু ব'লে হাত ধরে যত্ন করবে না। কিন্তু না বলেও থাকতে পারছি না।

(৬)

সে হাসিল। আমি সকল কথা বলিলাম। যে পাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহার মূলে প্রথমে লোভ ছিল না, লাম্পট্য ছিল না, পাপচিন্তার লেশমাত্র ছিল না। যে সময় স্নেহের কাঙ্গাল হইয়া ঘুরিতাম, গৃহে বসিয়া পুস্তক খুলিলে অক্ষরগুলা নিরর্থক মনে হইত, শয্যায় শুইলে গাত্রে লক্ষ লক্ষ কণ্টক বিঁধিত, ঠিক সেই সময় সেই পাপীয়সীর কুহকে পড়িয়াছিলাম। আমার বয়স তখন উনবিংশ বৎসর, তাহার বয়স আন্দাজ দ্বাবিংশ বৎসর। তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া নরকের পথে অগ্রসর হই নাই। তাহার মত সুন্দরী আমি অদ্যাবধি দেখি নাই। কিন্তু সে রূপ আমাকে মজাইতে পারে নাই। তাহার মত উজ্জ্বল চক্ষু আমি তাহার পূর্ব্বে কোন রমণীর দেখি নাই। কিন্তু আমি তাহার চক্ষুর সে লাবণ্যে মজি নাই। মজিয়াছিলাম, তাহার চক্ষুর এক অনির্ব্বচনীয় স্নেহের চাহনীতে। সে আমাদের বাড়ীর পার্শ্বে ভাড়া থাকিত। তখন শুনিয়াছিলাম, সে আমাদের ভাড়াটিয়া বাবুর স্ত্রী। বাবু সমস্ত দিন কার্য্যস্থলে থাকিত, রমণীটি আমার মত একেলা থাকিত। আমি যখন পুস্তক হস্তে লইয়া ভাবিতাম, সে আমার দিকে তাহার সেই করুণ নয়নে চাহিয়া থাকিত, আমি চাহিলে সে সরিয়া যাইত। আমি যখন ছাদের উপর বেড়াইতাম তখন সে ছাদে উঠিত, আমাকে দেখিয়া সরিয়া যাইত, সিঁড়ির ঘর হইতে আবার সেই করুণ নেত্রে চাহিয়া থাকিত। আমি একটু লজ্জিত হইতাম।

দিন দিন সেই রমণীর করুণ স্নেহের চাহনী আমাকে একটু বিব্রত করিতে লাগিল। আমি সে কথা কাহাকেও বলিলাম না। তখন যদি বন্ধুদের নিকট সে কথা বলিতাম হয়ত আমার জীবনের স্রোত অন্যপ্রকার হইত। আমি কিন্তু সে কথা কাহাকেও বলিতে সাহস করি নাই। কেবল সেই অনুগ্রহের চাহনী ব্যতীত তাহাতে কিছু ছিল না। সে ঘটনায় বলিবার কিছু ছিল না।

একদিন সন্ধ্যার সময় আহার করিয়া পান পাইলাম না। এরূপ প্রায় নিত্য ঘটিত। ভৃত্যকে ভৎসনা করিয়া ছাদের উপর গেলাম। বৈশাখ মাস। সারাদিনের ভীষণ উত্তাপের পর দক্ষিণে হাওয়ায় পৃথিবী যেন একটা নূতন জীবন লাভ করিয়াছিল। আমাদের ও তাহাদের ছাদের মধ্যে একটি অনুচ্চ প্রাচীরের ব্যবধান। সেই প্রাচীরের উপর বসিয়াছিলাম। সেদিন মনে বড় কষ্ট হইয়াছিল। হঠাৎ প্রাচীরের উপর ঠুন্ করিয়া কি শব্দ হইল। পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলাম—অবগুণ্ঠিতা সে প্রাচীরের উপর একটি রূপার কৌটা রাখিল। আমি বিস্মিত হইলাম। তাহার কাতর চক্ষু দেখিলাম—চাঁপার কলির মত অঙ্গুলি দেখিলাম—তাহার অলঙ্কারের নিক্কন শুনিলাম। আমি তাড়াতাড়ি প্রাচীর হইতে নামিলাম। সে সরিয়া গিয়া সিঁড়ির ছাদের নীচে আশ্রয় লইল।

আমি প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিলাম। তাহার সেই চাহনীতে কিন্তু উৎসাহ পাইলাম। ধীরে ধীরে পান তুলিয়া লইলাম। সে আবার আসিয়া শূন্য কৌটা লইয়া গেল। যাইবার সময় আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল।

সেই হাসি আমার কাল হইল। কথা লোকের কাল হইয়াছে ইতিহাস-পাঠে তাহা জানিতে পারা যায়। কিন্তু সেই হাসি আমার কাল হইল। আমি তখন ইংরাজি সাহিত্য পড়ি, নভেল পড়ি, সব বুঝি। হাসিটা প্রাণে গিয়া বিঁধিল। আর সে রমণীকে আমার দিকে চাহিয়া থাকিতে হইত না। আমি পুস্তক হাতে করিয়া বসিয়া আকুল নয়নে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতাম। ছাদের উপর যাইয়া প্রতীক্ষা করিতাম কতক্ষণে সে আসিয়া তেমনি করিয়া সরিয়া যাইবে, মিছামিছি ভৃত্যকে তিরস্কার করিতাম যদি সে আবার রূপার কৌটায় পান দেয়। একেবারে ঝাঁপ দিলাম—অগ্রপশ্চাৎ চাহিলাম না, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিলাম না, পুস্তকের নীতির কথা একবারও স্মরণ-পথে আনিলাম না।

সেই ঘটনার সাতদিন পরে প্রাচীরের উপর বসিয়াছিলাম। জ্যোৎস্না-লোকে চারিদিক হাসিতেছিল। দক্ষিণের বাতাস বহিতেছিল। আমি বসিয়া-ছিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিলাম। সে ছাদের উপর উঠিল, ধীরে ধীরে আমার নিকটে আসিল, প্রাচীরের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখের উপর জ্যোৎস্নার আলো পড়িয়া তাহার সেই সুন্দর মুখ আরও সুন্দর হইল, এ সমস্ত চুরি করিয়া দেখিতেছিলাম অথচ ভাণ করিতে-ছিলাম যেন কিছু দেখি নাই। আমাদের ছাদের জুঁই ফুলের গন্ধে প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ভোগ করিতেছিলাম। বাবুদের খাঁচার কোকিল

ডাকিতেছিল। আর কতকক্ষণ সে অবস্থায় ভাণ করিয়া বসা যায়? আমি যেন হঠাৎ তাহাকে দেখিলাম। একটু বিস্ময়ের ভাণ করিয়া "ওঃ!" বলিয়া নামিলাম।

কিছুক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ থাকিলাম। তাহার পর মাথায় দুষ্ট সরস্বতী আসিল। কথা কহিবার প্রবৃত্তি হইল। বলিলাম—রমেশবাবু এসেছেন?

সে হাসিল। বলিল—না।

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—পান কোথা?

সে বলিল—আমাদের বাড়ীতে এস। বড় একেলা থাকতে হয়। অসহ্য বোধ হয়। এস। আসবে না?

আমি গল্প থামাইলাম। ফণীন্দ্র মনোযোগ দিয়া আমার কাহিনী শুনিতেছিল। আমি বলিলাম—তারপর কি হ'ল আর বলতে হ'বে না। গ্রীষ্মের ছুটীর দুপুর বেলা প্রত্যহ তার ঘরে দিন কাটাতে লাগলাম। ওঃ তখন যদি তোমাদের বলতাম!

ফণীন্দ্র আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিল। এরূপ তো অনেকের ভাগ্যে ঘটে। তার জন্যে তো আমি যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছি। তবে দোষের মধ্যে স্ত্রীলোকটা পরের—

আমি বলিলাম—হ্যাঁ পরের স্ত্রী! উঃ কি ভীষণ! আমি যখন পাপাসক্ত হ'য়েছিলাম তখন তাকে পরস্ত্রী জেনেই এগিয়েছিলাম। পাপটা মনে—মনে জানতাম পরস্ত্রী তাই নিশ্চয় নরকে যাব। তবে পরে জেনেছিলাম চামেলি রমেশবাবুর রক্ষিতা বারাঙ্গনা। অবশ্য আমার পাপের ভার তার জন্যে লাঘব হ'বে না।

ফণীন্দ্রের মন থেকে যেন একটা বোঝা নামিল। সে বলিল—বেশ্যা! তবে আবার এত আত্মগ্লানি কেন? এত অজ্ঞাতবাস কেন?

আমি বলিলাম—শেষ অবধি শোন। কবে জানলাম সে বেশ্যা সে গল্প শোন। তারপর যদি ক্ষমা করতে পার সে গল্প শুনলেও যদি তুমি আমাকে তোমার বন্ধু ব'লে গ্রহণ কর তা' হ'লে জীবনে নূতন অঙ্ক আরম্ভ করব। ছাপাখানা ছাড়ব। সমাজে মিশ্‌ব। কিন্তু রক্তমাংসের শরীর নিয়ে তুমি পারবে না।

ফণীন্দ্র বলিল—দূর পাগল!

আমি বলিলাম—তোমার বউদিদির জন্যে মুক্তার শেলি কেনা হ'য়েছিল

জান? সে শেমিজ তোমার ঘর থেকে চুরি যায় জান? তার জন্যে তোমাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। কে চোর জান?

বিস্ফারিত নেত্রে সে আমার দিকে চাহিল। মনে সন্দেহ হইল, বিশ্বাস করিতে পারিল না।

আমি অগ্রপশ্চাৎ ভাবিলাম না। জেলে যাইতে হয় তবু ভাল, এ পাপের কথা ব্যক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। অনুতাপ করিলে পাপের লাঘব হয়। আমি বলিলাম—চোর আমি!

ফণীন্দ্রের নিম্নোষ্ঠ কাঁপিতেছিল। আমি বলিলাম—চোর আমি! চোর তোমার প্রাণের বন্ধু যতীন্দ্র। তোমার ঘরে ঢুকে দেখলাম খোলা ডেস্কে শেমিজ রয়েছে। রহস্য করবার জন্যে গোপনে বাড়ীতে আনলাম। তখনও চুরির ইচ্ছা ছিল না। রহস্য করিবার ইচ্ছা ছিল। বাড়ীতে জিনিসটা দেখে বড় লোভ হ'ল। ভাবলাম একবার চামেলির গলায় পরিয়ে দেখব তাকে কেমন মানায়। তখন আমাদের বি-এ পরীক্ষা হ'য়েছিল। ধীরে ধীরে তা'র কাছে গেলাম। তার গলায় পরিয়ে দিলাম। খুব মানিয়েছিল। তার পর যখন খুলতে গেলাম সে ফণিনীর মত আমাকে কামড়াতে গেল। খুলতে পেলাম না। আমি বললাম—ছিঃ ভাই তোমার স্বামী কি বলবে? সে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—স্বামী! কার স্বামী। ন্যাকা! জান না আমি রমেশবাবুর রক্ষিতা বেশ্যা! স্বামী! যাও পালাও না হ'লে পুলিস ডেকে ধরিয়ে দেব।

আমি নীরব হইলাম। ফণীন্দ্র কোন কথাই বলিল না। তাহাকে বুঝাইলাম সেই দিন ঘৃণায় ক্ষোভে ফিরিয়া আসিলাম। সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারিলাম না। দুই মাস অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিলাম। তাহার পর পরীক্ষার ফল বাহির হইল। অনুত্তীর্ণ হইলাম। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। দেশত্যাগী হইলাম। লোকে ভাবিল ফেল হইয়া পলাইয়াছি। আমি কিন্তু পাপের জ্বালায় দেশত্যাগী।

ফণীন্দ্রকে বলিলাম—ফণি!

সে বলিল—কি বল!

আমি বলিলাম—তোমার গাম্ভীর্য্য দেখে বুঝছি কি করবে। কিন্তু পুরাণো বন্ধুত্ব স্মরণ করে যদি দু'টা কথা রাখ তার পর সুখে জেলে যাব। কিন্তু এ দু'টা কথা যদি না রাখ, জেনো জেলে গিয়েও শান্তি পাব না। পুরাণো বন্ধুত্বের দোহাই। বল, পুলিস ডাকবার আগে দুটো কথা রাখবে?

সে অন্য মনে বলিল—কি?

আমি বলিলাম—প্রথমতঃ আমার কাছে সাত শত টাকা নেবে—শেলির দাম। আমার বাড়ি বেচার টাকা আছে আলাদা করে রেখেছি। আর দ্বিতীয়তঃ আমায় মুখে একবার বল—ক্ষমা করলে। পুলিসের কাছে তা' ব'ল না, হাকিমের কাছে তা' ব'ল না, কিন্তু আমাকে আড়ালে একবার বল—ক্ষমা করলে। আর এ বোঝা সহ্য করতে পারিনি, আর এ বিষের জ্বালায় জ্বলতে পারিনি। বল ভাই ক্ষমা করলে?

আমি কাঁদিয়া তাহার পা ধরিলাম। কাঁদিয়া বড় তৃপ্তি পাইলাম। পায়ে ধরিয়া বড় তৃপ্তি পাইলাম। বিষের জ্বালাটার যেন উপশম হ'চ্ছিল।

ফণীন্দ্রের চোখে জল আসিল। সে সস্নেহে আমাকে তুলিল, আলিঙ্গন করিল, বুকে তুলিয়া লইল, বলিল—পাগল। তোর জিনিস আমার জিনিস কি ভিন্ন? তোর মনের প্রবোধের জন্যে দাম ন'ব। কিন্তু তুই বল্ দেশে ফিরবি?

আমি আরও কাঁদিলাম। আরও তৃপ্তি পাইলাম। সে এতটা মহত্ত্ব দেখাইবে, প্রকৃতই আমাকে ক্ষমা করিবে, পূর্ব্বে তাহা কল্পনা করি নাই। তাহার দয়ায় অভিভূত হইয়া বলিলাম—বল ক্ষমা করলে?

সে বলিল—সর্ব্বান্তঃকরণে। বল্ দেশে ফিরবি?

আমি সজলনয়নে সম্মত হইলাম।

গ্রন্থ সমালোচনা

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত।—শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী দাসী কর্ত্তৃক বিরচিত। পূজ্যপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় একটী ক্ষুদ্র ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থ রচয়িত্রী ভক্তচূড়ামণি ৺লালাবাবুর কুলকন্যা। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন ঘোষ মহাশয়ের ধর্ম্মপত্নী। রচয়িত্রী কবিযশঃ প্রার্থনায় গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, তিনি যে গ্রন্থ রচনা করিয়া কবিযশঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন সে কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের মত সরল মধুর ভাষায় সহজ ছন্দে তিনি ভগবানের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন—সে বর্ণনা বড় হৃদয়গ্রাহী, বড় মর্ম্মস্পর্শী। লেখিকা নবীন ছন্দের উল্লম্ফন ছাড়িয়া সাবেক ত্রিপদীর আশ্রয় লইয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত পাঠ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদে লেখিকা তাঁহার দারুণ শোকে শান্তি লাভ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ভক্তের ভগবান তাঁহাকে শ্রীচরণে স্থান না দিয়া থাকিতে পারিবেন না।

মোস্‌লেম স্পেন ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা।

[লেখক—মহম্মদ কে, চাঁদ।]

পর্টু্গীজ আরব কলম্বসগণ।*

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কলম্বস নূতন মহাদেশ আবিষ্কার করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। নূতন ভূমি-আবিষ্কারার্থ অভিলাষী হইয়া তিনি যেরূপ অধ্যবসায় দেখাইয়াছিলেন, মহাসাগরোপরি পরিভ্রমণকালেও তদ্রূপ সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যখন নাবিকগণ অধৈর্য্য হইয়া পরস্পর ষড়যন্ত্র করিয়া অবশেষে কলম্বসের বিরুদ্ধে স্পষ্টতঃ বিদ্রোহী হইয়াছিল তখন তাহাতে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত ও শঙ্কিত না হইয়া ধৈর্য্য সহকারে তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। তিনি এতদূর অধ্যবসায়ী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই এক নূতন মহাদেশ আবিষ্কার করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন ও সেইজন্য জগতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় রহিয়াছে।

কিন্তু তাঁহার প্রায় পঞ্চ শত বর্ষ পূর্ব্বে পর্টু্গালের কয়েকজন আরবও এইরূপে অর্ণবযান লইয়া আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রে নূতন নূতন ভূমি-অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইয়াছিল। দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ তাঁহারা তাহাতে অকৃতকার্য্য ও বিফল-মনোরথ হইয়া এবং বহু কষ্টভোগ করিয়া পুনরায় স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। যদি তাঁহারাও কলম্বসের ন্যায় একটী নূতন দেশ বা মহাদেশ আবিষ্কার করিয়া তাহাতে উপনিবেশ স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেন তাহা হইলে তাঁহাদের নামও ইতিহাস-পৃষ্ঠায় নিশ্চয়ই স্থান প্রাপ্ত হইত। কলম্বস যেমন তাঁহার নাবিকগণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছনাভোগ করিয়াছিলেন, আরব-কলম্বসগণও তদপেক্ষা অধিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার লাঞ্ছনা-গঞ্জনার পরিণাম নূতন মহাদেশ-আবিষ্কার ও জগতে সকল সভ্যজাতির নিকট যশোলাভ, আর তাঁহাদের অকৃতকার্য্যতার পরিণাম স্পেনদেশের মোসলেম ইতিহাসের এক কোণে একটু স্থান-প্রাপ্তি!

---

* এই আরব নাবিকগণ কলম্বসের পূর্ব্বে আটল্যাণ্টিক মহাসমুদ্রে নূতন ভূমি অনুসন্ধান করিবার জন্য সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাদিগকেও পর্টু্গীজ আরব কলম্বস বলা হইল।

নূতন মহাদেশ আবিষ্কারক কলম্বস যেমন পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের পর্টুগীজ খৃষ্টান, তেমনই এই আরব কলম্বসগণও দশম শতাব্দীর কয়েকজন পর্টুগীজ মুসলমান। প্রথমোক্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল, শেষোক্ত ব্যক্তিগণের তাহা ব্যর্থ হইয়াছিল। আরব নাবিকগণ উদ্দেশ্য-সাধনে সমর্থ হন নাই বটে, তবে তাঁহারা তৎকালে যে নূতন নূতন দেশ অনুসন্ধানে উৎসুক ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কলম্বসের চারিশতেরও অধিক বর্ষ পূর্ব্বে মুসলমানগণ যে এইরূপ একটী ভৌগলিক অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বলা বাহুল্য যে, এক সময়ে মুসলমানগণ বাণিজ্যোপলক্ষে দেশ দেশান্তর-ভ্রমণে বিশেষ পটু ছিলেন ও তদুপলক্ষে যে নূতন নূতন দেশ-অনুসন্ধানে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইসলাম-প্রচারের বা বিস্তারের ইহাই একটী প্রধান কারণ। বাণিজ্যোপলক্ষে দেশ দেশান্তর গমনই ইসলাম-প্রচারের সহায় হইয়াছিল। মোসলেম ব্যবসায়িগণ যখনই যে দেশে গমন করিতেন, সেইখানেই অবসরমত আপনাদিগকে ইসলাম-প্রচারের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। এইরূপেই আফ্রিকা মহাদেশের কাফ্রী প্রভৃতি অসভ্য জাতির মধ্যেও ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল। যাঁহারা বলেন যে, 'এক হাতে তরবারি ও অপর হস্তে কোরাণ লইয়া' ইসলামধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাঁহাদের এ বাক্য ভিত্তিহীন অসার ও অনৈতিহাসিক। তাঁহারা বিদ্বেষবশতঃ ইসলামের উপর এরূপ অন্যায় দোষারোপ করিয়া থাকেন। যদি তাঁহারা ইসলাম-প্রচারের ইতিহাস একটু মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করেন, তাহা হইলে এরূপ অন্যায় ধারণা নিশ্চয়ই তাঁহাদের মন হইতে অন্তর্হিত হয়। মুসলমানেরা কখনও কি সুমাত্রা, যাবা ও চীন এবং আফ্রিকার অরণ্য ও শ্বাপদসঙ্কুল দেশের কাফ্রীদিগের মধ্যে তরবারি লইয়া গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন? এখন আফ্রিকায় ইউরোপের শক্তি প্রবল; তবুও মুসলমান বণিকগণ ইসলাম-প্রচারে ফললাভ করিতেছেন বলিয়া ইউরোপের খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ ব্যবসায় উপলক্ষে মুসলমানদিগের তথায় প্রবেশপথ বন্ধ করিবার নানা উপায় স্থির করিতেছেন। কারণ খৃষ্টান মিশনারিগণ তথায় ধর্ম্মপ্রচার করিয়া কোনও সন্তোষদায়ক ফল প্রাপ্ত হইতেছেন না।

যাহা হউক, কিরূপে দেশে দেশে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল যাঁহারা এ

বিষয়ে অধিক জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা লাহোর কলেজের ভূতপূর্ব্ব দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক ও পরবর্ত্তী আলিগড় কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ আর্নল্ড সাহেব কর্ত্তৃক প্রণীত ইসলাম প্রচার (প্রিচিংস্ অব ইসলাম) নামক গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন।

এক্ষণে আমার এই প্রবন্ধোদ্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। স্পেন-দেশীয় ঐতিহাসিক কণ্ডি (Conde) * তাঁহার 'স্পেনদেশে আরব রাজত্বের ইতিহাস' পুস্তকে মোসলেম ঐতিহাসিকগণের বর্ণনানুসারে পূর্ব্বোক্ত আরব কলম্বসগণ সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমি তাহাই অবলম্বন করিয়া তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-প্রদানে অগ্রসর হইলাম।

সুলেমান বিন অলহাকেমের রাজত্বকালে (দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে) এক দল আলিসবোনা (লিসবন) নগরবাসী—সংখ্যায় প্রায় ৮০ জন—সকলেই একজাতিভুক্ত ও পরস্পর আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ, আটলান্টিক মহাসমুদ্রের মধ্যস্থলে নূতন ভূমি-অনুসন্ধানার্থ জাহাজে আরোহণ করিয়া সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা কোনও একটী দ্বীপপুঞ্জের নিকটে অসংখ্য বাজপক্ষী দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সেইজন্য তাহার বহির্ভাগে যাওয়া অসম্ভব বোধ করিয়াছিল। কেবল ইহাও নহে, তাহারা ঐ সকল পক্ষীর উপদ্রবে পূর্ব্বোক্ত দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করিতেও প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইয়াছিল। তজ্জন্য তাহারা নগরে ফিরিয়া আসে। তদবধি এই সকল লোককে এম্প্রেন্দাদোর (Emprendadores) বা দুঃসাহসিক ভ্রমণকারী বলা হইত; আলিসবোনার যে অংশে তাহারা বাস করিত সেই অংশের নাম অলমোগাওয়ারগণের কল্লে (Calle) বা ষ্ট্রীট দেওয়া হইয়াছিল।

মোসলেম ঐতিহাসিক সেরিফ ইদ্রিস পূর্ব্বোক্ত ঘটনা এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন:—

তিনি বলিয়াছেন যে, মহাসাগরোপরি জাহাজ লইয়া গিয়া তাহাতে কি দেখা যাইতে পারে তাহা জানিবার ইচ্ছায় যেদিনা অলমোগাওয়ারগণ আলিস-বোনা (লিসবন নগর) হইতে বাহির হইয়াছিল; এবং পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন, অর্থাৎ বলিয়াছেন যে, অলহামাদরবের নিকটবর্ত্তী আলিসবোনার যে অংশে এই সকল অসমসাহসিক নাবিক বাস করিত তাহাদিগের জন্যই উহার উক্তরূপ নামকরণ হইয়াছিল।

---

* "History of the Dominion of the Arabs in Spain" translated from the Spanish of Dr. J. A. Conde, by Mrs. Jonathan Foster.

অতঃপর তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তাহারা মূলে আটজন লোক—আট ভ্রাতার পুত্রগণ, সুতরাং সকলেই জ্ঞাতি ভ্রাতা—তাহারা নিজেদের অধীনে একখানি বৃহৎ জাহাজ লইয়া কয়েক মাসের খরচের জন্য ইহাতে প্রচুর পানীয় জল ও রসদ সঞ্চিত রাখিয়াছিল।

অতঃপর পূর্ব্ববাহিনী বায়ুর প্রথম প্রবাহেই ইহারা সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল। প্রায় একাদশ দিবস জাহাজ চালাইবার পর তাহারা সাগরের এমন এক অংশে পৌছিয়াছিল যে, সেখানে কৃষ্ণবর্ণ গাঢ় ও আলোড়িত জলে ভয়ানক স্রোত ছিল। এই নাবিকগণ সেইখানে ভয়প্রাপ্ত হইয়াছিল ও অন্য দিকে তাহাদের জাহাজ ফিরাইয়া দক্ষিণ দিকে দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত জাহাজ চালাইয়া অবশেষে একটী দ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা তাহাকে 'আইল অব ফ্লক্‌স্' (Isle of Flocks) নাম দিয়াছিল, কারণ তথায় গণনাতীতসংখ্যক গো·মহিষাদির পাল দৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে চরাইবার জন্য তথায় রাখাল বা অন্য কোন লোক ছিল না বলিয়া তাহারা এই দ্বীপের পূর্ব্বোক্ত নাম দিয়াছিল।

এই দ্বীপে পৌছিবামাত্র তাহাতে তাহারা অবতীর্ণ হইয়া প্রথমতঃ বিশুদ্ধ প্রবহমান জলের একটী উৎস অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিল ও ইহার (উৎসের) উপর একটী বন্য ডুম্বরবৃক্ষও জন্মিয়াছে দেখিল। এখানে থাকিয়া তাহারা ঐ সকল গরুর পাল হইতে কয়েকটী গরু ধৃত করিয়াছিল। কিন্তু তাহার মাংসের আস্বাদ এত তিক্ত যে, কোন লোকই তাহা মুখে দিতে পারে নাই। তজ্জন্য তাহারা এই সকল প্রাণীর কেবল চর্ম্ম রাখিয়া দিল এবং দ্বীপ হইতে চলিয়া গিয়া দক্ষিণবাহিনী বায়ুর আনুকূল্যে পুনরায় দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত তাহাদের জাহাজ চালাইয়াছিল।

অতঃপর তাহারা অন্য একটী দ্বীপ আবিষ্কার করিয়াছিল; সেখানে মনুষ্যের আবাস ও চাষের যোগ্য ভূমি তাহারা প্রত্যক্ষ করে। ইহার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে প্রস্তাব করিয়া ও তাহাতে কি পাওয়া যাইতে পারে—এই উদ্দেশ্যে তাহারা এই দ্বীপের দিকে জাহাজের গতি ফিরাইল ও অধিকদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই তাহারা বহুসংখ্যক জোয়ার্কা ও লোকদ্বারা দৃঢ়রূপে সজ্জিত নৌকা দেখিতে পাইল: উহারা তাহাদের জাহাজ ধরিল এবং আরব নাবিকগণ বন্দী হইল এবং তাহারা তাহাদিগকে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত একটী নগরে লইয়া গেল।

তথায় গিয়া তাহারা দেখিল যে, সেখানকার লোকেরা একটু রক্তিমবর্ণ ও লম্বাকৃতি দীর্ঘ কেশবিশিষ্ট ; এই নাবিকেরা তাহাদিগের স্ত্রীলোকগণকে অতি সুন্দরী বলিয়া অনুমান করিয়াছিল। কেন না, আরবগণ তাহাদিগকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছিল।

নগরবাসিগণ তাহাদিগের কয়েদীগণকে তিন দিন আবদ্ধ রাখিয়াছিল। অতঃপর যে তাহাদের ভাষায় কথা বলিতে পারে এমন এক ব্যক্তি তথায় আসিল ও সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল 'তোমরা কাহারা, কি উদ্দেশ্যে তোমরা এখানে আসিয়াছ? তোমাদের বাটী কোন্ দেশে?' আরব নাবিকগণ তদুত্তরে তাহাদের উদ্দেশ্য তাহার নিকট সবিশেষ বর্ণনা করিল। সে তাহাদের জীবনের জন্য দায়ী বলিয়া অঙ্গীকার করিল।

এই লোকের সহিত যেদিন সাক্ষাৎ হইল তাহার দুই দিবস পরে ঐ দ্বীপের রাজার নিকটে তাহারা নীত হইল। দ্বিভাষী কর্তৃক পূর্ব্বে যে যে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, রাজাও তাহাদিগকে তদ্রূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উত্তর দিল যে, মহাসাগরে যে সকল আশ্চর্য্য পদার্থ আছে তাহা আবিষ্কার করিবার জন্যই তাহারা সমুদ্রযাত্রা করিয়াছে।

ইহা শ্রবণে রাজা ঈষৎ হাস্য করিলেন ও ঐ সকল ব্যবসায়ীকে এইরূপ বলিতে দ্বিভাষীকে আদেশ করিলেন যে, পরলোকগত রাজা তাঁহার পিতা লোকের প্রস্তাবমত মহাসাগর পরীক্ষা করিতে কতকগুলি জাহাজ পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ সকল লোক কয়েক মাস ধরিয়া তাহার বিস্তৃত সীমার মধ্য দিয়া গমন করিবার পর তাহাদের আশা বিফল হইল ও এমন কি দেখিল যে আলোক তাহাদিগকে বিফল করিতেছে, তজ্জন্য সমুদ্রযাত্রায় তাহাদের কোনরূপ লাভ হয় নাই। সুতরাং তাহারা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল।

অতঃপর রাজা তাঁহার দ্বিভাষীকে ভ্রমণকারিগণের জীবনের জন্য আশ্বাস দিতে আজ্ঞা করিলেন। পুনরায় তাহাদিগকে কয়েদে লইয়া যাওয়া হইল ও যতদিন পূর্ব্ব বায়ু প্রবাহিত না হইল ততদিন তাহারা সেইখানেই রহিল। পূর্ব্ব বায়ু প্রবাহিত হইলে ঐ দেশের লোকেরা তাহাদিগকে জোয়ার্কার মধ্যে রাখিয়া, তাহারা কোন্ দিকে যাইতেছে যেন দেখিতে না পায় এই উদ্দেশ্যে তাহাদের চক্ষু বাঁধিয়া দিল ও তাহাদের সহিত কয়েকদিন পর্য্যন্ত নৌকা চালাইল।

নাবিকগণ বর্ণনা করিয়াছে, "এইরূপে ঐ সকল লোকের সঙ্গে কয়েকদিন

ও রাত্রি ভ্রমণের পর আমরা অবশেষে এক সাগরকূলে আসিলাম ও তথায় তাহারা আমাদিগের সকলকেই নামাইয়া দিয়া আমাদিগের হাত পশ্চাদ্দিকে বাঁধিয়া আমাদিগকে সমুদ্রতীরে এই অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া গেল। আমরা তথায় অতি চিন্তার সহিত রহিলাম। অধিকন্তু বন্ধন হেতু আমরা প্রপীড়িত হইয়াছিলাম ও অরুণোদয় পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থায় থাকিলাম এবং ঠিক সেই সময়েই মনুষ্য-স্বরের ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইলাম। ইহা শুনিয়া আমরা সকলেই এক সঙ্গে একই সময়ে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলাম। যাহারা ঘটনাস্থলের অতি নিকটেই ছিল তাহারা আমাদের নিকটে উপস্থিত হইল। আমাদিগকে অসুখকর অবস্থায় দেখিয়া তাহারা আমাদিগকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল ও আমাদের অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। ইহা শুনিয়া আমরা তাহাদের ভাষায় উত্তর করিলাম, কারণ এই সকল লোক বার্ব্বারি দেশের লোক। অতঃপর তাহাদিগের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা জান, আমাদিগের দেশ হইতে তোমাদের দেশ কত দূর ?' আমরা বলিলাম,—'আমরা জানি না'। তাহাতে সেই ব্যক্তি বলিল, 'তাহা হইলে তোমাদের দেশ হইতে আমাদের দেশ দুই মাসের পথ'। ইহা শুনিয়া এই লোকগণের নেতা চীৎকার করিয়া বলিল, 'ওয়াসাফি' ('দুর্ঘটনাগ্রস্ত')! এইহেতু তৎকাল হইতেই এই তীরভূমিকে 'আসাফি' বলা হইত। ইহা মগরের (মরক্কো) দেশের সমুদ্রকূলবর্ত্তী বন্দর।

উপরোক্ত পর্টুগীজ কলম্বসগণের আটলান্টিক মহাসমুদ্রে নূতন ভূমি-অনুসন্ধানের এইরূপ বর্ণনা স্পেনের মোসলেম ইতিহাসের একাংশ গৌরব-মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে।

বন্দী সিরাজ

[লেখক —শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত নবাব সিরাজদ্দৌলা কিরূপে ধৃত হইয়া নবাব মিরজাফরের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন, মদোন্মত্ত সিরাজ দানা সা ফকীরের নাসিকাচ্ছেদ

করিয়া দিয়াছিলেন। পরে রাজমহলের নিকট পলায়নতৎপর নবাবের বহুমূল্য পাদুকা দেখিয়া সে তাঁহাকে চিনিয়াছিল। নাসিকার প্রতিশোধ লইবার জন্য সে মিরজাফরের কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া হতভাগ্য সিরাজকে বন্দী করাইয়াছিল। মারশাম সাহেব বলেন, নবাব সিরাজদ্দৌলা ফকীরের কান কাটিয়া দিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি রন্ধনের জন্য ইন্ধন লইতে রাজমহলের নিকটে সেই ফকীরের আশ্রমে গিয়াছিলেন। ফকীর সিংহাসনচ্যুত নবাবকে চিনিয়া নবাব মির-জাফরের কর্ম্মচারীকে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিল। তাহাতে সিরাজ বন্দী হন। ডাঃ ওয়ালস্ (Walsh) সাহেব মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে এই গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সমসাময়িক ইতিবৃত্তকার হরিচরণ দাসের চাহার গুলজার সুজাই নামক ইতিবৃত্তে যে বর্ণনা আছে, আমরা এস্থলে সে কাহিনী বিবৃত করিব—"সিরাজদ্দৌলা মুর্শিদাবাদ হইতে ত্রিশ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া একটি জঙ্গলের ধারে নামিয়া তাঁহার ভৃত্যদিগকে তাঁহার হুঁকার জন্য একটু অগ্নি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে বলিলেন। তাঁহার আজ্ঞানুসারে ভৃত্য নৌকা হইতে নামিল। নিকটে এক দরবেশের কুটীর ছিল। সে কুটীরের দিকে অগ্রসর হইয়া কুটীর-স্বামীর নিকট একটু অগ্নি যাচ্ঞা করিল। এরূপ কথিত আছে যে, দরবেশ পূর্ব্বে সিরাজদ্দৌলার ভৃত্য ছিল। সামান্য দোষের জন্য অবমানিত ও বিতাড়িত হইয়া সে ফকীর হইয়া এই জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সিরাজের ভৃত্যের হস্তে রত্নখচিত কলিকা দেখিয়া তাহার সন্দেহ হইল। সে তখনই তাহাকে চিনিয়া ফেলিল এবং ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল সে জঙ্গলে কিরূপে আসিল। ভৃত্যটি নির্ব্বোধ, সে সকল গুপ্তকথা প্রকাশ করিল। কৌশলে তাহাকে সেস্থলে বসাইয়া দরবেশ দ্রুতগতিতে নিকটবর্ত্তী সহরের নগর-রক্ষকের নিকট গিয়া সিরাজদ্দৌলার আগমন সংবাদ প্রদান করিল। নবাব জাফর আলি খাঁ এবং ইংরাজেরা নবাবকে ধরিবার জন্য আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। নগর-রক্ষক সেই দিনই সে আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তখনই নৌকায় চড়িয়া যাত্রা করিলেন এবং নবাবকে ধরিয়া জাফর আলি খাঁর বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দ্বারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া পাঠাইলেন।"

এগুলির মধ্যে কোন্ কাহিনী সত্যমূলক তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই।

দুঃখ।

[লেখক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।]

তুই কি, আমার দুঃখ! আমার দেবের দান?
তবে কেন এ প্রসাদে আকুল আমার প্রাণ?

যে চরণ হ'তে ঝরে সুখ-মন্দাকিনী-বারি,
তুই কি শীতল-করা করুণার স্রোত তা'রি?
তবে হৃদিমাঝে তুই কেন তপ্ত বালিরাশি?
কেন মন্দাকিনীসম তোরে নাহি ভালবাসি?
তুই যদি মধুময় সেই ক্ষীরোদের ক্ষীর,
তবে এত ক্ষার কেন, যেন লবণাম্বু নীর?

তুই কি সে চন্দ্রকর স্নিগ্ধ যাহে ধরাতল?
তবে কেন হৃদিমাঝে ঢেলে দি'স হলাহল?
তুই কি সে প্রেমময় মলয়ের আনা সুধা?
তবে কেন তোরে পেয়ে নাহি মিটে যায় ক্ষুধা?
তুই কি সে গোলোকের চির পূর্ণিমার হাসি?
তবে কেন কান্না তুই ভূলোক ভিতরে আসি?

যে নন্দন আনন্দের গন্ধে ভরা বার মাস,
তুই কিরে সেথাকার কুসুমের দিব্য বাস?
তুই কি সে দেবকণ্ঠে গীত অমরার গীত?
তবে কেন কর্ণে মোর সুর তার বিপরীত?
তুই কি সে দেবতার অবচিত পারিজাত?
তবে সে কুসুমাঘাতে কাঁদি কেন দিবারাত?

তুই কি, আমার দুঃখ! আমার দেবের দান?
তবে কেন এ প্রসাদে আকুল আমার প্রাণ?

স্নেহের জয়।

[লেখক—শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।]

(১)

বীরেশ্বরের বাস বনগ্রামে। তা'র বাপ-পিতামহ ও সে এই তিন পুরুষ ধরিয়া হুতোমপুরের জমিদার-বাটীতে চাকুরী করিতেছে। বাবুদের বাড়ীতে তা'র প্রতাপ-প্রতিপত্তি যথেষ্ট। সে বাবুদের ঘরের ছেলের মত হইয়া পড়িয়াছে। বাবুদের সঙ্গে একত্র আহারবিহার, খেলাধূলা—সব। প্রথম প্রথম বাপ-পিতামহের মত তা'র চালও সাধাসিধা ছিল; সেই কাণে কলম, মামুলী মেরজাই, ঠন্‌ঠনের চটী। কিন্তু বাবুদের সহিত সর্ব্বদা সঙ্গের প্রভাব সে অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে এ মানসিক শক্তি তাহার ছিল না, ফলে সে বিলাসিতার কবলে পড়িতে লাগিল। আজ কামিজটা, কাল জুতাটা, একদিন বা একখানা সাবান তাহার বাবুরা তাহাকে আদরের সহিত দান করিয়া প্রকারান্তরে তাহার মাথা খাইতে বসিল। এততেও তা'র মন বুঝি উঠিল না। সে বাবুদের মত পরিচ্ছদে সর্ব্বদা সজ্জিত থাকিতে ইচ্ছা করে। হীরার আংটী-বোতাম, সোনার ঘড়ি-চেন, এগুলি ব্যতিরেকে দিনাতিপাত করা তার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইয়া পড়িতে লাগিল। অথচ তাহার মাহিনা, দস্তুরি, পত্নীর গহনাগাটী ও সর্ব্বোপরি ভিটামাটি বিক্রয় করিলেও যে তাহার বাসনা পূর্ণ হইবে এমত আশাও নাই। সে প্রতিদিন বিমর্ষ, অতি বিমর্ষ হইয়া পড়িতে লাগিল। সে ভাবিল—

"তবে পরাণে 'ভোগ তৃষা' কেন গো দিলে,
অর্থ না দিলে যদি বিধিহে—
ভোগের তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া
মিটাব মনোসাধ কি দিয়ে।"

ভক্তের প্রার্থনা দেবতা বা অপদেবতার কর্ণে প্রবেশ করিল। বীর বীরেশ্বর অকূলে কূল পাইল। একটা সঙ্কল্প মনোমধ্যে সে বেশ করিয়া আঁটিয়া লইল। প্রভুভক্তি, ভালবাসা, প্রীতি তাহার অন্তর হইতে নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। বিলাসিতা চরিতার্থ করিবার জন্ত অনায়াসে সে একটী সুযোগ

আবিষ্কার করিল। সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল!

(২)

হুতোমপুরের হর্ত্তাকর্ত্তা পরেশবাবু। তাঁহার মত সচ্চরিত্র, ধর্ম্মভীরু, ন্যায়-পরায়ণ জমিদার গ্রামের প্রজাবৃন্দ বহুদিন দেখে নাই। তাঁহার প্রাণ সরল, হৃদয় উদার—সর্ব্বদাই জ্ঞানচর্চ্চায় তিনি নিমগ্ন। বীরেশ্বরের পরলোকগত পিতা, পরেশের স্বর্গীয় পিতার পুরাতন গোমস্তা—সেইজন্য পরেশ তাহাকে খুড়া বলিয়া সম্বোধন করিত এবং সেই সম্বন্ধে বীরেশ্বরকে 'বীরুদা' বলিয়া ডাকিত। শুধু ডাকা নহে, তাহাকে অগ্রজের ন্যায় ভক্তি করিত। বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া তাহার সমক্ষে তাম্র-কূট-সেবনও অবিধেয় বোধ করিত। ইহার ফল যাহা হইবার তাহা নিয়মিত-রূপে হইতে লাগিল। অর্দ্ধশিক্ষিত বীরেশ্বর বুঝিল, সে ভিন্ন পরেশের গতি নাই। তাহার পয়সা আছে, আশানুরূপ বিদ্যাবুদ্ধি নাই। বস্তুতঃ বীরেশ্বরের মনের কথা বুঝিতে পরেশকে এক মিনিটও বিলম্ব করিতে হয় নাই। কিন্তু তবু সে উপেক্ষা করিত। কিন্তু একদিনের নিমিত্তও সে বীরেশ্বরকে অবিশ্বাসী বলিয়া সন্দেহ করিবার অবকাশ পায় নাই। সে বুঝিত, আর যাহা হউক, যাহারা তিন পুরুষ তাহাদের বাটীতে 'মানুষ' হইতেছে, তাহারা অবিশ্বাসী হইতে পারে না।

বিধিচক্র কিন্তু মানবের ইচ্ছাধীন হইয়া ঘুরে না। একদিন প্রভাতে উঠিয়া পরেশ বাহিরে পায়চারি করিতেছে, বাটীর ভিতর হইতে পরিচারিকা তাঁহাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল। পরেশ অন্তঃপুরে শয়নকক্ষে আসিয়া পত্নী কনকলতার অধোবদন দেখিয়া বিস্মিত হইল, বলিল—"ব্যাপার কি ? এরই মধ্যে জোর তলব কেন?"

কনকলতা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"গহনার বাক্সটা তুমি কোথাও দেখেছ ?"

পরেশ—"না, আমি ত কিছুই জানি না! কি হ'ল দেখ দেখি।"

কনকলতা—সে কি! তাতে যে আমার বীণার শ্বশুর বাড়ীর গহনাগুলি সব আছে গো!

পরেশ—বল কি! এত ভারি মজার কথা দেখছি! বাড়ীর চাকর-বাকরদের সব জিজ্ঞাসা করা হয়েছে?

কনকলতা—সকলকেই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কোনও খবর না পেয়ে তোমার কাছে আর বীরু-ভাসুরের কাছে খবর পাঠিয়েছি!

এই সময়ে পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, গোমস্তাবাবুর ঘরের দরজা বন্ধ, অনেক ডেকেও সাড়া পাওয়া গেল না। পরেশ তখন স্বয়ং অনুসন্ধানে বহির্গত হইল।

(৩)

বাড়ীর চারিদিকে খুব একটা হৈ হৈ পড়িয়া গিয়াছে। ভৃত্যবর্গের বিশুষ্ক বদন দেখিলে করুণার উদ্রেক হয়। তাহারা পরস্পর পরস্পরকে দোষী মনে করিতেছে। পরিচারিকাদেরও মনের অবস্থা তদ্রূপ। পরেশ স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া কোনও কিনারা করিতে পারিল না। এমন সময়ে গোয়ালিনী দুধ দিতে আসিয়া বলিল—"বাবু আপনাদের বাড়ীতে না চুরি হয়েছে। পথ থেকে দেখে এলুম যেন খিড়কীর বাগানে একটা ভাঙ্গা বাক্স পড়ে রয়েছে।"

পরিচারকবৃন্দ তখন সোৎসাহে সেইদিকে ধাবমান হইল। পরেশ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বাগানে উপস্থিত হইল এবং দেখিল বাক্সটী তাহারই বটে। তখন তাহার দৃষ্টি পড়িল, বাগানের সংলগ্ন কক্ষের একটা জানালা ভগ্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহারা সেই সংকীর্ণ ভগ্ন জানালার ভিতর দিয়া গৃহাভ্যন্তরে গিয়া দেখিল, দ্বারটী ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। এইটীই গোমস্তার শয়নকক্ষ নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঘরের মেঝেতে কতকগুলি ছোটখাট লৌহের যন্ত্র পড়িয়া রহিয়াছে। সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস হইল, গোমস্তারই এই কাজ। ইহার অন্যান্য যথেষ্ট প্রমাণও পাওয়া গেল। পরেশ মুখ বিকৃত করিয়া জমিদারি সেরেস্তায় গিয়া দেখিল, খাতাগুলি ধূল্যবলুণ্ঠিত। লোহার সিন্দুক খোলা রহিয়াছে, ভিতরে একটী মাত্র টাকার তোড়া, নোটের তাড়া অপহৃত।

(৪)

জমিদার-বাটীতে খুব একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। স্থানীয় পুলিস সদলবলে উপস্থিত হইয়া সকলের জবানবন্দী ডায়েরীতে তুলিয়া লইল; হিসাব করিয়া দেখা গেল, বীরেশ্বর নগদ ও গহনায় প্রায় সাত সহস্র টাকা লইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল।

এইরূপ একটা ঘটনা যে অবশ্যম্ভাবী বীরেশ্বর তাহা ভালরূপই জানিত, তাই সে পূর্ব্ব হইতে এতটা সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল, যে তাহার নিকট অপহৃত দ্রব্যের কণামাত্রও পাওয়া যায় নাই।

* * * * *

যথা সময়ে পুলিস বীরেশ্বরকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিল। সে যতই

চতুর হউক না কেন, ফৌজদারী হাঙ্গামায় পড়িয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল! ভাবিতে লাগিল যদি সে জেলে যায় তাহা হইলে তাহার নাবালক পুত্র ও অসহায় পত্নীর কি দশা হইবে! যে টাকা সে চুরি করিয়া আনিয়াছে, সেই টাকাই যদি তস্করে চুরি করে। বিপদেই বুঝি মানবের ধর্ম্মজ্ঞান প্রবল হয়!

(৫)

ডিপুটী সাহেবের এজলাসে আজ খুব ভিড়। সরকার-পক্ষে উকীল খুব জোর বক্তৃতায় বুঝাইতেছেন যে, বীরেশ্বর টাকা ভাঙ্গিয়াছে, গহনার বাক্স অপহরণ করিয়াছে—'ফেরার' হইয়া পলায়ন করিয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে—ইত্যাদি ইত্যাদি—

দূরে পরেশ একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট। তাহার মুখে কথা নাই, দৃষ্টি ঘন ঘন বীরেশ্বরের মুখে পড়িতেছে! মাঝে মাঝে রুমালে সে মুখ মুছিতেছে। এমনই কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পরে টিফিনের সময়ে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গাত্রোত্থান করিলেন।

* * * * *

পরেশের সহিত তাহার জ্ঞাতি-ভ্রাতা রমেশ ছিল। পরেশ বলিল—"রমেশ, তোমার কি মনে হয় বল দেখি! সত্য সত্যই কি বীরেশ্বর দোষী?"

রমেশ বলিল—"তুমি এখনও সন্দেহ করছ! কি মনে হয়?"

পরেশ করুণস্বরে বলিল—"যাই হো'ক্ ভাই, তুমি একবার বীরেশ্বরের সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারবে?"

রমেশ—"সে এমন একটা কি কঠিন কাজ যে পার্‌ব না। তা'তে তোমার দরকার কি?"

পরেশ—"দরকার এমন কিছু না—তবে তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যে সে দোষ স্বীকার কর্‌তে পারে, একবার যাও"—

"আচ্ছা যাচ্ছি" বলিয়া রমেশ গাত্রোত্থান করিল—পরেশ বাধা দিয়া বলিল—"আচ্ছা দোষ—না না, তুমি যাও।"

রমেশ চলিয়া যাইতেছে, পুনরায় বাধা দিয়া পরেশ বলিল—"সে যেন দোষ স্বীকার না করে।"

"সে কি?" বিস্মিত হইয়া রমেশ বলিল—"সে কি?"

একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া পরেশ বলিল—"না, হয়ত বেচারার জেল হয়ে যাবে, তার ছোট ছোট নাবালক ছেলেগুলির—"

একটু ক্রোধপ্রকাশ করিয়া রমেশ বলিল—"তা হলে দুষ্টের দমন হয়, তোমার এ ইচ্ছা নাই ?"

"খুব আছে, তুমি যাও" এই বলিয়া রমেশকে বীরেশ্বরের নিকট পাঠাইয়া, রুমালে চক্ষু ঢাকিয়া পরেশ বসিয়া রহিল।

(৬)

"তার খাওয়া হয়েছে ত"—রমেশ ফিরিবামাত্র পরেশ উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল।

রমেশ একটু বিদ্রূপ করিয়া কহিল—"শ্বশুরবাড়ী যাবে, এখন জামাই আদরেই আছে।"

বিরক্তির সহিত পরেশ বলিল—"ছিঃ ছিঃ রমেশ তোমার মনুষ্যত্ব নেই দেখ্‌ছি। লোকটাত এখনও দোষী সাব্যস্ত হয় নাই, এখন থেকে পক্ষপাতিত্ব কচ্ছ কেন ?"

"আচ্ছা আমি জেনে আস্‌ছি"—একটু অপ্রস্তুতভাবে রমেশ এই কথা বলিয়া বীরেশ্বরের নিকট গেল।

রমেশকে দেখিয়া বীরেশ্বর নতমুখে বসিয়া রহিল। রমেশ ডাকিল—"বীরুদা"। বীরেশ্বরের নয়নদ্বয় অশ্রুতে প্লাবিত হইয়া গেল। রমেশের প্রাণটাও যেন কেমন কেমন করিয়া উঠিল, সে বলিল—"বীরুদা, তোমার কি ক্ষুধা পেয়েছে ? কিছু খাবে ?"

বলা বাহুল্য, গত ২।৩ দিন বীরেশ্বর প্রায় একপ্রকার অভুক্ত।

বীরেশ্বর খুব করুণস্বরে বলিল—"আমার খাবার সাধ ফুরিয়েছে—দাদা, ক্ষমা কর—আশীর্ব্বাদ কর যেন এইবার আমি মরতে পারি।"

* * * * *

ইন্সপেক্টর প্রভৃতি পুলিস কর্ম্মচারিবৃন্দকে সবিশেষ অনুরোধ উপরোধ করিয়া পরেশ স্বহস্তে কিছু মিষ্টান্ন লইয়া বীরেশ্বরের নিকট গেল। বীরেশ্বর পরেশের মুখের দিকে চাহিয়া মুখ নত করিল।

পরেশের মুখে বাক্যস্ফুরণ হইল না, কোনও ক্রমে আঁখিজল রুদ্ধ রাখিয়া বীরেশ্বরের হস্তে মিষ্টান্নের পাত্রটী অর্পণ করিল।

বীরেশ্বরও কোনও কথা না বলিয়া তাহা গ্রহণ করিল মাত্র।

(৭)

পরেশ জবানবন্দীতে বলিল—"বীরেশ্বর আমার অনেক দিনের গোমস্তা,

ওর বাপ-পিতামহ আমাদের সংসারে আজীবন কাজ করেছে। আমার গহনাপত্র টাকাকড়ি চুরি গেছে বটে, কিন্তু বীরেশ্বরকে আমি চুরি কর্‌তে দেখি নাই।"

প্রমাণাভাবে বীরেশ্বর বেকসুর খালাস পাইল।

পরেশ তাহার দক্ষিণ হস্ত ও রমেশ বামহস্ত ধারণ করিয়া একেবারে গাড়ীতে আরোহণ করিয়া বাটী ফিরিল। তিন জনেরই চক্ষু আর্দ্র; কাহারও মুখে কোনও কথা নাই।

* * * * *

বাটীর ভিতর করুণকণ্ঠে অনুচ্চস্বরে একটী রমণী ক্রন্দন করিতেছিল—সে বীরেশ্বরের পত্নী। স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য সে পরেশের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে এবং অপহৃত দ্রব্যগুলি প্রত্যর্পণ করিতে, বনগ্রাম হইতে পথ হাঁটিয়া আসিয়াছিল। স্বামীকে পাইয়া তাহার যেন ব্রত উদ্যাপন হইয়া গেল; সে পরেশের সম্মুখে একটী ছোট পুঁটুলি স্থাপন করিল।

পরেশ তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিল—"এ গুলো আমার প্রীতি-উপহার—আপনি গ্রহণ কর্‌লে আমি সুখী হ'ব।"

বীরেশ্বর বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল।

সেকালের ব্রাহ্মণের চিত্র।

৺কিঙ্কর ঠাকুর।

[লেখক—শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।]

সেকালে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কেমন অকপটহৃদয়, ধর্ম্মভীরু, সত্যসন্ধ, সংযমী এবং বিলাসলেশশূন্য ছিলেন, তাহার একটী চিত্র 'অর্চ্চনা'র পাঠক-পাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম। বাঙ্গালার সেই পুরাতন ব্রহ্মণ্যের আদর্শ এখন আর বড় একটা দেখা যায় না; এই রেখা-চিত্রে পাঠকবর্গ উহার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইতে পারিবেন।

৺কিঙ্কর ঠাকুরের নামের সহিত বাঙ্গালীর তেমন পরিচয় না থাকিলেও তিনি বঙ্গবাসীর স্মরণের যোগ্য। তাঁহার পূর্ণ নাম শ্রীরামকিঙ্কর ন্যায়ালঙ্কার। তাঁহার পিতা রামলোচন তর্কসিদ্ধান্ত অসামান্য নৈয়ায়িক ছিলেন। ইনিও

মহাপণ্ডিত। পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর বশিষ্ঠ গোত্রে ইঁহার জন্ম। এই বশিষ্ঠ বংশীয়গণ প্রধানতঃ ভাটপাড়ার ঠাকুর আখ্যায় অভিহিত। ইঁহাদের বংশে ৺নারায়ণ ঠাকুর নামে একজন সিদ্ধপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে এই বংশীয়েরা অদ্যাপি ঠাকুরবংশীয় নামে কীর্ত্তিত। প্রায় দেড় শত বৎসর হইল, কিঙ্কর ঠাকুর কাঁচড়াপাড়ার ঠাকুর-গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এক শত বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

অশূদ্রপ্রতিগ্রাহিতা, সদাচার-পালন, ধর্ম্মনিষ্ঠা, সৎপরিগ্রহ ও বিদ্যাবত্তা ইঁহাদের বংশগত। কিঙ্কর ঠাকুরেও তাঁহার ব্যতিক্রম হয় নাই। শিষ্য ও বিষয়-সম্পত্তি ইঁহার জীবিকার উপায়স্বরূপ ছিল। শিষ্য-বাটীতেই প্রায় ইঁহার বৎসরের ছয় মাস কাল অতিবাহিত হইত। এক্ষণে প্রায় সকল স্থানই সুগম হইয়াছে। কিন্তু সে সময়ে পূর্ব্বাঞ্চল অত্যন্ত দুর্গম ছিল। দস্যু-ভয় অত্যন্ত অধিক ছিল, পথঘাট ছিল না বলিলেই হয়। তবে গুরু মহাশয়দের পথে যত কষ্টই হউক না, শিষ্য-বাটীতে উপস্থিত হইলে শিষ্যগণের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সেবার গুণে সে কষ্ট দূরীভূত হইত।

১ম ঘটনা।

একদিন কিঙ্কর ঠাকুর খুলনার পূর্ব্বভাগে বালেশ্বর নামক নদীতে নৌকা-যোগে গমন করিতেছিলেন। নৌকা জলদস্যুগণ দ্বারা আক্রান্ত হইল। দস্যুরা সশস্ত্র নৌকায় উঠিলে ঠাকুর দস্যুগণকে কহিলেন—

"দেখ, তোমাদিগকে আমি আমার যাবতীয় দ্রব্যই দিতেছি। একমাত্র পরিধানস্বরূপ গামছা রাখিব। অনর্থক কেন ব্রহ্মহত্যা করিবে?"

দস্যুগণ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে ব্রাহ্মণ আপনি গামছা পরিধান করিয়া সমস্ত দ্রব্য ও অর্থাদি তাহাদিগকে দিলেন।

দস্যুগণ স্বকার্য্য সাধন করিয়া প্রস্থান করিলে ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে, তাঁহার হস্তের অঙ্গুলিতে একটি হীরকাঙ্গুরীয় রহিয়াছে। "সমস্তই দিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এই অঙ্গুরীয়টীও আমার দেয়"—এই ভাবিয়া মাঝিকে আপনার মনের সঙ্কল্প জানাইলেন। মাঝি তখন মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—

"ঠাকুর, আমাকে উহা হইতে ভাড়া দিতে হইবে। আর সাধ করিয়া আমরা বাঘের মুখে যাইতে পারিব না! নৌকা আমি কখনই ভিড়াইব না"।

ব্রাহ্মণ তখন কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"দেখ মাঝি; তোমাকে দ্বিগুণ ভাড়া দিব। অমুক শিষ্য-বাটী পৌঁছাইয়া দিলেই ত তুমি দ্বিগুণ ভাড়া পাইবে।

আমাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পাপ জন্য নরকে ডুবাইও না। আমার কথা যদি না শুন, তবে আমি এই নদীতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব ; এ পাপজীবন আর রাখিব না।"

মাঝি নৌকা ভিড়াইল। ব্রাহ্মণ তখন তীরে উঠিয়া চীৎকার করিয়া দস্যু-গণকে ডাকিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে ব্রাহ্মণ দস্যুগণের সন্ধান পাইয়া যখন আপনার হীরকাঙ্গুরীয়ের কথা জানাইলেন এবং অঙ্গুরীয়টি লইয়া তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাপালন হইতে মুক্ত করিবার জন্য যখন অনুরোধ করিলেন, তখন একজন দস্যু সেই হীরকাঙ্গুরীয় হাত পাতিয়া লইল। দস্যুরা চিরকাল পাপই করিয়া আসিয়াছে, এরূপ ভাবে পুণ্যের বিমলরশ্মি কখন তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সমবেত দস্যুগণের মধ্যে একটী বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ পাইল। দস্যুপতি অপর দস্যুদিগকে কহিল—

"দেখ, এ ব্রাহ্মণের দ্রব্য কখনই আমাদের সহিবে না। এই ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের দ্রব্য সমস্তই ফিরাইয়া দিই।"

বাস্তবিক দস্যুরা নরহত্যা করিয়া পাপের অধস্তন সোপানে অবরূঢ় হইয়াও ব্রাহ্মণের এই অলৌকিক ত্যাগ ও মহত্ত্ব-দর্শনে সকলেই দস্যুপতির প্রস্তাবে সম্মত হইল। কিন্তু ব্রাহ্মণ কোনও মতেই তাঁহার দ্রব্য ফেরত লইতে চাহিল না। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"যখন আমি ইহা তোমাদের দিয়াছি, তখন ফেরত লইব না।"

দস্যুরা ইহাতে আরও চমৎকৃত হইল। শুভক্ষণে তাহাদের সুমতি জাগিয়া উঠিল। সকলে একবাক্যে এই দস্যুতা জন্মের মত ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপথে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সঙ্কল্প করিল। ব্রাহ্মণের সম্মুখে সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, আর কখন এ পাপকার্য্য করিবে না। কিঙ্কর ঠাকুর তখন আপনার সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া দস্যুগণের আজীবন-সঞ্চিত পাপক্ষয়ের উপদেশ দিয়া চলিয়া আসিলেন।

২য় ঘটনা।

কিঙ্কর ঠাকুরের প্রৌঢ় বয়সে পত্নীবিয়োগ ঘটিলে তিনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন। তখন তাঁহার পুত্র "রামচন্দ্র" পিতার উপর কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইলেন। ঠাকুরের গৃহে দুর্গোৎসব খুব জাঁকজমকের সহিত নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বহু আত্মীয়কুটুম্বে সে সময় গৃহ পূর্ণ থাকে। এক বৎসর দুর্গোৎ-সবের সময়ে বড়ই শোচনীয় ঘটনা ঘটে। দুর্গোৎসবের ভাঁড়ারী ছিলেন,—ঠাকুরের দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুর। ইনি লোক বড় ভাল ছিলেন না।

একদিন ঠাকুরের পৌত্র, রামচন্দ্রের পুত্র চারি বৎসরের বালক ভাঁড়ার-ঘরে খাবার চাহিতে যায়। ঠাকুরের দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুর জামাতার পৌত্রকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দেন। বালক কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার (রামচন্দ্রের) নিকট এই ব্যাপারটীর বর্ণনা করিলে রামচন্দ্রের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি বৃদ্ধ পিতাকে সভাক্ষেত্রেই অপমানজনক ভাষায় তীব্রস্বরে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন,—"বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়া আপনার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে। নচেৎ আপনার দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুর আপনার গৃহে বসিয়া একমাত্র পৌত্রকে আজ অপমান করিতে সাহসী হয়?"

ঠাকুর পুত্রকে সভাস্থলে আর এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করিতে নিষেধ করিলেন। অসহিষ্ণু পুত্র তাহা শুনিলেন না; উপরন্তু মর্ম্মান্তিক শেলসম বাক্যে পিতাকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। তখন ঠাকুর পুত্রকে অভিশাপ দিলেন,—"এরূপ পিতৃ-অপমানকারী সন্তানের আর আমি মুখদর্শন করিতে চাহি না। এক মাসের মধ্যেই যেন এরূপ সন্তানের অপঘাত-মৃত্যু ঘটে!"

অভিশপ্ত পুত্র রামচন্দ্র আপনার এক পুত্র ও কন্যার হাত ধরিয়া কাঁটাল-পাড়ার গৃহ ত্যাগ করিয়া চুঁচুড়ার বাটীতে গিয়া রহিলেন। অবশ্য পুত্রকে অভিশপ্ত করিয়া পরে ঠাকুরের অনুতাপ হইয়াছিল। চন্দনপুরের জমীদার-শিষ্য শ্রীদ্বারিকানাথ মিশ্র ও অন্যান্য শিষ্যগণের অনুরোধে ঠাকুর পুত্রকে নিজের বাটীতে লইয়া আসিলেন। অভিশাপ-খণ্ডনের জন্য সমারোহে শান্তি স্বস্ত্যয়ন ও শিবপূজাও করাইলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ব্রাহ্মণের অভিশাপ অখণ্ডনীয়। ঠাকুর বলিতেন, "হাতের যে ঢেলা নিক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহা লক্ষ্যস্থানে পড়িবেই।"

একদিন চৌকাঠে মাথা লাগিয়া ঠাকুরের একমাত্র পুত্র রামচন্দ্র ভূমিতে পড়িয়া গেলেন, রক্তপাত হইতে লাগিল। অভিশাপ ফলিল; অভিশপ্ত পুত্রের অপঘাত মৃত্যু ঘটিল। গৃহে ক্রন্দনের রোল ঠাকুরকে জানাইয়া দিল,—তাঁহার একমাত্র পুত্র আজ তাঁহারই অভিশাপে যৌবনে প্রাণ হারাইলেন।

৩য় ঘটনা।

একদিন ঠাকুরের পত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে পতিকে বলেন,—"দেখ, আমি যেখানেই নিমন্ত্রণে যাই, সেখানে সকলেই আমাকে বলে,—'উহাকে বেশী করিয়া মাছ দাও। উহার স্বামী বৃদ্ধ, অধিকদিন সধবা থাকিয়া মাছ খাইতে পাইবে না' তজ্জন্যই উহারা ঐরূপ বলে বুঝি?"

কিঙ্কর ঠাকুর পত্নীকে সান্ত্বনা দিলেন, "ক্ষেপী কাঁদিস না, আমি একশত বৎসর বাঁচিব। তখন তোমার বয়স ৫৫ বৎসর হইবে"।

কথাটী অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গেল। পৌত্রের পুত্রকন্যা দেখিয়া একশত বৎসর বয়সে ঠাকুর গঙ্গাগর্ভে নশ্বর দেহ বিসর্জ্জন দিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে ঠাকুর দেখিতে যেন পাকা আমটীর মত ছিলেন। শেষ বয়সেও ইঁহার শক্তি অটুট ছিল। এরূপ দীর্ঘজীবী সৎ ব্রাহ্মণ এক্ষণে আর দেখা যায় না।

ঠাকুরের শ্বশুরকে দক্ষিণ অঞ্চলে দুর্দ্দান্ত প্রজাদের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। তাঁহার দেহ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

সংশয়।

[লেখক—শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।]

একবার বলে দাও—তুমি যা নিয়েছ
দে'ছ তারে পরিণতি বিশ্বের মাঝারে,
ধ্বংস নয়—মৃত্যু হ'তে দিয়েছ তাহারে
নবীন জীবনালোক আরেক সংসারে;
হেথা তার কর্ম্মবন্ধ সত্য টুটেছিল—
স্বেচ্ছাচারে লও নাই নব কর্ম্মে টানি',
দিয়ে গেছে সবটুকু যা দিবার ছিল,
অসময়ে যায় নাই টুটিয়া পরাণি;
একবার বলে দাও—তোল যবনিকা,
দেখাও মৃত্যুর পারে প্রিয় পরিজন;
একবার ছিন্ন কর এই প্রহেলিকা,
বুঝাও—মরণ শুধু আরেক জীবন;—
এক কর্ম্ম-পারাবারে শুধু দু'টী তীর,
শুধু কর্ম্ম-হেরফের—কেন আঁখি-নীর?

অবসরে।

[লেখক—শ্রীউমাচরণ ধর।]

জীবন-সংগ্রামে এই ক্ষুদ্র অবসরে
একটু স্বস্তি-তরে প্রিয়! লব গো শরণ,
পারি না পারি না আর ফেলিলাম দূরে
এটা ভাল এটা মন্দ শতেক বন্ধন।
একটু নিরালা হয়ে সেদিনের মত
ভুলে গিয়ে সংসারের নিয়ম-বিধান
তোমারে ভাবিব আমি মম মনোমত
ঘুচাইয়া দিব আজি সর্ব্ব ব্যবধান।
রুদ্ধ এ হৃদয় মম খোল গো দুয়ার
দেখাও যতনে আজি রেখেছি সম্ভার—
তব ধ্যান তব চিন্তা তব আলাপন
ব্যথিত হৃদয়'পরে তব সিংহাসন;
আর আর সে বিশ্বাস অমৃত সমান,
জীবনের পরপারে আবার মিলন।

বৈষ্ণব শাস্ত্র

[লেখক—শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।]

বৈষ্ণব শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ শাস্ত্রের লক্ষণ নির্দ্দেশ আবশ্যক। কারণ, সাধারণ শাস্ত্র না চিনিলে বিশেষ শাস্ত্র চেনা যায় না। শাস্ত্র কাহাকে বলে? তৎসম্বন্ধে ভট্ট কুমারিল বলিয়াছেন,—যাহার দ্বারা মানবদিগের প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উপদিষ্ট হয়, অর্থাৎ "ইহা কর উহা করিও না" এই প্রকার উপদেশ যে বাক্যে কথিত হয় সেই বাক্য নিত্যই [বেদ] হউক অথবা কৃতক [অনিত্যই] হউক, শাস্ত্র নামে কথিত হয়। শাস্ত্রের নানা প্রকার বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। দার্শনিকপ্রবর মধুসূদন সরস্বতী সমগ্র শাস্ত্রকে তিন প্রস্থানে বিভক্ত করিয়াছেন। আবার মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে বিদ্যার বা শাস্ত্রের চতুর্দ্দশ প্রকার বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসা-ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্যচ চতুর্দ্দশ॥" [১।৩]

অপরার্কধৃত ব্রহ্মপুরাণ বচনে ষোড়শ প্রকার বিদ্যার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"এবং চতুর্দ্দশৈতানি বিদ্যাস্থানানি সত্তম।
বেদান্তঃ পঞ্চদশকং বিদ্যা ষোড়শিকাভবেৎ॥"

অপরার্ক বলেন, অত্রত্য বেদান্ত শব্দে শারীরক সূত্র এবং বিদ্যা শব্দে বৃহদারণ্যক প্রভৃতি রহস্য অভিপ্রেত হইয়াছে *। বিষ্ণুপুরাণের মতে বিদ্যা বা শাস্ত্র অষ্টাদশ প্রকার। যথা—

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা এতাশ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা অষ্টাদশৈব তাঃ॥"

এই তালিকায় তন্ত্রের নাম দেখিতে না পাইয়া অনেকে তন্ত্রের আধুনিকতা কল্পনা করেন, কিন্তু শুক্রনীতিসারে দ্বাত্রিংশৎ প্রকার শাস্ত্রের তালিকায় তন্ত্রের নামও দেখিতে পাওয়া যায় †।

---

* বেদান্তঃ শারীরকম্। বিদ্যা বৃহদারণ্যকাদিরহস্যম্।

† বিদ্যাহ্যনন্তাশ্চ কলাঃ সংখ্যাতুং নৈব শক্যতে।
বিদ্যা মুখ্যাশ্চ দ্বাত্রিংশচ্চতুঃ ষষ্টিঃ কলাঃ স্মৃতাঃ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে নারদ-সনৎকুমার-বৃত্তান্তে কতকগুলি বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। দেবর্ষি নারদ সনৎকুমার সমীপে বলিয়াছেন,—আমি ঋগাদি চারিবেদ, ইতিহাস, পুরাণ [পঞ্চম বেদ], বেদের বেদ [ব্যাকরণ], পিত্র্য [শ্রাদ্ধকল্প], রাশি [গণিত], দৈব [উৎপাতজ্ঞান শাস্ত্র], নিধি [মহাকালাদি নিধিশাস্ত্র], বাকোবাক্য [তর্কশাস্ত্র], একায়ন [নীতিশাস্ত্র], দেববিদ্যা [নিরুক্ত], ব্রহ্মবিদ্যা [বেদ বুঝিবার বিদ্যা, শিক্ষা কল্প ও ছন্দঃ শাস্ত্র], ভূত-বিদ্যা [ভূততন্ত্র], ক্ষত্রবিদ্যা [ধনুর্ব্বেদ], নক্ষত্রবিদ্যা [জ্যোতিষ], সর্প-দেবজন বিদ্যা,—সর্পবিদ্যা [গারুড়], দেবজনবিদ্যা [গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতশাস্ত্র নৃত্য গীত বাদ্য শিল্পাদি বিজ্ঞান], অধ্যয়ন করিয়াছি।

প্রদর্শিত শাস্ত্রসমূহের মধ্যে যে গুলি বৈষ্ণবদিগের উপযোগী সেই গুলি বৈষ্ণব শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। যে গ্রন্থে বৈষ্ণবমাত্রের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেই গ্রন্থ অসাধারণ বৈষ্ণব শাস্ত্র এবং যে গ্রন্থে বৈষ্ণবাবৈষ্ণব সাধারণের উপাসনাদি কথিত হইয়াছে, সেই গ্রন্থও সাধারণ বৈষ্ণব শাস্ত্র বলিয়া কথিত হইতে পারে।

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের মতে ভাগবত তন্ত্র শিবোক্ত এবং বিষ্ণুক্ত শাস্ত্র পদ্মপুরাণ বরাহপুরাণ এবং নরসিংহপুরাণ প্রভৃতি বিষ্ণুবিষয়ক পুরাণ ও সামান্য সংহিতা এই গুলি বৈষ্ণবাভিমত শাস্ত্র। অন্যান্য মুনিগণ বিষ্ণু সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সে গুলিও ইহাতেই আশ্রিত, অর্থাৎ উক্ত গ্রন্থসমূহে যাহা কথিত হইয়াছে, অন্যান্য গ্রন্থে তাহারই প্রপঞ্চন মাত্র বুঝিতে হইবে।

যদ্ যৎ স্যাদ্বাচিকং সম্যক্ কর্ম্ম বিদ্যাভিসংজ্ঞকম্।
শক্তো মূকোঽপি যৎ কর্ত্তুং কলা-সংজ্ঞন্তু তৎস্মৃতম্॥
উক্তং সংক্ষেপতো লক্ষ্ম বিশিষ্টং পৃথগুচ্যতে।
বিদ্যানাঞ্চ কলানাঞ্চ নামানিতু পৃথক্ পৃথক্॥
ঋগ্‌যজুঃ সামচাথর্ব্বা বেদা আয়ু র্ধনুঃ ক্রমাৎ।
গান্ধর্ব্বশ্চৈব তন্ত্রাণি উপবেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
শিক্ষাব্যাকরণকল্পা নিরুক্তং জ্যোতিষন্তথা।
ছন্দঃ ষড়ঙ্গানীমানি বেদানাং কীর্ত্তিতানিহি॥
মীমাংসাতর্কসাংখ্যানি বেদান্তো যোগ এবচ।
ইতিহাসাঃ পুরাণানি স্মৃতয়ো নাস্তিকং মতম্॥
অর্থশাস্ত্রং কামশাস্ত্রং তথা শিল্প মলঙ্কৃতিঃ।
কাব্যানি দেশভাষাবসরোক্তি র্যাবনং মতম্॥
দেশাদিধর্ম্মো দ্বাত্রিংশদেতা বিদ্যাভিসংহিতাঃ।

"তন্ত্রং ভাগবতঞ্চৈব শিবোক্তং বৈষ্ণবস্তথা।
পদ্মোদ্ভবং পুরাণং হি বারাহঞ্চ তথা পরম্॥
ইমে ভাগবতানাস্তু তথা সামান্য সংহিতাঃ।
যদস্তন্ মুনিভি র্গীতম্ এতেষ্বেবাশ্রিতং হি তৎ॥"

প্রদর্শিত "তন্ত্রং ভাগবতঞ্চৈব" এই শ্লোকার্দ্ধের অন্য প্রকার অর্থও হইতে পারে,—তন্ত্র শব্দে সাধারণ তন্ত্র, ভাগবত এবং শিবোক্ত বৈষ্ণব শাস্ত্র অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণুর মাহাত্ম্যাদি সম্বন্ধে ভগবান্ শিব যে শাস্ত্র বলিয়াছেন সেই শাস্ত্র শিবোক্ত বৈষ্ণব শাস্ত্র নামে কথিত হইয়াছে। এইরূপ ব্যাখ্যার সমর্থনার্থ শ্রীমদানন্দ তীর্থের অভিমত উল্লেখযোগ্য; তিনি বলিয়াছেন যে,—"চ" শব্দের দ্বারা সমস্ত বেদশাস্ত্র আগম তন্ত্র যামল পুরাণ প্রভৃতিতে পুরুষ সূক্তমন্ত্রের বিষ্ণুপরতাই সূচিত হইয়াছে [পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন।১।১] শ্রীমদ্ভাগবতেও "নানাতন্ত্রবিধানেন" ইত্যাদি শ্লোকে বিষ্ণুপরায়ণ তন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। হয়শীর্ষের উক্ত বচনে যেমন তন্ত্র শব্দে সাধারণ তন্ত্র কথিত হইয়াছে, তেমন উক্ত গ্রন্থেরই স্থানান্তরে আরও পঁচিশখানা তন্ত্রের খবর পাওয়া যায়। এই পঁচিশখানির নাম, হয়শীর্ষ তন্ত্র, ত্রৈলোক্যমোহন তন্ত্র, বৈভব তন্ত্র, পৌষ্কর, নারদীয় তন্ত্র, প্রহ্লাদ তন্ত্র, গার্গ-গালব, শ্রীপ্রশ্ন, শাণ্ডিল্য তন্ত্র, ঈশ্বর-সংহিতাতন্ত্র, সাত্বত তন্ত্র, যুক্তিমত্তন্ত্র, বশিষ্ঠ তন্ত্র, শৌনক তন্ত্র, নারায়ণীয় তন্ত্র, স্বায়ম্ভুব তন্ত্র, কাপিল তন্ত্র, বিহগেন্দ্র তন্ত্র, আত্রেয় তন্ত্র, নারসিংহ তন্ত্র, আনন্দ তন্ত্র, অরুণ তন্ত্র, বৌধায়ন তন্ত্র ও বিশ্ববিভাষিত তন্ত্র *।

পঞ্চরাত্র গ্রন্থগুলি যে তন্ত্রেরই প্রকারভেদ, তাহা এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

* ব্যস্তানিমুনিভির্লোকে পঞ্চবিংশতি সংখ্যয়া।
আদ্যং সমস্ততন্ত্রাণাং হয়শীর্ষং প্রকীর্ত্তিতম্॥
ত্রৈলোক্যমোহনং তন্ত্রং বৈভবং পৌষ্করস্তথা।
নারদীয়ং তথাতন্ত্রং প্রহ্লাদং গার্গগালবম্॥
শ্রীপ্রশ্নং শাণ্ডিল্যতন্ত্রং তন্ত্র মীশ্বর-সংহিতা।
সাত্বতং যুক্তিমত্তন্ত্রং বাশিষ্ঠং শৌনকস্তথা॥
নারায়ণীয় মন্যচ্চ তন্ত্রং জ্ঞানস্য কারণম্।
স্বায়ম্ভুবং কাপিলঞ্চ বিহগেন্দ্রং তথাপরম্॥
আত্রেয়ং নারসিংহাখ্যং আনন্দাখ্যং তথাপরম্।
বৌধায়নং তথাতন্ত্রং তন্ত্রং বিশ্ববিভাষিতম্। হয়শীর্ষ প ২।

স্কন্দপুরাণ নামতঃ কতকগুলি গ্রন্থকে শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ইহাদের অনুকূল গ্রন্থান্তরকেও শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এবং এতদ্বিরুদ্ধ গ্রন্থকে শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

এই মতে ঋক্ যজু সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ, মহাভারত পঞ্চরাত্র ও মূল রামায়ণ এবং ইহাদের অনুকূল যে সকল গ্রন্থ, সেই গুলি শাস্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে, ইহাদের প্রতিকূল সমস্ত গ্রন্থই কুপথ-প্রদর্শক, সুতরাং শাস্ত্র নহে। স্কন্দপুরাণের এই প্রমাণগুলি শ্রীমদানন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"ঋগ্ যজুঃসামাথর্ব্বাচ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে।
যচ্চানুকূল মেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যো গ্রন্থ-বিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥"

বৈষ্ণবানুমোদিত বিবিধ শাস্ত্রের মধ্যে পঞ্চরাত্র গ্রন্থেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিবিধ গূঢ়তত্ত্ব অতি সমীচীন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থকারগণ পঞ্চরাত্র-গুলিকে স্থানে স্থানে ভাগবত নামেও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ভিত্তিও পঞ্চরাত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়। পঞ্চরাত্রের সংখ্যাগত বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। নারদ পঞ্চরাত্রে সাতখানি পঞ্চরাত্রের নাম কথিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ বলিয়াছেন, সাতপ্রকার পঞ্চরাত্র জ্ঞানীদিগের পরম জ্ঞানপ্রদ। সেইগুলি ব্রাহ্ম শৈব কৌমার বাশিষ্ঠ কাপিল গৌতমীয় ও নারদীয় এই সাত নামে অভিহিত হইয়াছে। ছয় প্রকার পঞ্চরাত্র বেদ সমস্ত পুরাণ ইতিহাস ধর্ম্মশাস্ত্র ও সিদ্ধিযোগজ্ঞ শাস্ত্র দেখিয়া এবং শঙ্কর হইতে জ্ঞানলাভ করিয়া নারদ মুনি জ্ঞানামৃতস্বরূপ পঞ্চরাত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১।১।৫৯—৬।

অত্রত্য সিদ্ধিযোগজ্ঞ শব্দে তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ অভিপ্রেত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিবিধ শাস্ত্রের সংমিশ্রণে পঞ্চরাত্রের উৎপত্তি, সুতরাং ইহা পুরাণশ্রেষ্ঠ নামে তন্ত্র-নামে এবং বেদসার-নামেও অভিহিত হইয়াছে।

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের মতে তন্ত্রসংজ্ঞক পঁচিশখান পঞ্চরাত্রের নাম পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় বাচস্পত্য অভিধানে যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে পাঁচখান পঞ্চরাত্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাঁচখান পঞ্চরাত্র বাশিষ্ঠ নারদীয় কাপিল গৌতমীয় ও সনৎকুমারীয় নামে অভিহিত, এবং কৃষ্ণমাহাত্ম্য-পরিপূর্ণ বলিয়া কথিত।

"বাশিষ্ঠং নারদীয়ঞ্চ কাপিলং গৌতমীয়কম্।
পরং সনৎকুমারীয়ং পঞ্চরাত্রঞ্চ পঞ্চকম্।
পঞ্চকং পঞ্চরাত্রাণাং কৃষ্ণমাহাত্ম্য পূর্ব্বকম্॥"

নারদীয় পঞ্চরাত্রের বচনানুসারে বুঝা যায় যে, নারদের পূর্ব্বে ছয়খানা মাত্র পঞ্চরাত্রই বর্ত্তমান ছিল, পরে নারদ পঞ্চরাত্র প্রণীত হইলে পঞ্চরাত্রের সংখ্যা সাত হইয়াছে। এই তালিকায় বিপুল হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি অন্যান্য পঞ্চরাত্রেই নিহিত ছিল, পরে ইহা স্বতন্ত্রাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পঞ্চরাত্রকারদিগের তন্ত্রানুশীলনেরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তন্ত্রশাস্ত্রে বশিষ্ঠ কুলভৈরব নামে অভিহিত হইয়াছেন। গৌতমের গৌতমীয় এবং বৃহদ্-গৌতমীয় তন্ত্র অদ্যাপি তান্ত্রিক সমাজে সুপরিচিত, অধিকন্তু গৌতমীয় তন্ত্রে বিষ্ণুপাসনার পরিপাটী বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইনি তন্ত্রবোধোপযোগী একখানা তন্ত্রব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন, শারদা তিলকের টীকাকার প্রথিত-নামা রাঘবভট্টের সময়েও তন্ত্রব্যাকরণের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্ত্রকে অশ্লীল বলিয়া উপেক্ষা করিলে বৈষ্ণবের জ্ঞানালোক অথবা হিন্দুর উপাসনাকাণ্ড একেবারেই অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। যাঁহারা বাঁধা পুরাণের রীতি-অনুসারে হিন্দুশাস্ত্রের রিপোর্ট লিখিতে অভ্যস্ত তাঁহাদের কৃপায় হিন্দুর যাবতীয় শাস্ত্রেরই অদ্ভুত ব্যাখ্যা উদ্ভাবিত হইতেছে। বাঁধা পুরাণের কথাটা একবার খুলিয়া বলাই সঙ্গত, কারণ এ ব্যাপারটা সাধারণের পরিচিত নহে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে রঙ্গপুর প্রদেশেই এই প্রথা প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ব্যাপারটা এই—পুরাণ-পাঠককে কিঞ্চিৎ অর্থদান করা শ্রোতাদিগের কর্ত্তব্য, একথা সর্ব্বত্রই সুবিদিত। কথকগণ যে কোনও স্থানে পুরাণ-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন, সেখানেই নরনারীগণ তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থদান করিয়া থাকেন। ক্রমে ইহা নিঃস্বের অর্থপ্রাপ্তির উপায়রূপে বিবেচিত হইলে, অযোগ্য ব্যক্তি-গণও এই দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই—পুরাণ-পাঠ হইবে শুনিলেই নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক মনে করেন, কোন দরিদ্রের পোষণার্থ "রামবাবু বা শ্যামবাবু" তাঁহার বাটীতে পুরাণ পাতিয়াছেন, সুতরাং টাকা একটি পাঠাইয়া দেওয়া যাউক। ইহাতে শ্রোতা হয় না হয় কেবল টাকা, সুতরাং পুস্তক খুলিবার দরকার হয় না, একখানা জলচৌকির উপর পুস্তক রাখা হয়,

সামনে একখানা থালা থাকে, এই থালাতেই টাকা আদায় হয়, ইহার নাম বাঁধা পুরাণ। বর্ত্তমানকালীন অনেক রিপোর্টারের রিপোর্টও ইহারই অনুরূপ। ট্রেভেলিং পণ্ডিত পুস্তকের নাম ধাম সন তারিখ লিখিয়া দিল, আর খোদেকর্ত্তা নামমাত্রের সাহায্যেই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় অল্লাক্ষরে অদ্ভুতাকারে লিখিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া দিলেন।

যাহা হউক, বৈষ্ণব গ্রন্থের মধ্যে তন্ত্রের সংখ্যা যে নিতান্ত কম নহে, সে কথা তন্ত্রের আলোচনা না করিলে বুঝিবার উপায় নাই। অদ্যাপি বৈষ্ণব-সম্মত দীক্ষা তন্ত্রানুসারেই হইয়া থাকে। কাহার পক্ষে কোন্ মন্ত্র অনুকূল ও প্রতিকূল এই বিচারোপযোগী চক্রের মধ্যে কতকু চক্র কেবল বৈষ্ণবের জন্য নির্দ্ধারিত দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তিতন্ত্রেও বিষ্ণুর সম্পর্ক এবং প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং বৈষ্ণবের সহিত তন্ত্রের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, একথা বলা যাইতে পারে। হিন্দুর সহিত তন্ত্রের সম্পর্ক মৌলিক কি আগন্তুক, এই বিষয়ের বিচারও মীমাংসা তন্ত্র না পড়িলে বুঝিবার উপায় নাই।

বৈষ্ণবের প্রধান শাস্ত্র পঞ্চরাত্র, পঞ্চরাত্রেও তন্ত্রের ভাগ প্রভূত মাত্রায় রহিয়াছে, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পঞ্চরাত্র গ্রন্থ হিন্দুধর্ম্মের উপাসনা কাণ্ডে প্রধান অবলম্বন বলিয়া উল্লেখযোগ্য। স্থূলোপাসনার প্রধান অঙ্গ মূর্ত্তিনির্ম্মাণপদ্ধতি পঞ্চরাত্রে যেরূপ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তেমন অন্যত্র প্রায় দেখা যায় না। হয়ত মূর্ত্তির কথা শুনিয়াই অনেকে ইহাকে আধুনিক আগন্তুক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং প্রসঙ্গত এই কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে হিন্দুর মূর্ত্তিতত্ত্ব বেদসম্মত, বেদের ব্রাহ্মণভাগে প্রতিমার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্ভুত ব্রাহ্মণ এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠাকার্য্যেও বৈদিক মন্ত্র পঠিত হইয়া থাকে। পঞ্চরাত্র গ্রন্থে প্রতিষ্ঠা-পদ্ধতি অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

উপসংহারে ইহাও বক্তব্য যে, হিন্দুর অন্যান্য সম্প্রদায় যেমন বেদনিয়ন্ত্রিত, মৌলিক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ও তেমনই বেদনিয়ন্ত্রিত। সুতরাং বেদবিরুদ্ধ আচরণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরও সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

বন্দী-পুত্র

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

(১)

কোটা সহরের ঈশ্বর সিংহের দোকানে প্রত্যহ অনেক সম্ভ্রান্ত রাজপুত সমবেত হইত। তাহার কারণ ঈশ্বর সিংহ স্বয়ং ক্ষত্রিয়—হারাবংশীয় বীর। পূর্ব্বে কোটার সৈন্যদলে সে অনেক সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছিল। এখন সে বৃদ্ধ, খঞ্জ। তাই যুদ্ধ-ব্যবসায় ছাড়িয়া সে সহরে দোকান খুলিয়াছিল। দোকানের একদিকে ফল বিক্রয় হইত, অপর দিকে ফুল বিক্রয় হইত। মধ্যে বসিবার বৈঠক। বড় বড় সৈনিকেরা সেই মজলিসে বসিয়া তামাকু সেবন করিত, পান আতর ও ফুলের মালা গ্রহণ করিত, আর গল্প করিত।

সে বহুদিনের কথা। সম্বৎ ১৮০০ সাল। অম্বরাধিপতির মৃত্যু-সংবাদে রাজপুতানায় নানা লোকের প্রাণে নানা রকমের আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল। বুঁদিরাজ বুধসিংহের ত্রয়োদশবর্ষীয় কুমার ওমেদা বীর বুঁদির কেল্লায় পঞ্চবর্ণের অম্বর-কেতনের পরিবর্ত্তে হারাবংশীয় ধ্বজা উড়াইবার জন্য বুঁদির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। মাতৃভূমি-উদ্ধারের জন্য দলে দলে হারাবংশীয় রাজপুত তাঁহার সহিত মিলিত হইতেছিল। সবাই বুঁদির অধিষ্ঠাত্রী দেবী আশাপূর্ণার নিকট বর চাহিতেছিল—মাতৃভূমি উদ্ধার করিয়া হারাবংশের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করিবার জন্য তাঁহারা উন্মত্ত হইয়াছিল।

ঈশ্বর সিংহের দোকানে বসিয়া দুইজন সেনাধ্যক্ষ গল্প করিতেছিল। প্রথম সেনাধ্যক্ষ বলিল—কথাটা গোপনীয়, কিন্তু বংশের টান বিষম টান।

তাহাদের অব্যবহিত দূরে বসিয়া ওমরা ফুলের মালা গাঁথিতেছিল। বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা—মুখে বেশ লাবণ্য—চক্ষে প্রগাঢ় বুদ্ধিমত্তার চাহনী ; তবু ওমরা খোঁড়া ঈশ্বর সিংহের ক্ষুদ্র দোকানে কর্ম্ম করিত। তিন মাস পরিশ্রম করিয়া সে বৃদ্ধ ঈশ্বরকে বিষম স্নেহের ডোরে বাঁধিয়াছিল। আর না বাঁধিবে কেন ? এ তিন মাস বৃদ্ধ কেবল গল্প করিয়াছে, তামাকু সেবন করিয়াছে আর সিদ্ধি ঘুঁটিয়াছে। দোকানের সকল কাজ ওমরা করিত। তাই সিদ্ধির নেশায় বিভোর হইয়া ঈশ্বর এক একবার ভাবিত—ওমরা যদি বৈশ্য না হইয়া রাজপুত

হইত তাহা হইলে তাহার হস্তে অপর্ণাকে সমর্পণ করিতাম। হায়! হায়! এমন যুবক হারাবংশে না জন্মিয়া বৈশ্যবংশে জন্মিল কেন?

ওমরা আপন মনে মালা গাঁথিতেছিল। আগন্তুক সেনাধ্যক্ষদ্বয়ের জন্য মালা গাঁথিতেছিল। কথাটা বলিয়া প্রথম সেনাধ্যক্ষ একটু সন্দেহের সহিত ওমরার দিকে চাহিল। ওমরার সে দিকে লক্ষ্য ছিল না।

ঈশ্বর সিং বলিল—বুঝেছি সরদার সাহেব। মুখে ভাব না রাখলে অম্বরের হাতে রক্ষা নাই। কিন্তু তা ব'লে রক্তের টান—

দ্বিতীয় সরদার ওষ্ঠের উপর তর্জ্জনী রাখিয়া ঈশ্বরকে কথা কহিতে নিষেধ করিল।

তাহারা তিন জনেই ওমরার দিকে চাহিল। সে মালা গাঁথিতেছিল। অন্যদিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। ঈশ্বর সিং হাসিয়া বলিল—ও ভাল লোক, বেনের ছেলে। ও এসব কথা বুঝবে না।

প্রথম সরদার বলিল—সাত দিনের মধ্যে পাঁচ হাজার লোক নিয়ে আমরা একেবারে বুঁদির ফৌজের সঙ্গে মিশ্‌ব।

ওমরার দৃষ্টি ছিল ফুলের উপর, কিন্তু সে ফুল বিঁধিতে গিয়া নিজের অঙ্গুলি সূচিকাবিদ্ধ করিল। তাহার বামহস্ত ঈষৎ স্পন্দন করিতেছিল; তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না।

দ্বিতীয় সরদার বলিল—এখন একেবারে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হ'লে অম্বর আমাদের বাধা দেবে। কোটা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হ'লে আর বুঁদির সাহায্য করব কেমন করে?

ঈশ্বর বলিল—ঠিক কথা। আমাদের মহারাজের খুব বুদ্ধি।

প্রথম সরদার বলিল—বুঁদি কোটা এক। উভয়েই হারাবংশী; হারাবংশীকে হারাবংশী না রাখ্‌লে কে রাখ্‌বে?

একথা সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া পরিগণিত হইত। বাদামের সরবতে মিশ্রিত সিদ্ধি পান করিয়া হারাবংশীয় বীরত্রয় অনেক বংশমহিমা কীর্ত্তন করিল। মোগল-দাস অম্বরাধিপতির অনেক নিন্দাবাদ হইল। কবে কোন্‌ পথে কোটার ফৌজ বুঁদির দিকে অগ্রসর হইবে সে সকল কথার আলোচনা হইল। ওমরা আপন মনে মালা গাঁথিতেছিল। ঈশ্বর সিং এক একবার বক্রদৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া মনে করিল—হায় রে হিসাবী বেনিয়া এসব কথায় যে কত সুখ তা বুঝতে পারলি নি!

কিন্তু পরদিন যখন অজ্ঞাতকুলশীল ওমরা অদৃশ্য হইল তখন তাহার মনে সন্দেহ হইল। বৃদ্ধ আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার কথা কাহাকেও বলিতে পারিল না। মনকে প্রবোধ দিয়া বলিল,—ওমরা অম্বরের গুপ্তচর হইলে নিশ্চয় প্রকাশ পাইত। রাজপুত হইলে কথাবার্ত্তায়, চালচলনে তাহার জাতীয়তা ব্যক্ত হইত।

(২)

ঠিক্ তৃতীয় দিবসে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে যখন কোটারাজের রাজ্যের মধ্যে অম্বরসেনার দামামা-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। সহরময় সোরগোল উঠিল যে, অম্বর সেনা কোটা আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তখন বৃদ্ধ ঈশ্বর সিংহ শিরে করাঘাত করিতে লাগিল। জননী জন্মভূমির মুখের দিকে চাহিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতেছিল। তাহারই অবিমৃষ্যকারিতায় আজ তাহার জননী উদ্ধত রাঠোরের লাঞ্ছনা সহ্য করিতেছিল। তাহারই দোষে আজ অম্বরসেনা বিনা প্রতিরোধে সহরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সহরে 'সাজ সাজ' রোল পড়িয়া গিয়াছিল। সকলে নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র বাহির করিতেছিল, অশ্ব সজ্জিত করিতেছিল। দুর্গের মধ্যে মহাসমারোহ পড়িয়া গিয়াছিল। রাজা সজ্জিত হইতেছিলেন, স্বদেশ-রক্ষার জন্য প্রাণদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ সুসজ্জিত চমূর আক্রমণ প্রতিরোধ করা সহজ ব্যাপার নহে। হারাবংশীয় বীরগণ তাহা বুঝিয়াছিল।

বৃদ্ধ অনেক চিন্তা করিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিল। ধীরে ধীরে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—অপর্ণা মাই। অপর্ণা। অপর্ণা মাই।

স্মিতমুখে অপর্ণা আসিয়া বলিল—কি বাবা!

বৃদ্ধ একবার সে দেবীমূর্ত্তি দেখিল। মাতৃহীন শিশুকে মাতৃস্নেহে পালন করিয়া বীর ঈশ্বর সিংহ তাহাকে এত বড় করিয়াছিল। ষোড়শী অপর্ণার সুললিত দেহের দিকে চাহিয়া, তাহার সেই স্নেহের হাসিতে মুগ্ধ হইয়া বৃদ্ধ বীর বুকের ভিতর একটু দুর্ব্বলতা অনুভব করিল। সহরের ভীম কোলাহল তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছিল। সে মুহূর্ত্তের জন্য দুইটী চিত্র দেখিল—শত্রুর অস্ত্রাঘাত-ক্লান্ত স্বদেশ, আর অসহায়া কন্যা। মুহূর্ত্তের জন্য স্নেহের মোহ তাহাকে কুমারীর দিকে টানিল। সে কন্যার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিল না।

অপর্ণা আবার বলিল—কি বাবা!

বৃদ্ধ বলিল—অম্বর কোটা আক্রমণ করতে আসছে।

অপর্ণা বলিল—হ্যাঁ তা' ত শুনছি। তা' বাবা আমরা ওদের তাড়াতে পারব না?

বৃদ্ধের হস্তপদ কঠিন হইল। চক্ষে জ্যোতিঃ ফিরিল। সে বলিল—"মার কৃপায় তা' পারব মা। কিন্তু কোটার এ বিপদ্ আমার জন্যে।"

"তোমার জন্যে?" অপর্ণা বড় বিস্ময়ে পিতার মুখের দিকে চাহিল।

বৃদ্ধ বলিল—ওমরা পালিয়েছে।

কন্যা বলিল—হ্যাঁ তা' ত জানি।

"সে বেনিয়া নয়, রাজপুত।"

অপর্ণার মুখ গম্ভীর হইল। নিম্নোষ্ঠ ঈষৎ কাঁপিল। অমন কান্তমূর্ত্তি, অত বলিষ্ঠ দেহ, চক্ষের অমন লাবণ্য, অমন তেজ ক্ষত্রিয়েরই শোভা পায়। একথা পূর্ব্বে অনেকবার অপর্ণা ভাবিয়াছে। তাই সে বিস্মিত হইল। তাই তাহার ওষ্ঠে সামান্য স্পন্দন অনুভূত হইল, তাই অতি ক্ষীণ—বহুদূরে আকাশের শেষে ক্ষীণ বিদ্যুতের রশ্মির মত—অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট একটা আশার রেখা উঠিয়াই মিলিয়া গেল।

বৃদ্ধ বলিল—কি নিমকহারাম! কি শয়তান! তাকে পুত্রের মত স্নেহ করলাম। শেষে সে কি দাগা দিলে! উঃ!

বৃদ্ধ শিরে করাঘাত করিল। কুমারী বিস্মিত হইল। বৃদ্ধ বলিল—এখন বুঝা যাচ্চে সে অম্বরের গুপ্তচর। আমার দোকানে মজলিস হয় বলেই সে আমার চাকুরী গ্রহণ করেছিল। আমরা গোপনে বুঁদির কুমারকে সাহায্য করতে যাবার বন্দোবস্ত করছিলাম। সে কথা সে শুনে গিয়ে দেশ থেকে ফৌজ এনেছে—আমাদের দেশ অবরোধ করবে। হায় হায়! আমার জন্যেই বোধ হয় এই রক্তপাত হ'ল।

বৃদ্ধের চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। অপর্ণার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল, সে সহানুভূতির ক্ষীণ রেখাটুকু গভীর ঘৃণার জ্বলন্ত চিত্রে ফুটিয়া উঠিল। কি বিশ্বাসঘাতকতা! কি নীচ ব্যবহার! বৃদ্ধ বলিল—মা প্রায়শ্চিত্ত করব। তলোয়ার হাথিয়ার যা' কিছু আছে বার করে দে। যদি ভিড়ের মধ্যে দেখতে পাই তো নিজের হাতে সেটার গলা কাটব।

পিতার সহিত কন্যার অনেক তর্ক হইল। পিতা বৃদ্ধ, অঙ্গহীন। তাহার ---- ---- বৃথা। গুপ্তচরের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য প্রকৃতপক্ষে কেহই দায়ী

হইতে পারে না। সে অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার জন্যই তাহাদের দেশে বাস করিতেছিল। সহরের মধ্যে তাহার মত অন্য গুপ্তচর ছিল কি না তাহা কে বলিতে পারে? কোন্ দূতের অনুগ্রহে আজ তাহাদের মাতৃভূমি বিপন্ন তাহার কোন প্রমাণ নাই। জীবনদান করিয়া বৃদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিলে আর দেশের কি মঙ্গল হইবে? অপর্ণা কন্যা না হইয়া যদি পুত্র হইত তাহা হইলে সে অম্বর দূতের শাস্তির বিধান করিতে পারিত।

সহরের কলরব ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছিল। উভয় পক্ষের কাড়া-নাকাড়ার শব্দ ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। শত্রু সহরের সন্নিকটে আসিয়াছিল।

বৃদ্ধ বলিল—মা হারাবংশের মেয়ে হ'য়ে কেন এমন কথা বলছিস্ বেটি। যেতে দে—বুড়াকে যেতে দে।

মন্ত্রের শক্তি বিষম শক্তি। হারাবংশ কথাটায় কোটা বুঁদির রাজপুত নরনারীগুলা যেন ক্ষিপ্ত হইত, স্নেহ-মমতা সব ভুলিত। একটা অদৃশ্য দেবতার কঠোর আজ্ঞা শুনিত।

কন্যার চক্ষে জল আসিল। সে বৃদ্ধ পিতাকে আলিঙ্গন করিল। অসহায় শিশুকে জননী যেমন স্নেহভরে চুম্বন করে, সেই রকম স্নেহে যোল বছরের বালিকা যাট বছরের বুড়াকে চুম্বন করিল, তাহার কেশহীন শিরে নিজের কোমল কপোল রাখিল, তাহার শিরা-উপশিরা শোভিত কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল—বাবা জিতে আস্‌বে? আবার এসে আমায় কোলে নেবে? আমার চুম্বন নেবে?

ভীষণ রোল উঠিল। শত্রু সহরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কোটায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বৃদ্ধ স্নেহের বাঁধন ছিঁড়িয়া রাজপথে নির্গত হইল। রাজপুত কুমারী যুদ্ধ দেখিবার জন্য প্রাসাদ-শিখরে উঠিল।

(৩)

কোটার সৈন্য প্রস্তুত ছিল না। তাহারা সাজিতে সাজিতে বন্যার জলের মত অম্বর-সেনা সহরের মধ্যে প্রবেশ করিল। স্থলে স্থলে দল বাঁধিয়া কোটার লোক তাহাদিগের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহাতে সে সুসজ্জিত সেনার পরাজয় হইল না। তাহারা চারিদিকে সহরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। কেল্লার দিকে অগ্রসর হইল। সে জনতার মধ্যে অপর্ণা পিতার কোন সন্ধান পাইল না। সে জনসমুদ্রের মধ্যে কে কোথায় মিশিয়াছিল কে বলিতে পারে?

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছিল। তিনজন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে তাহাদের গৃহের দিকে আসিতেছিল। সকলেই সুসজ্জিত একজনের হস্তে অম্বরের পাঁচ রঙ্গের কেতন।

বিস্মিতা অপর্ণা প্রাসাদ-শিখর হইতে নীচে নামিয়া আসিল। প্রথম দুইজন অশ্বারোহী প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়াছিল। তৃতীয় ব্যক্তি ঘোড়া ধরিয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। অপর্ণা দেখিল প্রথম অশ্বারোহী তাহাদের দোকানের ভৃত্য ওমরা। আজ ওমরা বহুমূল্য বস্ত্রে সজ্জিত। শিরে বহুমূল্য উষ্ণীষ তাহাতে মতি হীরা ঝলসিতেছিল। এমন কি তাহার পাদুকায় বহুমূল্য সুবর্ণসূত্রের কারুকার্য্য। অপর্ণাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে ওমরা অভিবাদন করিল। একটা অব্যক্ত পাশবিকভাবে তাহার চক্ষুর্দ্বয় ঝলসিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া অপর্ণা বিস্মিত হইল বটে, কিন্তু ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতেছিল। সে অন্য-মনস্কভাবে বলিয়া উঠিল—ওমরা!

ওমরা আবার অভিবাদন করিয়া বলিল—ক্ষমা করবেন। ওমরা বেনিয়া মরিয়াছে। আমি বহুদিন সরদার কেশর সিং—অম্বরাধিপতির একজন সেনা-নায়ক। আর ইনি আমাদের কুল-পুরোহিত। সৈনিকের বেশে থাকলেও ইনি ব্রাহ্মণ।

আগন্তুক প্রৌঢ়। কেশর সিংহ বিংশতি বয়স্ক যুবক। অপর্ণার সফরী-নেত্রে সে পশুরূপে প্রতিভাত হইলেও প্রকৃতপক্ষে কেশর সিংহ সুপুরুষ। আপাততঃ তাহার চক্ষে একটা পশুভাব খেলিতেছিল।

অপর্ণা বলিল—দূর হও কাপুরুষ। গুপ্তচর—পশু—আমার পিতার সর্ব্বনাশ করেছ, দেশের সর্ব্বনাশ করেছ—

বাহিরে ভীষণ কোলাহল হইতেছিল। কেশর সিংহ সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিল—কিন্তু তুমি আমার কি সর্ব্বনাশ করেছ জান, অপর্ণা? তোমার দেশ জয় করতে এসে আমি নিজে তোমার কাছে পরাজিত—

অপর্ণার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। সে পাদুকা খুলিয়া কেশর সিংহের বক্ষে নিক্ষেপ করিল। কেশর সিংহ নিমেষের জন্য জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু তখনই আত্ম-সংযম করিয়া বলিল—স্বাভাবিক। রাজপুত-কন্যার পক্ষে স্বাভাবিক—

অপর্ণা বলিল—তুমি নিশ্চয় বৈশ্য। রাজপুতের পক্ষে স্ত্রীলোকের পাদুকা-ঘাত সহ্য করা অস্বাভাবিক—কুক্কুর দূর হও।

তাহাতেও কেশর সিংহ আত্ম-বিস্মৃত হইল না। তিন মাসের সঞ্চিত কামে

সে জর্জ্জরিত হইয়াছিল। সে বলিল—শুন অপর্ণা বাই, দেশ জয় করলে যোদ্ধৃগণ কুমারীহরণ করে। যে সব রাজপুতানী সুবিধা পায় তারা আগুনে পুড়ে মরে। তোমার সে সুবিধা নাই। আমি তোমার পরকাল নষ্ট করতে চাই না। তোমায় ধর্ম্মবিবাহ করব, তাই পুরোহিত এনেছি।

ধীরে ধীরে বিপদের মাত্রাটা অপর্ণার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। বীরের মত তাহার অসীম সাহস থাকিলেও ললনা অপর্ণা শিহরিয়া উঠিল। সে বলিল—ছিঃ ছিঃ রাজপুত হয়ে তুমি এ কথা বলছ? আমি তোমার—

পশুবিক্রমে পাষণ্ড কেশর তাহার মুখ টিপিয়া ধরিল। পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিল। অপর্ণা বিধিমতে সে পিশাচদ্বয়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে যুবকের সহিত বল-পরীক্ষায় অতি অল্পলোক বিজয় কামনা করিতে পারিত। রাজপথে উভয় পক্ষে সংগ্রাম চলিতেছিল। মিশ্র কলরবে কোটা সহর পূর্ণ হইয়াছিল। সেই কলরবে পুরোহিত বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ করিল। নরাধম কেশর সিংহ অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা যুবতীর সিঁথিতে সিন্দুর লেপন করিল। তাহার পর কামান্ধ পশু যুবতীকে ক্রোড়ে তুলিয়া বাসর-গৃহে লইয়া গেল। পুরোহিত বাটীর বাহিরে চলিল।

(৪)

তখন সূর্য্যাস্ত হইয়াছিল। হারাবংশীয় রাজপুতের দল আক্রমণের প্রথম প্রকোপটা সহ্য করিয়া ক্রমে দল বাঁধিতে সমর্থ হইয়াছিল, সশস্ত্র হইয়া অম্বর-সেনার সহিত যুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যত বেলা বাড়িতে লাগিল, কোটার রাজপুত তত বেশী বিক্রম দেখাইতে লাগিল। সূর্য্যাস্তের সময় হইতে অম্বর-সেনা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

সারাদিন রণস্থল ছাড়িয়া কঠোর রাঠোর-কুলের কাপুরুষ কেশর সিংহ পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ঈশ্বর সিংহের বাটিতে লুকায়িত ছিল। একটি বিশ্বস্ত দূত অশ্ব ধরিয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। পুরোহিত প্রথমেই পলাইয়াছিল।

কেশরের অনুচর যখন দেখিল, আর সেস্থলে অপেক্ষা করা যুক্তিসিদ্ধ নহে, তখন সে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া প্রভুর বাসরগৃহের দ্বারে করাঘাত করিল। কেশর সিং বাহিরে আসিয়া তাহার মুখে সমস্ত কথা শুনিল। লম্পট হতবুদ্ধি হইয়া ধীরে ধীরে উষ্ণীষ খুলিল, বহুমূল্য পরিচ্ছদ খুলিল, পাদুকা খুলিল। তাহার পুরাতন পোষাক পরিধান করিল। তাহার পর কোন কথা না বলিয়া

অশ্বারোহণে গুপ্তপথ দিয়া পলায়ন করিল। পূর্ব্বে সে কখনও এরূপ পলায়ন করে নাই।

আর অপর্ণা! ভূমিলুণ্ঠিতা অপর্ণা অম্বরসেনার পরাজয়ের কথা শুনিল, পিশাচকে গৃহ ছাড়িয়া পলাইতে দেখিল, তবু তাহার প্রাণে তিলমাত্র হর্ষ উদয় হইল না। সে আপনার কথা ভাবিবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু ভগবান যেন তাহার চিন্তাশক্তিটুকুও কাড়িয়া লইয়াছিলেন। উঃ রাজপুত-রমণীর পক্ষে কি ঘৃণার কথা! কি লজ্জার কথা! তখনই সে মরিতে পারিল না কেন? সেদিন প্রত্যুষে মনের মধ্যে কত ভাব, কত আশা লইয়া কত আনন্দে সে শয্যাত্যাগ করিয়াছিল, আর এখন সে ভূমে লুটিতেছিল—প্রাণে আশা নাই, হৃদয়ে উদ্দীপনা নাই, লোকসমাজে তাহার স্থান নাই, বোধ হয় পরকালেও তাহাকে এই ভাবে ঘৃণিতা উপেক্ষিতা অস্পৃশ্যা হইয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। সে এক একবার ভাবিল, পিশাচ ধর্ম্মবিবাহ করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল। ধর্ম্মবিবাহ! কাহার ধর্ম্ম! পিশাচের ধর্ম্ম! উঃ কি যন্ত্রণা! কি আত্মগ্লানি! লক্ষ উপায়ে প্রাণ বাহির হইতে পারে, তাহার লক্ষ উপায়ের একটা উপায়ও মিলিল না কেন? সে আপনাকে লাঞ্ছিতা ঘৃণিতা নারকী বলিয়া বিবেচনা করিল। কোটার ভাবনা ভাবিতে পারিল না। পিতার ভাবনা—

এবার যুবতী উঠিল। তাহার দেহে বল আসিল। তামসিক ভাব কাটিয়া গেল, ক্ষত্রিয়সুলভ রাজসিক ভাবে যুবতী অনুপ্রাণিত হইল। মোহ-ঘোরটা কাটিয়া গেল, এবার তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ছিঃ ছিঃ! যদি বৃদ্ধ পিতা বাঁচিয়া থাকে, যদি পিতা এখনই ঘরে ফিরিয়া আসে। কেমন করিয়া সে হারাবংশীয় বীরের নিকট আপনার কলঙ্ক-মলিন মুখ দেখাইবে। তাহার পূর্ব্বেই কি প্রায়শ্চিত্ত বিধেয় নহে? কিন্তু গৃহে না বাহিরে? যুবতী অনেক কাঁদিল। শেষে স্থির করিল এ পাপ মাংস-পিণ্ডটা এ গৃহে ফেলিয়া পিতৃভবন অপবিত্র করিবে না। অম্বরের পিশাচ যে দেহ নষ্ট করিয়াছে সে দেহের শেষ আস্বাদন, কোটার শৃগাল-কুক্কুরের প্রাপ্য। অপর্ণা অন্ধকারের ভিতর দিয়া বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হইল।

(৫)

বৃদ্ধ গুপ্তপথ দিয়া একেবারে কোটার কেল্লার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। তখন অম্বরসেনা মাত্র কোটার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। সেখানে

সজ্জিত বাহিনীর সহিত মিশিয়া দ্বিপ্রহরে অম্বরসেনার সম্মুখীন হইয়াছিল। কিন্তু একে খঞ্জ তাহার উপর বৃদ্ধ, ঈশ্বর সিংহ প্রথম যুদ্ধেই আহত হইয়া পথের ধারে পড়িয়াছিল। সে আর সেস্থল হইতে উঠে নাই। রণক্ষেত্রে মরিবার সময় সে অর্পণার হাসিমাখা কোমল মুখখানি ধ্যান করিয়াছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর মরণকে ডরায় নাই। সে চিরকাল ঐরূপ মরণ আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল। আজ গৌরবে ভূষিত করিয়া বিশ্বজননী তাহাকে আপনার ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। মরণকালে বৃদ্ধের অধরে হাসি আসিয়াছিল, মৃতদেহে সে হাসিটুকু প্রকটিত ছিল। পুণ্যের হাসি—গৌরবের হাসি—যমরাজের প্রতি উপেক্ষার হাসি!

রাজপথসকল মৃতদেহে পূর্ণ ছিল। কোন শবের মুখে ভ্রূকুটি, কাহারও মুখে বেদনার চিত্র। কেহ নরকের ভাব মুখে লেপিয়া মরিয়াছিল, কেহ মরিবার সময় স্বর্গীয় হাসি হাসিয়াছিল—কাহারও মুখে বেদনার স্পষ্ট লক্ষণ, কাহারও মুখে ভীতির নিশানা। পথে ধূলি ছিল না, ক্ষত্রিয়রক্তে রাজপথ সিঞ্চিত হইয়াছিল। ক্ষিপ্তা অপর্ণা সেই রাজপথে ছুটিতেছিল। শবের ভ্রূকুটি, আহতের আর্ত্তনাদ তাহাকে পীড়িত করিল না। সে আপনার ভাবে বিভোর ছিল। কত তস্কর মৃত সৈনিকের দেহ হইতে অলঙ্কার চুরি করিবার জন্য শৃগাল-কুক্কুরের সহিত শব লইয়া টানাটানি করিতেছিল, অপর্ণা তাহা দেখিল না। সে অন্যমনে ছুটিতেছিল। এক অদৃশ্য শক্তি তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছিল। অকস্মাৎ ঈশ্বর সিংহের মৃতদেহের নিকট আনিয়া সেই অদৃশ্য শক্তি তাহার গতিরোধ করিল। দক্ষিণ পার্শ্বে চাহিয়া তারার আলোকে যুবতী পিতাকে চিনিল। ক্রোড়ের উপর তাহার মৃতদেহ রাখিয়া পিতার অধরে সে বারম্বার চুম্বন করিল। যুদ্ধে পাঠাইবার সময় সে পিতাকে বলিয়াছিল সে ফিরিলে তাহাকে চুম্বন করিবে।

তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ঈশ্বর সিংহের চিতার অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহার পার্শ্বের চিতা সজ্জিত ছিল, তাহাতে কোন শব ছিল না, চিতা তখনও প্রজ্বলিত হয় নাই। স্থিরদৃষ্টিতে অপর্ণা পিতার চিতার দিকে তাকাইয়াছিল।

কে তাহার মরিবার অধিকার অস্বীকার করিবে? তাহার মরণে ধরিত্রীর ভার লঘু হইবে, হারাবংশের কলঙ্ক ঘুচিবে, হিন্দুধর্ম্মের মর্য্যাদা বাড়িবে। কিন্তু আজ কি তাহার মরিবার দিন? সে আপনাকে হত্যা করিতে পারে কিন্তু নির্দ্দোষ শিশুকে পৃথিবী দেখিবার পূর্ব্বেই কি তাহার হত্যা করিবার অধিকার আছে?

সে পাপিয়সী কলঙ্কিনী, কিন্তু শিশু তো নির্দ্দোষ, সে তো কোন পাপ করে নাই। পিশাচের শিশু! কিন্তু পিশাচ-শিশুকে মারিবার অধিকার কি অপর্ণার আছে? উঁহু! কিন্তু শিশু জারজ—না না জারজ কেমন করিয়া? ধর্ম্মবিবাহ হইয়াছিল—কেশরের পৈশাচিকতার মধ্যে প্রাণ ছিল। ধর্ম্মবিবাহের শিশু—ক্ষত্রিয়-সন্তান, রাজপুত-শিশু। কিন্তু বাস্তবিক কি শিশু গর্ভে আছে। সে নির্জ্জন স্থলেও অভাগিনী লজ্জিতা হইল। নিঃসন্দেহ—অন্ততঃ অপেক্ষা করিতে দোষ কি? না আজ না। মরণ তো মুহূর্ত্তের কাজ। বিলম্বে দোষ কি? শিশুর রাঠোরের মত কঠোর মুখ হইবে না হারাবংশীয় তেজস্বিতায় শিশুর মুখ উদ্ভাসিত হইবে, সে তর্কের চাক্ষুষ মীমাংসাই শ্রেয়ঃ।

ঈশ্বর সিংহের চিতার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে অপর্ণা আবার অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গেল।

(৬)

বাত্তোয়ারার যুদ্ধ! কোটার ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকিবে। কোটার প্রসিদ্ধ বীর জালিম সিংহের সেই দিন হইতে খ্যাতি। বহুদিন ধরিয়া অম্বরাধিপতি কোটা ও বুঁদির নিকট হইতে কর গ্রহণ করিত। কিন্তু বাত্তোয়ারে চিরদিনের জন্য কোটার হারাবংশীয়দিগের উপর অম্বরের আধিপত্য লোপ পাইয়াছিল।

জঙ্গ বাত্তোয়ারো জিত
তারা জালিম ঝালা
রিঙ্গা এক রঙ্গ ছোড়া
রঙ্গ পঞ্চরঙ্গ্ কা।

"জালিম ঝালার সৌভাগ্য-তারকা বাত্তোয়ারের যুদ্ধ জয় করিবার পর উদিত হইয়াছিল। তিনি অম্বরের পাঁচ রঙ্গা কেতন এক রঙ্গে রঞ্জিত করিয়াছিলেন"—অর্থাৎ শোণিতসিক্ত করিয়াছিলেন। ১৮০০ সম্বতে কোটা বুঁদির জন্য লড়িয়াছিল; তাহা পূর্ব্ব কয়েক অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে বাত্তোয়ারে কিন্তু বুঁদি কোটার জন্য যুদ্ধ করিল না। ফলে কোটা হইতে অম্বর-প্রভাব লুপ্ত হইল। বুঁদি সম্যক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিল না।

বাত্তোয়ারের যুদ্ধে অম্বর-সেনা প্রাণপণ করিয়া লড়িতেছিল। এখন সর্দ্দার কেশর সিংহের পদমর্য্যাদা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে প্রাণপণে যুঝিতেছিল, সাধারণ সৈনিকের মত লড়িতেছিল।

আর এক সপ্তদশ বর্ষীয় যুবক কোটার পক্ষে তাহার সম্মুখে যশ অর্জ্জন করিতেছিল। কি তেজদীপ্ত কলেবর, কি অস্ত্রচালনা। অথচ যুবক সাধারণ সৈনিক। দ্রুত অশ্বচালনা করিয়া সেনানায়ক যুবকের দিকে ছুটিল। অপর সৈনিকগণ সরিয়া গেল। সমর-প্রাঙ্গণের একদিকে সেনানায়কের সহিত এই সাধারণ সৈনিকের যুদ্ধ চলিতে লাগিল—উভয়েই বীর, উভয়েই অস্ত্রনিপুণ।

কেহ কাহারও গাত্র স্পর্শ করিতে পারিল না। উভয়েই ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর, উভয়েই হাঁপাইতেছিল। কেশর সিংহ হাত তুলিল—উভয়েরই বিশ্রামের প্রয়োজন। ক্ষণকালের জন্য অস্ত্রচালনা বন্ধ হইল।

কেশর সিংহ বীরের দিকে চাহিল। তাহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। সে মুখ তাহার পরিচিত। সে মুখ সে অনেক দিন খুঁজিয়াছে ছদ্মবেশে কোটার কুটীরে কুটীরে ঘুরিয়াছে, সে মুখের সন্ধান পায় নাই। সে অনিমেষ লোচনে বালকের উষ্ণীষের দিকে চাহিল, তাহার পাদুকার দিকে চাহিল। এ উষ্ণীষ, এ পাদুকা কোটার কোন সৈনিকের ছিল না। সে চিনিল এ দুইটা পদার্থ তাহারই। তাহার প্রাণে দারুণ সন্দেহ হইল।

যুবক বলিল—আসুন, সর্দারজি আরম্ভ করি।

কণ্ঠস্বর পরিচিত। সর্দারের সন্দেহ রহিল না। তাহার হৃদয় সজোরে স্পন্দিত হইতেছিল। সে বলিল—মহাশয়ের নাম?

যুবক হাসিয়া বলিল—অধীন সামান্য সৈনিক মাত্র। মহাশয় সর্দার। আসুন বিলম্বে কাজ নাই।

সর্দার বলিল—যদি আমার কথার উত্তর দাও, বিনাযুদ্ধে বন্দী হব।

যুবক আশ্চর্য্য হইল। সে বলিল—এত বড় যোদ্ধা ভীত—

সর্দার বলিল—বিষম ভীত। এই তরবারি ফেল্‌লাম। তুমি কার সন্তান?

এ কথায় যুবক বড় বিব্রত হইত। সে বিরক্ত হইল। পিতৃ-পরিচয় সে জানিত না। মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলে মাতা রোদন করিত, বলিত একদিন বলিব। যুবক বলিল—কথায় কাজ নাই, যুদ্ধ করুন।

সে অসি খুলিল। সর্দার বলিল—বুঝলাম পিতৃ-পরিচয় দিবে না। যদি স্বীকার কর, নিজের সেনাপতির কাছে নিয়ে যাবার পূর্ব্বে বন্দীকে তোমার গৃহে তোমার মাতার সম্মুখে নিয়ে যাবে—তাঁর আশীর্ব্বাদ নিয়ে তার পর আমাকে কোটা-রাজের হাতে সমর্পণ করবে তা' হলে এখনি বন্দী হ'ব।

যুবক এত কথা বুঝিল না। তবে এত বড় সর্দারকে বন্দী করিয়া সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিলে তাহার পদোন্নতি হইবে, সে গৌরব লাভ করিবে, তাহা সে বুঝিতেছিল।

চতুর কেশর সিংহ যুবকের মনের ভাব বুঝিল। সে তাহাকে প্রলোভিত করিবার জন্য বলিল—শুন বালক! একবার বিবেচনা কর। কেশর সিংহকে বন্দী কর্‌বার গৌরব বড় সামান্য নয়।

কেশর সিংহের নাম শুনিয়া যুবক চমকিত হইল। তাহার যশোগাথা হারা-শিবিরেও গীত হইত। উঃ কি লোভ! কি সৌভাগ্য! মাতা তো মাত্র পাঁচ ক্রোশ দূরে কুটীরে অবস্থান করিতেছিল। সে মাতার মুখে অতি অল্প সময়ই হাসি দেখিয়াছে। আজ এ বন্দীকে গৃহে লইয়া গেলে সে নিশ্চয় বিষাদিনীর মুখে হাসি দেখিবে হয়ত নিজে সর্দার হইবে। উচ্চাশা তার তরুণ কর্ণে বীণা বাজাইতেছিল। সে সম্মত হইল। উভয় সেনার অলক্ষ্যে দুই বীর বনপথে প্রবেশ করিল।

(৭)

চিরদুঃখিনী অপর্ণা শিহরিয়া উঠিল। তাহাদের চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল। অপর্ণা বলিল—কিরে পাগল কা'কে ধ'রে এনেছিস্?

সগর্ব্বে পুত্র দেবীসিং বলিল—মা, এ সর্দার কেশর সিংহ।

বন্দী নতশিরে দাঁড়াইয়াছিল—সে নানা ভাবে বিভোর, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

অন্যমনে অপর্ণা বলিয়া ফেলিল—তোর পিতা!

গৃহে দীপ জ্বলিতেছিল। বিস্মিত হইয়া তিনজনে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কাহারও মুখে কথা ফুটিল না।

সর্দার প্রথমে কথা কহিল! সে নতজানু হইয়া বলিল—অপর্ণা ক্ষমা নাই? আমাদের জন্যে না হয় এই বীরকুমারের জন্যে—হারাবংশের গৌরব, রাঠোর-বংশের গৌরব—আমাদের পুত্রের জন্যে ক্ষমা কর, অপর্ণা। ছেলের বিক্রম নিজে বুঝেছি!

অপর্ণা স্থির হইয়া রহিল। কোনও কথা বলিল না। রাঠোর বলিল—"অপর্ণা তোমার অনেক সন্ধান করেছি। তুমি আস্‌বে না জানি। আজ আমার প্রায়শ্চিত্তের দিন। আজ নিজের গর্ব্ব খর্ব্ব করে নিজের স্বাধীনতা দিয়ে পুত্রের মঙ্গল কর্‌ব। বাবা আমাকে ধরে দিতে পারলে তোর রাজা তোকে সেনাপতি কর্‌বেন।"

সে পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে গেল। বিস্মিত দেবী একটু পিছনে সরিয়া গেল। রাঠোর বলিল—"কিন্তু তার আগে একবার বল ক্ষমা করলাম। অপর্ণা আমি কি স্বার্থত্যাগ করছি বল দেখি। প্রাণের চেয়ে বড় স্বাধীনতা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করছি। নিষ্ঠুর ক্ষমা করবে না? অপর্ণা!"

এবার অপর্ণা কাঁদিল। বলিল—"পুত্রের মঙ্গলের জন্য তোমাকে স্বামী ব'লে স্বীকার করলাম। তোমার পুত্র তুমি লও। আমি এই দিনের জন্যে সতের বৎসর বিষের জ্বালায় জ্বলছিলাম। পুত্রের পিতৃ-পরিচয়ের জন্যে দেবীকে তোমার উষ্ণীষ-পাদুকা দিয়েছিলাম। দেবী তোমার মার আশীর্ব্বাদ লও। পিতার সঙ্গে কোটা ত্যাগ কর।"

বীরদিগের চক্ষে জল আসিল। তাহারা ব্যাপারটা উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বে অপর্ণা তরবারি লইয়া নিজের বক্ষে বিদ্ধ করিল।

* * * * *

অভাগিনীর চিতার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে চোখ মুছিতে মুছিতে পিতা-পুত্র নীরবে জয়পুরাভিমুখে যাত্রা করিল।

সমসাময়িক সাহিত্য।

নব্য চীন।*

[লেখক—শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।]

চীন অতি পুরাতন দেশ। ভারতের সভ্যতার মত চীনের সভ্যতা অতি প্রাচীন। ইতিহাস একথা স্বীকার করিয়াছে। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন, খৃষ্টপূর্ব্ব ২৬৯৮ অব্দে চীন দেশে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৩০০ অব্দে চীনদেশ সম্রাট ইয়াও ও সান কর্ত্তৃক শাসিত হইত। ইঁহারা প্রজাপালক ছিলেন বলিয়া প্রজাগণ তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিত। সেই আদিম যুগেও চীনের অধিবাসিগণ বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিত, কৃষিকর্ম্মের মহিমা বুঝিত, লিখিতে জানিত এবং সচক্র যান তৈয়ারী করিতেও পারিত। তারপর চীনে বহু রাজ-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; বহু সভ্যতার সহিত চীনের

চীনের প্রাচীনত্ব †

---

* 'The emergency in China' by F. L. Hawks Pott. (1914) [এই পুস্তক খানিতে নব্যচীনের চিত্র অতি সুচারুরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধ ইহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয়]

† চীনের প্রাচীনত্বের পরিচয় 'Hutchinson's History of the Nations' নামক পুস্তকের 'The Chinese' শীর্ষক অধ্যায় হইতে প্রদত্ত হইল।

সংঘর্ষ হইয়াছে। কিন্তু চীনের অধিবাসিবৃন্দ তাহাদের রক্ষণশীলতা ত্যাগ করে নাই; বহুদিনের আচার-ব্যবহার ও শিক্ষাপ্রণালী তাহাদের এমনই মজ্জাগত হইয়াছিল যে, তাহারা সহজে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতীচ্যের যে নূতন সভ্যতা-রশ্মি পৃথিবীর সকল দেশকেই আচ্ছন্ন করিতে অগ্রসর হইতেছিল, চীনের রক্ষণশীলতা ও চীনবাসীর পুরাতন-প্রীতি তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। চীনের অধিবাসিকুল স্বদেশের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিপুল পরাক্রমে এই অপরিচিত সভ্যতার আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য যে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল,—ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যাহা ভবিতব্য তাহা ঘটিবেই। চীন এখন প্রতীচ্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত; প্রতীচ্য সভ্যতার অনুসরণে ব্যস্ত।

চীনে প্রতীচ্য সভ্যতা।

প্রতীচ্য সভ্যতা বিনাযুদ্ধে চীনে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ম্যানিলা সহরে পর্ত্তুগীজ ও স্পেনীয়গণ এক সময়ে বিশ সহস্র চীনদেশীয় শ্রমজীবীকে হত্যা করে। ইহাদের এই নিষ্ঠুরতা দেখিয়া চীনের অধিবাসিগণের ধারণা হয় যে, প্রতীচ্যের সকল লোকই বুঝি এইরূপ নির্ম্মম-নিষ্ঠুর! এইজন্যই প্রতীচ্য সভ্যতাকে চীনের রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে বহুদিন পদচারণা করিতে হইয়াছিল।

চীনে দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। এ ব্যাপারে পর্ত্তুগীজেরাই সমধিক অপরাধী। এতদ্ব্যতীত অহিফেনের গুপ্ত বাণিজ্যও চীনে চলিত। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে চীনের তদানীন্তন সম্রাট্ টাও কোয়াঙ্গ এই দুইটী ব্যাপারের উচ্ছেদের জন্য সবিশেষ চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তার পর ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মিলিত সেনাদল পিকিন সহরের রাজকীয় গ্রীষ্মাবাসে প্রবেশ করে। এই সকল কারণে চীনের অধিবাসিকুল প্রতীচ্য সভ্যতাকে বড় একটা আমল দিতে চাহে নাই। কিন্তু লখিন্দরের লৌহ-গৃহে কাল-নাগের সূচী-পরিমিত প্রবেশ-পথের মত ১৮৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত চীন-জাপান-যুদ্ধে যে অতি ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ পথ প্রস্তুত হইল, তাহারই ভিতর দিয়া প্রতীচীর সভ্যতা চীনে প্রবেশ করিল। তাহার পর হইতে অধিকাংশ পাশ্চাত্য জাতিই চীনে জমি পত্তনী লইতে আরম্ভ করে।

পাশ্চাত্য জাতিরা যে চীনে প্রবেশ করে, তথাকার বক্সার সম্প্রদায়ের ইহা ইচ্ছা নহে। অধিকন্তু তাহারা মনে করিত যে, বৈদেশিকদিগের আগমনে চীনের মস্তক অবনমিত হইতেছে। এই ধারণা বা সংস্কারবশেই বিগত ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের বক্সার-বিদ্রোহ হইয়াছিল।

বক্সার-বিদ্রোহের অবসানে চীনে শাসন-সংস্কারের কার্য্য আরব্ধ হয়। কেবল শাসন-সংস্কার বলিলে চলিবে না।—চীনে তখন সকল প্রকার সংস্কারের সূচনা হয়। প্রধানতঃ স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি-সাধনই এই সংস্কারকার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর রুষ ও জাপানের যুদ্ধে জাপানের জয়লাভের পর হইতে এই সংস্কারকার্য্য দ্রুতগতিতে চলিয়াছে।

যে দিন হইতে এই সংস্কারের আরম্ভ সেইদিন হইতেই চীনে নূতন জাতীয়তার বিকাশ হইয়াছে। চীন স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেমের মাদকতায় উন্মত্ত হইয়াছে। এই সময় হইতেই পুরাতন চীনের চিতাভস্মের উপর নব্য চীন গঠিত হইয়া উঠিতেছে।

নব্য চীন।

নব্য চীন পুরাতনের দিকে বড় একটা ফিরিয়া দেখে নাই; তাহার লক্ষ্য সম্মুখে। প্রতীচ্য যে পথের পথিক হইয়া জগতে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, চীন সেই প্রতীচ্যের অবলম্বিত পথেই চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে পুরাতন রাজতন্ত্র ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিয়াছে; তাহার পরিবর্ত্তে নূতন সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

রাজতন্ত্র ভাঙ্গিবার পূর্ব্ব হইতেই চীনের নব-মন্ত্রের সাধক যুবকবৃন্দ প্রতীচ্যের কর্ম্মক্ষেত্র পরিদর্শন করিতে দলে দলে যাত্রা করিয়াছে। জাপানের টোকিও সহরে সহস্র সহস্র চীনদেশীয় যুবক নব নব জ্ঞান শিক্ষা করিতেছে। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, মার্কিণে বহু চীনদেশীয় যুবক অবস্থান করিতেছে। উহারা বিদেশ হইতে "নব নব জ্ঞান" আনিতে আসিয়াছে। উহারা নূতন মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছে। "চীন যে কেবল চীনের সন্তানসন্ততির জন্য"—এই ধারণা এখন উহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে।

নূতন মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত চীন কি করিয়াছে,—এইবার দু' এক কথায় তাহার পরিচয় দিব। চীনের প্রাচীন শিক্ষাদান-পদ্ধতি তথন পুরাতনের কুক্ষিগত হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে নূতন জাতীয় শিক্ষার প্রচলন তথায় হইতেছে। চীনের সর্ব্বত্র রেলপথ নির্ম্মিত এবং বহু শিল্প প্রস্তুতের কল-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে চীনে এক মাইলও রেলপথ ছিল না; এক্ষণে তথায় ৬,০০০ মাইল রেলপথ তৈয়ারী হইয়াছে। নৈতিক উন্নতির দিকেও চীনের অধিবাসীদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহারা আপনাদের দেশে অহিফেনের প্রবেশ একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

নব্য চীনে সাধারণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার কারণ ছিল। যাঁহারা ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন,—সাধারণ বা গণতন্ত্রই চীনের শাসননীতিতে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান। স্বায়ত্তশাসন-প্রণালী চীনে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। চীনে লোকমতের অস্তিত্ব বহু প্রাচীন কাল হইতেই সূচিত হইয়াছে। লোকমতের এইরূপ শক্তি ও প্রাধান্য যে, অত্যন্ত সাহসী রাজপুরুষও ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হন না। আভিজাত্য বংশগত নহে। প্রতিযোগিতা-পরীক্ষার দ্বারা রাজপুরুষ-নিয়োগ হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় ত চীনে বহুদিন হইতে প্রচলিত। তাহার উপর চীনে নূতন জাতীয়তার উন্মেষ এবং পাছে উহাকে পর-পদানত হইতে হয়, এজন্য তাহার অত্যন্ত আশঙ্কাও হইয়াছে। এই সকল কারণেই যে চীন চির-প্রচলিত রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া সাধারণ বা গণতন্ত্রমূলক শাসন-প্রণালীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধ হয়।

চীন ও সাধারণতন্ত্র।

নব্য চীন ষোড়শোপচারে দেশ-মাতৃকার পূজা আরম্ভ করিয়াছে। এ পূজার প্রধান উপচার আত্মশক্তির উদ্বোধন। আত্মশক্তির জাগরণে চীন পরনির্ভরতা ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রেলপথ-নির্ম্মাণ ত বৈদেশিক পূর্ত্তবিৎ-গণের কার্য্য; উহারাই এ বিষয়ে অভিজ্ঞ। কিন্তু নব্য চীনের পূর্ত্তকারগণ বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদিগের বিনা সাহায্যেই সান্‌সি-মোঙ্গলীয় রেলপথ তৈয়ারী করিয়াছে। এ পক্ষে নব্য-চীনের কৃতিত্বের শতমুখে প্রশংসা করিতে হয়।

আত্মশক্তির উদ্বোধন।

চীনে পর্য্যাপ্ত তুলা উৎপন্ন হয়। সূতা-নির্ম্মাণ ও বস্ত্রবয়ন বাঙ্গালার সেকালের বয়ন-শিল্পের

মত চীনের একটী জাতীয় ব্যবসায়। নব্য চীনের ঘরে ঘরে এখনও তাঁত চলে,—ঐ তাঁতে কাপড় বুনা হয়। কলের কাপড়ের চেয়ে তাঁতের কাপড়ই তথাকার লোকে বেশী পছন্দ করে।

ক্ষুদ্র-বৃহৎ গৃহ-শিল্প ব্যতীত নব্য চীন প্রতীচ্যের আদর্শে কলকারখানা স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ধারণা,—বর্ত্তমান যুগের শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে শীঘ্রই নব্য চীন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। সেই প্রতিযোগিতাই প্রকৃত পক্ষে 'Yellow Peril' বা 'পীতাতঙ্ক' হইয়া দাঁড়াইবে। পরিশ্রমী চীনজাতি জগতের শিল্পক্ষেত্রে আপনার পুরাতন স্থান অধিকার করিবার জন্য যে চেষ্টিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নব্য চীনে জাতীয় উন্মেষণের এই যে সূচনা হইয়াছে,—ইহার ফলে চীনের সকল প্রদেশের

ভবিষ্যৎ।

অধিবাসীরা আপনাদের পার্থক্য ও বিরোধ বিস্মৃত হইতেছে। ইহার উপর রেলপথ, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির প্রবর্ত্তনে নব্য চীন যে মিলনের এক মহাক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইবে,—উহা এক অখণ্ড, সমষ্টিবদ্ধ বিরাট জাতিতে পরিণত হইবে, তাহার সম্ভাবনা এখন হইতে দেখা যাইতেছে।

তন্ময়তা

[লেখক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।]

করেছ মধুর হে জীবন-স্বামী
তোমার শারদ প্রভাতে।
ভরেছ আমার সারা মনপ্রাণ
তোমার সকল শোভাতে;
গাহে বিশ্ব সারা তোমার বিভব
ব্যোমপথে ঘোরে কি মধুর রব—
শুধু মোর বীন পড়ে' রব হীন
তোমার মুখর সভাতে।
এসেছ যখন সাধনার ধন!
গরিমা-উজল ভুবনে
ভাসিছে তোমার মধুর পরশ
শিশির শীতল পবনে।
সুধা-ভরা প্রভু করেছ হৃদয়—
আর আমি নাই, আমি তোমা-ময়
তোমাতেই হারা—তোমাতে মগন
ধূলি-কণা তব চরণে।

সচেতন ও অচেতন।

[লেখক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার, বি-এ।]

বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, পড়িয়া আসিতেছি, দেখিয়া আসিতেছি ও বুঝিয়া আসিতেছি যে, জগতের সমগ্র পদার্থকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়—সচেতন পদার্থ ও অচেতন পদার্থ। মানুষ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সচেতন ও বৃক্ষ প্রস্তর প্রভৃতি অচেতন পদার্থ। সচেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে একটা পাকাপাকি ভেদের ধারণা আমাদের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতেই হইয়াছে। বিশ্বাসী হিন্দুর নিকট ব্যবহারিক হিসাবে সচেতন ও অচেতন পদার্থে ভেদ থাকিলেও, যথার্থ অচেতন বা চৈতন্যবিহীন বলিয়া কোন পদার্থ নাই। অহল্যার গল্প সকলেই জানেন। অহল্যা মুনিপত্নী, পাপস্পর্শে প্রস্তর হইয়াছিলেন ও পুনরায় শ্রীরামচন্দ্রের পূতচরণস্পর্শে মানবী হইয়াছিলেন। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সাধারণতঃ আমরা যাহাদিগকে সচেতন ও অচেতন পদার্থ বলি তাহারা যে পরস্পর একেবারে ভিন্ন এরূপ ধারণা হিন্দুর হইতে পারে না। প্রস্তরে যদি চেতনা না থাকে তবে কোনও মানুষ প্রস্তর হইলে তাহার চেতনাটা যায় কোথা? আবার ঐ প্রস্তর মানুষ হইলে সেই মানুষে চেতনা আসে কোথা হইতে? অহল্যার দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে হইবে যে, মনুষ্যরূপিণী অহল্যার চৈতন্য পাষাণরূপিণী অহল্যার মধ্যে ছিল এবং সেই চৈতন্যই আবার পরে মনুষ্যরূপিণী অহল্যার চৈতন্যরূপে অভিব্যক্ত হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমতেও ক্রমে সচেতনে ও অচেতনে নির্ব্যূঢ়ভাবে ভেদের সম্ভাবনা কমিয়া আসিতেছে (এ সম্বন্ধে অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কারের কথা পরে বলিব)।

সচেতন ও অচেতন বলিতে আমরা কি বুঝি? সচেতন মানে চেতনা আছে এমন পদার্থ ও অচেতন মানে চেতনা নাই এমন পদার্থ। চেতনা শব্দের অর্থ

চেতনা কাহাকে বলে?

চৈতন্যের বিকাশ—পদার্থ-দেহে চৈতন্যের অভিব্যক্তি। সুতরাং চেতনা বলিতে চৈতন্য ও চৈতন্যের অভিব্যক্তি, এই উভয়কোটিক প্রসঙ্গ আসে। এই প্রবন্ধে আমরা বিচার করিব, (১) সর্ব্বপদার্থে চৈতন্য আছে কি না ও (২) সর্ব্বপদার্থে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয় কি না।

সর্ব্বপদার্থে চৈতন্য আছে কি না বিচার করিতে গেলে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, চৈতন্যের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমাদের আসে কোথা হইতে? আমরা কি চৈতন্য প্রত্যক্ষ করি না অনুমান করি? অনুমানের কথা পরে বলিব, আগে প্রত্যক্ষের কথা বলি।

চৈতন্য প্রত্যক্ষ নহে।

অক্ষ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। চক্ষু রূপ দেখে, কর্ণ শব্দ শোনে, নাসিকা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা রস আস্বাদন করে ও ত্বক্ স্পর্শ অনুভব করে। সুতরাং রূপ চক্ষুর প্রত্যক্ষ, শব্দ কর্ণের প্রত্যক্ষ, গন্ধ নাসিকার প্রত্যক্ষ, রস জিহ্বার প্রত্যক্ষ ও স্পর্শ ত্বকের প্রত্যক্ষ। চৈতন্য রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস বা স্পর্শ কোনটাই নহে। অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চৈতন্যের অনুভব হইতে পারে না। চৈতন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ নহে।

চৈতন্য আমাদের প্রত্যক্ষ না হইলেও চেতন ও অচেতন এই দুই প্রকার পদার্থেরই একটা জ্ঞানও আমাদের আছে, যেমন মানুষ চেতন, প্রস্তর অচেতন। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, আমাদের এই জ্ঞান অনুমান মাত্র। তুমি দেখ মানুষ হাত পা নাড়ে, খায়, হাসে, কাঁদে; তাই তুমি মনে কর মানুষ চেতন। আর প্রস্তর হাত পা নাড়ে না, খায় না, হাসে কাঁদে না; তাই তুমি মনে কর প্রস্তর অচেতন। বাষ্পীয় ইঞ্জিনও তাহার হাত পা নাড়ে, শব্দ করে, জল খায়; তবে তুমি ইঞ্জিনকে অচেতন বল কেন? বলিতে পার, ইঞ্জিন নিজের ইচ্ছায় হাত পা নাড়ে না, মানুষ তাহাতে যে বাষ্পীয় শক্তি সঞ্চালন করে সেই শক্তির বলে সে হাত পা নাড়ে; আর, মানুষ নিজের ইচ্ছায় হাত পা নাড়ে। কিন্তু মানুষের এই ইচ্ছা কি তোমার প্রত্যক্ষ? না। মানুষের হাত পা নাড়াই তোমার প্রত্যক্ষ। তোমার নিজের মধ্যে চৈতন্য আছে। এই চৈতন্য লইয়াই তোমার ব্যক্তিত্ব (individuality)। চৈতন্যও যাহা জ্ঞানও তাহা। জ্ঞানে অজ্ঞান নাই, সুতরাং সে নিজেকে জ্ঞান বলিয়া জানে। এইজন্যই তুমি চৈতন্যকে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর না করিয়াও নিজেকে চেতন বলিয়া জান। এই জ্ঞান তোমার স্বাভাবিক অনুভবসিদ্ধ। অতঃপর তুমি প্রত্যক্ষ কর যে, তোমার মধ্যে চৈতন্য থাকার জন্য তোমার দেহে অঙ্গসঞ্চালনরূপ কতকগুলি বিকার আবির্ভূত হয়। এই সকল বিকারের সহিত তোমার অন্তঃস্থিত চৈতন্যের একটা সম্বন্ধের অস্তিত্বের ধারণা তুমি করিয়া লইয়াছ। এই ধারণা হইতে তুমি অনুমান কর যে, যেখানে এই সকল বিকার আছে সেই

সাধারণতঃ চৈতন্য অভিব্যক্তির দ্বারা অনুমেয় হইলেও যথার্থতঃ অনুমেয় নহে।

খানেই চৈতন্য আছে, আর যেখানে নাই সেখানে চৈতন্য নাই। তাই মৃতদেহে, প্রস্তরাদিতে এই সকল বিকার না দেখিয়া তুমি উহাদিগকে অচেতন মনে কর। কিন্তু এই ধারণা তোমাকে অনেক সময়ে ভ্রমেও পাতিত করে। আমি শুনিয়াছি যে, এদেশে যখন প্রথম রেলগাড়ী চালান হয় তখন অনেকে অগ্রে ইঞ্জিনকে প্রণাম করিয়া তবে গাড়িতে চড়িত। তাহারা মনে করিত, ইঞ্জিন যখন জল ও কয়লা খায়, নিঃশ্বাসে বাষ্প উদ্গীরণ করে, ভয়ানক শব্দ করে ও অতিশয় দৌড়িতে পারে তখন নিশ্চয়ই উহা একটা ভারী শক্তিশালী জীব, হয়ত কোন দেবতাই হইবে। চৈতন্যের স্বরূপ জ্ঞান না থাকাতে এইরূপ ভ্রম অল্প বিস্তর সকলেরই হইয়া থাকে। অন্ধকারে দোদুল্যমান রজ্জু দেখিয়া বিজ্ঞেরও সর্পভ্রম হয়। মোট কথা, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান হয় সে জ্ঞান অনুমান দ্বারাও অভ্রান্ত রূপে চৈতন্যকে ধরিতে পারে না। চৈতন্যের অধিষ্ঠান বশতঃ জড়ে ক্রিয়া হইলে এবং সেই ক্রিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলে তবে ঐ জড়ের পশ্চাতে যে চৈতন্য আছে তাহার একটা অনুমান মাত্র হয়। কিন্তু কোনও জড়পদার্থে ক্রিয়া হইলেই যে তদধিষ্ঠানভূত চৈতন্যই উহার মূলীভূত কারণ তাহা না হইতেও পারে, তদ্বহির্ভূত চৈতন্য দ্বারাও ঐ ক্রিয়া হইয়া থাকিতে পারে। আমি নিজে আমার হাত নাড়িতে পারি, আবার একজন অন্য ব্যক্তিও আমার হাতখানা ধরিয়া নাড়িয়া দিতে পারে। এরূপ অবস্থায় একজন তৃতীয় ব্যক্তি দূর হইতে আমার হাত-নাড়া দেখিয়া কিরূপে বলিবে আমার নিজের অন্তঃস্থিত চৈতন্যের প্রেরণাতেই আমার হাত নড়িতেছে? সুতরাং আমার হাত-নাড়া দেখিয়া তৃতীয় ব্যক্তির মনে আমার মধ্যে চৈতন্য থাকার যে অনুমান হয় সেই অনুমান অভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। পুনশ্চ ইন্দ্রিয়ের শক্তি বড় কম। সেইজন্য চৈতন্যের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তিসকল তাহারা ধরিতে পারে না। গাছের একটা পাতায় অস্ত্রাঘাত করিলে কি গাছ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে? কই, আমরা ত কখন দেখি নাই যে, আঘাতজন্য গাছের কোনও কষ্ট হয়। সেইজন্য আমরা চিরকাল মনে করিয়া আসিয়াছি যে, গাছ অচেতন। একটা পিপীলিকাকে আঘাত করিলে সে বেদনায় অস্থির হয় ইহা আমরা দেখিতে পাই, সুতরাং একটা পিপীলিকাকেও বধ করিতে আমরা অনেক সময়ে অনিচ্ছুক হই এবং কেহ তাহাকে বধ করিলে আমাদের মনে কষ্ট হয়। কিন্তু একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষকে ছেদন করিতে আমাদের মনে কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না, কারণ আমাদের ধারণা আছে যে বৃক্ষ অচেতন, উহাকে ছেদন করিলেও উহার কোন ক্লেশ হয়

না। কিন্তু অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার আবিষ্কৃত অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রসকল দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধভাবে দেখাইয়াছেন যে, একজন সচেতন মনুষ্যের গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিলে তাহাতে যেমন বেদনার চিহ্ন সকল আবির্ভূত হয়, একটা বৃক্ষের গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিলেও তাহাতে সেইরূপ চিহ্ন সকল আবির্ভূত হয়। লৌহাদি ধাতুও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে নিদ্রা, জাগরণ প্রভৃতি নানারূপ সচেতনের ধর্ম্মের পরিচয় দেয়। অতএব কে বলিতে পারে যে, আমাদিগের ইন্দ্রিয়সকলের শক্তি যদি অপ্রতিহত হইত তাহা হইলে আমরা সর্ব্বপদার্থে চৈতন্যের অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিতাম না? সুতরাং প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুমানের দ্বারাও চৈতন্যের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব-সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না।

চৈতন্য স্বাধীন, অপরোক্ষ। চৈতন্যের স্বানুভূতি।

এ যাবৎ আমরা দেখিলাম যে, প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা চৈতন্যকে জানা যায় না। তাহাই যদি হইল, যদি চৈতন্যকে প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা স্থির করা না গেল তবে কি বুঝিতে হইবে যে চৈতন্য নাই বা থাকিলেও আমাদের দ্বারা তাহার খোঁজ হইতে পারে না? এইবার আমরা দেখাইব যে, চৈতন্য নিজেকেই নিজে প্রকাশ করে। চৈতন্য নাই বা চৈতন্যের সন্ধান আমাদের দ্বারা হইতে পারে না, একথা বলা যায় না। কারণ, নিজের চৈতন্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও ভুল হয় না।

জিহ্বা মেঽস্তি ন বেত্যুক্তির্লজ্জায়ৈ কেবলং যথা।
ন বুধ্যতে ময়া বোধো বোদ্ধব্য ইতি তাদৃশী।

পঞ্চদশী ৩।২০

অর্থাৎ আমার জিহ্বা আছে কি না একথা বলা যেমন লজ্জাকর, বোধ আমার বোধে আসিতেছে না, একথা বলাও তেমনি লজ্জাকর। আমাতে চৈতন্য নাই,—এই কথাটাই স্ববিরোধী, কারণ চৈতন্য নাই এই উক্তির জন্যই ত চৈতন্যের প্রয়োজন।

আমার এই যে নিজ চৈতন্যবোধ,—ইহা প্রত্যক্ষজন্য বা অনুমানজন্য নহে। ইন্দ্রিয়গণ চৈতন্যকে জানিতে পারে না, অনুমান দ্বারাও চৈতন্যকে ধরা যায় না, একথা উপরে বুঝাইয়াছি। তবে এ চৈতন্যবোধ হয় কিরূপে? চৈতন্যের দ্বারাই চৈতন্যের বোধ হয়। চৈতন্যই বোধশক্তি, জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞানের নিজেকে জানিবার জন্য অপর কাহারও সাহায্য লইতে হয় না।

অবেদ্যোঽপ্যপরোক্ষোঽতঃ স্বপ্রকাশোভবত্যয়ম।

পঞ্চদশী ৩।২৮

চৈতন্য ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অবেদ্য; কিন্তু অপরোক্ষ, অর্থাৎ অন্যের সাহায্য ব্যতীত প্রকাশমান, অতএব স্বপ্রকাশ, স্বাধীন, একাধারে জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। চৈতন্যের এই স্বানুভূতিকে অপরোক্ষানুভূতি বলা যায়।

বেশ, আমার চৈতন্য নিজেকে জানে, সুতরাং আমি যে সচেতন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হয় না। কিন্তু চৈতন্যের এই স্বানুভূতি থাকিলেও, পরানুভূতি আছে কি? অর্থাৎ সে পরের চৈতন্যের অনুভব করিতে পারে কি? আমার ইন্দ্রিয়গণ পরের চৈতন্যকে অনুভব করিতে পারে না বটে, কিন্তু আমার চৈতন্য উহা অনুভব করে। সকলের পক্ষেই এই কথা। সকলেই আত্মচৈতন্য দ্বারা পরচৈতন্যের অনুভব করে।

চৈতন্যের পরচৈতন্যানুভূতি।

শিশু মাটির পুতুলের সহিত কথা কয়, মেঘের সহিত আলাপ করে, চাঁদকে আয় আয় বলিয়া ডাকে। কবি পুষ্পে পুষ্পে প্রেমের বিকাশ দেখেন, সমীরণে সমীরণে নিঃশ্বাসের শব্দ শ্রবণ করেন, সন্ধ্যাগমে মুদিত কমলিনীতে বিরহের মর্ম্মবেদনা ও ফুল্ল কুমুদিনীতে মিলনের সুখোচ্ছ্বাস অনুভব করেন। চিত্রকর বর্ণে বর্ণে, পত্রে পত্রে, শিরায় শিরায়, আলোয় আঁধারে ভাবের লহরী ছুটাইয়া দেন। এই যে সর্ব্বপদার্থে চৈতন্য-দৃষ্টি ইহাকে অজ্ঞান বা কল্পনামাত্রের ফল বলা যায় না। শিশুতে অজ্ঞান থাকিতে পারে কিন্তু কবি ও চিত্রকরে অজ্ঞান নাই। কবি ও চিত্রকরে কল্পনা থাকিলেও শিশুতে কল্পনা নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, অজ্ঞান ও কল্পনার অতিরিক্ত কোন কারণে সময়ে সময়ে সর্ব্বভূতে চৈতন্যের দৃষ্টি হয়। এই দৃষ্টি অজ্ঞানজন্য ভ্রম বা কল্পনাজন্য খেয়াল মাত্র নহে। ইহা যথার্থ অনুভব, দ্রষ্টার আত্মচৈতন্যদ্বারা পরচৈতন্যের অপরোক্ষানুভূতি। এই অনুভূতি যে শিশু, কবি ও চিত্রকরের একচেটিয়া সম্পত্তি তাহা নহে। সকলেই, অজ্ঞাতসারে হউক আর জ্ঞাতসারেই হউক, সর্ব্বপদার্থে চৈতন্যের অনুভব করে। যখন বলি চন্দ্রমা স্নিগ্ধজ্যোতিতে জগৎ সুশীতল ও আলোকিত করিতেছেন, তখন চন্দ্রমা চৈতন্যশূন্য থাকেন না, চৈতন্যবিশিষ্ট কর্ত্তা হইয়া পড়েন। মনে করিতে পার, এস্থল চন্দ্রমা শব্দ দ্বারা চন্দ্রকে না বুঝাইয়া উহার শৈত্য ও আলোকশক্তিকে বুঝিতে হইবে, যে শক্তি চৈতন্যবিহীন। ইহা ভুল। চৈতন্য-বিরহিত শক্তি কখনও চৈতন্যবিশিষ্ট শক্তিমান্ দ্বারা চালিত না হইলে কার্য্য-

কারিণী হইতে পারে না। যে শক্তিমান্ চন্দ্রের শৈত্য ও আলোকশক্তিতে চৈতন্য চালিত করেন, তিনিই যথার্থ চন্দ্রমাপদবাচ্য। এই চৈতন্যকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপাবধারণ করা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানমাত্রসম্বল সাধারণ মনুষ্যের সামর্থ্যে কুলায় না। কিন্তু চিৎ স্বয়ং প্রকাশ, সুতরাং জীবের এই অসামর্থ্য সত্ত্বেও উহা নিজেই প্রকাশিত হইয়া অলক্ষ্যে জীবের স্বচৈতন্যের অনুভূতির বিষয় হয়। এই জন্যই মনুষ্যের ভাব ও ভাষা সর্ব্বপদার্থে চৈতন্যজ্ঞাপক। মনুষ্যের ভাব যদি এরূপ না হইত,তাহা হইলে ব্যাকরণে কেবল সচেতন পদার্থের কর্ত্তৃকারকে অধিকার হইত। বায়ু বহে—এস্থলে বায়ু কর্ত্তা, বহারূপ কার্য্যের কর্ত্তা, সুতরাং ব্যাকরণের প্রমাণে চেতন। যদি বল বায়ু যথার্থতঃ কর্ত্তা নহে, তবে উহা কি ? কর্ম্ম ? তাহা হইলে, বলিতে হয়, বায়ু বাহিত হয়। কিন্তু মনুষ্যের মনে বায়ু সম্বন্ধে এ কর্ম্মভাব নাই ; থাকিলে, ভাষায় তাহার অভিব্যক্তি হইত। বলিতে পার, বায়ু বহা মানে, বায়ু পরমাণুগত আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি দ্বারা ঐ সকল পরমাণুর স্থানচ্যুতি। যদি তাহাই হয়, তবে বায়ুস্থিত এই শক্তিই কর্ত্তা ও চেতন। যদি বল এই শক্তিও অচেতন ও অকর্ত্তা, বায়ু-পরমাণুগত উষ্ণতা হইতে উহার আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে এই উষ্ণতাকেই কর্ত্তা ও চেতন বলিতে হয়। যদি ইহাকেও চেতন বলিতে না চাও, ইহার পশ্চাৎস্থিত আর একজনকে বলিতে হইবে। এইরূপে একজন চেতন-কর্ত্তার অঙ্গীকার করিতেই হইবে। নতুবা ন্যায় মতে অনবস্থা দোষ হইয়া পড়ে—কার্য্যকারণের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে বায়ু বহে—এই ভাষাগত ভাবের অন্তরালে চেতন কর্ত্তার অনুভূতি অস্বীকার করা যায় না।

চৈতন্য প্রত্যক্ষ বা অনুমানের অপেক্ষা না করিয়া জ্ঞানমূর্ত্তিত্বহেতু স্বয়ংই প্রকাশ হয় এবং এইরূপে প্রত্যেক জীবের অন্তঃস্থিত চৈতন্য নিজেকে ও পর-চৈতন্যকে অনুভব করে—উপরে এই কথা বুঝা গেল। কিন্তু সাধারণতঃ জীবের এই অনুভূতি বড় প্রচ্ছন্ন। তাহার নিজেরই অনুভূতি তাহার নিকট অজ্ঞাত থাকে।

পরচৈতন্যানুভূতির প্রচ্ছন্নতা।

আমার অন্তঃস্থিত চৈতন্য জগন্ময় চৈতন্য দেখে, কিন্তু তাহা আমার বোধে আসে না। বিশ্বব্যাপী চিৎ জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে, কিন্তু মসিমাখা বস্ত্রের মধ্য দিয়া যেমন সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করে না, তেমনি আমার মলিন বুদ্ধির মধ্য দিয়া চিদালোক বিকশিত হয় না। এ একটা বিষম সমস্যা। আমার বোধে আসে কেবল বস্তুর বাহ্য বিকাশ, তাহার রূপ ও গুণ। যখন

সূর্য্যের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াই তখন কি বোধ করি? চক্ষু দিয়া বোধ করি তাহার আলোক, চর্ম্ম দিয়া বোধ করি তাহার উষ্ণতা। একটী সুন্দর গোলাপ ফুল হাতে পাইলে কি বোধ করি? চক্ষুঃ দিয়া বোধ করি তাহার সৌন্দর্য্য, নাসিকা দিয়া বোধ করি তাহার সুগন্ধ। প্রভাতে নিকুঞ্জবনে গেলে বোধ করি—কর্ণ দ্বারা পক্ষীর গান, চক্ষু দ্বারা স্বভাবের শোভা, নাসিকা দ্বারা কুসুমের সৌরভ, গাত্র দ্বারা মৃদু বায়ুর সুশীতল স্পর্শ। আহার্য্য মুখে দিলে বোধ করি, জিহ্বা দ্বারা তাহার রস। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও চর্ম্ম—আমাদের বোধের জন্য এই যে পাঁচটী ইন্দ্রিয় বা যন্ত্র আছে এই পাঁচটী যন্ত্রের দ্বারা যাহা বোধ করা যায় আমরা সাধারণতঃ তাহাই বোধ করিয়া থাকি। আর বোধ করি তজ্জন্য সুখ, দুঃখ ও মোহ। রসগোল্লা খাইলে সুখ হয়, কুইনাইন খাইলে দুঃখ হয়, অহিফেন খাইলে মোহ হয়। পাখীর গানে আনন্দ হয়, বাজারের গোলমালে কষ্ট হয়, বাঘের ডাকে মোহ হয়। পতির রূপে সুখ, সপত্নীর রূপে দুঃখ, উপপতির রূপে মোহ হয়। কুসুমের গন্ধে সুখ হয়, বিষ্ঠার গন্ধে দুঃখ হয়, ক্লোরোফরমের গন্ধে মোহ হয়। কোমল শয্যার স্পর্শে সুখ হয়, তীক্ষ্ণ পদার্থের স্পর্শে দুঃখ হয়, বিদ্যুতের স্পর্শে মোহ হয়। এইরূপে আমরা যাহাই বোধ করি তাহাই আমাদের মধ্যে সুখ, দুঃখ বা মোহের একটা ছাপ দিয়া দেয়। আগুনে হাত দিলাম, অমনি জ্বালা করিয়া উঠিল—হাতের মধ্যে আগুনের জ্বালারূপ একটা ছাপ পড়িয়া গেল। এই যে জ্বালা বা দুঃখ, ইহা কি? বোধ। কিসের বোধ? অগ্নিরই বোধ। সুতরাং এই জ্বালা, অগ্নি-পদার্থের ত্বগিন্দ্রিয়জন্য বোধ। কখনও আবার এই অগ্নির স্পর্শসুখ উৎপন্ন করে, কখনও আবার মোহ উৎপন্ন করে। সুতরাং স্পর্শ অনুভবের দ্বার দিয়া বিচার করিলে অগ্নির সত্তা সুখ, দুঃখ ও মোহে পর্য্যবসিত হয়। দৃষ্টিরূপ অনুভবের দ্বার দিয়া দেখিলেও তাহাই হয়—দৃষ্ট অগ্নি কোনও স্থলে সুখ, কোনও স্থলে দুঃখ, কোনও স্থলে মোহরূপে দ্রষ্টার অন্তরে আবির্ভূত হয়। অতএব আমার কাছে অগ্নির সত্তা সুখ, দুঃখ ও মোহেই আবদ্ধ। অন্যান্য সমস্ত পদার্থ-সম্বন্ধেও এই এক কথা। সকলেই আমার ভোগ্য হইয়া আমাতে সুখ, দুঃখ ও মোহে পরিণত হয়। আমি ভোক্তা—আমি সংসারে কেবল বিষয় ভোগ করি। বিষয় কি? স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, অর্থ, ভোজ্য, শয্যা প্রভৃতি। ভোগের মানে কি? সুখানুভব, দুঃখানুভব ও মোহাচ্ছন্নতা। সুতরাং "বিষয় ভোগ করি"—ইহার

পদার্থের বাহ্যভোগ্যরূপ হেতু এই প্রচ্ছন্নতা।

মানে স্ত্রীপুত্রাদিতে সুখাদি অনুভব করি। স্ত্রীপুত্রাদিতে সুখাদি আসিল কোথা হইতে? সুখাদি কি স্ত্রীপুত্রাদি হইতে ভিন্ন? স্ত্রীপুত্রাদি হইতে সুখাদি বাদ দিলে কি থাকে? এই প্রশ্নগুলি বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুখাদি বাদ দিলে স্ত্রী আর স্ত্রী থাকে না, পুত্র আর পুত্র থাকে না, বন্ধু আর বন্ধু থাকে না, শয্যা আর শয্যা থাকে না, মোট কথা, ভোগ্যের লোপ হয়, বিষয় উড়িয়া যায়। অগ্নি হইতে দাহজন্য সুখাদি বাদ দিলে সে আর অগ্নি থাকে না, জল হইতে শৈত্যজন্য সুখাদি বাদ দিলে সে আর জল থাকে না। ফলতঃ, ভোক্তা আমি, আমার নিকট কোন পদার্থেরই সুখাদির সমষ্টিভূত স্বরূপ ভিন্ন অন্য স্বরূপ নাই। অতএব ভোক্তার দিক দিয়া দেখিতে গেলে পদার্থমাত্রই জড়, চেতনাবিহীন, কারণ জড়ই ভোগ্য হয় ও চৈতন্যই ভোক্তা হয়। আমি যতক্ষণ মাত্র ভোক্তা, পদার্থের সহিত আমার সম্বন্ধ যতক্ষণ আমার চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারাই কেবল স্থাপিত হইবে ততক্ষণ সমস্ত জগৎ আমার নিকট চিহ্নিরহিত, তা কে জানে মানুষ আর কে জানে পাথর। যদি আমি কখনও ভোক্তার পর্য্যায় হইতে পৃথক হইতে পারি, যদি ভোগের সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া সত্তানুভবের জন্য প্রস্তুত হইয়া পদার্থের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারি, তবেই দেখিতে পাইব যে, সুখাদিস্বরূপ ভিন্ন পদার্থের আর এক স্বরূপ আছে—চিৎস্বরূপ। আমি যে, পরিমাণে ভোগকে ভুলিতে পারিব, সেই পরিমাণে পদার্থের এই চিৎস্বরূপের অনুভব করিতে পারিব। শিশু ভোগে বিভোর নয় বলিয়াই ইহার অনুভব করে। কবি ও চিত্রকর ক্ষণিকের তরে ভোগ-বিস্মৃত হইতে পারেন বলিয়া সেইক্ষণে ইহার অনুভব করেন। সাধারণ জীব ভোগকে ভুলিতে পারে না বলিয়া ইহার অনুভব হইতে বঞ্চিত হয়।

ভোগ্য অচেতন।

পদার্থের আন্তর চৈতন্য রূপ।

দেখিলাম, জাগতিক পদার্থমাত্রেই চৈতন্য বিদ্যমান, কেবল পদার্থের ভোগ্যত্বহেতু জীবের বোধের দ্বারে উহা সাধারণতঃ প্রচ্ছন্ন থাকে। অতঃপর বিচার্য্য এই যে, সকল পদার্থের অভ্যন্তরে চৈতন্য থাকিলেও সকল পদার্থের দেহে কি চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়? পূর্ব্বে বলিয়াছি সচেতন শব্দের দুই অর্থ করা যায়—যাহাতে চৈতন্য আছে ও যাহার দেহে চৈতন্য অভিব্যক্ত হয়। যাহাতে চৈতন্য আছে এই অর্থ করিলে সর্ব্বপদার্থই সচেতন। কিন্তু তাই বলিয়া কি, যাহার দেহে চৈতন্য অভিব্যক্ত হয় এই অর্থেও সর্ব্বপদার্থ সচেতন? এস্থলে বিবেচনা করিতে

চৈতন্যের দ্রষ্টৃভাব ও ভোক্তৃভাব।

হইবে দেহে চৈতন্যের অভিব্যক্তি বলি কাহাকে? জড়দেহ ব্যাপিয়া চৈতন্যের ভোক্তৃরূপে আবির্ভাবকে দেহে চৈতন্যের অভিব্যক্তি বলা যায়। এই অভিব্যক্তির ফলে জড়দেহ চেতনবৎ হয় ও তজ্জন্য চৈতন্য সুখাদি অনুভব করে। চৈতন্যের স্বানুভূতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সর্ব্বপদার্থান্তর্গত চৈতন্য নিজেকে নিজে অনুভব করে, কারণ চৈতন্য স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ। চৈতন্যের এই স্বানুভূতিকে ভাষার খাতিরে অনুভব বলিতে হয়, কিন্তু যেখানে অনুভাবক, অনুভাব্য ও অনুভব সবই এক চৈতন্য, সেখানে চৈতন্য নিজেকে অনুভব করে, ইহা বলা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। এই বিড়ম্বনা এড়াইয়া দার্শনিক বলিয়াছেন, ইহা চৈতন্যের স্বস্বরূপে অবস্থান। ইহাতে ভোক্তৃভোগ্যের সম্বন্ধ নাই—আছে চৈতন্যের নির্ব্বিকার নিরঞ্জন সত্তামাত্র। চৈতন্যের এই স্বস্বরূপে অবস্থান ভিন্ন আর এক ভাব আছে—সেটী ভোক্তৃভাব, যে ভাবে চৈতন্য বিষয় ভোগ করে, কখনও সুখী হয়, কখনও দুঃখী হয়। চৈতন্য ভোক্তা, জড় ভোগ্য। ভোগের মধ্য দিয়া চৈতন্য নিজেকে সুখী বা দুঃখী বলিয়া বোধ করে। এস্থলে চৈতন্য যেন দুইভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগে দ্রষ্টা হয় ও অন্যভাগে ভোক্তা হয়। বৈদিক ঋষি অতি সুন্দরভাবে এই কথাটি ব্যক্ত করিয়াছেন :—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ঋগ্বেদ ১।১৬৪

অর্থাৎ, দুই পক্ষী, একত্র সংযুক্ত ও পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন, একই বৃক্ষে বিরাজ করে। তাহাদের মধ্যে একজন স্বাদু পিপ্পল ভক্ষণ করে ও অপর জন দর্শন করে।

একই দেহবৃক্ষে দ্রষ্টা চৈতন্য ও ভোক্তা চৈতন্যরূপ দুই পক্ষী বসতি করে। এই ভোক্তা চৈতন্যের অধিষ্ঠান বশতঃ ভোগের চিহ্নস্বরূপ দেহে অঙ্গসঞ্চালনাদি বিকার হয়। অঙ্গসঞ্চালনাদি ভোক্তৃচৈতন্যের দেহরূপ ভোগক্ষেত্রে অভিব্যক্তি মাত্র। ভোগক্ষেত্রে চৈতন্যের এইরূপ অভিব্যক্তি হইলে ভোগক্ষেত্র সচেতন হয়। কর্ম্মসংস্কার বশতঃ চৈতন্যের বিষয়ভোগে বাসনা হয়, এবং বাসনাতৃপ্তির নিমিত্ত ভোগ্যক্ষেত্র দেহ গঠিত হয়। ভোক্তৃভাবাপন্ন চৈতন্যই জীব। জীবের যতক্ষণ জীবত্ব বা ভোক্তৃত্ব আছে ততক্ষণই দেহ আছে। জীবের ভোক্তৃত্ব লোপ পাইলে তাহার আর দেহ থাকে না, সে তখন জন্মমরণরূপ সংসার হইতে মুক্তি লাভ করে, চৈতন্য স্বস্বরূপে মাত্র অবস্থান করে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে,

ভোগক্ষেত্র দেহে চৈতন্যের অভিব্যক্তি।

যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণ দেহী জীবের ভোক্তৃত্ব আছে। আবার, ভোক্তৃত্ব যতক্ষণ আছে ভোগও ততক্ষণ আছে, কারণ ভোগ বিনা ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না, যে ভোগ করে না তাহাকে ভোক্তা বলা যায় না। দেহ দ্বারা ভোগ নিষ্পন্ন হয়, অতএব ভোগকালে দেহে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হইবেই। এইরূপ বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, দেহমাত্রেই দেহী চৈতন্যের ভোগজন্য অভিব্যক্তি আছে। ভোগের তারতম্যানুসারে চৈতন্যের এই দৈহিক অভিব্যক্তিরও তারতম্য হয়। যেমন, একজন জাগ্রৎ মনুষ্যের গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিলে, তাহাতে বেদনাজন্য যে পরিমাণে বিকার হয়, একজন অজ্ঞান মনুষ্যের গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিলে তাহাতে তজ্জন্য সেই পরিমাণে বিকার হয় না, কারণ জাগ্রৎ অবস্থায় যে পরিমাণ বেদনার ভোগ হয়, অজ্ঞান অবস্থায় সে পরিমাণ বেদনার ভোগ হয় না। আবার, মনুষ্যের চর্ম্মে যে পরিমাণ বেদনার ভোগ হয়, গণ্ডারের চর্ম্মে সে পরিমাণে বেদনার ভোগ হয় না। একটা জন্তুর গাত্রে যে পরিমাণ বেদনার ভোগ হয়, একটা বৃক্ষের গাত্রে সে পরিমাণ বেদনার ভোগ হয় না। একটা বৃক্ষের গাত্রে যে পরিমাণ বেদনার ভোগ হয়,একখণ্ড লৌহের গাত্রে সে পরিমাণ বেদনার ভোগ হয় না। কিন্তু এইরূপে লৌহ-প্রস্তরাদিতে বেদনার ভোগ যতই কম হউক না কেন, একেবারে লোপ হয় না, কারণ ভোগ না থাকিলে ভোক্তা থাকে না এবং ভোক্তা না থাকিলে দেহ থাকে না। অতএব একেবারে অচেতন কোন পদার্থ নাই। সকল পদার্থেই চৈতন্য ভোক্তৃভাবে থাকিয়া—ভোগের মধ্য দিয়া নিজেকে নিজে অনুভব করে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানশাস্ত্রও শনৈঃ শনৈঃ এই সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

সকল পদার্থই সচেতন।

সুতরাং চৈতন্যের অস্তিত্ব বা ভোক্তৃত্ব, এই উভয় ভাবের কোনও ভাবেই কোনও পদার্থকে অচেতন বলা যায় না। সকল পদার্থেই চৈতন্য স্বরূপে ও ভোক্তৃরূপে অবস্থান করে এবং তজ্জন্য সকল পদার্থেই চেতনা বিদ্যমান।

চেতনা যেমন জগতের সর্ব্বপদার্থেই বিদ্যমান, জড়ত্ব বা অচেতনত্বও তেমনি জগতের সর্ব্বপদার্থে বিদ্যমান। অচেতনত্বের বিদ্যমানতা বশতঃই জগৎ অর্থাৎ গতিশীল, হ্রাসবৃদ্ধিবিশিষ্ট। হ্রাস ও বৃদ্ধি, ক্ষয় ও উপচয়, জন্ম ও মৃত্যু জড়ের ধর্ম্ম। কারণ, জড় ভোগ্য; ভোগ-সম্পাদনের নিমিত্ত ভোগ্যের জন্ম ও বৃদ্ধি হয়,আবার ভোগ সমাপ্ত হইতে হইতে ভোগ্যের ক্ষয় ও সমাপ্ত হইয়া গেলে উহার মৃত্যু বা নাশ

জড় ও চৈতন্যের সম্মিলন।

হয়। পুনশ্চ, চৈতন্য অক্ষর নিত্য। ভোগ্যের সহবাসে চৈতন্য ভোক্তা, কিন্তু ভোগ্যের ক্ষয় বা উপচয়ে, জন্ম বা মৃত্যুতে ইহার ক্ষয় বা উপচয়, জন্ম বা মৃত্যু নাই। চৈতন্য জ্ঞানমাত্র, শুদ্ধ সংবিৎ। জ্ঞাতব্যের হ্রাস ও বৃদ্ধি, সৃষ্টি ও নাশ হয়, কিন্তু জ্ঞান চিরকাল জ্ঞানই থাকে। "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"। কিন্তু গতিশীল জগতে, মৃত্যুধর্ম্মী সংসারে জড় ও চৈতন্য একাঙ্গ হইয়া থাকে, যেখানে জড় সেইখানেই চৈতন্য, যেখানে চৈতন্য সেইখানেই জড়। জড় ভোগ্য ও চৈতন্য ভোক্তা। এই ভোগ্য ও ভোক্তার সম্মিলনে জগৎ হয়, অথবা এই সম্মিলনই জগৎ। শুদ্ধ চৈতন্য জগৎ পদবাচ্য নহে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, জগতে শুদ্ধ জড়নির্ম্মুক্ত চৈতন্য না থাকিলেও, চৈতন্যবিহীন কেবল জড় ত থাকিতে পারে। এ প্রশ্নের উত্তর কতকটা উপরে দিয়াছি। উপরে দেখাইয়াছি যে জীবের যে, সহজ জ্ঞান (intuition) আছে, তাহা দ্বারা জীব সর্ব্বপদার্থেই চৈতন্যের অস্তিত্ব অনুভব করে। মানুষের ভাষাও এই অনুভবের অনুকূল। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের যত উৎকর্ষ হইতেছে, ততই উহার দ্বারা জড়ে চেতনার অভিব্যক্তি প্রমাণিত হইতেছে। ইহা ছাড়া আরও দেখিতে হইবে,—জগতে জড়মাত্রই সংহত পদার্থ, বহু পরমাণুর একত্রীভূত অবস্থা। জড় অর্থাৎ অচেতন পদার্থ, স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে অক্ষম। তবে এ সংঘাত আসে কোথা হইতে? বলিতে পার, পরমাণুগত আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি হইতে। কিন্তু এই শক্তিকে চালনা করিবার জন্য তাহাতে শক্তিমান্ চৈতন্যের কার্য্যকারী হস্ত বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। সুতরাং পরমাণুতে চৈতন্যের অন্তর্ভাবিত্ব অস্বীকার করা যায় না। আর্য্যঋষি সর্ব্বশাস্ত্রেই বারম্বার এই শিক্ষাই দিয়াছেন। জড় জগতের সর্ব্বত্র চৈতন্যকে দেখিয়া জড়ের ধর্ম্ম সুখ, দুঃখ, মোহ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য জীবকে উপদেশ দিয়াছেন।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।
অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
    রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
    রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো—
    রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
    রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

সিদ্ধান্ত ঃ—জগতের প্রত্যেক পদার্থ একাধারে জড় ও চেতন। যখন উহা অপরের ভোগ্য হয় তখন উহা জড়, আবার যখন উহা নিজে অপরকে ভোগ করে তখন উহা চেতন অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থই ভোগ্যভাবে জড় ও ভোক্তৃভাবে চেতন। ফলতঃ, জাগতিক পদার্থের দুইরূপ—ভোক্তৃরূপ ও ভোগ্যরূপ। ভোক্তা ও ভোগ্যের সমবায়ে জগৎ গঠিত। অতএব জগতে জড়ত্ব ও চৈতন্য উভয়ই সর্ব্বব্যাপী, উভয়ই বিভু। দর্শনশাস্ত্রে এই জড়ত্বকে প্রকৃতি ও চৈতন্যকে পুরুষ বলে। প্রকৃতি ও পুরুষ অচ্ছেদ্য আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া জগন্ময় লীলা করিতেছেন। সংসার-ব্রজে নিত্য রাসলীলা বিরাজমান।

কল্পনা ও বাস্তব।

[লেখক—শ্রীসতীশচন্দ্র বর্ম্মণ, বি-এল্।]

১

কল্পনায় সৃজি স্বর্গ কিন্নর অপ্সরা,
ছায়াহীন দেবগণে, অনন্ত প্রভায়,
মোহন নন্দন বন রূপের পসরা,
অপার আনন্দে কবি স্মিতমুখে চায়।

২

নিম্নে—বহু নিম্নে কেলি ক্ষীণ নীহারিকা,
ছুটিছে প্রসারি পাখা কবির কল্পনা,
দূরে লুটাইছে ধরা মলিন মৃত্তিকা,
ক্ষুদ্রাদপি তারকায় কে করে গণনা?

৩

অপরূপ রূপ মাঝে, মানসগুঞ্জন,
নিমগ্ন ধরার কবি ধরায় বিস্মরি—
বসন্ত বিভব কোথা, বিহগকূজন,
সুরভিত সারাবন, পুষ্পিত বল্লরী!

৪

কোথায় হেমন্ত ধান্যে শ্যামলা ধরণী,
[illegible] গায় [illegible] দূর গিরিশিরে
কলাপীর নৃত্যকলা শুনি মেঘধ্বনি,
পুণ্যতোয়া তরঙ্গিনী ছুলে তীরে তীরে!

৫

কোথায় শরতশোভা, নীল নভঃ তল,
কুমুদ কহ্লার স্বচ্ছ সরসীর জলে,
ফুলবন বিথিকায় জ্যোৎস্না বিহ্বল,
উথলি পড়িছে রূপ যেন পলে পলে!

৬

ফিরিয়া না দেখে কবি বসুন্ধরা পানে,
পদতলে লুটাইছে প্রসূন সুন্দর,
নাহি শুনে কলকণ্ঠ পিককুল গানে;
শূন্যে গড়িতেছে স্বর্গ কল্পনাকাতর।

৭

হেথায় ঝরিছে উৎসে প্রেম ভালবাসা,
ধূলায় রয়েছে পড়ি লক্ষ হেমকণা,
সতত ক্ষরিছে মধু, কুহরিছে আশা,
কাননে প্রকৃতি চাহে কুরঙ্গনয়না।

৮

অবহেলি হেন ধরা আলোক ছায়ায়,
সুখ দুখে শোক হর্ষে মানব জীবন,
শিশুর মদির হাসি, মোহিনী মায়ায়,
কোন্ কল্পনায় রাজ্য করি আকিঞ্চন ?

৯

আমি বরিয়াছি ধরা বাস্তব জগৎ,
কি লাবণ্যে অভিনব চির মনোহর,
বিশ্বমাঝে বহিয়াছে যেন চিত্রবৎ
ঝলকি উঠিছে রূপ সুন্দর—সুন্দর।

বঙ্গের স্থাপত্য।*

[প্রথম প্রস্তাব]

[লেখক—শ্রীননীগোপাল মজুমদার।]

সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবের হৃদয়ে ভাবব্যঞ্জনার গভীর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। এই আকাঙ্ক্ষার ফলে যে প্রচেষ্টার উদ্ভব হয় তাহাই নানা আনন্দময় রসমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কবির কাব্যে ও শিল্পীর শিল্পকলায় আত্মপ্রকাশ করে। এই আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন স্তরবিভাগ আছে। জ্ঞানের আলোক যতই স্ফুটতর ও উজ্জ্বলতর হইতেছে ততই কলাবিদ্যা ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে উঠিতেছে, শিল্পীর শিল্পচাতুর্য্য সফলতায় গৌরবান্বিত হইয়া উঠিতেছে।

সাধারণতঃ শিল্পচর্য্যার উন্নতির ধারা এইরূপ। কিন্তু, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এ স্তরবিভাগ তত নিয়মানুগত বা ক্রমিক নহে। মানবজাতির ইতিহাস অনুশীলন করিলে মনে হয় জাতীয় ইতিহাসের উপর শিল্পকলার প্রভাব অত্যন্ত অধিক। বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের বিষয় যত কথা অবগত হওয়া গিয়াছে তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন ভারতশিল্পের সুগোপন অন্তঃপুরে অতীতের কত কথা নানাছন্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ শিল্পকলার নিদর্শনসমূহ অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে একটা সুমধুর সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাচীন স্থান হইতে শিল্পের যে সকল স্মৃতিচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে স্থাপত্যের নিদর্শনই অধিক। এই সকল আবিষ্কারের ফলে প্রতীচ্য পণ্ডিতসমাজে এদেশের স্থাপত্য অধিকতর সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,

* ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

ভারতীয় স্থাপত্যকে আলোচনার উচ্চ বেদিকা হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া কোনও মতে যুক্তিসঙ্গত নহে।

এদেশের সভ্যতার প্রধান উপাদান ধর্ম্মপ্রবণতা। এদেশের লোক চিরসুন্দরের উপাসক। সৌন্দর্য্যের সেবা করিয়াই তাহারা আপনাদের সভ্যতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। দেবতাকে তাহারা উপাসনা করিত সুন্দর বলিয়া, শিল্পের সেবা করিত সৌন্দর্য্য সৃষ্ট হইবে বলিয়া। ধর্ম্মপ্রবণতা ও সৌন্দর্য্যলিপ্সা তাহাদের জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মে চিরন্তনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই দুইটি মূলবস্তু ভারতীয় স্থাপত্যেও জাগরণের মহিমান্বিত আলোকে বিকশিত হইয়াছে।*

বৌদ্ধযুগে যখন ভারতময় স্থাপত্যের নবীন-জাগরণ অনুভূত হইয়াছিল, তখন তাহার একটি প্রবল তরঙ্গে বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়া যায়। অমিতাভের বিজয়-জয়ন্তী বঙ্গের শ্যামল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নূতন ভাবের আবেগে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধস্থাপত্যও বাঙ্গালীর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। এই স্থাপত্যরীতি অন্যান্যদেশীয় রীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক না হইলেও অনেকাংশে স্বতন্ত্র। পারিপার্শ্বিক দেশসমূহের প্রচলিত স্থপতিবিদ্যার প্রভাব চিরন্তন প্রথার অনুসারে বঙ্গীয় স্থাপত্য সংক্রমিত হইয়াছিল; কিন্তু এই সকলের একত্র সম্মিলনে যে অভিনব স্থাপত্যের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা সৌন্দর্য্য, কল্পনাকৌশল ও মৌলিকতার পরিচায়ক। পণ্ডিতবর ফার্গুসন সর্ব্বপ্রথম বঙ্গীয় স্থাপত্যের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার সূত্রপাত করেন। কিন্তু ইহার যথার্থ স্বরূপ কি, তাহার নিজস্বই বা কতটুকু তাহা এ পর্য্যন্ত কেহও নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইলেন না। ফার্গুসনের সমকালে অথবা তাঁহার কিছু পরে আরও কয়েকজন লেখক এদেশের স্থাপত্যের কথা আলোচনা করিয়াছিলেন, কানিংহাম তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তৎসঙ্কলিত "প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কার্য্যবিবরণী" সমূহ তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ। কিন্তু এ পর্য্যন্ত স্থাপত্যের দিক হইতে, শিল্পকলার দিক হইতে বঙ্গের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনার সূত্রপাত কেহ করেন নাই—বঙ্গীয় স্থাপত্যের ইতিহাস লিখিত হয় নাই—যে দেশে গৌড়, সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপ্তি, ত্রিবেণী প্রভৃতি নগর বর্ত্তমান ছিল, সে দেশের স্থাপত্যের ইতিহাস অদ্যাপি লিখিত হইল না।

---

* "The art of ancient India has always been purely a religious one; its architecture as well as its sculpture, which has always been intimately connected therewith, was never and nowhere employed for secular purposes."—*Grunwedel : Buddhist Art in India.*

অধুনাতন সময়ে হ্যাভেল স্মিথ-প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষিগণ ভারতীয় স্থাপত্য লইয়া আলোচনা করিতেছেন—ইহা নবযুগের সূচনামাত্র বলিয়া কথিত হইতে পারে। ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাস-উদ্ঘাটন, যথার্থ স্বরূপ-নিরূপণ এখনও ভবিষ্যতের অনির্দ্দিষ্ট ছায়ায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বঙ্গের স্থাপত্যচিহ্নসমূহের অস্তিত্ব ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। কাল এজন্য অবশ্যই দায়ী, কিন্তু 'কালে'র উপর সমস্ত দোষ চাপান কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না। অজ্ঞ বঙ্গবাসিগণ আপনাদের দেশের কীর্ত্তিনিচয়ের মূলে নিজেরাই কুঠারাঘাত করিয়াছে। এই প্রকারে বহুকীর্ত্তির লোপ হইয়াছে। ইহা অপেক্ষাও আর এক গুরুতর কারণে বঙ্গীয় স্থাপত্যচিহ্নের লোপ হইয়াছিল, সে পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তৃগণের অযত্ন ও অবহেলায়। মুসলমানরাজগণ হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের স্থাপত্যচিহ্নসমূহের ধ্বংসসাধন করিয়া আপনাদের নবীনস্থাপত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার পবিত্র দেবালয়-সমূহ বিধ্বস্ত করিয়া তাহারই ইষ্টকে মুসলমানগণ মসজিদসমূহ রচনা করেন। বঙ্গের প্রাচীনতম মসজিদ সকলের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। * প্রাচীন হিন্দুগৌড়ের ধ্বংস হইলে তাহারই উপাদানে মুসলমান গৌড়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইংরাজগণ যখন প্রথমে এদেশে আসেন তখন ভাবী অতুল রাজ্যগৌরবের কথা তাঁহাদের মনে হয় নাই—ভবিষ্যতের অচিন্ত্য প্রভাব ও অপ্রতিহত মহিমার অদৃশ্য ইঙ্গিতে তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। একসময় যে তাঁহারা বণিক্ বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভারতের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিবেন,—একথা তখন তাঁহাদের আদৌ মনে হয় নাই। সেই কারণেই পূর্ব্বগামী মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের অনুকরণে বঙ্গীয় স্থাপত্যনিদর্শনসমূহকে তাঁহারা ক্রীড়নক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। গৌড়, সপ্তগ্রাম, পাণ্ডুয়া এইরূপে হতশ্রী ও বিগতসৌধ হইয়াছে।

এনামেল-করা ইষ্টকের জন্য একসময় গৌড় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে এই ইষ্টকের লোভে অনেক রমণীয় প্রাসাদের সৌন্দর্য্য হৃত হইয়াছিল। স্থানীয় জমিদারগণ অবাধে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের ইষ্টক নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যবহার করিতে পারিতেন, তজ্জন্য নিজামৎ দফ্তরে বার্ষিক ৮০০০ মুদ্রা আসিত। গ্রাণ্ট সাহেব একথা লিখিয়া গিয়াছেন। † হুসেন সাহের

* "For materials they utilised the fragments of Hindu temples they had demolished."—*Pre-Mogul Mosques of Bengal. Journal of the Asiatic Society of Bengal. 1910. P.P.* 24—25.

† Blochmann's Geography and History of Bengal.

সমাধিমন্দির, গুণমন্ত মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ প্রভৃতি মুসলমানযুগের কীর্ত্তি সমূহও এই সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। * মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, মালদহ এবং রঙ্গপুর গৌড়ের অবশেষ আহরণ করিয়া শোভায় ও সম্পদে "মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল। † শুধু যে গৌড়ের এই দশা তাহা নহে, ভারতের অনেক নগরের অনেক পুরাকীর্ত্তি এইরূপে শাসনকর্ত্তৃগণের বর্ব্বরতায় বসুধা-পৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। লর্ড কার্জ্জন এইজন্যই ইংরাজ রাজত্বের প্রথম কল্পকে Era of Vandalism বা ধ্বংসের যুগ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই ধ্বংসের প্রতিবিধানে যত্নবান হইলেন। আজ প্রত্নতত্ত্ববিভাগের যে এত উন্নতি দেখিতেছি ইহার মূলে এই সদাশয় শাসনকর্ত্তার একাগ্র হিতকামনা বিহিত রহিয়াছে। তিনি ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তিনিচয়ের সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করিলে সেগুলি এতদিন বর্ত্তমান থাকিত কি না সন্দেহ।

বঙ্গের স্থাপত্যকীর্ত্তির অনেক লোপ হইয়াছে, কিন্তু তাহা ভাবিয়া হা হুতাশ করিয়া বিশেষ লাভ নাই। প্রাচীন কালে বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে কত শত সৌধমন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল; কালপ্রভাবে এবং বিভিন্ন তন্ত্রের শাসনকর্ত্তার ধ্বংস-সাধনেচ্ছায় তাহার অনেক লুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সব শেষ হয় নাই। অতীতের স্মৃতিপরিপূত কাহিনী-বিজড়িত অনেক কীর্ত্তিচিহ্ন এখনও বঙ্গের শান্ত-তরুবীথিকার বিহগকলতানমুখরিত অন্তরালে দেশবাসীর সহানুভূতির অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে! বঙ্গের অতীত বার্ত্তা এ সকল হইতে সংগৃহীত হইতে পারে, বিলুপ্ত স্থাপত্যবিদ্যার ইতিহাস-গুহায় এক নূতন আলোকের সম্পাত হইতে পারে।

বঙ্গের স্থাপত্যশিল্পের প্রথম সূত্রপাত কবে হইয়াছিল, প্রথম উন্মেষ কবে হইয়াছিল তাহা কল্পনা করা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, বঙ্গদেশীয় মন্দিরের প্রথম নিদর্শন খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর নির্ম্মিত মহাবলীপুরের "দ্রৌপদীর রথে" প্রতিভাত হয়।‡ মহাবলীপুর মাদ্রাজের অন্তর্গত একটি স্থান। "দ্রৌপদীর রথ" একটি মন্দিরবিশেষ, পাষাণ কাটিয়া ইহা নির্ম্মিত হয়।¶ ইহার আকৃতি বঙ্গদেশের "চৌচালা" গৃহের ন্যায়। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর

* Archæological Survey of India. (1902—3)

† Ravenshaw-Gaur, its ruins and inscriptions.

‡ J. A. S. B. 1909.

¶ Fergusson and Burgess : Cave-temples of India.

পূর্ব্বেও যখন বঙ্গদেশ ভারতের অন্যতম সভ্যপ্রদেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল, বৌদ্ধযুগে যখন এ দেশ বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছিল, তখনও যে বঙ্গের একটা স্বতন্ত্র স্থাপত্যপদ্ধতি বর্ত্তমান ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

বঙ্গদেশে এখনও মৌর্য্যশিল্পের কোনও নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি যে মৌর্য্যশিল্প এদেশে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ আছে। চীন পরিব্রাজক অন-উয়ন চোয়াঙ বঙ্গদেশের অশোকনির্ম্মিত স্তম্ভ ও স্তূপসমূহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে বহুসংখ্যক বিহার, দেবমন্দির প্রভৃতি বর্ত্তমান ছিল। পরিব্রাজক লিখিয়াছেন, যাঁহারা ধনী তাঁহারা ইষ্টকনির্ম্মিত হর্ম্ম্যাদিতে বাস করিতেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধনে বিংশতিটী সঙ্ঘারাম ও শতাধিক দেবমন্দির, সমতটে ত্রিশটী সঙ্ঘারাম ও একশত দেবমন্দির, তাম্রলিপ্তিতে দশটী সঙ্ঘারাম এবং পঞ্চাশটী দেবমন্দির এবং কর্ণসুবর্ণে উক্তসংখ্যক দেবমন্দির ও বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম বিরাজ করিত।* দেশে কতসংখ্যক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী থাকিলে এত বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম থাকিতে পারে,—পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাহা আমাদিগকে প্রথম জানাইলেন।† হিন্দুর আচার-ব্যবহারে, হিন্দুর হিন্দুত্বে, হিন্দুর সাহিত্যধর্ম্মে বৌদ্ধপ্রভাব কতদূর সংক্রামিত হইয়াছিল তাহা মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় সুধীসমাজে প্রকাশ করিয়া বরণীয় হইয়াছেন। অন-উয়ন চোয়াঙ সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশে শত শত বৌদ্ধবিহার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক-বর্ণিত বঙ্গের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের ধ্বংস হইয়াছে, সুতরাং কোথায় যে সে সকল বিহারাদি বর্ত্তমান ছিল তাহা আর এক্ষণে বলা যায় না।

ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুরে বৌদ্ধযুগের বঙ্গীয় স্থাপত্যের শত শত নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, বগুড়া প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধকীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। দিনাজপুরে বর্দ্ধনকুটী নামে একটি স্থান আছে। ওয়েষ্টমেকট সাহেব ইহাকেই পরিব্রাজক-বর্ণিত পুণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।‡ যোগীগুম্ফা বৌদ্ধস্মৃতি ছাপাইয়া রাখিয়াছে, ইহার সন্নিকটে বহুদূর-ব্যাপী ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। উত্তরবঙ্গে খেতলালের নিকটে ভানুবিহার নামে একটি গ্রাম আছে। এই

* Beal's Records of the Western Countries. Vol. II. P.P. 194—204.

† Living Budhism in Bengal. P. 2.

‡ J. A. S. B. Vol. XLIV. P. 188.

গ্রামে দুইটী উচ্চ ইষ্টকস্তূপ ও একটী দেবালয়ের অবশেষ লক্ষিত হয়। কানিংহাম বলেন, অন-উয়ন চোয়ান পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত যে পো-সি-পো বিহারের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই ভাসুবিহার। * পরিব্রাজক লিখিয়াছেন, উক্ত বিহারে প্রায় সাত শত মহাযানমতাবলম্বী বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন। বিহারের সন্নিকটে অশোকনির্ম্মিত একটি স্তূপ ছিল। পরিব্রাজক ভাসুবিহারে অনেক স্তূপ দেখিয়াছিলেন। নবদ্বীপের অন্তর্গত সুবর্ণবিহারগ্রামে প্রাচীনকালে একটী বিহার ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সমতটের অন্তর্গত সোমপুরবিহারের নাম বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত একটি বুদ্ধমূর্ত্তির পাদদেশে পাওয়া গিয়াছে। † সোমপুর কোথায় ছিল জানা যায় না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বালাণ্ডায় একটী বিহার ছিল। ভিক্ষুগণ প্রজ্ঞাপারমিতার চর্চ্চা করিতেন। আসরফপুর তাম্রশাসন ‡ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, প্রায় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আসরফপুরের সন্নিকটে একটী "বুদ্ধমণ্ডপ" বিরাজ করিত। সন্ধ্যাকর নন্দী তদীয় রামচরিতকাব্যে ¶ রামপালের রামাবতী নগরীর অতুলনীয় শোভার কীর্ত্তন করিয়াছেন, কবির লেখনীমুখে রামাবতীর বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। গৌড়কবি সন্ধ্যাকর রামাবতীকে "অমরাবতীসমান" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন :—

"অমরাবতীসমানে [ক] বরেন্দ্রীকৃতাতঙ্কাম্।
সুমনোভিরভিব্যাপ্তা নিস্প্রত্যূহামৃতস্য পরিপূর্ণৈঃ ॥"
—রামচরিত ৩।২৯।

রামাবতীনগরে "বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত" "কর্ব্বুরময় মন্দির" প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহাতে অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধমূর্ত্তি প্রপূজিত হইতেন। "কর্ব্বুরময়" বলিতে কি বুঝায় বলা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহাতে মীনাকরা ইষ্টকনির্ম্মিত বুঝায়। রামপাল রামাবতী-সন্নিধানে "জগদ্দল মহাবিহার" প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার বৌদ্ধধর্ম্মানুসরণ বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। এই বিহারে বিভূতিচন্দ্র নামে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। শান্তিদেববিরচিত "শিক্ষাসমুচ্চয়" নামক একখানি পুথির শেষে আছে :—

"দেয়ধর্ম্মোহয়ং প্রবরমহাযানযায়িনো জগদ্দলপণ্ডিতবিভূতিচন্দ্রস্য।"

* Archæological Survey of India. Vol. XV. P.P. 102—103.
† Archæological Survey of India. Vol. 1908-9. P.P. 157—158.
‡ Memoirs A. S. B. Vol. I. No. 6.
¶ Memoirs A. S. B. 1910 Vol. III.

বেণ্ডাল সাহেব তাঁহার সংস্কৃত পুথির বিবরণে * ইহার কথা বলিয়াছেন। রামচরিতে লিখিত আছে :—

"মল্লাণাং স্থিতিমূঢ়াং জগদ্দলমহাবিহারচিতরূপাম্।
দধতো লোকেশমপি মহত্তারোদীরিতোরুমহিমানম্।"

—রামচরিত ৩।৭।

রামপাল রামাবতীপুর সন্নিকটে তিনটী শিবালয় স্থাপন করেন।

বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত বহুস্থানে প্রাচীন বৌদ্ধযুগের স্থাপত্যের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বৌদ্ধস্থাপত্যের চিহ্নসমূহ পাওয়া গিয়াছে। বজ্রযোগিনী, মঠবাড়ী, বেজনীসার, ধামগড়, বাজাসন, নান্নার প্রভৃতি স্থানে যে সকল অসংখ্য ধ্বংসস্তূপ প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয় তাহা পূর্ব্বতন বৌদ্ধযুগের স্থাপত্যশিল্পের পরিচয় ফুটাইয়া তুলে।

পালবংশীয় দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে গৌড়রাজ্য একজন বৈদেশিকের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিল। দিনাজপুরের স্তম্ভলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় এই গৌড়বিজেতা ["কাম্বোজান্বয়জ"] ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে বরেন্দ্রমণ্ডলে এক শিবমন্দির স্থাপন করেন।

গৌড়ের পালবংশীয় রাজগণের রাজত্বকালে এবং তাহার পূর্ব্বে কি উপাদানে বঙ্গীয় স্থপতিগণ আপনাদিগের রচনাপ্রতিভা অভিব্যক্ত করিতেন তাহা ঠিক জানা যায় না। ফার্গুসন বলিয়াছেন, ইষ্টকই নির্ম্মাণকার্য্যের প্রধান উপাদান ছিল। এদেশে প্রস্তর অতিশয় দুর্লভ; সুতরাং প্রস্তরদ্বারা মন্দিরাদিনির্ম্মাণ বহুব্যয়সাপেক্ষ ছিল। এইজন্য বঙ্গীয় স্থাপত্যে প্রস্তর অপেক্ষা ইষ্টকই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। † ফার্গুসন প্রভৃতি লেখকগণ বঙ্গদেশে ইষ্টকের এবং খিলানের অধিকমাত্রায় ব্যবহারের যে হেতুনির্দ্দেশ করিয়াছেন হ্যাভেল তাঁহার গ্রন্থে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। হ্যাভেল বলেন "It seems more logical to assume that the Bengali builders bring bricklayers rather than stone-masons, had learnt louse the radiating arch whenever it was useful for constructive purposes long before the Muhammadans came there." ‡ মুসলমান-

* Bendall's Catalogue of the Budhist Sans. Mss. in the University Library of Cambridge.

† Fergusson : Indian and Eastern Architecture. Vol. II. P. 545.

‡ Havell : Indian Architecture. P. 56.

রাজত্বের পূর্ব্বে এদেশে যে সকল মন্দির, বিহার প্রভৃতি নির্ম্মিত হইত ফার্গুসন বলেন সেগুলির উপাদান ছিল ইষ্টক। কেবল বঙ্গদেশ প্রস্তরহীন বলিয়া যে এ রীতি প্রচলিত ছিল এমন ধারণা করা সঙ্গত নহে। ভারতের যে সকল প্রদেশ পর্ব্বতময়, যেখানে সহজেই প্রচুর পরিমাণে প্রস্তর পাওয়া যায় সে সকল স্থানেও ইষ্টকনির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর দেবালয় বিরাজমান রহিয়াছে— ভিতরগাঁ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে ইষ্টকস্থাপত্যের অসংখ্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।* গৌড়ীয় অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তিসমূহ প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বঙ্গীয় ভাস্করগণ ইষ্টকের ন্যায় প্রস্তরের উপরেও আপনাদের কলানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে এই প্রকারের অসংখ্য প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গান্ধার, মথুরা, সারনাথ প্রভৃতি স্থানের ভাস্করগণের ন্যায় বঙ্গীয় ভাস্করগণও মূর্ত্তিরচনায় অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। এমন কি গৌড়ীয় ভাস্করগণ স্থলবিশেষে অন্যান্য প্রদেশের ভাস্করগণ অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর সৌন্দর্য্যসাধনা ও নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গীয় শিল্পাচার্য্যগণ কেবল যে ইষ্টক লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন প্রস্তরে হস্তক্ষেপ করিতেন না ইহা বিশ্বাস করা যায় না। ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য চিরদিন ভারতে এক নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছে।† ভাস্কর্য্য এদেশে স্থাপত্যের অঙ্গমাত্র। দেবালয় ও দেবমূর্ত্তিতে যে সম্বন্ধ, ভারতে স্থাপত্যের সহিত ভাস্কর্য্যের প্রায় সেই সম্বন্ধ। ভারতীয় স্থপতিগণের নৈপুণ্য দেবালয়-নির্ম্মাণে এবং ভাস্করগণের নৈপুণ্য মূর্ত্তিরচনায় প্রতিফলিত হইয়াছিল।

হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে গৌড়ই বঙ্গীয় স্থাপত্যের অগ্রণী ছিল। গৌড়ে যখন বঙ্গগৌরবরবি অস্তমিত হইল, বাঙ্গালীর এত দিনের সাম্রাজ্যরচনা নিমেষে ধূলিসাৎ হইল, তখন বঙ্গের স্থাপত্যও ক্রমশঃ লুপ্ত ও বিস্মৃতপ্রায় হইয়া আসিতে লাগিল। বঙ্গের স্থাপত্যের স্মৃতি কেবল পরবর্ত্তী যুগের পাঠান ও মোগল-স্থাপত্যে রহিয়া গেল। এ যুগের স্থাপত্যচিহ্ন সমূহের প্রথা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

* Archæological Survey of India. 1908—9. Dr. Vogel's Report.

† Budhist Art in India.

সম্মানিত।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

(১)

ব্যবসার খাতিরে অমরেন্দ্রবাবুর সহিত আমার পরিচয় হইলেও তাঁহার সৌজন্যে, তাঁহার উদারতার গুণে আমার সহিত তাঁহার একপ্রকার সখ্য জন্মিয়াছিল। তিনি ত্রিপুরা জেলার জমিদার হইয়াও কলিকাতায় আসিয়া স্বদেশী সাবানের কারখানা খুলিয়াছিলেন। কলিকাতার পার্ক ষ্ট্রীটে বাস করিয়া তিনি অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন। অমরেন্দ্রবাবু সুপুরুষ, সংসারে তাঁহার স্ত্রী ব্যতীত অপর কাহাকেও দেখিতাম না। তাঁহার স্ত্রী অসামান্যা রূপবতী ও মধুরভাষিণী, বোধ হয় বিদুষী—কিন্তু বড় বিলাসপ্রিয়া। অবশ্য তাঁহার পক্ষে বিলাসিতা শোভা পাইত। সেরূপ অপ্সরকান্তি লইয়া স্থূল জগতের তুচ্ছ সাংসারিক কথাবার্ত্তা কাজকর্ম্ম করিলে সে রূপের অবমাননা করা হইত। তিনি বিলাস-বিলোল-বিলেক্ষণে সুরভি কোমল শয্যায় অর্দ্ধশায়িত ভাবে যখন আমাকে তাঁহার কল্পিত রোগের বর্ণনা দিতেন, তখন সত্য কথা বলিতে কি, ধনী অমরেন্দ্রের প্রতি আমার ঈর্ষ্যা হইত।

সে দিন অমরেন্দ্রবাবু এক ভেলভেটের চৌকীতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার সুন্দরী স্ত্রী কোমল কোচের উপর হইতে তাঁহার দেবী-দুর্লভ হাত বাড়াইয়া বলিলেন—ডাক্তারবাবু, আবার দেখুন দেখি আমার নিশ্চয় জ্বর হয়।

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—আপনার কোন অসুখ নেই। ভগবান এতটা সৌন্দর্য্য দিয়ে আপনার দেহটা গড়েছেন কি রোগের বাসা কর্‌বার জন্যে? রোগ হয় কাদের?

জমিদার-দম্পতি হাসিলেন, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিলেন—প্রেমিক প্রেমিকার চাহনী—মাধুরী ভরা, কোমলতা-মাখান দৃষ্টি। অমরেন্দ্র বলিলেন—হ'য়েছে? ডাক্তারের মুখে ঐ কথাটা না শুন্‌লে নয়?

হনুমান-চক্ষু ব্যক্তিকে সফরীনেত্রের মালিক বলিলেই সে কেবল প্রসন্ন হয় না। সুন্দরীকে সুন্দরী বলিলেও সে বড় আনন্দ পায়। প্রাণে প্রাণে তুষ্ট হইয়া অথচ চক্ষে ললনা-সুলভ লজ্জা মাখাইয়া তিনি আমার দিকে ভর্ৎসনার

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—অবশ্য অপাঙ্গে সন্তোষ। আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম—আজ্ঞে না তা না—মানে হ'চ্চে, আপনার কোন রোগ নেই। আর থাকলেও সে রোগ ডাক্তার বদ্যি ধরতে পারে না। সন্ন্যাসী দেখাতে হয়—দৈব ওষুধ খেতে হয়।

উভয়েরই মুখ গম্ভীর হইল। তাঁহারা পরস্পরের দিকে চাহিলেন। আমি বলিলাম--বলেন তো সন্ন্যাসী ডেকে আনি, আমার বাড়ীতে আজ এক সন্ন্যাসী অতিথি এসেছেন।

তাঁহারা আবার পরস্পরের দিকে চাহিলেন। অমরেন্দ্র বাবু বলিলেন—আপনি শিক্ষিত লোক হ'য়ে ঐ ভণ্ড বেটাদের প্রশ্রয় দেন? ওদের মধ্যে কত চোর জুয়োচ্চোর খুনে বদমায়েস আছে জানেন!

আমি বলিলাম—তা সত্য। কিন্তু ওদেরও মধ্যে খাঁটি লোক আছে। আমার বন্ধুটী পাগলা সন্ন্যাসী—একেবারে উদাসীন পাগল—মাঝে মাঝে আমার কাছে আসেন। বলেন তো আপনার সঙ্গে—

অমরেন্দ্রবাবু বলিলেন—মাপ্ করবেন। ওসব ভণ্ড বেটাদের আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে দিই না। সব বেটার এক একটা ইতিহাস আছে।

(২)

আমার অতিথি পাগলা সাধুর যে একটা ইতিহাস ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। তাঁহাকে উপর উপর দেখিলে মনে হইত তিনি আনন্দময়, শোক দুঃখ হিতাহিত শুভাশুভ সকল বিষয়ে উদাসীন। কিন্তু একটু গভীরভাবে তাঁহার চরিত্রটা অধ্যয়ন করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইত যে, কতকগুলা অতি গভীর দ্বন্দ্বময় ভাবের সঙ্গে তাঁহাকে অহরহঃ সংগ্রাম করিতে হয়। আমি চিকিৎসা ব্যবসায় করিতাম বলিয়াই এ কথাটা বুঝিতে পারিতাম। তাঁহার মানসিক সংগ্রামের চিহ্ন তাঁহার চক্ষে, তাঁহার ললাটে এবং তাঁহার তরুণ শিরের স্থানে স্থানে শুক্ল কেশে বিদ্যমান ছিল। আমার মনে হইত যে তিনি ক্রমশঃ সে সংগ্রামে বিজয় লাভ করিতেছিলেন। "ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনী" প্রভৃতিতে তিনি সমদর্শী অপর লোকে এরূপ বুঝিলেও আমার দৃঢ়বিশ্বাস তিনি স্ত্রীজাতিকে ঘৃণা করিতেন। তিনি সম্ভ্রান্তবংশীয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। প্রকৃত সাধুর মত তিনি অর্থকে কেবল তুচ্ছজ্ঞান করিতেন না, অর্থের উপর তাঁহার ঘৃণা ছিল। প্রায় সাত মাস পূর্ব্বে তিনি যখন আমার নিকট আসিয়াছিলেন তখন আমি তাঁহাকে পাথেয়র জন্য পাঁচটি টাকা দিয়াছিলাম। তিনি প্রথমতঃ অর্থগ্রহণ

করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন শেষে কিন্তু আমার মনে কষ্ট হইবে ইহা বুঝিয়া বাম হস্তে পাঁচটি মুদ্রা গ্রহণ করেন। স্বামীজি চলিয়া যাইবার মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার পুত্র আসিয়া বলিল—বাবা আজ আমাদের ফুটবল ক্লবের খুব লাভ হ'য়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কেন?

বালক বলিল—আমরা খেলছিলাম সেখানে সেই পাগলা সন্ন্যাসী গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। আমরা সকলে তাঁহাকে নমস্কার করলাম। তিনি বলিলেন—তোমাদের কাপ্তেন কে? রমেশ এগিয়ে গিয়ে বল্‌লে—আজ্ঞে আমি। তিনি অমনি তাঁর হাতে পাঁচটি টাকা দিয়ে বললেন—এই নাও আমার চাঁদা। কিন্তু দেখো যেন কোন রকম কুকথা, কুকাজ, কুভাব তোমাদের ক্লবের কোন ছেলের মধ্যে না প্রবেশ করে।

অমরেন্দ্রবাবুর বাটী হইতে আসিয়া আমি পাগলা স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে বসিলাম। সাধারণতঃ শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় যে সকল কথা আছে তিনি সরল তেজস্বী ভাষায় সেই সব কথার অবতারণা করিতেন। আজ নানা কথার পর তিনি বলিলেন,—মোটের উপর ধরি মাছ না ছুই পানিই হ'ল আমাদের দেশের শাস্ত্রের শিক্ষা।

আমি বলিলাম—আচ্ছা স্বামীজি আপনি যখন সংসারে ছিলেন তখন কি ঐ নীতি অনুসারে কাজ করতেন?

স্বামীজির মুখ গম্ভীর হইল। তিনি বলিলেন—একদিন বল্‌ব। আমি যখন সংসারে ছিলাম তখন এ সকল নীতির অস্তিত্বও জানতাম না। যখন সংসারে ছিলাম তখন আমার গৃহে দুর্গোৎসব হ'ত, সব হ'ত। কিন্তু আমি সে সকল কাজে কেবল রাজসিক ভাবে লিপ্ত থাকতাম। সংসারে ভাল কাজের মধ্যে করতাম—দান।

আমি বলিলাম—তার চেয়ে আর ভাল কাজ কি আছে?

তিনি হাসিয়া বলিলেন—এত বড় ভাল কাজটাও অন্য সকল কাজের মত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক তিন ভাবে করা যায়। রাজসিক দান কা'কে বলে জানেন?

আমি বলিলাম—হ্যাঁ

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্।

তিনি বলিলেন—ঠিক কথা। আমি কেন দান করতাম জানেন? আমার পিতা সামান্য অবস্থা থেকে প্রায় ক্রোড়পতি হ'য়েছিলেন। কি ক'রে অর্থসঞ্চয় করেছিলেন কেহ জানত না। প্রকাশ্যে কুসীদজীবীর কাজ করতেন দেখতাম। কিন্তু তাঁর ঐশ্বর্য্যের মুলটা কি ব্যবসায়ে হ'য়েছিল তা' কেহ ঠিক জানত না। গ্রামে প্রবাদ ছিল—

স্বামীজি হঠাৎ যেন বুঝিলেন যে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি আপনার পূর্ব্ব জীবন সম্বন্ধে এত কথা কহিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি নীরব হইলেন। আমার কিন্তু বড় কৌতূহল জন্মিল। আমি বলিলাম—কি প্রবাদ ছিল?

তিনি বলিলেন—যে বাবা যক্ষের ধন পেয়েছিলেন। যে যক্ষের ধন পায় সে কখন সুখী হয় না, কখনও অর্থব্যয় করতে পারে না। পিতা বড় কৃপণ ছিলেন, আর বোধ হয় কখনও সন্তুষ্টচিত্ত ছিলেন না।

তিনি নীরব হইলেন। তাঁহার ললাটে নানাপ্রকার রেখা পড়িল। তিনি মনের মধ্যে কি একটা তোলাপাড়া করিতেছিলেন। হঠাৎ মুখ তুলিয়া তিনি বলিলেন—পিতা মৃত্যুশয্যায় আমাকে বলিয়াছিলেন যে অসৎ উপায়ে তিনি ঐ ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হ'য়েছিলেন। কি অসৎ উপায় তা' তিনি আমাকে বলেন নি। কিন্তু একথা বলেছিলেন যে, যে উপায়ে তিনি ঐ ধনের মালিক হয়েছিলেন সে বৃত্তান্ত কেহ শুনলে তাঁকে জেলে যেতে—

স্বামীজি নিজেই শিহরিয়া উঠিলেন। দুই এক মুহূর্ত্ত এদিক ওদিক চাহিয়া তিনি বলিলেন—সেই জন্যে আমি দান করতাম। ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে যে পাপটা মিশান ছিল, সে পাপটা খণ্ডনের জন্যে দান করতাম।

আমি একটু অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—স্বামীজি আপনাদের জন্মস্থান কোথায়?

স্বামীজি গম্ভীর ভাবে বলিলেন—আর ওকথা না।

(৩)

স্বামীজি এক এক সময় বালকের মত হাসিতেন। তিনি আমাদের প্রস্তাব শুনিয়া মহোল্লাসে হাসিতে লাগিলেন। আমরা সকলেই হাসিলাম। প্রস্তাবটা অপর কিছু না, প্রস্তাবটা স্বামীজির ছবি তুলিবার। আমার বন্ধু সুরেশ্বর সখ করিয়া ফটোগ্রাফি বিদ্যা শিখিয়াছিল। সে স্বামীজির ছবি তুলিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছিল। স্বামীজি বালকের মত হাসিয়া বলিলেন—ছিঃ! ছিঃ! এই নশ্বর দেহটার আবার এত সম্মান!

সুরেশ্বর ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বলিল—আপনি তো আর ছবি দেখবেনও না রাখবেনও না। আপনি একবার ধ্যানস্থ হ'য়ে বসবেন মাত্র, আমরা আপনার ছবি তুলে নে'ব। আপনি কিছু টেরও পাবেন না।

স্বামীজি বড় অমায়িক। এ সামান্য বিষয়ে আমাদের কর্ম [illegible] সকলে মনঃকষ্ট পাইবে ইহা আশঙ্কা করিয়া তিনি [illegible] একখানা হরিণের চামড়ার উপর তিনি পদ্মাসনে বসিলেন। [illegible] পরি-বর্ত্তন। আমরা উভয়েই বিস্মিত হইলাম। শরীরের সহিত যে মনের দৃঢ় সম্বন্ধ তাহা নিত্যই উপলব্ধি করিতাম। কিন্তু শরীর ও মনের বাঁধন যে এত দৃঢ়, তাহা পূর্ব্বে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। সেই কৃশ মলিন, গৈরিকধারী, মুণ্ডিতশির, তরুণ সাধুকে সাধারণতঃ দেখিলে মোটেই ভক্তির উদ্রেক হইত না। তাঁহাকে ভদ্রঘরের একটা অর্ব্বাচীন ভবঘুরে বলিয়াই মনে হইত। কিন্তু আমাদের চিত্রের জন্য তিনি যখন চক্ষু মুদিয়া যোগাসনে বসিলেন, এক অপূর্ব্ব কান্তি আসিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সমুজ্জ্বল করিল। সে রূপ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তিনি যে ভিতরে যোগ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। তাঁহার সে মূর্ত্তি হইতে আমাদের অনুপলব্ধ একটা গভীর আনন্দের চিহ্ন স্ফুরিত হইতেছিল। আমার পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে মানুষের তেজ চক্ষু ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায় না। মদন-ভস্মের সময় মহাদেবের ললাট হইতে তেজশিখা বহির্গত হইয়া বিশ্ববিজয়ী কামদেবকে ভস্মীভূত করিয়াছিল, একথা শাস্ত্রে পড়িয়াছিলাম বটে, কিন্তু চক্ষু ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয় হইতে তেজের স্ফুরণ বাস্তব জগতে দেখি নাই। স্বামীজির কিন্তু সমস্ত বদন হইতে একটা অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল। অজ্ঞ লোকের পক্ষে তাহা কিরূপ ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল সে কথা বলিতেছি।

অমরেন্দ্রবাবুর বাঁশরীমোহন নামে পুরাতন ভৃত্য ছিল। কেবল বাঁশরীই তাঁহার ত্রিপুরার ভৃত্য, অপর সব ভৃত্য কলিকাতার। সে রূপে গুণে প্রায় রবীন্দ্রনাথের "কেষ্টাবেটা"র মত। অমরেন্দ্রবাবুর পরিবারে তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। সে আপন ইচ্ছামত কাজকর্ম্ম করিত। আপন মনে ঘুরিত ফিরিত, কাহারও নিকট নিজ কার্য্যের জবাবদিহি করিবার তাহার প্রয়োজন ছিল না. সকলে তাহাকে শ্রদ্ধা করিত, যত্ন করিত, ভয় করিত বটে; আমার কিন্তু প্রথম দিন হইতে তাহার উপর একটা বিদ্বেষভাব জন্মিয়াছিল। কেন জানি না তাহাকে দেখিলে আমি বড় পাপী, বড় নিষ্ঠুর, বড় বিশ্বাসঘাতক

বলিয়া মনে করিতাম, কিন্তু অমরেন্দ্রবাবু এবং তাঁহার গৃহিণীর তাহার উপর অচল বিশ্বাস ছিল। অবশ্য আমার জ্ঞানতঃ সে কোনও গর্হিত কার্য্য করে নাই। কিন্তু তবু তাহার উপর আমার একটা ভীষণ বিদ্বেষ ভাব ছিল। আমার এই স্বতঃজাত প্রবৃত্তির মূলে যে সত্য ছিল তাহা অদ্যকার ঘটনা হইতে বেশ বুঝিয়াছিলাম।

আমরা যখন স্বামীজির ছবি তুলিতেছিলাম, তখন সেই স্থলে বাঁশরীমোহন আসিয়া উপস্থিত হইল। সে স্বামীজির দিকে চাহিয়া প্রকৃতপক্ষে কাঁপিতে লাগিল। ভূতের ভয় পাইলে মানুষে যেমন শিহরিয়া উঠে, অত বড় বলিষ্ঠ কৃষ্ণকায় বাঁশরীমোহন স্বামীজির জ্যোতির্ম্ময় মুখের দিকে চাহিয়া সেই প্রকার শিহরিয়া উঠিল। তাহার পর মাতালের মত টলিতে টলিতে লোকটা প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি তাহার অনুবর্ত্তন করিলাম, পরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কি বাঁশরীমোহন ?

বাঁশরীমোহন অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল—মা ঠাকরুণের অসুখ করেছে, বিকেলে আমাদের ওদিকে একবার যাবেন।

আমি বলিলাম—আচ্ছা তা' যাব। তোমার কি অসুখ করেছে নাকি ?

গৃহে আসিয়া বাঁশরী সামলাইয়া লইয়াছিল। সে একটু হাসির ভাণ করিয়া বলিল—অনেকটা পথ রোদে হেঁটে এসেছি কিনা ডাক্তার বাবু তাই দেহটা আনচান ক'রে উঠেছিল।

আমি বলিলাম—তবু ভাল। আমি ভাবলাম বুঝি তুমি সন্ন্যাসী দেখে আঁতকে উঠেছিলে।

বাঁশরী বলিল—না। যেতে ভুলবেন না ডাক্তার বাবু। মা ঠাকরুণ বড় রাগ করবেন।

(৪)

স্বামীজি চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। অবশ্য চিত্রে তাঁহার সে জ্যোতির বিকাশ হয় নাই। কিন্তু তবু চিত্রে স্বামীজির মুখে যথেষ্ট তেজের পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। সে চিত্র দেখিয়া সকলেই সুরেশ্বরের শিল্পচাতুর্য্যের সুখ্যাতি করিয়াছিল।

সেদিন অমরেন্দ্রবাবু সে সময় সে গৃহে ছিলেন না। তাঁহার স্ত্রী আমাকে তাঁহার কল্পিত রোগের কথা বলিতেছিলেন। এই রোগের কল্পনায় তাঁহার হস্তপদ চলাফেরা একটু ভারী করিয়াছিল। সর্ব্বদা একটা আলস্যের ভাব তাঁহার অঙ্গে বিরাজ করিত। সেটুকু তাঁহার মত সুন্দরীকে বড় মানাইত।

আমি তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে বলিলাম—সেদিন সন্ন্যাসীর কথা বলছিলাম মনে আছে ?

তিনি তর্জ্জনীতে বস্ত্রাঞ্চল জড়াইতে জড়াইতে মদালসা ভাবে বলিলেন—কে সন্ন্যাসী ?

আমি বলিলাম—সেই যে অমরেন্দ্রবাবু বল্লেন—সন্ন্যাসী মাত্রেই ভণ্ড, জুয়াচোর।

তিনি সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি পূর্ব্ববৎ অলসভাবে বলিলেন—কে জুয়াচোর ?

আমি পকেট হইতে স্বামীজির ফটোচিত্র বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলাম। বলিলাম—দেখুন দেখি কি ব'লে মনে হয় ?

সর্ব্বনাশ! আমি কখনও এরূপ কথা স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতে পারি নাই। স্নায়ুরোগে উত্তেজক পদার্থ একেবারে নিষিদ্ধ তাহা জানিতাম। কিন্তু স্বামীজির চিত্রের তেজ ইঁহার স্নায়ুর এত অধিক উত্তেজনা করিতে পারে সে সন্দেহ মোটেই আমার মনে হয় নাই। চিত্রখানি দেখিবামাত্র সুরেন্দ্রবাবুর স্ত্রীর চক্ষু স্থির হইল, হস্তপদ দৃঢ় হইল,মুখে রক্ত ছুটিয়া তাহা গভীর রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিল। একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া তিনি মূর্চ্ছিতা হইলেন। আমি বড় অপ্রতিভ হইলাম। তাড়িত ঘণ্টা টিপিলাম। ভৃত্য ছুটিয়া আসিল। আমি তাঁহার চক্ষে শীতল জলের প্রক্ষেপ দিতে আরম্ভ করিলাম। ধীরে ধীরে তিনি চক্ষু মেলিলেন। আমি বলিলাম—ভাল হ'য়েছেন ?

তিনি কেবল ঘাড় নাড়িলেন। এমন সময় অমরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাড়াতাড়ি আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন।

আমি অপ্রতিভ হইয়াছিলাম। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, ইঁহার দুর্ব্বল স্নায়ু—তেজীপুরুষের একখানা ছবি দেখে ফিট হ'য়েছিল।

অমরেন্দ্রবাবু কথাটা ভাল বুঝিলেন না। মার্ব্বেলের ছোট টেবিলের উপর ছবিখানা পড়িয়াছিল। তিনি সেখানা হাতে করিয়া তুলিয়াই যেন তাড়িতের আঘাত পাইলেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। তপ্ত লৌহের মত চিত্রখানা তাঁহার হস্ত হইতে ভূমে কার্পেটের উপর পড়িয়া গেল।

তিনি রোষকষায়িত নেত্রে উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া বলিলেন—এ সব কি ?

আমি বলিলাম—সন্ন্যাসীর ছবি।

তিনি বলিলেন—তা আমার বাড়িতে কেন? ডাক্তারী করতে এসেছেন্ ডাক্তারী করবেন।

তাঁহার দুর্ব্বিনীত কণ্ঠস্বরে আমি বড় মর্ম্মাহত হইলাম। তাঁহার মুখের ভদ্রতার কোমলতার ভাব একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল। একটা নীচ নারকী ভাব তাঁহার মুখ হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কোথাও ভদ্রতার চিহ্নমাত্র ছিল না।

আমি তাঁহার কথায় বড় বিরক্ত হইলাম। আমি বলিলাম—আপনি আত্ম-বিস্মৃত হ'চ্চেন কেন?

তিনি পূর্ব্বের মত উত্তেজনার সুরে বলিলেন—কেবল ডাক্তারের মত ডাক্তারী করতে পাবেন তো আসবেন। কলকাতার সহরে ডাক্তারের অভাব নেই। বিশেষ আমার বাড়ীতে।

তাঁহার মুখে এ নীচ ও নিষ্ঠুর ভাবটা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমি বুঝিলাম সে মুখের এইটাই স্বাভাবিক ভাব, ভদ্রতার ও অমায়িকতার ভাবটা কেবল মুখোস মাত্র।

আমি ধীরে ধীরে তাঁহার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

(৫)

আমি কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না। স্বামীজির চিত্রখানি পুনঃ পুনঃ দেখিলাম, অপর অনেক লোককে সে চিত্রখানি দেখাইলাম। অনেকে মুগ্ধ হইল বটে কিন্তু অমরেন্দ্রবাবুর মত বা তাঁহার স্ত্রীর মত কেহ বৈদ্যুতিক প্রবাহের আঘাত অনুভব করিল না। তাঁহাদের পুরাতন ভৃত্য বাঁশরীমোহনও স্বামীজিকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিল! তবে কি ইহারা স্বামীজির সহিত পরিচিত? স্বামীজির অতীত জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে মাত্র একটি কথা জানিতাম—তিনি প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ছিলেন। অমরেন্দ্রবাবুও ধনবান। ইঁহাদের উভয়ের কি কোনও সম্পর্ক ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর পাইবার কোনও উপায় ছিল না। সেদিন অমরেন্দ্রবাবু আমাকে যেরূপ অবমান করিয়াছিলেন তাহাতে ভবিষ্যতে তিনি আহ্বান করিলেও তাঁহার বাটীতে যাইব না তাহা স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু এই রহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিবার একটা প্রবল বাসনা আমার হৃদয়ে বলবতী হইয়াছিল।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে একদিন স্বয়ং অমরেন্দ্রবাবু আমার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সে দিনের মুহূর্ত্তব্যাপী কঠোর নীচ ভাবের চিহ্ন অবধি তাঁহার মুখে

ছিল না। তিনি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আবার আমাকে তাঁহার গৃহে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

আমি বলিলাম—আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? সন্ন্যাসী—

আমার কথায় বাধা দিয়া অমরেন্দ্রবাবু বলিলেন—হ্যাঁ সেই কথাটা বুঝাইবার জন্যেই আমার আসা। একবার এক সন্ন্যাসীর ওষুধ খেয়ে আমার স্ত্রীর এক নিকট-আত্মীয় মারা যান। সেই অবধি আমাদের সন্ন্যাসী-বিদ্বেষ। সেদিনে সন্ন্যাসীর ছবি দেখে তাঁর পুরাণ শোকটা জেগে উঠেছিল। দুর্ব্বল স্নায়ুতে সে বেগ ধারণ করতে পারেন নি।

আমি বলিলাম—আচ্ছা এ ছবির সাধুকে আপনারা চেনেন?

তিনি বলিলেন—না।

(৬)

অমরেন্দ্রবাবু গবর্ণমেণ্টের হস্তে বিভিন্ন ব্যাপারে দানের জন্য অনেক অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন, আপনার অমায়িকতায় রাজপুরুষদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট অমরেন্দ্রবাবুর সহৃদয়তার জন্য তাঁহাকে রাজসম্মানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। রায় অমরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর তাঁহার প্রমোদ-উদ্যানে বন্ধুবান্ধবদিগকে ভোজ দিতেছিলেন। কোন অনুষ্ঠানের ক্রুটি ছিল না। বাগানবাটী অতি মনোরম সাজে সজ্জিত হইয়াছিল। নৃত্য গীত পান ভোজনে সকল আমন্ত্রিত ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হইয়া নবভূষিত রায় বাহাদুরের যশোগান করিতেছিল। প্রমোদ-উদ্যানের একদিকে পর্দ্দা মিলন হইয়াছিল—কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত কুলের কুলবধূরা তথায় অমরেন্দ্র-গৃহিণীর আদর-আপ্যায়নে বিমোহিত হইতেছিল সন্দেহ নাই। আমি তাঁহার সে রাত্রের বেশভূষা দেখি নাই। কিন্তু আমি মানস চক্ষে সেই দেবীমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছিলাম—মদালসা ভাব, মরালগতি, মুখে মধুর সরস হাস্য, চক্ষে বিলাস-বিলোল কটাক্ষ। আজ অমরেন্দ্রবাবুর সম্মানে তিনি সম্মানিতা—ইঁহাদের আদর-আপ্যায়নে কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত নরনারী পরিতুষ্ট।

উদ্যানের ভিতর অত আমোদ-প্রমোদ একটানে সহ্য করিতে পারিলাম না। অনেকে দল বাঁধিয়া বাগানের চারিদিকে ঘুরিতেছিল। লতা বীথিকার ঈষদন্ধকারে দুই একদল যুবক বসিয়া সুরাপান করিতেছিল ও উচ্চহাস্য করিতেছিল। আমি আস্তে আস্তে উদ্যানের প্রাচীরের বাহিরে একটা নিভৃত

স্থানে শুষ্ক রসাল স্কন্ধের উপর বসিয়া একটু বিশ্রামলাভ করিতেছিলাম। সে স্থলে জ্যোৎস্নালোক ব্যতীত অপর আলোক ছিল না।

সে স্থলে বসিয়া এক একবার সজ্জিত প্রমোদ-উদ্যানের দিকে চাহিতে-ছিলাম—সুসজ্জিত নিমন্ত্রিতদিগের বস্ত্রের শোভা দেখিতেছিলাম, এক একবার নিস্তব্ধা প্রকৃতির দিকে চাহিতেছিলাম। অকস্মাৎ কে আমার স্কন্ধ স্পর্শ করিল। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম স্বামীজি—পাগলা স্বামী—মুণ্ডিতশির, কৃশকায়, কটিতে মলিন গৈরিক বাস, অঙ্গে পথের ধূলা—দৈন্যের, দারিদ্র্যের জলন্ত চিত্র—বিশেষ সে স্থলে। বৈপরীত্যটা বড় লাগিল ভাল—একদিকে ধন ঐশ্বর্য্য বিলাস রাজসম্মান—অপরদিকে দৈন্য দারিদ্র্য বৈরাগ্য। কেবল তাঁহার মুখের জ্যোতিঃ—কিন্তু সে 'মুখের জ্যোতিঃ অন্ধকার রাত্রে বড় লক্ষ্য হইতেছিল না। আমি পাগলা স্বামীকে প্রণাম করিলাম, বলিলাম—কি স্বামীজি হঠাৎ কোথা থেকে ?

স্বামীজি হাসিয়া বলিলেন—আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। এ কি ব্যাপার !

অনেকগুলি "বড়"লোক অমরেন্দ্রকে ঘিরিয়া ধন্যবাদ দিতেছিল। তাড়িতা-লোকে অমরেন্দ্রের মুখের অমায়িক হাসিটুকু যেন জ্বলিতেছিল। আমি বলিলাম —স্বামীজি ঐ যে লোকটি দেখছেন—উনি রাজসম্মান পেয়েছেন, খেতাব পেয়েছেন, সকলে তাঁহাকে অভিনন্দন করচেন। কি সুখচিত্র! বাগানের অপরদিকে ওঁর স্ত্রী মহিলাদের পরিতুষ্ট করছেন—বড় সুন্দরী, অপ্সরীর মত চেহারা। বলুন দেখি স্বামীজি এসব দেখেও আপনারা বলে বেড়ান কামিনী-কাঞ্চনে সুখ নাই !

স্বামীজি হাসিলেন। বলিলেন—শুনবেন ? আমার কাহিনী ?

আমি বলিলাম—নিশ্চয়।

স্বামীজি শুষ্ক বৃক্ষস্কন্ধে বসিলেন, এবার তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মুখখানা আমার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি বলিলেন—আজ আমার মন একেবারে জয় হ'য়েছে। গুরুদেব বলেছেন আর ভয় নেই। মনে আছে বলেছিলাম—ধনীপুত্র ছিলাম, অতুল ধনের অধীশ্বর। কাঞ্চন ছিল, সুন্দরী কামিনীও ছিল—অপ্সরার মত রূপ, মন্থরগমনা, মদালসা, বিলাস-বিলোলনেত্রা, হাত পা গুলা যেন নবনীনির্ম্মিত। কামিনী কাঞ্চন দুই ছিল—তবু বৈরাগ্য গ্রহণ করলাম—কেন ?

কেন ? সে প্রশ্ন বহুদিন আমার মনে উদিত হইয়াছিল। আমি স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলাম।

তিনি বলিলেন—আমার পিতার এক পিতৃমাতৃহীন ভাগিনেয় ছিল। আমারই সমান বয়স। দুজনেই দুজনকে দাদা বলিতাম। আমি পরিণীত ছিলাম, সে তখনও অনূঢ়। স্ত্রীকেও বিশ্বাস করিতাম তাহাকেও বিশ্বাস করিতাম। একদিন নিজের চক্ষে দেখিলাম—বুঝলেন আর মুখে ব'লে কি হ'বে—অপ্সরা স্ত্রী আর পিস্‌তুতো ভাই—

স্বামীজি স্থির হইল। উত্তমরূপে মুখের সকল স্থল পর্য্যবেক্ষণ করিলাম—একেবারে ভাবহীন—দ্বেষ নাই, লজ্জা নাই, ক্রোধ নাই, কাম নাই—কেবল স্বর্গীয় জ্যোতিঃ।

তিনি বলিলেন—যৌবনমদে মত্ত হইয়া তখন সিদ্ধান্ত করিলাম উভয়কেই হত্যা করিব। এক পুরাতন ভৃত্যও তাহাদের পাপে লিপ্ত ছিল। সকলগুলাকে কাটিব, পৃথিবীর ভার কমাইব। আবার ভয় হইল, লজ্জা হইল—অপর ভাব আসিল—পিতার পাপলব্ধ ধন—পাপীয়সী স্ত্রী—কামিনী কাঞ্চন উভয়ই পাপের—রাগে ক্ষোভে কিংকর্ত্তব্য হইয়া পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। বাগানের বাহিরে একটী সন্ন্যাসী ধরিল। বলিল—'বেটা এতেও শিক্ষা হয় না। সব ধন ওদের হাতে ছেড়ে, স্ত্রী ছেড়ে আমার সঙ্গে আয়।' দেখলাম লোকটা অন্তর্য্যামী। মন্ত্র-মুগ্ধের মত তাঁর সঙ্গে চললাম। আট বৎসর সাধনা ক'রে মাত্র পরশু দিন একেবারে শান্ত হ'য়েছি—রোজ দ্বন্দ্ব করতাম ক্রমশঃ বৃত্তি জয় করছিলাম—আজ আর কোন দ্বেষ নাই, কোন দ্বন্দ্ব নাই, ক্রোধ নাই, মনে ক্ষমা আছে কিন্তু ভগবানের ক্ষমা নাই—

স্বামীজি স্থির হইলেন। ভিতর হইতে হাসির রোল উঠিল। জলতরঙ্গের ঐক্যতান বাজিল।

স্বামীজি বলিলেন—এখন তাহারা ক্ষণিক আনন্দ করিবে কিন্তু প্রকৃতি ছাড়িবে না। তাহাদেরই মঙ্গলের জন্যে তাদের শাস্তি হ'বে। গুরুদেব ভবিষ্যতটা দেখিয়েছেন—লোকটা পাগল হ'য়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, আবর্জ্জনার ভিতর থেকে উচ্ছিষ্ট অন্ন কুড়িয়ে খাবে। স্ত্রীলোকটা একটা ভৃত্যের সঙ্গে ব্যভিচার করে অসহ্য যন্ত্রণা পাবে, দাসীবৃত্তি করবে শেষে হাঁসপাতালে প্রাণত্যাগ করবে। আমরা প্রার্থনা ক'রেও তাদের বাঁচাতে পারব না। তাঁর ইচ্ছা!

আমি বলিলাম—তাদের আর দেখেছেন ?

তিনি বলিলেন—আমি সন্ন্যাসীর সঙ্গে চলে যাবার পর তাদের দেশে বাস

করা অসাধ্য হ'ল। তারা আমার পিতার যক্ষের ধন নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে এসে নাম বদলে বাস করছে। লোকে জানে তারা স্বামী স্ত্রী।

জলতরঙ্গ বন্ধ হইল। একজন বলিল—সবাই বল 'জয় রায় বাহাদুরের জয়।' শত কণ্ঠে শব্দ উঠিল—"জয় রায় বাহাদুরের জয়।"

স্বামীজি বলিলেন—আচ্ছা যাই। ঈশ্বর রায় বাহাদুরের মঙ্গল করুন। উনিই আমার ভাই—ওঁর অপ্সরা-প্রতিম "স্ত্রী" পূর্ব্বে আমার ধর্ম্মপত্নী ছিলেন—ওঁ।

স্বামীজি উঠিলেন। আমি বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। বাক্‌রোধ হইল—ধূলি-ধূসরিত, মলিন গৈরিক-বাস পরিহিত, মুণ্ডিতশির, কৃশ স্বামীজি অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়া গেল—আমি দেখিলাম তাঁহার চৌদিকে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ—আর অমরেন্দ্র পাপী লম্পট রাজসম্মানে সম্মানিত, হাস্যমুখ অমরেন্দ্র, প্রমোদোদ্যানে দাঁড়াইয়া সমাজের অভিনন্দন গ্রহণ করিতেছিল। বড় তৃপ্ত বড় সুখী বড় সম্মানিত! পাগল ধূলার মধ্যে চলিতেছিল। আর তাহারই ঐশ্বর্য্য, তাহারই ললনা লইয়া—কে জানে সমাজে এমন কতগুলি আছে? একবার সন্ন্যাসীর দিকে চাহিলাম, একবার তাহার দিকে চাহিলাম—উভয়ের ভবিষ্যৎ স্মরণ করিলাম, স্ত্রীলোকটার ভবিষ্যৎ স্মরণ করিলাম। সর্ব্বনাশ!

কে জানে কে সম্মানিত—সন্ন্যাসী না রায় বাহাদুর! আমি ধীরে ধীরে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

কবি রঙ্গলাল।

[লেখক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।]

কবি রঙ্গলালের অদৃষ্টও কতকটা তাঁহার গুরু ঈশ্বর গুপ্তের অনুরূপ। গুপ্ত-কবির মত তিনিও তাঁহার প্রাপ্য গৌরব হইতে বঞ্চিত। প্রায় ছাব্বিশ বৎসর হইল, তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহার দেশে তাঁহার একটা স্মৃতি সভাও হইল না।

* *
*

আধুনিক সমালোচনার ঠেলায় রবীন্দ্রনাথ 'ঋষি' হইতেছেন, কত অকবি 'কবিবর' আখ্যা পাইতেছেন,—শনিবারে শনিবারে কত সভার, কত সমিতির বাজে বৈঠক বসিতেছে, কিন্তু যে কবির কলম হইতে বাহির হইয়াছে—

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,—কে বাঁচিতে চায়।'

সে কবির কথা কেহ বলে না,—তাঁহার কাব্যের কৃতিত্বের কেহ আলোচনা করে না! ১লা বৈশাখ তাঁহার মৃত্যু-দিন গেল, সাহিত্য-পরিষদও সেদিন তাঁহার স্মৃতির সম্মানার্থ কিছু করা কর্ত্তব্য বোধ করিল না!—মনুষ্যত্বের এদেশে এতই দুর্ভিক্ষ!

* *
*

রঙ্গলাল কি দরের কবি?—প্রথম শ্রেণীর না হউন, তিনি যে একজন উচ্চদরের কবি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নাট্য-সাহিত্যে যেমন মধুসূদন, উপন্যাস-সাহিত্যে যেমন প্যারীচাঁদ, এ যুগের কাব্য-সাহিত্যে বোধ হয় রঙ্গলালও তেমনই। তিনি নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন বটে,—"পুরাতন দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরাজ। দীনবন্ধু ইঁহাদের সন্ধিস্থল।"—আমাদের কিন্তু মনে হয়, বঙ্কিম এস্থলে দীনবন্ধুর নাম না করিয়া রঙ্গলালের নাম করিলেই যুক্তি-যুক্ত করিতেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে উষার আলোক দেখা যায়, রঙ্গলাল সেই উষার আলোক; আর মধুসূদন সেই উষার সূর্য্যস্বরূপ।

* *
*

রঙ্গলালের উপর আর একটা অবিচার আমরা করিয়া আসিতেছি।—তিনিই যে সর্ব্বপ্রথম ভারত-ইতিহাসের উপকরণ লইয়া বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, এ কথা কেহই মুখ ফুটিয়া বলি না। কবিবর নবীনচন্দ্র তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধে' বলিতেছেন,—

'দুরাশার মন্ত্রে মুগ্ধ আমি মূঢ়মতি।
নতুবা যে পথে কোন কবি বিচরণ
করেনি, সে পথে কেন হবে মম গতি?"

—এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ও বলিয়াছেন,—"নবীনচন্দ্র যে পথে গমন করিয়াছেন, সে পথে কেহই তাঁহার পূর্ব্বে পাদক্রম করেন নাই।" কিন্তু কথাগুলা ঠিক নহে। রঙ্গলালই নূতন ফুলে নূতন মালা গাঁথিবার আশায় ভারত-ইতিহাসের 'মণিপূর্ণ খনি'তে সাহস সহকারে সর্ব্বপ্রথম প্রবেশ করেন। 'পদ্মিনী-উপাখ্যান'ই প্রথম বাঙ্গালা ঐতিহাসিক কাব্য। তাঁহার 'কর্ম্মদেবী' ও 'শূর সুন্দরী'র উপাখ্যানটুকুও রাজস্থান হইতে গৃহীত।

* *
*

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতি-বৈর ঘটিয়াছে।" সেই 'সৌভাগ্যে'র সূত্রপাত ঠিক হেমচন্দ্রের কবিত্ব হইতে হয় নাই,—হইয়াছিল রঙ্গলালের কবিত্ব হইতে। ঈশ্বর গুপ্তে স্বদেশ-প্রেম ছিল বটে, কিন্তু জাতি-বৈর

ছিল না। রঙ্গলালের হাতেই উহার প্রথম আমদানী হয়। এমন কি, তিনি 'কুমার-সম্ভবে'র যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাও ঐ জাতি-বৈর ভাবের প্রেরণায়। তিনি নিজমুখেই বলিয়া গিয়াছেন যে,—"আমরা ভিন্ন দেশীয়দিগের দ্বারা অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ বিধায়, ক্রমে ক্রমে সনাতন রীতি নীতি, আচার ব্যবহারাদি পরিহার পূর্ব্বক বহুরূপীর ন্যায় বহুরূপ ধারণ করিতেছি। আমরা পূর্ব্বে কি ছিলাম, এইক্ষণেই বা কি হইয়াছি, ইহার পর্য্যালোচনা করণে স্বদেশহিতৈষী মাত্রেরই মনে বাসনা জন্মে, সেই বাসনা পূর্ণ করণে প্রাচীন গ্রন্থনিকর বিশেষতঃ স্বদেশীয় পুরাতন কাব্যকলাপই সবিশেষ শক্তি রাখে; প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের কিরূপ পরিচ্ছদ, কিরূপ বাসগৃহ ছিল, কিরূপ নিয়মে বিবাহাদি সংস্কার সম্পন্ন হইত, তাহা মহাকবি কালিদাসের লিপিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন নহেন, তাঁহারা তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়া পূর্ব্বোক্ত অভিলাষ কথঞ্চিৎ রূপে পূর্ণ করিতে পারেন, তন্নিমিত্তেও আমি এই মহাকাব্যের অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হই।"—তাই বলিতেছিলাম, রঙ্গলাল জাতি-বৈর ভাবের সর্ব্বপ্রধান না হউন,—প্রধান ঘটক বটে। "আমরা পূর্ব্বে কি ছিলাম, এইক্ষণেই বা কি হইয়াছি"—একথা বাঙ্গালীকে রঙ্গলাল নানা রকম করিয়া শুনাইয়া গিয়াছেন। জাতি-বৈর-ভাবের তিনি প্রথম প্রচারক।

* *
*

অনুবাদেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যকে যথাযথভাবে বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ এদেশে রঙ্গলালই সর্ব্বপ্রথম করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। সে অনুবাদিত গ্রন্থ—কুমারসম্ভব। ভাষা ও ছন্দের উপর রঙ্গলালের যে কি অদ্ভুত অধিকার ছিল, তাহা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদৃচ্ছাক্রমে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা—

"কনক কমল ঘায় পীড়িত পার্ব্বতী কায়,
করজলে বিঘ্নিত লোচন,
নামিলে নদীর জলে, কটি বেরি মীনদলে
করে পুনঃ মেখলারচন ॥"

রঙ্গলালের 'কুমারসম্ভবে'র পূর্ব্বে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'বাসবদত্তা' বাজারে বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেখানি সংস্কৃত কাব্যের ঠিক অনুবাদ নহে—ভাবানুবাদ মাত্র।—মূলের সহিত অনেকস্থলেই ইহার মিল নাই।

* *
*

রঙ্গলাল-সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুকে বিশেষ কিছু কখনও বলিতে শুনি নাই। তবে সঞ্জীব-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একবার লিখিয়াছিলেন যে,—"রঙ্গলালের পদ্মিনী উৎকৃষ্ট উচ্চ অঙ্গের ভাবমালায় পরিপূর্ণ; উহাতে সর্ব্বপ্রথম হিন্দুমহিলার সতীত্ব ও দেশানুরাগ পবিত্রানুরাগ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। স্বাধীনতার মোহিনী শক্তির ছটা দেখাইয়া দিয়াছেন। ইনি বহুকালাবধি পদ্যাদি আর লিখেন না; কিন্তু ইঁহার কবিত্ব-শক্তির ও কাব্য-লিখন-ক্ষমতার কিছুমাত্র ন্যূনতা হয় নাই। ৩।৪ বৎসর হইল, বঙ্গদর্শনে ইনি 'নীতিকুসুমাঞ্জলি' নামে কতক-

গুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার মত পরিষ্কার, ইংরেজিতে যাহাকে smart বলে, তেমন কবিতা আর কখন দেখি নাই। তাঁহার কবিতার দৌড় ঠিক পোপের মত। পরিষ্কার টিকল, অথচ সম্যক সম্পূর্ণ।"—ইহা ছাড়া, আর একজন মনীষীও রঙ্গলালের সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম—রমেশচন্দ্র। রমেশচন্দ্র তাঁহার "Literature of Bengal" নামক গ্রন্থের একস্থলে লিখিয়াছেন,—"His পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্ম্মদেবী and সুরসুন্দরী are full of spirited descriptions of war and heroism. No authentic history perhaps affords to the poet such stirring tales of heroism and valour as that of Rajastan, and our poet has served his country well by embalming passages from the annals of Rajasthan in admirable verse."—কিন্তু এসব কথা এখনকার কয়জন পাঠক জানে?

স্বর্গীয় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

[লেখক—শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।]

[জন্ম ২০শে জুন, ১৮৭১ ; মৃত্যু ৮ই জুন, ১৯১৫]

যে সকল প্রবাসী বাঙ্গালী চরিত্র, সদাচার ও মনীষা-প্রভাবে যুক্তপ্রদেশ-বাসীর হৃদয় অধিকার করিয়াছেন, স্বর্গীয় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম।

বিগত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ডাক্তার সতীশচন্দ্র পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে সতীশচন্দ্রের বয়স মাত্র ৪৪ বৎসর হইয়াছিল।

মনীষী সতীশচন্দ্রের মেধা ও পাণ্ডিত্য দেশ-প্রসিদ্ধ ছিল। প্রয়াগের ত্রিবেণী-সঙ্গমে যেমন গঙ্গা যমুনা সরস্বতী এই ত্রিধারার সমাবেশ,—প্রয়াগ-প্রবাসী সতীশচন্দ্রেও তেমনই মনুষ্যত্ব, পাণ্ডিত্য ও চরিত্র এই ত্রি-রত্নের মিলন। মানুষে এমন ত্রিত্ব,—এমন জ্ঞান, ধর্ম্ম, ভক্তি এই ত্রিধারার সমবায় বড় একটা দৃষ্ট হয় না।

বাঙ্গালার কোনও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারে সতীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। সে পরিবারে ব্রহ্মণ্যের গৌরবও যেমন ছিল, আভিজাত্যের মর্য্যাদা-বোধও তেমনই প্রবল ছিল। এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের এক শাখা যখন আগ্রায় অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে সতীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। যেখানে রমণীর সৌন্দর্য্যের উপর স্থপতি-বিদ্যার শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য 'তাজ' বিরাজ করিতেছে, সেই আগ্রা সহরে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও ভক্তির সৌন্দর্য্যে সৌন্দর্য্যশালী সতীশচন্দ্র জন্ম-

পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। 'তাজে'র সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-কৌশলে বিশ্বের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু সতীশচন্দ্রের জ্ঞান ধর্ম্ম-ভক্তির সৌন্দর্য্য বিকশিত হইতে না হইতেই ইহলোক হইতে তিরোহিত হইল! এমন অকাল-মরণ বড়ই শোচনীয়, কিন্তু উপায় নাই। বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবীর, কর্ম্মবীর ও ভক্তিবীরগণের অধিকাংশই এমনই অকালেই সংসার হইতে অপসারিত হইয়াছেন।

সতীশচন্দ্রের প্রতিভা পাঠজীবনেই সুপ্রকট হয়। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে—১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আলিগড়ের "মহম্মেডান য়্যাংলো ওরিয়েণ্ট্যাল কলেজ" হইতে সতীশচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে বেশীর ভাগ মুসলমান ছাত্রেরাই অধ্যয়ন করে। হিন্দু ছাত্রের অবশ্য এখানে প্রবেশের কোনও বাধা ছিল না। সতীশচন্দ্র যে শেষ জীবনে সমন্বয়ের পথে থাকিতেন, এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরোধ ও পার্থক্যে কোনও দিনই তিনি বিচলিত হন নাই,—তাহার ভিত্তি এই আলিগড়ের শিক্ষামন্দিরে। এখানে তিনি প্রীতি ও মিলনের মন্ত্রেই দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন,—বিরোধ বা বিদ্বেষের ছায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাই, যুক্ত-প্রদেশের সকল শ্রেণীর, সকল বর্ণের, সকল জাতির লোক তাঁহাকে ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সতীশচন্দ্র এলাহাবাদ ও কলিকাতা উভয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই বি-এ পরীক্ষা দিলেন। তখন তিনি আগ্রা কলেজের ছাত্র। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়েই ইংরাজী অনার্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। এই বৎসরের মার্চ্চ ও নভেম্বর মাসে তিনি যথাক্রমে এলাহাবাদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। হুগলী কলেজে অধ্যাপনা করিবার সময়ে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এল্-এল্-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এইখানেই সতীশচন্দ্রের ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি ও কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন; তদবধি তিনি এই কার্য্যই করিতেছিলেন। ওকালতীতে তাঁহার প্রভূত আয় ছিল।

সাধারণতঃ অর্থ আসিলে লোকে অর্থেরই পরিচর্য্যা করিয়া থাকে। কিন্তু সতীশচন্দ্র যে ধাতুতে গঠিত ছিলেন, তাহা অর্থকে মানুষের সেবাতেই নিযুক্ত [illegible] করিয়াছিল। আর্ত্তের সেবায়, অভাব-গ্রস্তের অভাব-

বিমোচনে,—এক কথায় 'দরিদ্র-নারায়ণে'র পরিচর্য্যায় তিনি অকাতরে অর্থ দান করিতেন। বহু স্বদেশী শিল্পবাণিজ্যানুষ্ঠানেও সতীশচন্দ্র অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। দরিদ্র ছাত্রগণের শিক্ষাবিধানের জন্য চিরদিনই সতীশচন্দ্র মুক্তহস্ত ছিলেন। পরের ক্লেশ-মোচনের জন্য সতীশচন্দ্র আত্মক্লেশ উপেক্ষা করিতেন। আপনার ভাণ্ডার শূন্য করিয়াও তিনি পরের সাহায্য করিতেন। সতীশচন্দ্রের দান অপরিমেয় ছিল, কিন্তু তাহাতে তামসিকতা ছিল না। দক্ষিণ হস্ত দান করিলে তাঁহার বামহস্তকে তিনি সে কথা জানাইতে দিতেন না। বিদ্যাসাগর, ও তারক পরামাণিকের মত গুপ্তদান তাঁহার যথেষ্টই ছিল। সুতরাং সতীশচন্দ্রের তিরোধানে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তগণের যে ক্লেশ হইবে, তাহা সহজে বিদূরিত হইবে না।

সতীশচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান সুগভীর ছিল। তিনি ঠাকুর আইনের অধ্যাপক ছিলেন। "স্পেসিফিক্ রিলিফ" সম্বন্ধে তিনি যে আইন-পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ব্যবহারশাস্ত্র-ক্ষেত্রে তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ হইয়া থাকিবে। ইহাতে তাঁহার প্রগাঢ় মনীষা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি ও মৌলিক গবেষণার প্রভূত পরিচয় বিদ্যমান। সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারশাস্ত্রবিৎ স্যর রাসবিহারী ঘোষ 'মর্টগেজ' সম্বন্ধে যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন, সতীশচন্দ্রের পুস্তক তাহার সমশ্রেণীভুক্ত হইবার গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। সতীশচন্দ্র ইংরাজীতে সুলেখক ছিলেন, এবং শুনিয়াছি, বাঙ্গালাও বেশ লিখিতে পারিতেন। মিল্টনের 'কোমাস', বার্কলির 'ডায়ালগ' এবং উপনিষদের সম্বন্ধে তিনি যে সকল পুস্তক লিখিয়াছেন, সেগুলি তাঁহার স্মৃতি সাহিত্য-মন্দিরে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

সতীশচন্দ্র অদ্বিতীয় কর্ম্মবীর ছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রের মাঝেই তিনি দেহপাত করিয়াছেন। দেশবাসীর সকল কল্যাণকর অনুষ্ঠানেই তিনি যোগদান করিতেন। কংগ্রেসের বক্তৃতামঞ্চে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদিকায় কোনও স্থলে সতীশচন্দ্রের কণ্ঠ নীরব ছিল না। দেশে শিক্ষাপ্রচারের জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ ছিল। দেশবাসী যাহাতে জাতীয়ভাবে শিক্ষালাভ করে, এজন্য প্রস্তাবিত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে উদ্যোগী ছিলেন। তিনি বালিকা-বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন,—বালিকাগণই উত্তরকালে মাতৃপদাভিষিক্ত হইবে। মাতা শিক্ষিতা না হইলে সন্তানের সুশিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি হয় না।

হুগলীতে প্রসিদ্ধ সোহং স্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেই পরিচয়ই

ক্রমশঃ উভয়কে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়াছিল। সোহং স্বামী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, সতীশচন্দ্রও বেদান্তের পরম ভক্ত। গ্রীষ্মের সময়ে সতীশচন্দ্র নাইনিতালে গিয়া সোহং স্বামীর আশ্রয়ে বাস্ করিতেন ও ধর্ম্মালোচনায় কাল কাটাইতেন। সতীশচন্দ্র সমগ্র মানবে নারায়ণের অধিষ্ঠান দেখিতেন। তাই মানুষের সেবাই তাঁহার মতে সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম ছিল।

সংসারে তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র, কর্ত্তব্যপরায়ণ ভ্রাতা, কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ স্বামী;—সংসারের বাহিরে বৃহত্তম সংসারে তিনি আর্ত্তের বন্ধু, দরিদ্রের সহায়; কর্ম্মী, জ্ঞানী, ত্যাগী, ঋষি ও তাপস।

প্রয়াগের যুক্তবেণীতে বাঙ্গালী জাতির যে রত্ন অকালে বিসর্জ্জিত হইল, আশা করি, বাঙ্গালার মুক্তবেণীতে আবার সে রত্নের আবির্ভাব হইবে।

সাহিত্য-সমাচার।

বিদ্যোদয়ঃ।—স্বর্গীয়-হৃষীকেশশাস্ত্রিণা প্রবর্ত্তিতম্। সংস্কৃতমাসিকপত্রম্। সম্পাদকৌ শ্রীভববিভূতি-বিদ্যাভূষণ এম, এ, শ্রীভবভূতি-বিদ্যারত্নৌ। মাঘ—চৈত্র। বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের অধ্যুষিত বঙ্গদেশে এই একখানি মাত্র সংস্কৃত সাময়িক পত্র কোনও রূপে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। মলাটের উপর 'মাসিক পত্র' বলিয়া লেখা থাকিলেও তিন মাস অন্তর ইহার সংখ্যাত্রয় একত্র বাহির হয়। সুতরাং "বিদ্যোদয়" এখন ত্রৈমাসিক পত্র রূপেই পরিণত হইয়াছে। স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্রদ্বয় ইহার সম্পাদক। শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ কনিষ্ঠ হইলেও সম্ভবতঃ এম, এ, পাশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নামই প্রথমে বসিয়াছে। নতুবা দ্বন্দ্ব সমাসের নিয়মেও শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্নের নাম পূর্ব্বে থাকিত।

প্রথমেই শ্রীযুক্ত কালীপদ কাব্যব্যাকরণতীর্থের কবিতা—"সরস্বতীস্তোত্রম্"। লেখক "গীত গোবিন্দের" অনুকরণে কবিতা লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু প্রতি শ্লোকেই অধম মিল। "পরভৃতরুতমতি মাত্রং" "দধদিব বন্ধনসূত্রম্" "মলয়সমীরো মন্দং" "চুম্বতি সুমধুরকুন্দম্"—এইরূপ অদ্ভুত মিলের কবিতা লিখিয়া জয়দেবকে না ভ্যাংচাইলেই ভাল ছিল। অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ, "পাশ্চাত্যদেশেষু সংস্কৃতালোচনপ্রবৃত্তিঃ" প্রবন্ধে বিদেশীয় যে সকল মনীষী, ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলনে যত্নবান্ ছিলেন, তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। 'বিদ্যোদয়ে''র এই সংখ্যায় সকল লেখকের নাম প্রবন্ধের নিম্নদেশেই সন্নিবেশিত আছে, কেবল এই প্রবন্ধেরই শিরোভাগে "লেখকঃ—শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ, এম, এ"—মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা এই বৈশিষ্ট্যের কারণ বুঝিলাম না। ইহা সম্পাদকীয় গৌরবের পরিচায়ক হইলে দ্বিতীয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্নের লিখিত প্রবন্ধের নিম্নে

লেখকের নাম সংযোজিত থাকিত না। শ্রীযুক্ত ভববিভূতিবাবুর এই প্রবন্ধে একটুও রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় নাই; প্রবন্ধটী যেন বাঙ্গালা ভাষার বিভক্তি বদলাইয়া লিখিত হইয়াছে। "খৃষ্টীয়পঞ্চদশশতাব্দ্যা অন্তিমভাগে ইউরোপখণ্ডেষু ধারাবাহিকযুদ্ধ বিগ্রহাদিসমাজবিধ্বংসকর-ঘটনাপুঞ্জেষু নির্ব্বাণং গতেষু—" এইরূপ সংস্কৃত ভাষা দেখিলে মনে হয়, ইহা যেন কোনও স্কুলের বালক "খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তিম ভাগে ইউরোপ খণ্ডে ধারাবাহিক যুদ্ধ বিগ্রহাদি সমাজ-বিধ্বংসকর ঘটনাপুঞ্জ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে—" এই বাঙ্গালা হইতে অনুবাদ করিয়াছে। লেখকের জানিয়া রাখা উচিত যে, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত লিখিবার ভঙ্গী (Style) একরূপ নহে। লেখক, সংস্কৃত মাসিক পত্রের সম্পাদকতা করিতেছেন. 'যুদ্ধ' ও 'বিগ্রহ' যে এক পর্য্যায়ের শব্দ, ইহাও কি তাঁহার জানা নাই? লেখক এই প্রবন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে নানা ভাষায় লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছে। আমাদের মনে পড়ে, লণ্ডন হইতে প্রকাশিত "জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তরে"র ভূমিকায় মহামতি গোল্ডষ্টুকার, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি পাশ্চাত্যদেশীয়দিগের অনুরাগের কথা বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লেখক আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যানুরাগীদিগের মধ্যে জনসন, ভিনিস, উড্রফ প্রভৃতির নাম বাদ দিয়া কেবল বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের আসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। জানি না, এ স্তুতিবাদের মধ্যে কোনও পার্থিব প্রত্যাশা আছে কি না। শ্রীযুক্ত ইন্দীবরকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ, "ব্রাহ্মণাচারঃ" প্রবন্ধে ব্রাহ্মণদিগের সদাচারের আবশ্যকতার কথা বলিয়াছেন। কেবল ব্রাহ্মণ কেন, সকল বর্ণেরই সদাচার অবলম্বনীয়। শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন, "ফটিকচন্দ্রচরিতম্" লিখিয়াছেন। ইহা কি গল্প? "রাখালদাস ন্যায়রত্নপরলোক-গমনে বিলাপঃ" শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্কতীর্থের লিখিত কবিতা। কবিতায় ভাষালালিত্য ও ভাব-মাধুর্য্য উভয়েরই অত্যন্তাভাব। কতকগুলি শব্দ ছন্দোবদ্ধ করিলেই কবিতা হয় না। এই কয়েক ছত্র কবিতা লিখিতে গিয়া লেখক আবার "রঘুবংশে"র অজ-বিলাপ হইতে "করুণা-বিমুখেন মৃত্যুনা"—এই এক চরণ আত্মসাৎ করিয়াছেন। এই সকল কবিযশঃপ্রার্থী সত্যই করুণার পাত্র। "রত্নপ্রয়াণম্" নিবন্ধই এই সংখ্যার "বিদ্যোদয়"কে গৌরবান্বিত করিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিয়োগে বারাণসীতে আহূত বিরাট শোক-সভায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাই "রত্নপ্রয়াণ" নামে "বিদ্যোদয়ে" বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধের প্রসন্ন গম্ভীর ভাষা ও অলঙ্কারের সংসৃষ্টি দেখিলে ইহা এ যুগের রচনা বলিয়া বোধ হয় না। এই প্রবন্ধ পড়িবার সময়ে 'বাসবদত্তা' পড়িতেছি বলিয়া ভ্রম হয়। এই প্রবন্ধের একস্থানে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিশেষণরূপে "সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা" লিখিত আছে। "বিদ্যোদয়ে"র সম্পাদক, এই স্থান চিহ্নিত করিয়া পাদটীকায় লিখিয়াছেন, "জ্ঞানার্থকবেত্তের্ব্বেত্তেতিরূপং দুর্ঘটং তথাপ্যনু-প্রাসরসিকৈর্ব্বিন্দতেরেতদ্রূপমঙ্গীকৃতমিতি মত্বা সন্তোষ্টব্যং বৈয়াকরণৈঃ।" অর্থাৎ 'জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতু হইতে 'বেত্তা' পদ সিদ্ধ হয় না, তথাপি অনুপ্রাস-রসিক লেখক, লাভার্থক বিদ্ ধাতু হইতে 'বেত্তা' পদ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, ইহা মনে করিয়া বৈয়াকরণগণ সন্তুষ্ট থাকিবেন।' 'বিদ্যোদয়'-সম্পাদকের এ ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়। শ্রীযুক্ত তর্করত্ন মহাশয় কি সম্পাদকের কাণে

কাণে বলিয়া দিয়াছেন যে, আমি জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতু হইতে 'বেত্তা' পদ সিদ্ধ করিয়াছি। তিনি হয় ত বিচারার্থক বিদ্ ধাতু (যাহার বিন্তে রূপ হয়) হইতে 'বেত্তা' পদ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তাহাই করা যুক্তিসিদ্ধ। এক ঈশ্বর বা যোগী ব্যতীত সকল তত্ত্বের জ্ঞাতা কেহ হইতে পারে না; অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ সর্ব্বতত্ত্বের বিচারকর্ত্তা হইতে পারেন। সম্পাদক মহাশয় যে স্বীয় শব্দশাস্ত্রজ্ঞতা প্রকাশের জন্য লিখিয়াছেন, লাভার্থক বিদ্ ধাতু হইতে (যাহার 'বিন্দতি' রূপ হয়) 'বেত্তা' পদ হইয়াছে, এ উক্তি তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রকটনের প্রতিবন্ধকতাই করিতেছে। কারণ, ব্যাঘ্রভূতি, কাশিকাকার ও ধাতুবৃত্তিকার মাধবাচার্য্যের মতে লাভার্থক বিদ্ ধাতু সেট্, জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতুর ন্যায় ইহারও 'বেদিতা'ই রূপ হইবে, 'বেত্তা' হইবে না। কাশিকার স্পষ্টই লিখিয়াছেন, "বেত্তিবিন্দতী উদাত্তাবেব। বেদিতা বিদ্যানাম্। বেদিতা ধনস্য।"—কাশিকা, "একাচ উপদেশেঽনুদাত্তাৎ।" ৭।২।১০

সম্পাদকের এই সীমালঙ্ঘন সঙ্গত হইয়াছে কি?

ঢাকার লাড্ডু (ও অন্যান্য গল্প)—মূল্য ।৵০ আনা। শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন নাগ প্রণীত ও প্রকাশিত। আমরা বহুদিন হইতে 'দিল্লির লাড্ডু'র নাম শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু উহা সাকার কিম্বা অশ্বডিম্বের মত নিরাকার পদার্থ তাহা এতাবৎ জানিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। লেখক কিন্তু তাহার একটা বেশ পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"আমাদের দেশে বিবাহের পরদিন জামাইকে গল্পচ্ছলে গল্পের পাত্র পাত্রীগণ যেমন "জামাই ঠকানো" কৌতুকে জলের সহিত নুন, চৈ পাতার পান, বিছানার নীচে ভিজা চাঁদর (?) দেন—দিল্লিতেও তদ্রূপ তৃণদ্বারা খাবার তৈয়েরী করিয়া চিনির বেঠন দিয়া দিতেন। আজও দিল্লির কোন কোন স্থানে এই প্রথা বিদ্যমান আছে।" "ঢাকার লাড্ডু" কিন্তু "দিল্লির লাড্ডু"র মত কিছু না বা কৌতুকের জিনিষ।" এ ছত্রের অর্থ ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম না হইলেও বুঝা যায় যে "ঢাকার লাড্ডু খাবার জিনিষ।" লেখক উক্ত পরিচয় দিয়া 'ঢাকার লাড্ডু' শীর্ষক একটী গল্প-রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মধ্যে এই গল্পটী হৃদয়গ্রাহী ও শ্রেষ্ঠ রচনা। কিন্তু ইহার শেষ চারি ছত্র বাদ দিলে গল্পটীর "আর্ট" বজায় থাকিত বলিয়া মনে হয়। "পথের মাঝে" ও "জীবন পথে" গল্পদ্বয়ে 'রোমান্স' (Romance) আছে। 'পরিণাম' গল্পটী নূতনত্ব বর্জ্জিত। 'পুনরাগমন' সমাজচিত্র। নববিবাহিতা বধূকে স্বামী বলিল—"আমি যাচ্ছি, নির্ম্মলা! এই আমার শেষ দেখা।" "চোখে ঘুম মুখে ত্রাস" লইয়া বালিকা বলিয়া উঠিল, "একি! কোথা যাচ্ছ, প্রিয়তম? ... ... উন্মুক্ত বক্ষে, এলোকেশে তাড়াতাড়ি বাম হাতে শরীরের ভর রাখিয়া ডান হাত বাড়াইয়া স্বামীর কাপড় ধরিয়া সেই সিক্ত চোখে তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "যেওনা বলছি। ... ... আমি ত কিছু করিনি প্রিয়তম। আমি ছাড়বোনা। কাছে এস! উঃ!" ... ... 'জোর করিয়া কাপড় ছিনাইয়া' স্বামী চলিয়া গেলে বালিকা "মা! মা!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।"—হিন্দুর ঘরে সদ্যঃ বিবাহিতা বালিকার মুখে এই বক্তৃতাগুলি অস্বাভাবিকতা-দোষদুষ্ট।

পুস্তকখানির ছাপা কাগজ প্রভৃতি ভাল হইয়াছে, দেখিলে পাঠ করিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু ভাষার দোষ, বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতির জন্য 'ঢাকার লাড্ডু' পাঠকের রসনা তৃপ্ত করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। লেখক 'কৈফিয়তে' বলিয়াছেন তিনি উহার জন্য দায়ী নহেন। দায়িত্ব গ্রহণ না করার কারণ অবশ্য তিনি লিখেন নাই। যাহা হউক, ত্রুটীগুলি পর সংস্করণে সংশোধিত হইলে এবং স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্জ্জিত হইলে পুস্তকখানি উপাদেয় হইবে। গল্পগুলির আখ্যানবস্তু ভাল, লেখকের শক্তি ও সাধনা আছে বলিয়াই আমরা পূর্ব্বোক্ত ইঙ্গিতটুকু দিয়া রাখিলাম।

নেমি-চরিত।

[লেখক—শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারে আমাদের যেমন দর্শন, পুরাণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থরাজি বিরাজমান আছে, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সেইরূপ বিবিধ গ্রন্থ, জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। এতদিন পর্য্যন্ত জৈনদিগের অধিকাংশ গ্রন্থ অপ্রকাশিত ছিল। শঙ্করাচার্য্যের 'শারীরক ভাষ্যে' ও মাধবাচার্য্যের 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে' অতি সংক্ষিপ্তভাবে জৈন দার্শনিক মতবাদ অবগত হওয়া ভিন্ন স্বতন্ত্র জৈন দর্শন গ্রন্থ পাঠ করিবার সুযোগ ছিল না। জৈন কাব্য ব্যাকরণাদির ত প্রচারই ছিল না। যাঁহারা জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ, তাঁহারা মুদ্রাঙ্কিত ভাবে জৈন গ্রন্থ-প্রচারের একান্ত বিরোধী। তাঁহাদের বিশ্বাস, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগ্রন্থ মুদ্রিত হইলে তাহার মাহাত্ম্য নষ্ট হয়। এই কারণে জৈন গ্রন্থাবলী প্রচারিত হইতে পারে নাই। কত জৈন মন্দিরে কীটদষ্ট হইয়া বিবিধ জৈনগ্রন্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি জৈনাচার্য্যগণ সেগুলির প্রচার করিতে দেন নাই। এখন ক্রমশঃ এতাদৃশ ধর্ম্ম-বিশ্বাসী বৃদ্ধ জৈনদিগের অভাব হইতেছে, তাই ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি জৈন মুদ্রিত গ্রন্থ শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে।

বোম্বাইয়ের 'কাব্যমালা'য় চম্পূ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি অনেক জৈনগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বোম্বাইয়ের 'জৈনগ্রন্থ রত্নাকর' কার্য্যালয় হইতেও নানাবিধ জৈন পুস্তক বাহির হইতেছে। কাশীস্থ শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয়বিধ জৈনধর্ম্মাবলম্বীদিগের উদ্যোগে কাশীতেও অনেক জৈনগ্রন্থ প্রচারের কার্য্য চলিতেছে। মদীয় পরমবন্ধু কাশীস্থ "জৈনধর্ম্ম প্রচারিণী-সভা"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত পান্নালাল বাক্‌লীওয়াল মহোদয়ের ঐকান্তিকচেষ্টার ফলে কাশীতে 'সনাতন জৈনগ্রন্থমালা' নামক সংস্কৃত 'সিরিসে' অনেক জৈন দার্শনিক গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে। ইহারই উদ্যোগে জৈনদিগের পূজনীয় গ্রন্থ 'মহাপুরাণে'রও মুদ্রণ-কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে।

সম্প্রতি 'জৈনগ্রন্থ-রত্নাকর-কার্য্যালয়' হইতে "নেমি-চরিত" নামক একখানি

কাব্য বাহির হইয়াছে। এই পুস্তকখানি ইতিপূর্ব্বে 'কাব্যমালা'য় ও মারাঠী অনুবাদ সহিত স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে 'নেমিদূত' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকখানির রচয়িতা 'বিক্রম' নামক একজন জৈন কবি। গ্রন্থকর্ত্তা কাব্যের উপসংহারে লিখিয়াছেন যে,—

"তদদুঃখার্ত্তং প্রবরকবিতুঃ কালিদাসস্ত কাব্যা
ন্তস্ত্যং পাদং সুপদরচিতান্মেঘদূতাদ্ গৃহীত্বা।
শ্রীমন্নেমেশ্চরিতবিশদং সাঙ্গনস্যাঙ্গজন্মা
চক্রে কাব্যং বুধজনমনঃপ্রীতয়ে বিক্রমাখ্যঃ॥"

[কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের সুললিত 'মেঘদূত' কাব্যের অন্তিম চরণ গ্রহণ করিয়া সাঙ্গন-পুত্র বিক্রম কবি সুধীজনের সন্তোষার্থ করুণ রসাত্মক এই নেমিচরিত কাব্য রচনা করিয়াছেন।]

জৈন দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথের সম্বন্ধীয় একটী পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বন পূর্ব্বক কবি এই 'নেমি চরিত' কাব্য লিখিয়াছেন। কাব্যারম্ভের অবতরণিকা এইরূপ :—

যদুবংশে অন্ধকবৃষ্ণি নামক এক সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁহার দশ পুত্র। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠের নাম সমুদ্রবিজয় ও সর্ব্বকনিষ্ঠের নাম বসুদেব। সমুদ্র-বিজয়ের ঔরসে শিবাদেবীর গর্ভে নেমিনাথের এবং বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। জৈন পৌরাণিক গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ 'নবম নারায়ণ'-রূপে অভিহিত হইয়াছেন *।

সমুদ্রবিজয়, বসুদেব প্রভৃতি যে সময়ে মথুরায় বাস করিতেন, সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজ মাতুল কংসকে বধ করেন। কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ স্বীয় জামাতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। জরাসন্ধ তৎকালে একজন প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। তিনি জামাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য

* জৈন সম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বর বীতরাগ, সর্ব্বজ্ঞ ও হিতোপদেশক। জৈনেরা ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন না। ইঁহাদের মতে যুগ ছয় প্রকার। ১ম সুষমা সুষমা, ২য় সুষমা, ৩য় সুষমা দুঃসমা, ৪র্থ দুঃসমা সুষমা, ৫ম দুঃসমা, ৬ষ্ঠ দুঃসমা দুঃসমা। 'দুঃসমা সুষমা' নামক ৪র্থ যুগে ৬৩ জন শলাকা পুরুষের আবির্ভাব হয়। ২৪ তীর্থঙ্কর, ৯ নারায়ণ, ৯ প্রতিনারায়ণ, ৯ বলভদ্র ও ১২ চক্রবর্ত্তী—ইহাদিগকে শলাকা পুরুষ বলা হয়। জৈন সমাজে কেবল তীর্থঙ্কর-দিগেরই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা আছে, নারায়ণাদির মূর্ত্তি কল্পিত হয় না। ৯ জন নারায়ণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ অন্তিম নারায়ণ।

অগণ্য সৈন্যবাহিনী লইয়া মথুরা আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই অতর্কিত ব্যাপারে যদুবংশীয়েরা অতিমাত্র ভীত হইয়া পড়িল। তাহাদের এমন সামর্থ্য নাই যে, তাহারা রাজা জরাসন্ধের সহিত সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হয়। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ তখন বালকমাত্র। অবশেষে অন্য উপায় না দেখিয়া যদুবংশীয়গণ মথুরা পরিত্যাগ করিয়া সৌরাষ্ট্র দেশের সমীপবর্ত্তী দ্বারিকায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল।

দ্বারিকাতেই নেমিনাথের জন্ম হয়। শ্রীকৃষ্ণ নেমিনাথের অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। কালে শ্রীকৃষ্ণ একজন পরাক্রমশালী নরপতি হইয়া উঠিলেন। দ্বারিকা তাঁহার রাজধানী হইল।

নেমিনাথ ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। জুনাগড়ের রাজা উগ্রসেনের পরমা সুন্দরী কন্যা 'রাজীমতী'র সহিত নেমিনাথের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইল।

যথাসময়ে বরের শোভাযাত্রা জুনাগড়ে উপস্থিত হইল। নেমিনাথ রথ হইতে দেখিলেন যে, এক স্থানে অনেকগুলি ছাগকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই নিরপরাধ পশুগুলিকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে কেন?" সারথি উত্তর করিল, "এই বরযাত্রিদিগের মধ্যে যাহারা মাংসাহারী, তাহাদিগের ভোজনের জন্য এই পশুগুলিকে বধ করা হইবে।"

সারথির এই কথা শুনিয়া নেমিনাথের হৃদয়ে অকস্মাৎ এক ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি এতগুলি প্রাণীর বধাশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিলেন। নেমিনাথ ভাবিতে লাগিলেন, "এক আমারই জন্য এতগুলি প্রাণীর জীবন নষ্ট হইবে! বিনা অপরাধে এই অসহায় পশুগুলি ভীষণ মৃত্যু যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিবে! ইহারই নাম কি সংসার-ধর্ম্ম! ইহাই কি সামাজিক রীতি নীতির পরিণাম! আমি এমন স্বার্থপর সংসারে থাকিতে চাই না—এরূপ ঘৃণিত সুখে আমার কাজ নাই। আমি এমন পথ অবলম্বন করিব, যাহাতে সকল জীবের দুঃখ দূর করিতে পারি।"

নেমিনাথ সারথিকে সেইখানেই রথ থামাইতে বলিয়া রথ হইতে নামিয়া পড়িলেন। তিনি বিবাহোচিত সমস্ত পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিলেন এবং জুনাগড়ের নিকটবর্ত্তী রামগিরি (গিরনার?) পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া জৈনদীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক কঠোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এই ঘটনার পর হইতেই "নেমি-চরিত" কাব্য আরম্ভ হইয়াছে। এই কাব্যের বিশেষত্ব এই যে, কালিদাস-কৃত "মেঘদূতে"র প্রত্যেক শ্লোকের অন্তিম চরণ গ্রহণ করিয়া সমস্যাপূরণাকারে কবি এই কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। "মেঘদূতে"র শ্লোক লইয়া এইরূপ সমস্যাপূরণাকারে কাব্য রচনা করা নূতন নহে, জৈনাচার্য্য জিনসেন "মেঘদূতে"র সমস্ত শ্লোক অন্তঃপ্রবিষ্ট করিয়া ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের চরিত্রাবলম্বনে "পার্শ্বাভ্যুদয়" কাব্য লিখিয়াছেন। "পার্শ্বাভ্যুদয়" "নেমিদূত" হইতে বৃহদায়তন কাব্য, কারণ "মেঘদূতে"র একটী শ্লোকে "পার্শ্বাভ্যুদয়ে"র চারিটী শ্লোক হইয়াছে। "পার্শ্বাভ্যুদয়" কাব্যের রচয়িতা জিনসেনের পরিচয় প্রবন্ধান্তরে লিপিবদ্ধ করিয়াছি *। সমস্যাপূরণাকারে কাব্য রচনা করা কবির সামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। অন্যরচিত এক চরণের সহিত ভাবসঙ্গতি রাখিয়া অবশিষ্ট তিন চরণ নিজে লিখিতে হইবে। এইরূপ পরাধীনতার মধ্যে থাকিয়া কাব্যরচনার পদ্ধতি সংস্কৃত সাহিত্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে কঠিন কঠিন সমস্যাপূরণ করিতে দিয়া কবিদিগের প্রতিভার পরীক্ষা করা হইত। যাঁহার রচনা অল্প সময়ের মধ্যে উত্তম হইত, তাঁহাকে নানা প্রকারে পুরস্কৃত করিবার ব্যবস্থা ছিল। এখনও বিদ্যামোদী সামন্তরাজগণের সভায় নূতন পণ্ডিত উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সমস্যা পূরণ করিতে দেওয়া হয়। সমস্যা পূরণ এক কঠিন ব্যাপার। কেহ হয়ত প্রশ্ন করিল, "সিন্দূরবিন্দুর্বিধবাললাটে", ইহা প্রকৃতই এক সমস্যা,—তখন ত আর বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল না—কবি অনন্যোপায় হইয়া প্রশ্নোত্তররূপে ইহার পূরণ করেন যে,—

"কা ভাতি ভালে বরবর্ণিনীনাং কা রৌতি দীনা মধুযামিনীষু।
কস্মিন্ বিধত্তে শশিনং মহেশঃ "সিন্দূরবিন্দুর্বিধবাললাটে।"

[বরবর্ণিনীদিগের ভালে কি শোভা পায়?—সিন্দূরবিন্দু।
কোন্ হতভাগিনী মধুমাসের রজনী কাঁদিয়া অতিপাতিত করে?—বিধবা।
মহাদেব কোন্ স্থানে শশিকে ধারণ করেন?—ললাটে।]

এইরূপ "পিপীলিকা নৃত্যতি বহ্নিকুণ্ডে", "সূচ্যগ্রে কূপষট্‌কং তদুপরি নগরং তত্র গঙ্গাপ্রবাহঃ", "প্রবিশতি জলমধ্যে শীতভীতা মৃগাক্ষী"—প্রভৃতি আরও অনেক সমস্যা আছে। আলোচ্য কাব্য "নেমিদূত", "মেঘদূতে"র শ্লোকাংশ লইয়া যে ভাবে রচিত হইয়াছে, ইহা ঠিক সমস্যাপূরণ নহে, ইহার

* "আর্য্যাবর্ত্ত", ১৩১৯, ফাল্গুন-সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

নাম পাদপূরণ। যে শ্লোকাংশ আপাততঃ শ্রবণে অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তাহা পূর্ণ করিতে পারিলেই প্রকৃত সমস্যাপূরণ করা হয়। সমস্যাপূরণ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম, এখন প্রকৃত অনুসরণ করা যাউক।

বিক্রম-কবি নিম্ন-লিখিত রূপে কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন,—

"প্রাণিত্রাণপ্রবণহৃদয়ো বন্ধুবর্গং সমগ্রং
হিত্বা ভোগান্ সহ পরিজনৈরুগ্রসেনাত্মজাঞ্চ।
শ্রীমান্ নেমির্বিষয়বিমুখো মোক্ষকামশ্চকার
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥"

[বন্ধনগ্রস্ত পশুকুলের দুরবস্থা দেখিয়া শ্রীমান্ নেমিনাথের করুণামসৃণ হৃদয় শোকব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি আত্মীয়স্বজন ও রাজা উগ্রসেনের কন্যা রাজীমতীকে পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যপূর্ণ-হৃদয়ে সাংসারিক দুঃখ-বেদনা হইতে মুক্তিলাভের প্রত্যাশায় নমেরু প্রভৃতি নিবিড় ছায়াপ্রধান তরুসমূহে সুশোভিত রামগিরি (গিরনার?) পর্ব্বতস্থ আশ্রমকে বাসস্থানরূপে মনোনীত করেন।]

"সা তত্রোচ্চৈঃ শিখরিণি সমাসীনমেনং মুনীশং
নাসাগ্রন্যস্তানিমিষনয়নং ধ্যাননির্ধূতদোষম্।
যোগাসক্তং সজলজলদশ্যামলং রাজপুত্রী
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ॥"

[ভাবী স্বামী নেমিনাথ, অকস্মাৎ এইরূপ সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রস্থান্ করিলে শোকাকুলহৃদয়া রাজকুমারী রাজীমতী, সখীকে সঙ্গে লইয়া সেই পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তিনি গিয়া দেখিলেন, নেমিনাথ সেই উচ্চ গিরিভূমিতে অধিরূঢ় হইয়া নির্ণিমেষ নয়ন নাসাগ্রে স্থাপন পূর্ব্বক কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নেমিনাথ, নব জলধরের মত শ্যামলবর্ণ, তাই তাঁহাকে উৎখাতক্রীড়ারত হস্তীর ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল।]

"উদ্বীক্ষ্যৈনং শমসুখরতং মেদুরাম্ভোদনাদৈ
র্নৃত্যৎকেকিব্রজমধনগং প্রোল্লিখন্নীপপুষ্পম্।
সা শোকার্ত্তা ক্ষিতিতলমগাৎ স্যান্ন দুঃখং হি নার্য্যাঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে॥"

[সেই পর্ব্বতে নিবিড় জলদের মৃদুমন্দ ধ্বনি শুনিয়া শিখিকুল কেমন তালে তালে নাচিতেছে, স্নিগ্ধ সমীরণের মৃদু মধুর স্পর্শে কদম্ব ফুল শিহরিয়া

উঠিতেছে, এহেন সময়ে হৃদয়ের অধিদেবতা প্রিয়তমকে গৃহ ছাড়িয়া সুদূর পার্ব্বত্যদেশে শান্তি-সুখে নিমগ্ন দেখিয়া রাজকুমারী দুঃসহ হৃদয়-বেদনায় ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। কণ্ঠালিঙ্গনাকাঙ্ক্ষী প্রিয়জন দূরে থাকিলে নারীর প্রাণে কি বিষম ব্যথা জাগিয়া উঠে না ?]

রাজকুমারী, হৃদয়ের অরুন্তুদ যন্ত্রণায় উদ্বেলিত হইয়া নেমিনাথকে কহিতে লাগিলেন,—

"তুঙ্গং শৃঙ্গং পরিহর গিরেরেহি যাবঃ পুরীং স্বাং
রত্নশ্রেণীরচিতভবনদ্যোতিতাশান্তরালাম্।
শোভাসাম্যং কলয়তি মনাগ্‌ নালকা নাথ যস্যা
বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্ম্যা ॥"

[নাথ, পর্ব্বতের এই নিম্নোন্নত কঠিন ভূমি পরিত্যাগ কর। যে নগরীর বহুমূল্য রত্ননির্ম্মিত প্রাসাদের দীপ্তিতে দিগন্তরাল উদ্ভাসিত, এমন কি, বহির্ভাগস্থ উদ্যান-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত মহাদেবের শীর্ষবিহারী চন্দ্রের ধবল-কিরণ ধৌত হর্ম্ম্যপরম্পরায় শোভিত অলকাপুরীও শোভাসম্পদে যাহার সমকক্ষ নহে, চল, নিজেদের সেই দ্বারিকা নগরীতে যাই।]

* * * *

"বন্যাহারা ধৃতমুনিজনাচারসারাঃ সদারা
যাং নাথান্তে বয়সি সুধিয়ঃ ক্ষত্রিয়াঃ সংশ্রয়ন্তি।
কিং তারুণ্যে গিরিবরভুবং সেবসে তাং তপোভিঃ
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাং চোপভুজ্য ॥"

[হে নাথ, জীবনের শেষ সময়ে সুধী ক্ষত্রিয়বৃন্দ মুনিজনোচিত কঠোর আচার অবলম্বন করিয়া যে শৈলাবাস আশ্রয় করেন, তুমি এই যৌবনের প্রথম উন্মেষের সময়ে কি সেই গিরিভূমিতে বাস করিবে এবং সামান্য স্রোতোবারিমাত্র পান করিয়া শরীরকে নিতান্ত ক্ষীণ করিয়া ফেলিবে ?]

* * * *

"ত্বাং যাচেহহং ন নয়বিদুষা কাপি কার্য্যে বিলম্বো
গন্তব্যা তে সপদি নগরী স্বা যতঃ সা ত্বদম্বা।
মুক্তাহারা সজলনয়না ত্বদ্বিয়োগার্ত্তিদীনা
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়েবোপলভ্যঃ ॥"

[আপনার কাছে আমি প্রার্থনা করিতেছি, শীঘ্রই আপনি নিজ রাজ্যে চলুন ; নয়জ্ঞ বিদ্বানেরা সৎকার্য্যে বিলম্ব করেন না। আপনার মাতৃদেবী এই

দুঃসহ শোকে তাঁহার পরিত্যাগ করিয়াছেন, কাঁদিয়া কাঁদিয়াই তিনি দিনরাত্রি অতিপাতিত করেন। যে উপায়ে তাঁহার এই দীনভাব দূর হয়, সত্বরই তাহা আপনার করা উচিত।]

রাজকুমারী, নেমিনাথকে গৃহে ফিরিবার জন্য এইরূপ অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সংসারবিরক্ত নেমিনাথ সেই "নিবাতনিষ্কম্প ইব প্রদীপঃ" —কিছুতেই তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য আনয়ন করিতে পারিল না।

ইহার পর রাজীমতীর সহচরীও স্বীয় সখীর অসহ্য দুঃখ-বেদনা নেমিনাথের কাছে জানাইয়া তাঁহাকে দ্বারিকাপুরীতে যাইবার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করিল। সে নেমিনাথকে শেষ কথা বলিল,—

"গত্বা শীঘ্রং স্বপুরমতুলং প্রাপ্য রাজ্যং ত্রিলোক্যাঃ
কীর্ত্তিং শুদ্ধাং বিতনু সুহৃদাং পূরয়াশাঞ্চ পিত্রোঃ।
রাজীমত্যা সহ নবঘনস্যেব বর্ষাসু ভূয়ো
মাভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ।"

[হে দেব, আপনি দ্বারিকায় চলুন, অতুল রাজ্যশাসনের দ্বারা পবিত্র কীর্ত্তি অর্জ্জন করুন। ভ্রাতৃ বন্ধুবর্গ ও মাতাপিতার হৃদয়-পোষিত আশা পূর্ণ করা কি আপনার উচিত নয়? বর্ষাকালে বিদ্যুতের সহিত নব জলধরের যেমন বিচ্ছেদ হয় না, তেমনই সখী রাজীমতীর সহিত ক্ষণকালের জন্যও যেন আপনার আর বিচ্ছেদ না ঘটে।]

এইখানেই "মেঘদূত" কাব্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। "মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ"—ইহাই "মেঘদূতে"র শেষ ছত্র। "মেঘদূত" কাব্যের প্রত্যেক শ্লোকের অন্তিম চরণ ঠিক রাখিয়া অবশিষ্ট তিন চরণ গ্রন্থকার নিজে রচনা করিয়াছেন। ইহার পর "নেমিচরিত" কাব্যে আরও তিনটী শ্লোক আছে, তাহা সমস্যাপূরণাত্মক নহে,—কবির স্বাধীন রচনা। এই শ্লোক তিনটীর মধ্যে প্রথম দুই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে,—

সখীর মুখে বিরহ-বিধুরা রাজকুমারীর অশেষ দুরবস্থার কথা শুনিয়া সংসার-বিরক্ত হইলেও নেমিনাথের করুণামসৃণ হৃদয় পতিব্রতার দুঃখাতিশয়ে আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি রাজীমতীকে নিজের সহচরী করিয়া লইয়া পবিত্র ধর্ম্মোপদেশের দ্বারা তাহাকে মোক্ষলাভের অধিকারিণী করিলেন। শ্রীমান্ নেমিনাথ, সেই পর্ব্বত-শিখরেই ধ্যানবলের মাহাত্ম্যে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। দেবতা ও মনুষ্যবৃন্দ আসিয়া তাঁহার স্তুতি আরম্ভ করিলেন। নেমিনাথ

সংসারের দুঃখ-সম্ভিন্ন আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া নিঃশ্রেয়স দশার অবিচ্ছিন্ন কল্যাণ ভোগ করিতে লাগিলেন।

গ্রন্থের শেষ শ্লোকে কাব্য ও কবির পরিচয় লিখিত আছে; শ্লোকটী যথাস্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে।

"নেমিচরিত" কাব্যের রচনা-শৈলী খুব প্রশংসার্হ নহে; অনেক কবিতাই দুরান্বয়-দোষে দুষ্ট। দুই একটী শ্লোকের অর্থ-সঙ্গতিও যথাযথ রক্ষিত হয় নাই। সমস্যাপূরণের অনুরোধে গ্রন্থকার অনেক স্থলে বর্ণনীয় গিরিনদী প্রভৃতির নামান্তর কল্পনা করিয়াছেন। জুনাগড়ের নিকট 'রামগিরি' নামক কোনও পর্ব্বত না থাকিলেও কবি 'গিরনার' পর্ব্বতকেই 'রামগিরি' নামে আখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল দোষ সত্ত্বেও কবি যে অপর একখানি কাব্যের শ্লোকাবলীর অন্তিম চরণ লইয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব।

চিৎ ও অচিৎ।

[লেখক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার, বি-এ।]

চেতনত্ব ও অচেতনত্ব পরিদৃশ্যমান জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। চিৎ ও অচিৎ —চৈতন্য ও জড়—একত্র ও একাঙ্গীভূত হইয়া একই স্থানে একই কালে বিরাজ করিতেছে। জগতে চৈতন্যকে জড় হইতে পৃথক করিয়া ফেলা যায় না, জড়কে চৈতন্য হইতে পৃথক করা যায় না।

চৈতন্য ও জড়ের ধর্ম্ম।

পরন্তু প্রত্যেক বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় কখনও চৈতন্যের ধর্ম্ম, কখনও জড়ের ধর্ম্ম প্রকাশ করে। অতঃপর দেখা প্রয়োজন, চৈতন্যের ধর্ম্ম কি ও জড়ের ধর্ম্ম কি। চৈতন্য ও জড় এই দুই নামেই উহাদের চেতনত্ব ও অচেতনত্ব ধর্ম্মের নিশানা বর্ত্তমান। কিন্তু, চেতনত্ব ও অচেতনত্ব, এই দুই ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক ধর্ম্ম আসিয়া পড়ে। সেগুলি কি, তাহাই আমরা এখানে দেখিব। চৈতন্যের কথা পরে বলিব, আগে জড়ের কথা বলি।

জড়ের সাধারণ ধর্ম্ম।

জড়ের ধর্ম্ম স্থূলতঃ দ্বিবিধ—সাধারণ ও বিশেষ। অর্থাৎ, কতকগুলি ধর্ম্ম জড়মাত্রেই বিদ্যমান ও কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জড় পদার্থে

বিদ্যমান। যেমন, অচেতনত্ব সর্ব্ব জড়পদার্থেই বিদ্যমান, উত্তাপ মাত্র অগ্নিতে বিদ্যমান, শৈত্য জলে বিদ্যমান ইত্যাদি। জড়ের সাধারণ ধর্ম্মগুলি একে একে নিম্নে দেখাইতেছি :—

১। অচেতনত্ব। জড় অচেতন, অজ্ঞান।

২। ত্রিগুণত্ব। পদার্থ মাত্রই জড়রূপে প্রতিভাত হইলে দর্শকের চিত্তে সুখ, দুঃখ ও মোহের আকারে আবির্ভূত হয় (আষাঢ়ের অর্চ্চনায় "সচেতন ও অচেতন" প্রবন্ধে ইহা বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়াছি)। জড় এইরূপে সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক। সুখ, দুঃখ ও মোহকে ত্রিগুণ বলে। ব্যাসদেব পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যে বলিয়াছেন, "যা ভোগেষ্বিন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তেরুপশান্তিস্তৎসুখং যা লৌল্যাদনুপশান্তিস্তদ্দুঃখং", অর্থাৎ, তৃপ্তিবশতঃ ভোগের বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের উপশান্তিকে (নিবৃত্তিকে) সুখ বলে ও চঞ্চলতাবশতঃ (লৌল্যাৎ) ইন্দ্রিয়গণের অশান্তিকে দুঃখ বলে (২।১৫ পা)। সুখ ও দুঃখ এই উভয়েরই অনুভবে চিত্তের অশক্তিকে মোহ বলে। চিত্ত ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে ভোগে প্রবৃত্ত হইলে ভোগ্য সুখ, দুঃখ ও মোহ এই তিন রূপে ভোক্তার চিত্তে পরিণত হয়। ভোগ দ্বারা চিত্তের তৃপ্তি হইলে ও তজ্জন্য চিত্ত শান্ত হইলে ভোগ্য সুখরূপী হয়; তৃপ্তি না হইলে অথচ চিত্তের তজ্জন্য চঞ্চলতা থাকিলে, ভোগ্য দুঃখরূপী হয়; ভোগ্যসংস্পর্শে চিত্ত বিমূঢ় হইলে অর্থাৎ তৃপ্তিরূপ সুখানুভূতি বা অতৃপ্তিরূপ দুঃখানুভূতিতে অশক্ত হইলে ভোগ্য মোহরূপী হয়। অতএব শান্তিই সুখ, অশান্তিই দুঃখ এবং শান্তি ও অশান্তির অননুভূতিই মোহ। এই শান্তি, অশান্তি ও অননুভূতি কাহার? জড়ের না চেতনের? ভোগ্যের না ভোক্তার? অবশ্যই ভোক্তার, কারণ জড় ভোগ্যের অনুভূতি নাই। সুতরাং জড়ের সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকতা ভোক্তার দিক দিয়া, ভোগ্যের দিক দিয়া নহে। জড় ভোক্তার অনুভূতির সমীপে সুখ, দুঃখ ও মোহরূপে পরিণত হয়। অতঃপর বিবেচ্য, ভোগ্য বা জড়ের দিক দিয়া দেখিলে এই সুখ, দুঃখ ও মোহ কি আকারে দৃষ্ট হয়। প্রণিধান পূর্ব্বক ভাবের বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে চিত্ত যখন কোন ভোগে প্রবৃত্ত হয় তখন ভোগ্য যদি সেই ভোগের অনুকূলে নিজ সত্তাকে প্রকাশ করে তাহা হইলে চিত্ত সেই ভোগ্যকে ভোগ করিয়া শান্ত ও সুখী হয়। কিন্তু ভোগ্য যদি ভোগের অনুকূলে নিজ সত্তাকে প্রকাশ না করিয়া চঞ্চলতা অবলম্বন করে, অর্থাৎ, ভোগের জন্য চিত্তকে আত্মদান না করিয়া তাহার নিকট হইতে সরিয়া সরিয়া পলাইয়া পলাইয়া বেড়ায়, তাহা হইলে চিত্ত দুরন্ত ভোগেচ্ছা পোষণ

করিয়া তাহার পশ্চাতে দৌড়িয়া দৌড়িয়া অশান্ত ও দুঃখী হয়। আবার, ভোগ্য যদি ভোগের অনুকূলে স্বপ্রকাশ করিয়া ভোক্তাকে সুখী না করে অথচ চঞ্চলতা অবলম্বন করিয়া ভোক্তাকে প্রলুব্ধ, অশান্ত ও দুঃখীও না করে, পরন্তু নিজের প্রকাশ ও চাঞ্চল্য ধর্ম্মকে চাপা দিয়া একটা আবরণশক্তি দ্বারা ভোক্তাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে যে তাহার আর সুখানুভূতি বা দুঃখানুভূতি, শান্তি বা অশান্তি কিছুই থাকে না, তাহা হইলে সে না ভোগ করিয়া তৃপ্ত ও সুখী হয়, না ভোগে বঞ্চিত হইয়া অতৃপ্ত ও দুঃখী হয়—কেবল সংজ্ঞাহীন মুগ্ধের ন্যায় অবস্থান করে। অতএব, ভোগ্য ভোক্তাকে স্বপ্রকাশ দ্বারা সুখী, চাঞ্চল্য দ্বারা দুঃখী ও আবরণ দ্বারা মুগ্ধ করে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, ভোগ্যের তিনটী কার্য্য বা ধর্ম্ম আছে—প্রকাশ, চাঞ্চল্য ও আবরণ। একই পদার্থে যখন তিনটী ধর্ম্ম বিদ্যমান, তখন ঐ পদার্থকে মৌলিক তিনভাগে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে, যাহাদের মধ্যে একভাগের ধর্ম্ম প্রকাশ, আর এক ভাগের ধর্ম্ম চঞ্চলতা ও আর এক ভাগের ধর্ম্ম আবরণ। বলিতে পার যে, মৌলিক এক পদার্থেই এই তিন ধর্ম্ম থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা পারে না, কারণ প্রকাশ, চাঞ্চল্য ও আবরণ পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম—চাঞ্চল্যের দ্বারা প্রকাশ ও আবরণের হানি হয়, আবরণের দ্বারা প্রকাশ ও চাঞ্চল্যের হানি হয় ও প্রকাশ দ্বারা চাঞ্চল্য ও আবরণের হানি হয়। ধর্ম্ম তিনটী যখন পরস্পর-বিরোধী তখন উহারা তিনটী ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থেরই ধর্ম্ম হইবে। এই তিনটী মৌলিক পদার্থ কি? একটী প্রকাশিত হইয়া আত্মদান করিয়া ভোক্তার ভোগ সম্পাদন করে, আর একটী চঞ্চল হইয়া ভোক্তার ভোগ-সম্পাদনে বাধা দেয় ও তৃতীয়টি আবরণ শক্তি দ্বারা ভোক্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। যাহা নিজের দ্বারা ভোগ সম্পাদন করে তাহাকে বলা হয় সত্ত্ব, সৎ এর ভাব, অনাবিল অস্তিত্ব principle of existence; যাহা চঞ্চল হইয়া ভোগে বিঘ্ন উৎপাদন করে তাহা রজঃ, আবেগ, principle of activity; এবং যাহা আচ্ছন্ন করে তাহা তমঃ, আবরক, principle of suppression, secretiveness. ভোক্তার দিক হইতে ভোগ্য যেমন সুখ, দুঃখ ও মোহ এই ত্রিগুণাত্মক, ভোগ্যের দিক হইতে উহা তেমনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক। ভোক্তায় যাহা সুখ, ভোগ্যে তাহা সত্ত্ব; ভোক্তায় যাহা দুঃখ, ভোগ্যে তাহা রজঃ; ভোক্তায় যাহা মোহ, ভোগ্যে তাহা তমঃ। সত্ত্বই সুখ, রজই দুঃখ, তমই মোহ। ইহাদিগকে গুণ বলি, কারণ ইহারা পরের উপকারী হয়, ভোক্তার প্রয়োজন সিদ্ধ করে। তাই বাচস্পতি

মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন "গুণা ইতি পরার্থাঃ", গুণ শব্দের বন্ধনার্থও হয়—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ভোক্তৃচৈতন্যকে সংসারক্রমে বন্ধন করে বলিয়া গুণ।

অচেতনমাত্রই সত্ত্ব, রজঃ ও তমের সমষ্টি। যদি সমস্ত অচেতন পদার্থকে বিশ্লেষণ করা যায় তাহা হইলে এই তিন গুণকে উহাদের সাধারণ উপাদান বলিয়া বোঝা যায়। প্রথম উপাদান, উহারা আছে এই ভাব, উহাদের সত্ত্ব বা অস্তিত্ব। দ্বিতীয় উপাদান, উহারা সকলেই চলৎ বা চঞ্চল এই ভাব, উহাদের রজঃ বা আবেগ। তৃতীয় উপাদান, উহারা উহাদের অস্তিত্ব ও আবেগকে অল্প বিস্তর চাপিয়া রাখে এই ভাব, উহাদের তমঃ বা আবরকত্ব। এই তিন উপাদান সর্ব্ব অচেতন পদার্থে থাকিতেই হইবে। কোন অচেতন পদার্থ আছে অথচ উহার আবেগ ও আবরকত্ব নাই, এরূপ হইতে পারে না। কারণ, প্রকাশধর্ম্মী সত্ত্বমাত্র হইলে উহা নিত্যসিদ্ধ ভোগ্য হয় অর্থাৎ ভোক্তা উহাকে নিরন্তর ভোগ করিতে থাকে। নিরন্তর ভোগকে ভোগ বলা যায় না এবং নিরন্তর ভোগ কখনও হয় না। যেমন অন্ধকার আছে বলিয়াই আলোক আলোক, তেমনি ভোগের ব্যাঘাত আছে বলিয়াই ভোগ ভোগ। পরন্তু জন্ম, মৃত্যু, বিকার প্রভৃতি পরিবর্ত্তন লইয়াই জগৎ (গম্ ধাতু হইতে জগৎ শব্দ হইয়াছে—যাহা গমন করে অর্থাৎ পরিবর্ত্তিত হয় তাহাই জগৎ)। সত্ত্বমাত্রের পরিবর্ত্তন নাই। সুতরাং সত্ত্ব মাত্র জগৎ নহে। পরিবর্ত্তনতত্ত্বই আবেগ বা রজঃ। সুতরাং জাগতিক পদার্থে সত্ত্বের সহিত রজঃ থাকিবেই। আবার, সত্ত্বের সহিত রজঃ থাকিলেই পদার্থের নিত্যসিদ্ধ ভোগ্যত্বের অপহ্নব হয় না। রজঃ সত্ত্বকে ঢাকিতে পারে না। সত্ত্বকে ঢাকিবার জন্য আবরণতত্ত্ব বা তমের প্রয়োজন। সুতরাং সত্ত্বের বিদ্যমানতা থাকিলেও যখন কোনও পদার্থ নিত্য-সিদ্ধ ভোগ্য হয় না তখন উহাতে তমের অন্তর্ভাবিত্ব আছেই। এইরূপে কোনও অচেতন পদার্থের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিলেই সঙ্গে সঙ্গে উহার আভ্যন্তরীণ আবেগ বা চাঞ্চল্য ও আবরকত্বের অঙ্গীকার করিতে হয়। পদার্থসিদ্ধির জন্য আর কোন তত্ত্বের অঙ্গীকার করা প্রয়োজন হয় না। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণ একত্র হইলেই অচেতন পদার্থের সর্ব্বাঙ্গীন অস্তিত্ব সিদ্ধ হইল, কারণ তাহা হইলেই উহা ভোক্তার নিকট সুখ, দুঃখ ও মোহরূপে উপস্থিত হইতে পারিল এবং তজ্জন্য পরার্থ অর্থাৎ ভোক্তার প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইল।

অচেতন মাত্রই যদি সত্ত্ব, রজঃ ও তমের সমষ্টি হইল তাহা হইলে ত সকল

অচেতন পদার্থ এক হইয়া গেল। তাহা হয় না। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন অচেতন পদার্থে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে সংযুক্ত হয়। জগন্ময় সত্ত্বরজস্তমঃ সমুদ্রে ত্রিগুণের তারতম্যানুসারে অসংখ্য বুদ্বুদ উত্থিত হইয়া অসংখ্য অচেতন ভোগ্যের সৃষ্টি হইতেছে। ভোক্তৃচৈতন্য অসংখ্য প্রকারে সুখ, দুঃখ ও মোহ ভোগ করে বলিয়া অসংখ্য বিভিন্ন পরিমাণে সত্ত্বরজস্তমের সমষ্টি গঠিত হইয়া অসংখ্য ভোগ্যের উদ্ভব হয়। কথাটা আর একটু বিশদ করিয়া বলিতেছি। সত্ত্বের ধর্ম্ম প্রকাশ, রজের ধর্ম্ম চঞ্চলতা ও তমের ধর্ম্ম আবরণ। কার্য্যে যাহা প্রবৃত্তি তাহাই চঞ্চলতা; ফলতঃ, প্রবৃত্তি, স্পন্দন ও চঞ্চলতা একই কথা। আবার, বস্তুধর্ম্ম নিয়মিত হইলেই চাপা পড়ে বা আচ্ছাদিত হয়। এই নিয়মন বা নিয়মকে স্থিতিও বলা যায়, কারণ প্রকাশের বিপরীত স্থিতি অপ্রকাশার্থক। সুতরাং নিয়ম, আবরণ ও স্থিতি একই কথা। ইংরাজিতে বলিতে গেলে, প্রকাশ = revelation, manifestation ; প্রবৃত্তি = excitement ; স্পন্দন = vibration ; চঞ্চলতা = activity, restlessness, mobility ; এবং নিয়ম = control ; আবরণ = suppression ; স্থিতি = stagnation, static inertia. ত্রিগুণের এই ত্রিবিধ ধর্ম্ম পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে। এই ক্রিয়া বা গুণবৃত্তি ত্রিবিধ—**অভিভব, আশ্রয় ও মিথুন**। ত্রিগুণ পরস্পর পরস্পরকে পরাভূত করিয়া ক্রিয়া করে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমকে পরাভূত করিয়া প্রকাশিত হয়; রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃকে পরাভূত করিয়া চঞ্চল হয়; ও তমঃ, সত্ত্ব ও রজঃকে পরাভূত করিয়া আবরণ করে। ইহাই ত্রিগুণের পরস্পরাভিভববৃত্তি। গুণ-ত্রয় এইরূপে পরস্পরকে অভিভব করিলেও, পরস্পরের সাহায্যে কার্য্য করে। প্রকাশধর্ম্মী সত্ত্বের সাহায্যে রজঃ ও তমঃ প্রকাশিত হয়; প্রবৃত্তিধর্ম্মী রজের সাহায্যে সত্ত্ব ও তমঃ স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; ও নিয়মধর্ম্মী তমের সাহায্যে সত্ত্ব ও রজের প্রকাশ ও প্রবৃত্তি কার্য্য নিয়মিত হয়। ইহাই ত্রিগুণের পরস্পরাশ্রয়বৃত্তি, যাহার দ্বারা গুণত্রয় পরস্পরের ধর্ম্মের দ্বারা উপকৃত হয়। আশ্রয় শব্দ এস্থলে আধারাধেয় ভাবে ব্যবহৃত হয় নাই, সাহায্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। গুণ-ত্রয়ের আর এক বৃত্তি মিথুন বৃত্তি, অর্থাৎ একত্র হইয়া কার্য্য করা। যেখানে সত্ত্ব সেইখানেই রজঃ ও তমঃ, যেখানে রজঃ সেইখানেই সত্ত্ব ও তমঃ, যেখানে তমঃ সেইখানেই সত্ত্ব ও রজঃ। গুণত্রয় এককালে একত্র বিদ্যমান থাকে। সত্ত্ব আছে রজঃ ও তমঃ নাই, রজঃ আছে সত্ত্ব ও তমঃ নাই, তমঃ আছে সত্ত্ব ও রজঃ নাই এরূপ হয় না। অর্থাৎ, কেবল সাত্ত্বিক, কেবল

রাজসিক, কেবল তামসিক বা কেবল সত্ত্বরাজসিক, কেবল সত্ত্বতামসিক, বা কেবল রজস্তামসিক কোনও পদার্থ জগতে হয় না। একথা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি।

৩। বিষয়ত্ব, পরার্থত্ব, পরাধীনত্ব। ভোগ্য ভোগের বিষয়, সুতরাং পরার্থ, পরাধীন। ভোক্তার প্রয়োজনাধীনে ভোগ্যের উৎপত্তি ও ক্রিয়া হয়। ভোক্তার প্রয়োজন না থাকিলে ভোগ্য থাকে না। অপ্রয়োজনীয় পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভবে না। অপ্রয়োজনীয় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে জগতের শৃঙ্খলা লোপ পায়। প্রয়োজন না থাকিলেও যদি ভোগ্যের উৎপত্তি ও ক্রিয়া হইতে পারিত তাহা হইলে প্রত্যেক ভোক্তার নিকটেই সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য একই সময়ে আবির্ভূত হইয়া যুগপৎ তাহার ভোগের বিষয় হইত এবং ভিন্ন ভিন্ন ভোগ্য যুগপৎ সুখ, দুঃখ ও মোহরূপে আবির্ভূত হওয়ায় সুখ, দুঃখ, মোহের স্বরূপের হানি হইত। যদি বল, ভোক্তা যে ভোগ্যটি আহরণ করিবেন, সেইটীই তাঁহার নিকটে আসিবে। তাহা হইলেই ত হইল যে ভোক্তার প্রয়োজনানুসারে ভোগ্যের উৎপত্তি হয়। বলিতে পার, ভোক্তার প্রয়োজন হইলেও সে যদি ভোগ্যের আহরণে চেষ্টিত না হয় তাহা হইলে ত ভোগ্য তাহার নিকট আসে না। ইহা ভুল। ভোক্তার যথার্থ প্রয়োজন হইলে সে চেষ্টিত হইবেই হইবে। আর যদি সে চেষ্টা করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলেও ঈশ্বরেচ্ছায় তাহার সে ভোগ্য প্রাপ্য হইবে, যেমন শিশুর প্রয়োজনে মাতৃস্তনে দুগ্ধ হয়। পুনশ্চ, ভোগ্য যদি পরার্থ বা পরাধীন না হইয়া স্বার্থ বা স্বাধীন হইত তাহা হইলে উহার জড়ত্ব ঘুচিয়া গিয়া চেতনত্ব আসিয়া পড়িত এবং তখন উহা ভোগ্যের পর্য্যায়চ্যুত হইয়া ভোক্তার পর্য্যায়ভুক্ত হইত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জগতে সর্ব্বপদার্থে চিৎ ও জড় একাঙ্গ হইয়া বর্ত্তমান। পদার্থ যখন স্বাধীন ভোক্তা হয় তখন চেতন ও যখন চেতনের অধীন হইয়া ভোগ্য হয় তখন অচেতন। সুতরাং অচেতনত্ব ও পরাধীনত্ব অভিন্ন।

৪। সংহতত্ব।—জড়মাত্রই ত্রিগুণের সংঘাত বা মিশ্রণ।

৫। পরিণামিত্ব, অনিত্যত্ব। ভোগের নিমিত্ত জড়ের উৎপত্তি। ভোগের অবসান হইলেই ভোগ্য জড়ের লোপ হয়। ভোগ হইতে হইতে উহার পরিবর্ত্তন হয়। এইরূপে জগতের সর্ব্ব জড় পদার্থই অবিরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ভোগের স্বভাব যখন অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তিত হওয়া তখন ভোগ্যকেও অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তিত হইতে হইবে। সুখ, দুঃখ, মোহ কেহই পর পর দুইক্ষণে

এক ভাবে থাকে না। ভোগ্য সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক, সুতরাং উহাও পর পর দুইক্ষণে একভাবে থাকে না। এই পরিবর্ত্তন লইয়াই সংসার। পরিবর্ত্তন না থাকিলে সংসার থাকে না। কোনও জীবই নিরন্তর একভাবে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে না, বা মোহাচ্ছন্ন থাকে না। নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল ভোগের উপাদান ভোগ্যও নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল, পরিণামী, অনিত্য। ভোগে স্থিতি নাই, অতএব ভোগ্যেও স্থিতি নাই।

[জড়ের সাধারণ ধর্ম্মগুলি উপরে বলিলাম। বিশেষ বিশেষ জড়ের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম বলিতে গেলে, অগ্রে কোন্ কোন্ পদার্থ জড় তাহা দেখা প্রয়োজন। অতএব আমরা যখন জড়বর্গ নির্ণয় করিব সেই সময়ে উহাদের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের উল্লেখ করিব।]

জড়ের এই সাধারণ ধর্ম্মগুলি বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক বিচার করা উচিত। যে পদার্থে এই সকল ধর্ম্মের কোন একটী বিদ্যমান দেখিবে সেই পদার্থকেই অচিৎ বলিয়া জানিবে। চৈতন্যে এই সকল ধর্ম্মের কোনটীই নাই।

অতঃপর চৈতন্যের ধর্ম্মগুলি দেখাইতেছি :—

চৈতন্যের ধর্ম্ম।

(১) **চেতনত্ব, দ্রষ্টৃত্ব।** চৈতন্য শুদ্ধ জ্ঞান, সুতরাং দ্রষ্টা। জ্ঞানে অজ্ঞান না থাকায়, উহার দৃষ্টি অবাধিত। জ্ঞান জ্যোতিঃ-স্বরূপ, তাহার নিকট সর্ব্বপদার্থ উদ্ভাসিত।

(২) **নির্গুণত্ব।** ত্রিগুণাত্মক জগৎ জড়। চৈতন্য তাহার বিপরীত।

(৩) **অবিষয়ত্ব, স্বার্থত্ব, স্বাধীনত্ব।** চৈতন্য ভোগ্য নহে, সুতরাং অবিষয়, স্বার্থ, স্বাধীন, স্বরাট্। চৈতন্য চৈতন্যার্থ হইতে পারে না, নিজে নিজের ভোগ্য বা উপকারক হওয়া যায় না। চৈতন্য জড়ার্থও হইতে পারে না, কারণ জড়ের অচেতনত্ববশতঃ স্বার্থ সম্ভবে না।

(৪) **অসংহতত্ব।** চৈতন্য বা শুদ্ধজ্ঞান একরস, অমিশ্র পদার্থ। সংহতত্ব বা মিশ্রত্ব জড়ের ধর্ম্ম।

(৫) **অপরিণামিত্ব, নিত্যত্ব।** শুদ্ধজ্ঞানের পরিণাম নাই, ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই। চৈতন্য অক্ষর, অব্যয়, অজর, অমর।

এইরূপে চিৎ ও অচিৎ পরস্পর বিপরীতধর্ম্মী। জীব নিরন্তর চিদচিতের এই প্রভেদ বিচার করিলে অচিদ্রূপী ভোগ্যের মোহ কাটাইয়া সুস্থ হইতে পারে। সে যদি উপলব্ধি করিতে পারে যে, সে চৈতন্যস্বরূপ, তাহার সহিত জড়

ভোগ্যের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহা হইলে সে সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক সংসারব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া নিরাময় হয়।

ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব চৈতন্যের আরোপিত ধর্ম্ম মাত্র।

বলিতে পার, জড় পরার্থ, পর চৈতন্য, সুতরাং চৈতন্যের অর্থে বা প্রয়োজনে যখন জড়ের অস্তিত্ব তখন জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের আত্মপ্রয়োজনের সম্বন্ধও রহিয়াছে। অতএব চৈতন্য ভোক্তা। পুনশ্চ, ভোক্তা হইলেই কর্ত্তা হইতে হয়। জড় নিজের অচেতনত্বহেতু অকর্ত্তা। চৈতন্যই ভোক্তা হইয়া ভোগ-নিষ্পাদনের নিমিত্ত জড়ে ক্রিয়া করায়। সুতরাং জড়ের সহিত চৈতন্যের ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধ অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু স্থিরচিত্তে চৈতন্যের স্বরূপ বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, জীব একটা ভয়ানক ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়াই জড়কে নিজের প্রয়োজনীয় ভোগ্য বলিয়া মনে করে। সাধারণ জীব ভ্রমাধীন, ইহা প্রত্যক্ষ। তাহার দৃষ্টি অল্প, বুদ্ধি ক্ষীণ, বিচারশক্তি বিপর্য্যস্ত। সে ভাবে এক, হয় আর। সে ঘুরে সুখের প্রত্যাশায়, কিন্তু পায় দুঃখ। কামক্রোধাদির বশবর্ত্তী হইয়া সে অন্ধ, ক্ষিপ্ত, অজ্ঞ, মূঢ়। সে চৈতন্যের স্বরূপ জানে না। তাহার চৈতন্য তাহার অজ্ঞানের সংসর্গে পড়িয়া তাহার নিকট স্বরূপ হারাইয়া ভোক্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জ্ঞান ও অজ্ঞান একত্রাবস্থান করায় অজ্ঞের নিকট এক হইয়া গিয়াছে। সে জ্ঞানকে অজ্ঞান হইতে, চৈতন্যকে অচৈতন্য হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতে জানে না ও পারে না। সেইজন্যই তাহার নিকট চৈতন্য ভোক্তা ও রাগদ্বেষাদিগুণবিশিষ্ট। বিবেকহীন হওয়ায় সে তাহার বুদ্ধিগত ভ্রমাত্মক রাগদ্বেষাদিকে চৈতন্য আরোপ করিয়া চৈতন্যের প্রয়োজন সৃষ্টি করে। সেই মিথ্যা প্রয়োজনের মিথ্যা সাধনের জন্য এই মিথ্যা জড় জগতের আবির্ভাব। বিবেচনা করিয়া দেখ, জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যের কোনও প্রয়োজন থাকিতে পারে না। জ্ঞান পূর্ণস্বভাব, পূর্ণের কোন অভাব থাকিতে পারে না, এবং অভাব না থাকিলে প্রয়োজন হয় না। শব্দ-স্পর্শ-রূপ রস-গন্ধজন্য সুখ-দুঃখ-মোহই প্রয়োজন। চৈতন্যের সুখ-দুঃখ-মোহ থাকিতে পারে না,—সুখ-দুঃখ-মোহ থাকিলে তাহার জ্ঞানের অপহ্নব হইল, জ্ঞানস্বরূপত্ব লোপ পাইল। যথার্থ জ্ঞান বিকার-রহিত, সুতরাং সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক বিকারী জড়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। ভোগরূপ প্রয়োজন তাহাতে সম্ভবে না, কারণ ভোগের দ্বারা ভোক্তার বৃদ্ধি বা হানি হয়—ভোগের পূর্ব্বে ভোক্তা যাহা, ভোগকালে বা ভোগের পরে ঠিক তাহা থাকে না। কিন্তু

জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যে হানি বৃদ্ধি নাই। সুতরাং চৈতন্যের ভোক্তৃত্ব জীবের অজ্ঞানজনিত। অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই জীবের ভোক্তৃত্ব লোপ পায় এবং ভোক্তৃত্ব লোপ পাইলেই কর্তৃত্বও লোপ পায়। অজ্ঞানকে অজ্ঞান বলিয়া ধরিতে পারিলেই অজ্ঞান বিনষ্ট হইল, ভ্রমের অস্তিত্ব ততক্ষণ যতক্ষণ সে ভ্রম বলিয়া ধরা না পড়ে। রাগদ্বেষাদিজনিত অজ্ঞান, নিত্যানিত্যবিচার দ্বারা রাগদ্বেষাদির ক্ষয় হইলে, বিনষ্ট হয়। "চৈতন্যস্বরূপ আমি অসংসর্গী, অবিক্রিয়, অচল, নিত্য, শব্দস্পর্শাদি জন্য হানি বা বৃদ্ধি আমার নাই। অতএব, স্তুতি, নিন্দা, প্রভৃতি প্রিয় বা অপ্রিয় শব্দ; শীত, উষ্ণ, মৃদু, কর্কশ প্রভৃতি প্রিয় বা অপ্রিয় স্পর্শ; স্ত্রী, পুত্র, শত্রু, মিত্র প্রভৃতি প্রিয় বা অপ্রিয় রূপ; মধুর, অম্ল, লবণ প্রভৃতি প্রিয় বা অপ্রিয় রস; ও পুষ্প, অনুলেপ প্রভৃতি প্রিয় বা অপ্রিয় গন্ধ আমাকে কি করিবে? অবিবেকী ব্যক্তিই শব্দাদির সহিত আত্মার সম্বন্ধ স্থাপন করে, সুতরাং প্রিয় শব্দাদি তাহারই বৃদ্ধি ও অপ্রিয় শব্দাদি তাহারই হানি করে। কিন্তু বিবেকী আমার কেশাগ্রেরও হানি বৃদ্ধি উহারা করিতে পারে না। আমি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অরস, অগন্ধ, অব্যয়, নিত্য।" অহরহঃ এইরূপ বিচার দ্বারা জীব রাগদ্বেষাদির হাত হইতে মুক্ত হইয়া ভোক্তৃত্বের মোহ কাটাইলে চৈতন্যস্বরূপে অবস্থান করে।

চৈতন্যের ভোক্তৃত্বকে মিথ্যা বলিলে একটা মহা সমস্যা আসিয়া পড়ে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ভোক্তার প্রয়োজনে ভোগ্যের আবির্ভাব, সচেতনত্ব ও অচেতনত্ব, অর্থাৎ ভোক্তৃত্ব ও ভোগ্যত্ব, জগতের সর্ব্বপদার্থে একত্র ও একাঙ্গীভূত হইয়া বিদ্যমান, আবার এখানে বলিতেছি যে ভোক্তৃত্ব মিথ্যা। এ কিরূপ হইল? ভোক্তৃত্ব মিথ্যা হইলে ভোগ্যত্বও মিথ্যা হয়। ভোগ্যত্ব মিথ্যা হইলে ত্রিগুণাত্মক জগৎ মিথ্যা হয়। কিন্তু ত্রিগুণাত্মক জগৎ প্রত্যক্ষ, উহাকে মিথ্যা বলি কিরূপে? এ বিষম সমস্যা। একদিকে ভোক্তৃত্বকে মিথ্যা না বলিলে চৈতন্যের চৈতন্যত্বই থাকে না, অপর দিকে ভোক্তৃত্বকে মিথ্যা বলিলে এত বড় বিরাট প্রত্যক্ষ জগৎটা মিথ্যা হইয়া যায়। কিন্তু উপায় নাই। চৈতন্য স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ, জ্ঞানাত্মক। চৈতন্যের সাহায্যেই জীব জড়রূপী জগৎকে উপলব্ধি করে। সুতরাং চৈতন্য মুখ্য ও জড়রূপী জগৎ গৌণ। চৈতন্যকে মিথ্যা করিয়া জগৎকে সত্য করা যায় না। অতএব চৈতন্যকেই সত্য ও জগৎকে মিথ্যা নিশ্চয় করিয়া এই সমস্যার পূরণ করিতে হইবে। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি, মিথ্যা প্রয়োজনের মিথ্যা সাধনের জন্য এই মিথ্যা জড় জগতের আবির্ভাব।

পরমার্থতঃ একমাত্র নিত্য চৈতন্যই আছে, জড় জগৎ নাই। ইহাই হিন্দুর অদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈততত্ত্বেই জীবের পরম শান্তি।

চিতিস্বরূপে স্বতএব মে মতে
রসাদিযোগস্তব মোহকারিতঃ।"

উপদেশসহস্রী ২।৮।১

"জগন্মিথ্যাধীভাবাদাক্ষিপ্তৌ কাম্যকামুকৌ।
তয়োরভাবে সন্তাপঃ শাম্যেন্নিঃস্নেহদীপবৎ॥"

পঞ্চদশী ৭।১৩৬

"ইন্দ্রজালমিদং জগৎ"—ঐ ৭।১৭৪

"একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।"

"অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা।"

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

"তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥"

চিত্রকূটের পথে।

[লেখক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি. এ.]

"পাথর কেনা, গঙ্গা-স্নানের" ন্যায় স্বাস্থ্যোন্নতি ও তীর্থদর্শন—এই উভয় উদ্দেশ্য লইয়া বিগত বড়দিনের ছুটীতে আমরা বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশন হইতে প্রসিদ্ধ তীর্থ চিত্রকূটাভিমুখে যাত্রা করিলাম। কাশী হইতে মোগলসরাই পর্য্যন্ত এই পথটুকু পুনঃ পুনঃ দেখিতে দেখিতে এতই 'এক-ঘেয়ে' হইয়া গিয়াছে যে, তাহাতে কিছুই নূতনত্বের আস্বাদ পাওয়া গেল না। তবে গঙ্গার 'ডফারিন' পুল হইতে কাশীর প্রাতঃকালীন দৃশ্য যতই পুরাতন হউক না কেন, তাহা চির নূতনই মনে হয়।

প্রায় প্রত্যেক দেশের রাজধানীর প্রধান অট্টালিকাদিতে সেই দেশের জাতীয় ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। পলিটিকস্-বিউরোক্র্যাসী-সর্ব্বস্ব ইংরাজ

জাতির প্রকৃত পরিচয় রাজধানী লণ্ডনের প্রথম-দর্শনেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ, পার্লামেণ্ট-সৌধের উচ্চ চূড়া দেখিয়া ইংরাজের হৃদয়ে রাজনীতির আলোচনাই যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কলাসৌন্দর্য্যপ্রিয় ফরাসী জাতি লুভের (Louvre) প্রভৃতি শিল্প-কারুকার্য্যের শ্রেষ্ঠনিদর্শনস্বরূপ গৃহগুলি তাহাদের রাজধানীতে দর্শকের প্রধান দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য গড়িয়া রাখিয়াছে। আমেরিকার রাজধানী নিউ ইয়র্ক সহরে ব্যবসায়ীদিগের ত্রিশ চল্লিশ তল গৃহগুলির প্রাধান্য ও প্রাচুর্য্য দেখিলেই আমেরিকানদের জাতীয় ভাব বুঝিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। সেইরূপ ধর্ম্মপ্রধান ভারতবাসীর রাজধানী কাশীক্ষেত্রের মঠ-মন্দির-দেউল প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্ম-গৃহ-বিরাজিত ঘাটগুলির দৃশ্য দেখিলেই মনে হয় যে এই-খানেই ভারতের মর্ম্মকথা—ভারতের "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং" একেবারে জাজ্বল্যরূপে শিল্পকলার ভিতর দিয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। তাই এই কাশীর দৃশ্য যতবার দেখি, ততবারই আনন্দ ও গৌরবে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠে। বাস্তবিকই কাশীর মঠ-মন্দির-দেউলে আমাদের জাতীয় ভাবের অভিব্যক্তি আছে। আমাদের সনাতন ধর্ম্মের ন্যায় এই সনাতন মনোহর দৃশ্যের ঠিক বিপরীত আর একটী দৃশ্য এবার নয়নগোচর হইল। দেখিলাম,—পুরাতন সেতুর পার্শ্বেই নবনির্ম্মিত "পনটুন"-সেতুর উপর দিয়া মানুষ, ঘোড়া, গরুর গাড়ী প্রভৃতি অনবরত যাতায়াত করিতেছে। এই সেতুটী নির্ম্মিত হওয়াতে রেল কোম্পানী ও জন-সাধারণের নানারূপ সুবিধা হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

আমরা প্রায় বেলা আন্দাজ ১০টার সময় মোগলসরাই জংসনে গাড়ী বদল করিয়া বোম্বাই মেলে চিওকি নামক ষ্টেশনের অভিমুখে রওনা হইলাম। পথে চুনার, মির্জ্জাপুর, বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখিতে পাওয়া গেল।

চিওকি জংসনের পর হইতে আমাদের পুষ্পদামশোভিত বোম্বাই মেল (সেদিন বড় দিন) ঘুরিয়া ফিরিয়া নক্ষত্র বেগে দক্ষিণাপথের দিকে ছুটিল। আমরা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই দিগন্ত-প্রসারিত মাঠের পর মাঠ নব নব দৃশ্যপট লইয়া আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। কোথাও রক্তবর্ণ কঙ্করময় বন্ধুর ভূমি, দূরে নিকটে সবুজবর্ণের বৃক্ষরাজি সুস্নিগ্ধ, সুশীতল ছায়া লইয়া বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ভীষণত্ব নষ্ট করিতেছে, কোথাও ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ-প্রস্তরের, নতোন্নত ভূমি রক্তিমাভ অথবা ধূসর ক্ষেত্রের পার্শ্বে

প্রসারিত থাকিয়া লাল কালোর এক অপূর্ব্ব মিশ্র-শোভা ফুটাইতেছে। কোথাও বা গাঢ় লোহিতবর্ণের অসমান ভূমির উপল-বক্ষঃ দিয়া সূর্য্য-কিরণোদ্ভাসিত স্বচ্ছতোয়া ক্ষুদ্র নদী বহিয়া চলিয়াছে। দেখিলাম,—রেলপথের দুই পার্শ্বে সুবিস্তৃত প্রান্তরের সীমায় সীমায় প্রকৃতি-দেবীর বিচিত্র প্রাকারস্বরূপ এক একটী পর্ব্বতশ্রেণী দণ্ডায়মান। সুনীল, ঈষন্নীল, বেগুনী রঙ্গের নানাকার-বিশিষ্ট পর্ব্বতশ্রেণী নিয়ত আলো ও ছায়া লইয়া নব নব বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছে। তাহারা কোন্ এক সুদূরের বার্ত্তা লইয়া 'নিবাত নিষ্কম্প' ভাবে চির কুহেলিকাময়—চির গভীর রহস্যময় দিক্‌চক্রবালের কোলে অর্দ্ধশয়ান হইয়া বর্ষের পর বর্ষ কাটাইতেছে, কে তাহার নিগূঢ় তথ্য নিরূপণ করিবে?

এইরূপে দৃশ্য-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া প্রায় দেড়টা আন্দাজের সময়ে আমরা মাণিকপুর নামক জংসনে উপস্থিত হইলাম। এইখানে বোম্বাই মেল পরিত্যাগ করিয়া এক ঘণ্টার উপর ঝান্সী লাইনের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে হইল। এই অবসরে অনেকেই জলযোগ সারিয়া লইলেন। আমরাও যথা-প্রাপ্ত হিন্দুর আহার্য্য পেড়া, সন্দেশ, ও দুগ্ধে পরিতৃপ্ত হইলাম।

প্রায় অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় ঝান্সী লাইনের ট্রেণ আসিল। আমরা লাট্‌বহর লইয়া তাহার একটী কামরায় উঠিয়া পড়িলাম। এইখানেই আমা-দের পাণ্ডা স্থির হইয়াছিল। তাঁহার দুইজন অনুচর আমাদের সঙ্গ লইলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে জানালা হইতে দেখিতে পাইলাম, আমাদের গাড়ী ধীরে ধীরে পশ্চিমাভিমুখে চলিতেছে। কিছু দূর চলিতেই ট্রেণ পার্ব্বত্য পথে আসিয়া পড়িল। তখন ট্রেণের বেগের সঙ্গে সঙ্গে কঠিন কঙ্করময় পথে দ্রুতগতির জন্য তাহার শব্দ ও ঝাঁকি নিদারুণ ভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিঙ্গের পথে কিছুদূর ঠিক এইরূপ প্রবল ঝাঁকি সহ্য করিতে হয়। কিন্তু এই ঝাঁকির কষ্ট রেল-লাইনের উভয় পার্শ্বের বিচিত্র দৃশ্য শোভা দেখিয়া একেবারেই ভুলিয়া গেলাম। বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, দুইদিকে উত্তর দক্ষিণ প্রান্তে বিস্তৃত ক্ষুদ্র-বৃহৎ পর্ব্বতশ্রেণী রেলপথকে যেন ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এ স্থানের রেলপথও সর্পগতিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়া, কঙ্করময় ভূমির উপর দিয়া নানাভাবে প্রসারিত হইয়াছে। মাঝে মাঝে দেখা গেল, রেলের দুইদিকে পাহাড়-ঘেরা এক একটী ক্ষুদ্র ঢালু জমি, তাহার মধ্য-ভাগে একটী ক্ষীণকায়া জলহীন পার্ব্বত্য নদী পতিত হইয়াছে,—লতাগুল্মাচ্ছন্ন পাহাড়ের গায়ে কদাচিৎ দুই একটী গরু মহিষ চরিতেছে। এই আকারের

দৃশ্য অনবরত দেখা যাইতে লাগিল। কিছু দূর এই ভাবে চলিতে চলিতে সহসা একটী স্বচ্ছতোয়া ক্ষুদ্র নদী নয়নপথে পতিত হইল। কৌতূহলবশতঃ পাণ্ডার অনুচরবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, উহার নাম বাল্মীকি নদী। অদূরস্থিত বাল্মীকি মুনির আশ্রমের প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইয়া এই নির্জ্জন পথে উহা উত্তরাভিমুখে চলিয়াছে। বাল্মীকির আশ্রমের কথা শুনিয়া মনে হইল, তবে কি ইহা সেই প্রাচীন লোকপ্রসিদ্ধ তমসা নদী, যাহার তীরে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ আদি কবি বাল্মীকি ব্যাধ-হত রক্তাক্তকলেবর ক্রৌঞ্চমিথুনকে দেখিয়া শোক-গদ্গদচিত্তে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

সেই অবধি কাব্যের যে রসধারা বহিয়াছিল তাহা তমসার পূত প্রবাহেরই মত আজ পর্য্যন্ত আমাদিগকে শান্তিবারি-সেচনে পরিতৃপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। কাব্যের রসধারার নাম এখন যাহাই হউক, তমসার আর সে নাম, সে গৌরব নাই। বাল্মীকির আশ্রমের কথায়, তমসার সাক্ষাদ্দর্শনে নানাবিধ প্রাচীন ভাব মনে জাগিতে লাগিল। যে চিত্রকূটে যাইতেছি তাহার সহিত বাল্মীকির আশ্রমের ত সান্নিধ্য-সম্বন্ধ থাকিবেই, কারণ ভগবান্ রামচন্দ্র বনবাসের আরম্ভে বাল্মীকির আশ্রম হইয়াই ত অদূরবর্ত্তী চিত্রকূটে গমন করিয়াছিলেন। রামায়ণের নানা চিত্র—মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এই ভাবে ভাব-জগৎ ও বাস্তব-জগতের প্রয়াগ-সঙ্গম দিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে অপরাহ্ণ প্রায় তিন ঘটিকার সময় ক্ষুদ্র 'করঈ' (সংস্কৃত করবী) নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম।

করঈতে আমাদিগকে ট্রেণ পরিত্যাগ করিতে হইল। কারণ, চিত্রকূট যাইতে হইলে এই ষ্টেশনে অবতরণ করাই সুবিধাজনক। ইহার পরবর্ত্তী ষ্টেশন চিত্রকূটেও অবতরণ করা যাইতে পারে; কিন্তু সেখান হইতে পথ কিছু দীর্ঘ। এখান হইতে আড়াই ক্রোশ পথ গোযানে অথবা একা গাড়ীতে অতি-বাহিত করিলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছান যায়। আমরা গাড়ী হইতে নামিতেই পাণ্ডার অনুচরদ্বয় অবিলম্বে একখানি গোযান ও একখানি অর্দ্ধভগ্ন একা সংগ্রহ করিয়া আনিল। জিনিষপত্রের সহিত ভৃত্যকে গোযানে বসাইয়া আমরা তখন একার "বিষম ধাক্কা" খাইতে খাইতে উঁচু নীচু পথে চলিতে আরম্ভ করিলাম। ষ্টেশন হইতে অল্প কিছুদূর অগ্রসর হইলে একটী সেকালের ধরণের প্রকাণ্ড দুর্গাকার অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া গেল। জিজ্ঞাসায় জানিতে

পারিলাম, ইহা একদিন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাজি রাওয়ের ভ্রাতা অমৃত রাওয়ের বাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই সমগ্র স্থানটী তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বৃত্তিস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার দেহাবসান হইবামাত্র এই সুবৃহৎ প্রাসাদটী পুনরায় যথাক্রমে গভর্ণমেণ্টের হস্তে ফিরিয়া আইসে। এখন অবশ্য এই প্রাসাদে করঙ্গী এলাকায় স্কুল, কাছারী, ট্রেজারি ইত্যাদি বসিয়াছে। আর অমৃত রাওয়ের বংশধরগণ অধুনা প্রাসাদের বাহিরে একটী ক্ষুদ্র গৃহে দরিদ্রের ন্যায় বাস করিতেছেন।

করঙ্গী বান্দা নামক জিলার অন্তর্গত একটী সব-ডিভিসন। চিত্রকূট ইহারই অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। এখনকার দিনের সব-ডিভিসনে যাহা যাহা প্রয়োজন করঙ্গীতে সে সকল আছে। ক্রমশঃ আমরা করঙ্গীয়ের সদর ছাড়াইয়া গ্রাম্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ। রাস্তায় একটীও জনপ্রাণী নাই। আমরাই কয়েকটী মাত্র প্রাণী গাড়ীর মৃদু শব্দে চারিদিকের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া চলিতেছি। পথে একটী ক্ষুদ্র নির্ম্মলতোয়া নদী গাড়ী-সমেতই অতিক্রম করিতে হইল। রাস্তার দুই পাশে উঁচু নীচু রক্তিমাভ কঙ্করময় প্রস্তর প্রসারিত রহিয়াছে। চারিদিকের প্রাকৃতিক শোভা বড়ই রুক্ষ গম্ভীর। রাস্তার ধারে ধারে শুষ্ক ভুট্টার সপত্র দণ্ডগুলি কাঁচা সোণার রং ফলাইয়াছে। যতই চলিতেছি, ততই এক এক অভিরাম দৃশ্য নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। দক্ষিণদিকে চাহিয়া দেখিলাম, একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বতমালা পূর্ব্ব পশ্চিমে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রাচীরের ন্যায় বিস্তৃত হইয়াছে। তাহার শীর্ষভাগ এতই সমতল যে দেখিলে মনে হয় যেন পেন্সিলের একটী টানে সেটী কে আঁকিয়া রাখিয়াছে। সেই পাহাড়টীর ঠিক পশ্চিমে আর একটী ক্ষুদ্র পাহাড়, তাহার পরেই চিত্রকূটের সমীপস্থ কামতানাথ পর্ব্বত। তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়। সূর্য্যদেবের শেষ রক্তিম কিরণচ্ছটা সেই সকল পাহাড়ের গায়ে পড়িয়া এক অপূর্ব্ব বেগুনী রংয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। দূরে দুই একটী ময়ূর দেখিতে পাইলাম। তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া উচ্চ কেকারবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে। ইতস্ততঃ যেন রামায়ণ-বিবৃত, উত্তর চরিত-বর্ণিত দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে চলিতেছি। পথে কত বৃক্ষই দেখিতে পাওয়া গেল। তাহারা হয়ত প্রাচীন কবির ভাষায় কোনটী জম্বু, কোনটী লোধ্র, কোনটী পিত শাল, কোনটী পিয়াল, তিনিশ, বেণু, মধুক ইত্যাদি হইবে। চারিদিকের শান্ত নিসর্গ-শোভার মধ্যে প্রাচীন স্মৃতিজড়িত ধূম্রাকার অদূরবর্ত্তী চিত্রকূটের

বিচিত্র পর্ব্বতরাজি দেখিয়া এক অনির্ব্বচনীয় রসে হৃদয় ভরিয়া উঠিল। আধুনিক সহর হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া এবং রেল-জাহাজ ট্রাম-মোটরের সংস্পর্শে পতিত হয় নাই বলিয়া এই পবিত্র জনপদ এখনও যেন সেই প্রাচীন গৌরব লইয়াই বিরাজ করিতেছে। তাই সেই ত্রেতাযুগের পবিত্র স্থান, সেই অগস্ত্য, অত্রি, বাল্মীকি ও শ্রীরামচন্দ্রের পদরজে পূত এবং বাল্মীকি-কালিদাস-ভবভূতি-বন্দিত স্থানে আসিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলাম। চির-পোষিত আকাঙ্ক্ষা যেন আজ অপ্রত্যাশিতরূপে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই পথ দিয়াই না একদিন চীরবাসধারী বিষয়-বৈরাগী শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আশ্রমবাসের জন্য চিত্রকূটে গিয়াছিলেন? আর অদূরস্থিত চিত্রকূটের মনোরম শোভা দেখিয়া ভাবে গদ্‌গদ হইয়াছিলেন? তাই সেই পথের, সেই শোভার মধ্যে চলিতে চলিতে আনন্দে তাঁহার দেহ পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইয়াছিল! এই প্রসঙ্গে এস্থানে রামায়ণ হইতে কয়েকটী ছত্র উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। রামচন্দ্র এই পথে যাইতে যাইতে কমল-লোচনা সীতা ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন, "জানকি, দেখ, এই বসন্তকালে পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষসকল স্ব স্ব কুসুম সমূহে মালাধারী হইয়া যেন সম্যক্ প্রজ্বলিত হইতেছে। লক্ষ্মণ! এই ভল্লাতক ও বিল্ববৃক্ষ সকল মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সেবিত না হওয়ায় পুষ্প ও ফলভরে অবনত এবং প্রায় প্রতি বৃক্ষেই মধুকরগণ-সঞ্চিত দ্রোণ-পরিমাণ মধুচক্র সমস্ত লম্বিত রহিয়াছে। দেখ, আমরা নিশ্চয়ই এখানে সুখে জীবন ধারণ করিতে পারিব। ঐ পুষ্প-সংস্তরযুক্ত রমণীয় বনমধ্যে কোকিল কূজন করিতেছে এবং ময়ূর তাহার অনুকরণ করিতেছে। ঐ উচ্চ শিখর-সমন্বিত ও পক্ষিসমূহের কূজন-মুখরিত চিত্রকূট পর্ব্বতে হস্তিগণ বিচরণ করিতেছে। দেখ ভ্রাতঃ! আমরা ঐ চিত্রকূট পর্ব্বতের সমভূভাগবর্ত্তী বিবিধ বৃক্ষসমাকীর্ণ রমণীয় অথচ পুণ্যপ্রদ কাননে আনন্দ অনুভব করিব।" বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ যেখানেই সুবিধা পাইয়াছেন সেই খানেই চিত্রকূটের এইরূপ বর্ণনায় আত্মহারা হইয়াছেন। রামায়ণে চিত্রকূটের দৃশ্য-বর্ণনা যতটা স্থান অধিকার করিয়াছে অত আর কিছুতে করে নাই। আমরা এই ভাবে নানা দৃশ্য শোভা দেখিতে দেখিতে, নিস্তব্ধ পথ নিস্তব্ধ ভাবেই অতিবাহিত করিয়া ঠিক সন্ধ্যায়, দীপ জ্বালাইবার সময়ে চিত্রকূটে পাণ্ডার গৃহে উপনীত হইয়াছিলাম।

নানা কথা।

[লেখক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।]

ঈশ্বর গুপ্ত ও শকুন্তলা ঃ—'বসুমতী'র পুস্তক-বিভাগ হইতে ঈশ্বর গুপ্তের যে দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাণ্ড এক ভুল দেখিলাম। ভুল এই যে, যে লেখা ঈশ্বর গুপ্তের নহে, সেই লেখা ঈশ্বর গুপ্তের রচিত বলিয়া তাহাতে চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

—*—

রচনাটির নাম—শকুন্তলা। গ্রন্থাবলীর প্রথমেই ইহা মুদ্রিত হইয়াছে, এবং ইহার পাদ-টীকায় এইটুকু লেখা আছে যে,—"কবি ইহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।" কিন্তু একথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। গ্রন্থখানি অসমাপ্ত নহে,—আমরা ইহার সবটুকুই পাইয়াছি। সপ্তম স্তবকে ইহা সমাপ্ত। 'বসুমতী'র গ্রন্থাবলীতে যে অংশটুকু প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রথম স্তবক মাত্র।

—*—

তারপর, এ গ্রন্থখানি ঈশ্বর গুপ্তের যে রচিত নহে, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রমাণ,—এই সম্পূর্ণ 'শকুন্তলা' গ্রন্থখানি, যাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই পুস্তকের মলাটে লেখা আছে,—"শ্রীহরিমোহন গুপ্ত প্রণীত।" ইহা ছাড়া, পুস্তকের 'বিজ্ঞাপনে'ও হরিমোহনবাবু স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"বহুকাল হইল শকুন্তলার কিয়দংশ মাত্র 'প্রভাকরে' প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা যৎকালে প্রকটিত হয়, তৎকালে ভূতপূর্ব্ব প্রভাকর সম্পাদক ৺ বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও 'ছাত্রবোধে'র রচয়িতা শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে অনুরাগ প্রকাশ করেন। নানা কারণে উহা একাল পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই, এবং মুদ্রাঙ্কন পূর্ব্বক প্রকাশ করিবারও আমার মানস ছিল না, কেবল কাব্যানুরাগী বন্ধুবর্গের আগ্রহাতিশয় প্রযুক্ত প্রচার করিতে বাধ্য হইলাম।"

"আমাদিগের দেশের যে দশা তাহাতে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিবেন, শকুন্তলা আবার কেন? তাহার উত্তর এই, বিদ্যাসুন্দর, বেতাল পঞ্চবিংশতি ও মহাভারত আবার কেন? কিন্তু সহৃদয় পাঠকগণ এরূপ আপত্তি কখনই

করিবেন না, যেহেতু তাঁহারা জানেন রঘুবংশে কালিদাস কহিয়াছেন, আমি পূর্ব্ব পণ্ডিতদিগের বাক্যস্বরূপ দ্বার দিয়া এই মহান্ বংশে সেইরূপে প্রবিষ্ট হইব, বজ্রদ্বারা ছিদ্রিত মণিমধ্যে সূত্র যেরূপে অনায়াসে প্রবেশ করে।"

"শকুন্তলা আমার যৌবনাবস্থার রচনা। যৌবনাবস্থার লেখায় যে সমস্ত দোষ লক্ষিত হয়, এই কাব্যে অবশ্যই তাহার কিছু কিছু সম্ভাবনা আছে, অধিকন্তু আমার মনে উৎসাহ না থাকাতে পুনর্ব্বার দৃষ্টি করি নাই. সুতরাং উহা যদবস্থ ছিল তাহাই মুদ্রিত হইয়াছে। অতএব সহৃদয় পাঠক মহাশয়েরা আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি, এই কাব্য শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয়ের আনুকূল্যে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে ইহার কোন কোন অংশ আমার সম্মান্ত মিত্র শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখাইয়াছিলাম। তিনি ইহার মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করাতে অধুনা সাধারণের নয়নগোচর করা গেল।—২৮এ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯১ শক। কাঁচড়াপাড়া।"—আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট করিবার জন্য গ্রন্থকার-লিখিত 'বিজ্ঞাপনে'র সবটুকুই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এখন 'বসুমতী'র পুস্তক-প্রকাশক এই সাংঘাতিক ভুলের সংশোধন করিলেই আমরা সুখী হইব। কোনও এক অখ্যাত লেখকের লেখা ঈশ্বর গুপ্তের রচিত বলিয়া চালাইতে পারিলে বহি বিকায় বটে, কিন্তু সে জুয়াচুরী মতলব 'বসুমতী'র কর্ত্তাদের আছে বলিয়া মনে হয় না।

—*—

ঋষি ও রবীন্দ্রনাথ।—রবীন্দ্রনাথ একবার দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"ভাল কাব্যের সমালোচনায় পাঠকের হৃদয়ে সৌন্দর্য্য সঞ্চার করিবার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া নূতন এবং কঠিন কথায় পাঠককে চমৎকৃত করিয়া দিবার প্রয়াস আজকাল দেখা যায়; তাহাতে সমালোচনা সত্য হয় না, সুন্দর হয় না, অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক হইয়া উঠে।"—কথাটা যখন রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, তখন বোধ করি, স্বপ্নেও তিনি মনে করেন নাই যে, তাঁহারই কাব্যগ্রন্থের অদৃষ্টে ঐ সমালোচন-বিড়ম্বনা লেখা আছে!

—*—

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যে সকল 'সমালোচনা' আজকাল বাহির হইয়া থাকে, তাহার প্রায় পনেরো আনা সাড়ে তিন পাই "সত্য হয় না, সুন্দর হয় না, শুধু অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক হইয়া উঠে।"—একথা আমাদের মন-গড়া কথা নহে।

'প্রবাসী' ও 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকার পাতা উল্টাইলেই এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে রবীন্দ্রনাথকে কেহ 'ঋষি' বলিতেছেন, কেহ 'রাজর্ষি' বলিতেছেন, কেহ বা তাঁহার ব্রহ্ম-সঙ্গীতের সহিত সামগানের তুলনা করিতেছেন। অথচ 'ঋষি' কাহাকে বলে, 'মন্ত্রদ্রষ্টা' কে, 'সামগান' জিনিষটা কিরূপ, সে সব কথা এই সমালোচক-সম্প্রদায়ের একেবারেই জানা নাই। জানা থাকিলে কি কেহ এমন কেলেঙ্কারী করিতে পারে ?

—•—

সেদিন একখানা বাঙ্গালা মাসিকে দেখিতেছিলাম, রবীন্দ্রনাথের 'ঠিকুজী'তে নাকি আছে যে, দেশের কতকগুলি বানর তাঁহাকে খোঁচা মারিবে। কথাটা নেহাৎ মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাকে 'ঋষি' 'মন্ত্রদ্রষ্টা' প্রভৃতি বলা, প্রকারান্তরে তাঁহাকে খোঁচা দেওয়ারই সামিল। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কত কবি কত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের অদৃষ্টে 'ঋষি' খেতাব কখনও জুটে নাই। এমন কি, কালিদাস, ভবভূতি, জয়দেব প্রভৃতি সংস্কৃত কবিগণকেও তাঁহাদের টীকাকারগণ কোনও কালে 'ঋষি' বা 'মন্ত্রদ্রষ্টা' প্রভৃতি কিছু বলিয়া যান নাই। রবীন্দ্রনাথের দুরদৃষ্ট ! তাই তাঁহাকে তাঁহার সমালোচকগণের নিকট হইতে এই অত্যাচার-অবিচার সহ্য করিতে হইতেছে। 'ঋষি' বা 'মন্ত্রদ্রষ্টা' বলিলে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হয়,—আমরা যাহা বুঝি, তাহাতে বলিতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি ঐ কথা প্রয়োগ করিলে তাঁহাকে উপহাস করা হয়,—তাঁহাকে লইয়া রঙ্গ করা হয়।—কেন ? তাহাই বলিতেছি।

—*—

ঋষি কে ? প্রাচীন হোতা ও অধ্বর্য্যু যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা "মন্ত্র" রচনা করিতেন, তাঁহাদিগকেই 'ঋষি' বলা হইত। 'ঋষি' শব্দের অর্থ 'দ্রষ্টা'। সাধারণে যাহা দেখিতে পায় না, তাহা তাঁহারা দেখিতে পান। আর "মন্ত্র" কি ?—যে সকল পবিত্র বাক্যের দ্বারা যজ্ঞতগণকে 'মনন' বা হৃদয়ঙ্গম করা যায়, সেই সকল পবিত্র বাক্যের নাম মন্ত্র। বিপিনচন্দ্র বলেন,—"মন্ত্র মাত্রেই অপ্রাকৃত শক্তি সম্পন্ন। সে শক্তি কোথা হইতে আসে, কে জানে ? কিন্তু মন্ত্র-সাধক মাত্রেই মন্ত্রের অদ্ভুত, অপ্রাকৃত শক্তি অল্প বিস্তর প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। মন্ত্রের প্রধান গুণ এই যে, তাহার উচ্চারণে, আপনা হইতেই বস্তু প্রকাশিত হইয়া পড়ে। মন্ত্র শব্দ মাত্র। শব্দ ধ্বন্যাত্মক, ধ্বনি বিশেষকে

অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়। গো শব্দ গ+ও, এই দুই ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়। কিন্তু গ বা ও, বা উভয়ের সংযোগ সিদ্ধ গো, এ সকলের কোনটাই বস্তু নহে। গো বস্তুর নাম, বস্তু বিশেষকে নির্দ্দেশ করে; বস্তুর সঙ্কেত, বস্তুর চিহ্নমাত্র। মন্ত্র শব্দাত্মক বা ধ্বন্যাত্মক তাহাও মূলতঃ অবস্তু। কিন্তু বারম্বার গো শব্দ উচ্চারণ করিলে, সেই উচ্চারণের বা আবৃত্তির শক্তিতে কখনো গো বস্তু প্রকাশিত হইবে না। ইহার কারণ এই যে, 'গো' শব্দ মাত্র, ইহা সিদ্ধ মন্ত্র নহে। তপঃ প্রভাবে সিদ্ধমন্ত্রে অপ্রাকৃত শক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে, এইজন্য সিদ্ধমন্ত্রের প্রকৃতি অন্যরূপ। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ, ওঁ সত্যং শিবং সুন্দরং—এই সকল সিদ্ধমন্ত্রের ঐকান্তিক আবৃত্তিতে মন্ত্রের অভীষ্ট বস্তু স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া পড়ে। নামে ও বস্তুতে, এক্ষেত্রে একান্ত অভেদ। যে শব্দের এই অপ্রাকৃত শক্তি আছে, যাহার উচ্চারণ ও আবৃত্তিতে বস্তু প্রকাশিত হয়, তাহাকেই মন্ত্র বলে। স্তব ও মন্ত্রে প্রভেদ অনেক। মন্ত্র স্বল্পাক্ষর, স্তব যত দীর্ঘ হউক না কেন, তাহাতে তাহার স্তুতিগুণ নষ্ট হয় না। মন্ত্র অন্তরঙ্গ সাধন, স্তব বহিরঙ্গ সাধন; মন্ত্র সূত্র, স্তব বৃত্তি।" সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে স্তব বলিলেও বলিতে পার, কোনও আপত্তি করিব না। কিন্তু তাহার উপর যাইয়া আর হাস্যরসের সৃষ্টি করিও না! অত্যুক্তি, অতিরঞ্জন বা উচ্ছ্বাস সমালোচনার অঙ্গ নহে।

—*—

স্বামী বিবেকানন্দের কথাও আজ মনে পড়িতেছে। তিনি বলিতেন—"কেবল 'আমি ঋষি' বলিলেই চলিবে না, কিন্তু যখনই তুমি যথার্থ ঋষিত্ব লাভ করিবে, তুমি দেখিবে, অপরে কে জানে কেন, তোমার কথা না শুনিয়া থাকিতেই পারিবে না।…তিনিই ঋষি, যিনি ধর্ম্মকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, যাঁহার নিকট ধর্ম্ম কেবল পুঁথিগত বিদ্যা, বাগ বিতণ্ডার তর্কযুক্তি নহে,—সাক্ষাৎ উপলব্ধি—অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎকার। উপনিষদ বলিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি সাধারণ মানবতুল্য নহে—মন্ত্রদ্রষ্টা;—ইহাই ঋষিত্ব।" আমাদের এসকল কথা বলিবার হেতু এই যে, যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা যেন এই সকল কথা মনে রাখিয়াই তাঁহার সমালোচনা করেন। সমালোচন-শক্তির যদি অভাব বোধ হয়, তাহা হইলে দয়া করিয়া ঐ কাজটিতে হাত নাই বা দিলেন, তাহাতে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না। কিন্তু দোহাই আপনাদের! সমালোচন-শক্তির অভাবটা আপনারা তৈলে পূরণ করিবেন না!

কর্ম্মযোগী ভূদেব।—জ্যৈষ্ঠ মাস বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ একটা স্মরণীয় মাস। এ মাসে বাঙ্গালার যত বড় বড় লোকের মৃত্যু হইয়াছে, এত বোধ করি আর কোনও মাসে হয় নাই। ভূদেব, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল, অক্ষয় দত্ত, রজনী গুপ্ত ও বিশারদ প্রভৃতি বহু রত্নই এই মাসে কাল-সাগরে বিলীন হইয়াছে।

—*—

ভূদেবকে লক্ষ্য করিয়া কবিবর হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—

"ইংরাজী শিক্ষার ফুল বাঙ্গালী শিকড়ে।
নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের ঝাড়ে॥"

—বাস্তবিক, বাঙ্গালী-শিকড়ে ইংরাজী শিক্ষার এমন অপূর্ব্ব ফুল এদেশে দ্বিতীয় হয় নাই।—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম সংঘাতে বাঙ্গালায় যতগুলি ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ভূদেব অতুল্য, অনুপমেয়। যে সময়ে আমরা "ধর্ম্ম ভাঙ্গিতেছিলাম, সমাজ ভাঙ্গিতেছিলাম, প্রথা ভাঙ্গিতেছিলাম, চরিত্র ভাঙ্গিতেছিলাম, সদাচার ভাঙ্গিতেছিলাম;—এমন কি, যে সময়ে অনাচারে, অত্যাচারে, স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিয়া, অকালে কালস্রোতে ডুবিতে পারাও যেন একটা বিশেষ গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতাম', সেই সময়ে কর্ম্মযোগী ভূদেব উহার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দুধর্ম্মের আলোক ধরিয়াছিলেন। তিনি বিলাতী বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াও, কখনও আত্মবিসর্জ্জন করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই বিলাতী শিক্ষার নয়নানন্দকর উজ্জ্বল চাকচিক্যে একবার না একবার অল্পবিস্তর মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু 'বিচারকুশল ভূদেব চিরদিনই স্বদেশের ধর্ম্মে, শাস্ত্রে, সমাজে, সংস্কারে, সাহিত্যে বিশ্বাস রাখিয়া একভাবেই জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। স্যর লোপার লেথব্রিজ বলিতেন, "Vidyasagar was the very ideal of a high mind, benevolent and intellectual Brahmin of the old school —Kristo Das the model of the kindly, clever, versatile man of the world—but Babu Bhoodeb seemed to me to combine some of the best qualities of both these great men." অর্থাৎ, বিদ্যাসাগর মহাশয় উচ্চাশয়, পরোপকারী ও প্রাচীন তন্ত্রের বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ ছিলেন, আর কৃষ্ণদাস পাল সদয় স্বভাব, চতুর ও সুদক্ষ কাজের লোকের আদর্শ স্বরূপ ছিলেন; কিন্তু ভূদেববাবুতে এই দুই মহাত্মারাই সদ্‌গুণাবলীর

সমাবেশ ছিল।" ইডেন সাহেবও তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে স্যর লর্ড ক্যাম্বেলকে বলেন,—"Bhoodeb has many of the higher qualifications of the Europeans and very few of the failings of his country-men."—অর্থাৎ ভূদেবে ইউরোপীয় সদ্‌গুণ অনেক আছে, কিন্তু তাঁহার দেশের লোকের যে সকল ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহাতে নাই বলিলেও চলে।"—এ সকল কথা অত্যুক্তি নহে। তাঁহার চরিত্র-কথাই ইহার সাক্ষ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র বাক্যে 'সাম্যবাদ' প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু ভূদেবের ব্যবহারে 'সাম্যবাদ' ফুটিয়া উঠিত। ভূদেবকে আমলা পয়লা প্রভৃতির সহিত মিলিতে মিশিতে দেখিয়া বঙ্কিম তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন, "আপনি আমলাদের নিয়ে একত্রে বসেন কেন?"—উত্তরে ভূদেব তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, 'চাকুরীর পদ-মর্য্যাদা শুধু সরকারী কাজ করিবার সময়,—চব্বিশ ঘণ্টা কেহ চাকরে নয়—সিভিলিয়ান কমিশনরও সব্‌ডেপুটির সহিত 'ক্লবে' মিশেন।" —কিন্তু বঙ্কিমবাবুর একথা তখন ভাল লাগিল না। পরে একদিন কথা-প্রসঙ্গে ভূদেববাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেন,—"কন্যার বিবাহ দেওয়া বড়ই কঠিন হইয়াছে। যাহাদের কুল আছে, তাহাদের বিদ্যা নাই; যাহাদের কুল ও বিদ্যা আছে, তাহাদের অন্নসংস্থান নাই।"—এই কথায় বঙ্কিমবাবু বলিয়া উঠিলেন,— "আমার একটি মেয়ের বিবাহের জন্য আমিও বড়ই ভাবনায় পড়িয়াছি।" ভূদেব বাবু বলিলেন,—"তোমাদেরই ঘর। ছেলে এবার প্রথম বিভাগে বি-এ পাশ করিয়াছে, ছেলে মাতামহের বিষয় অনেক হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে। বাপ কেরাণীগিরি করে এবং বলে ছেলের বিষয় থেকে খাব কেন? সে লোকটিকে তুমি জান, এখানকার কলেক্টরীতে কাজ করেন। আমার স্বগোত্র। তোমার কাজে লাগিতে পারে।"—বঙ্কিমবাবু আগ্রহ সহকারেই বলিলেন, "কে? তাঁর ছেলে এত ভাল, আর তাঁর মন এত উঁচু?"—তখন ভূদেবের হাসিমুখ দেখিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র সব বুঝিতে পারিলেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"এটা সেদিন-কার তর্কের শেষ নিষ্পত্তি হইল। আপনার কাছে আসিয়া যদি সৎশিক্ষা না পাইব ত কোথায় পাইব? যেখানে কন্যাদানের কথা মনে হইতে পারে, সেখানে আর অফিসের বাহিরে আমলা হাকিমের পার্থক্য কোথায়? এ বিষয়ে আমার বড়ই বিষম ভ্রম ছিল।"* —এই রকম ভুল-ভ্রান্তি অনেকেরই ভূদেব

* ভূদেব-জীবনী।

সংশোধন করিয়া দিতেন। বাক্যে ও কার্য্যে তাঁহার চিরদিন সামঞ্জস্য ছিল। ভাবের ঘরে লুকোচুরি খেলা করিতে তিনি কোনকালেই ভালবাসিতেন না।

—*—

"যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং"—ইহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন ; তবে যে শিক্ষা মেয়ে মানুষকে বিবি করিয়া তুলে,—জোয়ান অব্ আর্ক সাজিয়া বথামি করিবার প্রশ্রয় দেয়, সে শিক্ষা তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। সমাজ-সংস্কারেও তাঁহার বিলক্ষণ সহানুভূতি ছিল, তবে সংস্কারের নামে স্বেচ্ছাচারিতা বা উচ্ছৃঙ্খলতাকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার "পারিবারিক প্রবন্ধে" 'অর্থ সঞ্চয় ও মিতব্যয়িতা' সম্বন্ধে যে উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, নিজের জীবনে তাহার অনুশীলন করিয়াছিলেন,—তাহার প্রায় সমুদায়—দেড় লক্ষেরও অধিক টাকা, সংস্কৃত এবং বঙ্গভাষায়, হিন্দুশাস্ত্রের ও অধ্যাপকবর্গের উন্নতির জন্য দান করিয়া গিয়াছেন।"—এমন সাত্ত্বিক নিষ্কাম দানের উদাহরণ সর্ব্বদেশেই বিরল। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একবার কাহারও দুর্ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—"আমি ত উহার কোন উপকার করি নাই,—ও আমার নিন্দা করে কেন ?"—ভূদেবের মুখে কিন্তু এমন কথা কেহ কখনও শুনে নাই। বিদ্যাসাগরের এই কথা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,"কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা করাটাতেই আশাভঙ্গের কারণ নিহিত আছে। তা ছাড়া, সকলের প্রতি সব সময়ে এক মাপের দয়ার কার্য্য করাও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। দানটা "দেশে কালে চ পাত্রে চ" হওয়া চাই। যে সকল ভাল লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা উপকার পাইয়াছেন, তাঁহারা কি উঁহার প্রতি একান্তই ভক্তিমান নহেন ? তবে, সকল অপাত্রগুলাই তাঁহার দান পাইলে সুপাত্র হইয়া পড়িবে, এরূপ দুরাশা করিলে তাহা সফল হইবে কেন ?" * আসল কথা, ভূদেবের জীবন—আদর্শ জীবন। সে জীবন আমাদের ভবিষ্যতের পথ-প্রদর্শক। তিনি এমন একটি আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা স্মরণ করিলে জীবন স্বতঃই মহত্ত্বের পথে আকৃষ্ট হয়।

—*—

সাহিত্য-ভাণ্ডারে তিনি যে দান করিয়া গিয়াছেন, সে দানও সামান্য নহে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেদিন সভাপতির আসনে বসিয়া কেন যে বলিলেন, "বাঙ্গালী নানা বিষয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া হেল্স সাহেবের মত বা এডিসন সাহেবের

* ভূদেব-জীবনী।

মত রচনা লিখিতেছে,—এত দেখা যায় না" ;—ইহা বুঝিতে পারিলাম না। বিপিনচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, শশধর, হীরেন্দ্রনাথ, উমেশ বটব্যাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও দ্বিজদাস প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিই, একা ভূদেবেরই 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ,' 'আচার প্রবন্ধ,' 'পুষ্পাঞ্জলী' প্রভৃতি পুস্তক কি সাহিত্যের সামান্য সম্পদ? বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যার চার্লস ইলিয়ট মহোদয় 'সামাজিক প্রবন্ধ' সম্বন্ধে বলেন যে "No single volume in India contains so much wisdom and none shows such extensive reading. It is the result of the life-long study of a Brahmin of the old class in the formation of whose mind eastern and western philosophy have had an equal share."—ইহার মর্ম্ম এই যে, 'সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এমন গ্রন্থ দ্বিতীয় নাই, যাহাতে একাধারে এত জ্ঞান ও এত বেশী অধ্যয়নের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুল্য জ্ঞান যাঁহার চিত্তকে গঠিত করিয়াছে,—এমন এক প্রাচীন তন্ত্রের ব্রাহ্মণ সন্তানের ইহা আজীবন অধ্যয়নের ফল।' ভূদেবের পুস্তকের পরিচয় দিবার জন্য সাহেব প্রদত্ত সার্টিফিকেট উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল না ; তবে দেশের হরপ্রসাদগণের নিকট সাহেবের উক্তি সত্য ও মিষ্ট লাগে বলিয়াই অনিচ্ছাসত্ত্বেও উহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

—•—

কিন্তু আমাদের জন্য যিনি এত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতির সম্মানার্থ আমরা কি করিয়া থাকি? ১লা জ্যৈষ্ঠ তাঁহার মৃত্যু দিন গত হইল,—দেশের কে সেদিন তাঁহার নাম করিল? জমীদার জ্যোৎকুমারের ও সম্পাদক বিহারীলালের উপাধি প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য সভা হইতেছে,—'সাহিত্য সঙ্গতে'র মাসে মাসে বৈঠক বসিতেছে,—সন্দেশ রসগোল্লার শ্রাদ্ধ হইতেছে, অথচ কর্ম্মবীর ভূদেবের নাম দেশবাসী ভুলিয়াও মুখে আনে না! পরিষদের কর্ত্তব্য-জ্ঞানের কথা আর নূতন করিয়া কি বলিব! বাঙ্গালীর এ ঔদাসীন্য—এ কলঙ্ক কি কখনও ঘুচিবে না?

বাঙ্গালী লেখকের মনুষ্যত্ব।—বাঙ্গালী লেখকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে দেখিয়া দেশের অনেকেই আশান্বিত। অনেকেরই মুখে

শুনিতে পাই যে, এই অতি সাহিত্য-চর্চ্চার ফলে বাঙ্গালীর নাকি মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে, মনুষ্যত্বের উন্মেষ ঘটিতেছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত কি ঠিক?

—*—

আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি, এবং এখনও বলিতেছি যে, সাহিত্য মানুষ গড়ে, এ কথা সত্য; যদি সে সাহিত্য মানুষের হাতে গড়া হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশে যাঁহারা এখন সাহিত্য চর্চ্চা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত মানুষ কয়জন? কয়জনের স্পষ্ট কথা বলিবার সাহস আছে? কয়জনে স্পষ্ট কথা হাসিমুখে সহ্য করিতে পারেন? সমালোচনা করা এখন একপ্রকার বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রায় সকলেই ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান। 'প্রবাসী,' প্রভৃতি কয়েকখানি কাগজ এই সমালোচনার ভয়ে আমাদের 'অর্চ্চনা'র সহিত বিনিময় বন্ধ করিয়া দিয়াছে। 'সবুজপত্র' সাহস করিয়া এ পর্য্যন্ত বিনিময় করিতে অগ্রসরও হন নাই। অথচ, এই সকল কাগজের সম্পাদকেরাই কাগজে কলমে কত বীরত্বই প্রকাশ করিয়া থাকেন!

—*—

মুখে ইঁহারা নিজেদের পুরুষত্বের—মনুষ্যত্বের বড়াই করেন বটে, কিন্তু ব্যবহারে স্ত্রীলোকের অপেক্ষাও ইঁহারা অধম। ইঁহাদের কাজের ত্রুটি দেখাই-লেই ইঁহারা চটিয়া লাল হন,—গালাগালি দেন। সম্প্রতি এইজন্য একখানা গালাগালি পূর্ণ 'পত্রাঘাত' পাইয়াছি। একজন এম-এ-উপাধিধারী অধ্যাপক-সম্পাদকের পত্রে আপনারা তাহার পরিচয় লউন;—

শ্রীশ্রীরামঃ ভাটপাড়া

তাং ১লা জুলাই, ১৯১৫

পরম সুহৃদ্বরেষু

যথোচিত সম্ভাষণপূর্ব্বকবিজ্ঞাপনমেতৎ,

ভরসা ছিল আপনারা অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য দ্বারা আমাকে যে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন, সে সৌহার্দ্দ্য চিরদিন বজায় থাকিবে, এবং ইতিপূর্ব্বে যতবার সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহাতে সে ধারণা অক্ষুণ্ণই ছিল। কিন্তু এবার জুন মাসের অর্চ্চনা পত্রিকায় যেরূপ বৈরীভাবে বিদ্যোদয়ের সমালোচনা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্বধারণা একেবারে গিয়াছে। আমার নামটী উপরে কি নীচে ছাপা হইয়াছে এই ভাবে কটাক্ষ করায় কি আপনার মত মহানুভবের কার্য্য হইয়াছে, না * * * বাবুর উচিত হইয়াছে? আর আমার প্রবন্ধটীর উপর—"অসার, অসংস্কৃত বা বাংলা সংস্কৃত" এই ভাবে লিখিবার পূর্ব্বে একবার কি জানা উচিত ছিল না এ প্রবন্ধটীর

সংস্কৃত সাহিত্যিক সমাজে কত আদর হইয়াছে? পূর্ব্ব বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া জানাইতেছি—যে সুদূর হরিদ্বারের সংস্কৃতালোচনার কেন্দ্রস্থল মহাবিদ্যালয় হইতে সুপণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "ভারতোদয়" হিন্দী পত্রিকায় এই প্রবন্ধটী হিন্দী অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত হইয়াছিল, যদি কৌতূহল হয়, দেখাইতে পারি। ইহা খুবই জানিবেন হরিদ্বারের পণ্ডিতগণ অল্পবিদ্য কেশেল (?) হাম্ বড় হতভাগ্যগণ অপেক্ষা শত গুণ বিদ্বান এবং নিজেদের নামের জাহির করিবার জন্য এরূপ নীচতার আশ্রয় করে না। অর্চ্চনার দুর্ভাগ্য যে এরূপ পরশ্রীকাতর আত্মম্ভরী হতভাগ্যগণের এত মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। এখনও সাবধান হউন, উহাদের জন্য আপনাদের পত্রিকার যেটুকু মর্য্যাদা ছিল তাহাও যাইতে বসিয়াছে। আমরা প্রাণপাত করিয়া বিদ্যোদয় বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছি, কোথায় উৎসাহ পাইব, তা নয় এরূপ নীচতার সহিত আক্রমণ। এত বড় বাংলা দেশে আর ত কেউ সংস্কৃত এক কলম লিখিতে পারে না। কেবল গালি দিবার সময় মজবুত। ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়াছি।

পুনশ্চ—

অনেক ভাষায় পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে জানি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় আলোচিত হয় নাই, এরূপ করাতে কি অসঙ্গত হইয়াছে জানি না। ভট্টপল্লী, সংস্কৃত কলেজ, হরিদ্বার, জয়পুর প্রভৃতির পণ্ডিতসমাজ একবাক্যে ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া প্রশংসা করিলেন, আর কেশেল্ (?) সমালোচকের পাল্লায় পড়িয়া আপনারা ইহার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিলেন না, ইহার তীব্র সমালোচনা করিলেন। ইহা হইতে হিন্দী অনুবাদ সুদূর হরিদ্বারের পত্রিকায় প্রকাশ কি ইহার প্রতি আদরের পরিচায়ক নহে? এরূপ নীরস বিষয়টী ইহা অপেক্ষা সুসংস্কৃতে যদি কেহ লিখিতে পারে, আমরা তজ্জন্য পারিতোষিক দিতে প্রস্তুত আছি। "খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দ্যা অন্তিমভাগে"—ইত্যাদি বাক্যটী যদি কোন পণ্ডিত ইহা অপেক্ষা সুভাবে লিখিয়া দিতে পারেন আমরা তাঁহাকে বিদ্যোদয়ের সম্পাদক করিতে প্রস্তুত আছি। "যুদ্ধ" ও "বিগ্রহ" এক পর্য্যায় হইলেও, বিগ্রহ ও যুদ্ধে যে পার্থক্য আছে তাহা অল্পবিদ্য কেশেল (?) সমালোচককে ভাল করিয়া অমরকোষ দেখিয়া বিদ্যাটা ঠিক করিয়া লইতে বলিবেন। সংস্কৃত না জানিয়া, এক কলম সংস্কৃত না লিখিয়া কি করিয়া বিদ্যোদয়ের সমালোচনা করিতে দুঃসাহসী হয় ভগবানই জানেন। নিয়মিত বিদ্যোদয় পাঠ করিয়া যেন সংস্কৃতে অভিজ্ঞতা শিক্ষা করে। রত্নপ্রয়াগের কপি আমাদের কাছে আছে, দরকার হইলে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিব, কত ভুল আছে ইয়ত্তা নাই, আমরা শুদ্ধ করিয়া লইয়াছি। ভগবানের দয়ায় পিতৃদেবও কাহাকেও তোয়াক্কা রাখিতেন না, আমরাও কাহাকে রাখি না। পূর্ব্ব বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া এতটা মনের দুঃখ জানাইতে পারিলাম। কেশেল কুক্কুরের ঘেউ ঘেউনিতে ভয় করি না। ইতি

শ্রীভববিভূতি শর্ম্মণঃ।

—কোনও ভদ্রলোকের ছেলে যে এমন কদর্য্য ভাষায় পত্র লিখিতে পারে, তাহা অনেকেই বিশ্বাস করিবেন না মনে করিয়া পত্রখানা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। নহিলে, এ চিঠি ছাপাইয়া ভদ্রজনপাঠ্য 'অর্চ্চনা'র অঙ্গ কলুষিত করিতাম না।

ইহা ছাড়া, ভোয়ে-শুয়ে, কেলো-ভুলো প্রভৃতি লেখকদের গালাগালি পূর্ণ পত্র যে আমাদের কত হস্তগত হয়, তাহার হিসাব নাই। দোষকে দোষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেই এই কেলো লেখকগণ মনে করেন যে আমরা ঈর্ষা-বশতঃই তাঁহাদের লেখার নিন্দা করিতেছি। যাঁহাকে জীবনে চিনি না—যাঁহার সহিত কোনও কালে আলাপ পরিচয় নাই, তাঁহার লেখার সমালোচনা যদি তাঁহার মনের মতন না হয়, তাহা হইলে তিনিও মনে করেন যে আমরা তাঁহার হিংসা করিয়া তাঁহার লেখা ভাল বলিতেছি না। কিন্তু মিথ্যা দেখিয়া তাহা মার্জ্জনা না করা, বা শৈথিল্য দেখিয়া সহ্য না করার নাম যদি হিংসা বা বিদ্বেষ হয়, তাহা হইলে সে অপবাদ মাথা পাতিয়া বহন করিতে রাজী আছি। কিন্তু এ প্রহসনের কি কখনও যবনিকা পড়িবে না? মুখেত আমরা রাতদিনই হুঙ্কার দিয়া বলিতেছি, "মানুষ আমরা, নহিত মেষ।" কিন্তু আমাদের প্রতি কার্য্যেই যে 'মেষত্ব' ফুটিয়া বাহির হইতেছে!

অর্চ্চনা।

[লেখক—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস, বি-এল্।]

আমার মানসকুঞ্জে যত ভাব-কলি
কা'র পদস্পর্শে হর্ষে উঠিয়াছে ফুটি';
নয়ন-সম্পাতে কা'র সহসা চঞ্চলি'
কল্পনা-লতিকা পড়ে ফুল-ভারে লুটি'!
হৃদয়-বীণার মোর সুপ্ত স্বর্ণ তারে
ধ্বনিয়া তুলিল কে গো সঙ্গীত-লহরী?
তিমসিক্ত চিররুদ্ধ অন্ধ কারাগারে
দীপালী আলোকে দিক্ কে বা দিল ভরি'!
নিজনাভি গন্ধে অন্ধ মত্ত মৃগসম
আপনি আপন ভাবে আনন্দে বিভোর,—
প্রতি শিরা, প্রতি স্নায়ু, প্রতি রন্ধ্রে মম
কি উচ্ছ্বাস! বহে নেত্রে আনন্দের লোর!
প্রেম-উৎস-উচ্ছলিত নিত্য চিত্ত-মাঝে
তোমারি অর্চ্চনা, প্রভু, করি সর্ব্ব কাজে!

কানু! আয় ফিরে আয়!

[লেখক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।]

কানু! আয় ফিরে বনছায়!
এ কেমন রীতি চাহ না তাদেরে
যাহারা তোমায় চায়।
যাহারা তোমায় তুলে লয় বুকে
কাঁটাটী বিঁধিলে পায়!
হেরিলে তোমার মলিন বদন
হয় পাগলের প্রায়!

আয় ভাই! ফিরে আয়।
তোমার বিহনে ব্রজ যে তোমার
হয়েছে আঁধার হায়!
তমালের বনে নাহি হাসি আর
বাজে না তোমার বেণু;
তৃণে তৃণে পথ রেখেছে লুকায়ে
তোমার চরণ-রেণু!

আয় ফিরে আয় ভাই।
দেখে যাও শুধু— শুধু একবার
কত ভালবাসে রাই।
ভাবিয়া ভাবিয়া তোমার কালিয়া
হয়েছে সে তনু কালো।
কেঁদে কেঁদে চায় মেঘে মেঘে পড়ে
যখন চাঁদের আলো।

কি আর কহিব তোরে!
ভুলিয়া রয়েছ তাহারে পাষাণ
কেমনে পরাণ ধ'রে?
তোমার কিশোরী নাহি সে কিশোরী
চেনা নাহি যায়—চাহি!
দেহে আছে প্রাণ বুকে আছে আশা
তবু যেন কিছু নাহি!

তস্কর।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্‌-এ, বি-এল্‌।]

(১)

অফিস বন্ধ হইবার পূর্ব্বে প্রায় এক ঘণ্টা মুষলধারে বৃষ্টি পড়িয়াছিল। গৃহে পীড়িত পুত্র। বিশেষ সেদিন বিরাজমোহন বেতন পাইয়াছিল—মবলগ ত্রিশ টাকা। কলিকাতার রাজপথগুলাও নিরাপদ নহে। এই সব সাত পাঁচ ভাবিয়া চিরন্তন অভ্যাস ছাড়িয়া আজ বিরাজমোহন ট্রামগাড়িতে উঠিল। ট্রামগাড়িতে উঠিল বটে, কিন্তু বিধাতা সে সামান্য বিলাসটুকুও তাহার ভাগ্যে লিখেন নাই। ট্রামগাড়ি বহুকষ্টে কলুটোলার মোড় অবধি আসিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। পথে জল জমিয়াছিল। সুতরাং অপরাপর যাত্রীর সহিত বিরাজমোহনকে গাড়ি হইতে নামিতে হইল। চরণের জীর্ণ পাদুকা বিরাজমোহনের বাম হস্তে উঠিল। দক্ষিণ হস্তে ছত্রধারণ করিয়া জল ঠেলিতে ঠেলিতে বিরাজমোহন গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল।

জলের উপর দিয়া চলিবার সময় বিরাজমোহনের চক্ষে পেশোয়ারিদিগের ফলের দোকানগুলা বড় লোভ জন্মাইল। গৃহে পীড়িত শিশু, সকালে তাহাকে বুকে করিয়া বিরাজমোহন হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ লইয়া আসিয়াছিল। ডাক্তার শিশুর পথ্যের জন্য বেদানা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিরাজমোহন মাত্র ত্রিশ টাকা বেতন পাইত। তাহাতে তাহার পঁচিশ ছাব্বিশ দিন মোটা ভাত মোটা কাপড়ে কায়ক্লেশে চলিত। মাসের শেষ চার পাঁচ দিন ঋণ করিয়া চালাইতে হইত। তাই বিরাজমোহন শিশুর জন্য বেদানা কিনিতে পারে নাই। আজ তাহার বেদানা কিনিবার বাসনা হইল।

বেদানার দাম দিয়া টাকার থলিটি বন্ধ করিয়া বুকের পকেটে রাখিবার জন্য হাত তুলিয়াছে এমন সময় চার পাঁচ জন লোকের একটা ভিড় বিরাজমোহনের উপর আসিয়া পড়িল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে জল ছিট্‌কাইয়া লাগিল। তাহার এক হাতে জুতা ও বেদানা, অপর হস্তে টাকার থলি ও ছাতা। গোলমালে ঠিক কি হইল বিরাজমোহন তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহার হাতের টাকার থলি অন্তর্দ্ধান করিল! সর্ব্বনাশ! থলিটা পড়িল না কেহ টানিয়া লইল,—

বিরাজমোহন কিছু বুঝিতে পারিল না। সে বিস্মিত হইয়া এদিক ওদিক চাহিল। ভিড়টা ততক্ষণে সরিয়া অপর ভিড়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। বিরাজমোহন জলের মধ্যে পদ সঞ্চারণ করিয়া দেখিতে লাগিল, টাকার থলির সন্ধান পাইল না। জলের মধ্যে হাত দিয়া খুঁজিল। দুই একজন পথের লোক তাহার কাহিনী শুনিয়া উপযাচক হইয়া জলের মধ্যে খুঁজিতে লাগিল। দুই একজন তাহাকে পরিহাস করিয়া হাসিল। একজন বলিল—"ও পকেট-মারের কাজ, আমাদের পাড়ার ননীর অমনি হয়েছিল।" একজন তাহাকে প্রতিবাদ করিল। কিন্তু হতভাগ্য বিরাজমোহন জলে ভিজিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কাঁদিতে লাগিল। দীর্ঘ একমাস কাল—একদিন, দুইদিন করিয়া ত্রিশ দিন—রুগ্ন শিশু—দোকানের ঋণ—বাড়িওয়ালার কড়া নিয়ম—কি বিভীষিকা!

(২)

মিঠ্ঠু সোনার প্রথমে অপর লোকের মতই জীবন আরম্ভ করিয়াছিল। প্রথম যৌবনে সে বিবাহ করিয়াছিল,পুত্রলাভ করিয়াছিল। স্বর্ণকারের দোকানে প্রথমে কারিগরের তামাক সাজিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে 'হাফর তাইতে', সোনা গলাইতে, সোনা পিটিতে, শেষে মোটামুটি অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছিল। দিন দিন শিল্পের প্রতি তাহার অনুরাগ জন্মিতেছিল। কিন্তু একদিন অকস্মাৎ বিধি তাহার ভার্য্যাটিকে ডাকিয়া লইলেন। মিঠ্ঠু মাতৃ-হীন শিশু লইয়া বড় বিব্রত হইল, বুকে করিয়া শিশুকে পালন করিতে লাগিল—ভাঙ্গা বুক, কাজ-কর্ম্মে শৈথিল্য জন্মিল, স্বর্ণকারের সহিত কলহ আরম্ভ হইল। মিঠ্ঠু তামাকু সেবন করিত, প্রাণের জ্বালা নিভাইবার জন্য মাঝে মাঝে এক এক টান গঞ্জিকা সেবন করিতে লাগিল। এক একদিন রস পান করিত—তালের রস। তাড়ি পান করিয়া মিঠ্ঠু থাকিত ভাল, প্রাণটা খুব হাল্‌কা বোধ হইত, ভাঙ্গা বুকটা যেন জোড়া লাগিত, আবার দার পরিগ্রহ করিবার বাসনা হইত। কিন্তু নেশা কাটিয়া গেলে মিঠ্ঠু সে কথা মনে স্থান দিত না। বাপ্ রে! সৎ মার হাতে পড়িলে কি তাহার স্নেহের বাবুয়া বাঁচিবে!

কিন্তু ভগবানের নিয়ম বড় গোলমেলে, বড় যুক্তিহীন। এত আদরের বাবুয়াটি তিন দিনের জ্বরে মিঠ্ঠুর কুটীর শূন্য করিয়া চলিয়া গেল! মিঠ্ঠু অনেক কাঁদিল, অনেক শোক করিল—শোক-নিবারণের জন্য গাঁজা টানিল, তাড়ি পান করিল, দুই একদিন মদ্যপান করিল—কিন্তু ক্ষণিক বিস্মৃতি, ক্ষণিক শান্তি। প্রাণের বহ্নি নেশা করিলে দারুণ বেগে জ্বলিয়া উঠে। মিঠ্ঠু শান্তি পাইল না!

কাজকর্ম্ম এক রকম ছাড়িয়া দিল—কাহার জন্য কাজ, কাহার জন্য পরিশ্রম, কাহার জন্য অর্থ!

যেমন অর্থাগমে মানুষ নষ্ট হয়, তেমনি শোকে মানুষ নষ্ট হয়। যেমন কমলার কৃপা কটাক্ষে মানুষ নরকের পথ বাছিয়া লয়, তেমনি তাহার রোষদীপ্ত ভ্রূকুটিতেও মানুষ নরকের পথে অগ্রসর হয়। অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেই মানুষ দৈনন্দিন অভ্যাসের পরিবর্ত্তন করিতে চাহে। সেই পরিবর্ত্তনের ফলে কেহ স্বর্গের দিকে অগ্রসর হয়, কাহারও সম্মুখে নরকের কপাট খুলিয়া যায়। দারুণ শোকে কেহ দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যোগ শিক্ষা করে, কেহ মাদকের দাসত্ব গ্রহণ করে। মিঠ্ঠু অশিক্ষিত, মিঠ্ঠুকে কেহ সুপরামর্শ দিল না। সে বাবুয়ার শোকে অনেকগুলা কু-অভ্যাসের শরণাপন্ন হইল। কোকেন খাইতে শিখিল—কোকেনে জিহ্বা অশক্ত হয়, হস্তপদ অসাড় হয়, চিন্তাশক্তি মোহাচ্ছন্ন হয়। দুঃখ রাজসিক—সত্ব ও তামসে তাহার নিবৃত্তি। সাত্বিক অভ্যাসের উপদেষ্টা তাহার ছিল না। সে মোহপথ আশ্রয় করিল। কোকেনে ক্ষণিক তৃপ্তি পাইল, কিন্তু কোকেন-সেবন রাজবিধির বিরুদ্ধ। একদিন মিঠ্ঠুকে পুলিসে ধরিল; মিঠ্ঠুর দণ্ড হইল; সে কারারুদ্ধ হইল।

এখন মিঠ্ঠু ভিন্ন লোক—পুত্রশোক, ভার্য্যাশোক, নিজের অধঃপতনের জন্য অনুতাপ আর তাহার নাই। এখন সে অবস্থার দাস, ক্ষণিক সুখের প্রত্যাশী। সমাজের রীতিনীতি, বজ্র-বাঁধন তাহার নিকট হাস্যাস্পদ বলিয়া পরিগণিত হইল। সে চোরের দলে মিশিল—দুষ্টের দলে মিশিল।

তাহার দলের সর্দ্দার একদিন বলিল—'মিঠ্ঠু, তুই কোকেন বেচা ছাড়, এবার তোকে পকেটের কাজ শিখাব।'

মিঠ্ঠু সম্মত হইল। আমরা পকেট মারাকে দুষ্কার্য্য বলি, চোরেরা পকেট-মারাকে শিল্পের মধ্যে গণনা করে। তাহারা বলে, 'পকেটের কাজ'। কাপড়ের কাজ, দুধের কাজ, সোনার কাজের মত তাহাদের "পকেটের কাজ"। মিঠ্ঠু পকেট-শিল্প শিক্ষা করিতে সম্মত হইল। কিন্তু এত বড় শিল্পটা তো একেবারে শিক্ষা করা যায় না। মিঠ্ঠুকে প্রথমে "ভিড় ঠেলা"র কাজ শিখিতে হইল। যখন পকেট-শিল্পী পকেটের কাজে বাহির হইত, তখন মিঠ্ঠু তিন চারি জন লোকের সহিত তাহার অনুগমন করিত, যাহার পকেট মারিতে হইবে তাহার চারিদিকে ইহারা ভিড় করিত। পকেট-মার পকেট হইতে টাকা তুলিয়া ইহাদের একজনের হস্তে দিত। সে লইয়া পলাইত। ক্রমে ভিড় সরিয়া

যাইত। সন্দেহ করিয়া কাহাকেও ধরিলে 'ভিড়ের' লোকেরা পথের লোকের মত তাহাকে প্রহার করিত, চোরের উপর ঘৃণা প্রকাশ করিত, ক্রমে ধাক্কা দিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দিয়া সকলে পলাইত। মিঠ্ঠু ভিড়ের কাজ ছাড়িয়া ক্রমে পকেটের কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। সে কার্য্যে সে যে বেশ পক্কতা লাভ করিয়াছিল, ইহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না। সে যখন বিরাজমোহনের টাকার থলি চুরি করিল, তখন পথের কেহ তাহাকে সন্দেহ করিল না। এমন কি মিঠ্ঠুর দলের লোকেরাও তাহার শিল্পচাতুর্য্যের সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিল না।

(৩)

যেদিন মিঠ্ঠু সোনার বিরাজমোহনের অর্থ চুরি করিল, সেদিন তাহাদের দলপতি কলিকাতায় ছিল না। চোরেরা অপরের পদার্থ চুরি করে বটে, কিন্তু পরস্পরের নিকট সাধু। সে দিন যে যাহা অপহরণ করিয়াছিল প্রত্যেকে আপনার নিকটে রাখিয়া দিল। সন্ধ্যার পর বড়িপাড়ার কুটীর মধ্যে বসিয়া আপনাপন প্রিয় নেশার দ্রব্য লইয়া এই দলের তস্করগণ নিজ নিজ কর্ম্মের প্রশংসা করিতেছিল। একজন বলিল,—'আজ মিঠ্ঠু খুব হাত সাফাই দেখাইয়াছে।'

মুস্তাফা প্রাচীরের কাজ করিত অর্থাৎ রাত্রে প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া গৃহস্থের বাটী চুরি করিত। সে বলিল,—'আরে পকেটের কাজ কি কাজ? পাঁচীলের কাজে ছিকৃমত আছে।'

উভয় দলে বড় তর্ক হইল। মিঠ্ঠু বলিল—'পারি নে এমন কাজ নেই।' মুস্তাফা বিদ্রূপ করিল। ফলে সেই রাত্রে মিঠ্ঠু প্রাচীরের কার্য্যে যাইতে মনস্থ করিল। একটা দায়িত্ব-পূর্ণ নূতন কাজ করিতে হইবে বলিয়া সে রাত্রিতে মিঠ্ঠু অধিক মাদকদ্রব্য ব্যবহার করিল না।

তখন প্রায় রাত্রি একটা বাজিয়াছে। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল। ঘাঁটির পাহারাওয়ালা একটা পানওয়ালার দোকানে বসিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। পথে জনমানবের সমাগম নাই। বর্ষার দৌরাত্ম্যে জোড়াসাঁকোর পথে কুকুরগুলা অবধি বাহির হয় নাই। মিঠ্ঠু সোনার একটা সরু গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। গলির প্রত্যেক দরজায় আঘাত করিয়া দেখিল সকল দরজা বন্ধ। গলির প্রান্তে একটা অতি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটি। দরজার পরই বোধ হয় সামান্য একটু উঠান, তাহার পরেই বাটি; দরজার উপরের প্রাচীরে উঠিলে

দ্বিতলের বারান্দায় পৌছান যায়। মিঠ্ঠু বুঝিল, তাহার অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে এই বাটীই আদর্শ। সে অল্প আয়াসেই দ্বিতলের প্রাচীরের উপর উঠিল।

গৃহের মধ্যে একটী ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছিল। একটী মলিন শয্যার উপর একটী শিশু শুইয়াছিল। তাহার এক পার্শ্বে একটী যুবতী, অপর পার্শ্বে একটী যুবক। যুবতী শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। যুবক শিরে হাত দিয়া যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল। যুবকের মুখ দেখিয়া মিঠ্ঠু বিস্মিত হইল। কি বিধির বিপাক! এ যে সেই বাবু! এক দিনে দুই বার এক শীকার! মিঠ্ঠু জানালা দিয়া দেখিতে লাগিল।

যুবতী বলিল—'আর ভাবলে কি হবে? সমস্তই অদৃষ্টের ফের'।

বিরাজমোহন বলিল—'হ্যাঁ অদৃষ্টের তো ফের। কাল খাব কি? একদিন নয় দু'দিন নয়, ত্রিশ দিন, এক মাস। এক মাস না খেয়ে কি করে থাকব?'

স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী বলিয়া প্রবাদ থাকিলেও অনেক সময় অল্পদর্শী স্ত্রীবুদ্ধি পুরুষ-বুদ্ধি অপেক্ষা প্রখর। স্ত্রীবুদ্ধি অধিক দূর দেখে না, যে দিকে জল পড়ে সেই দিকে ছাতা ধরে। মণিমালা বলিল—'আর কি হবে? এখনও তো আমার হাতের সোনার শাঁখা আছে। ঐ সোনাটা বেচ্‌লে এখন কুড়ি টাকা হবে, তাতে একমাস কষ্ট ক'রে চল্‌তে পারে'।

কথাগুলা বিরাজমোহনের প্রাণে শেলের মত বাজিল! সে কি অপদার্থ! একে একে স্ত্রীর সকল অলঙ্কার নষ্ট করিয়াছিল, মাত্র শাঁখা দুই গাছি অবশিষ্ট ছিল। সে কোন উত্তর দিল না। একটী গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

শিশুটী কাঁদিয়া উঠিল। জ্বরের প্রকোপে শিশু অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল। জ্বরের একটু প্রশমন হইতেছিল, শিশুর গলার স্বর ভাঙ্গিয়াছিল। তাহার চীৎকারে উভয়ে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

পাষণ্ড মিঠ্ঠু গবাক্ষ দিয়া সে চিত্র দেখিতেছিল। সে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিল। তাহার শিল্পের ফল স্বচক্ষে দর্শন করিল। তাহার শিল্পের পরিণাম একমাসে কিরূপ হইবে তাহা সে কল্পনা-নেত্রে দেখিল।

বিরাজ বলিল—'একটু দুধ দিতে পার্‌লে বোধ হয় ছেলেটা শান্ত হ'ত। কাল সকালেও নিদেন কিন্তু'—

যুবক আর বলিতে পারিল না। দুর্ব্বলতা গোপন করিবার জন্য চীৎকার করিয়া কাঁদিতেও পারিল না। কিন্তু সে কাঁদিতেছিল, ভূমিকম্পে যেমন

অট্টালিকার কম্পন হয়, সেই রকম তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। মণিমালাও চক্ষু মুছিতেছিল।

মিঠ্‌ঠু সোনার সে দৃশ্য দেখিল। তাহার স্মৃতি একটা পুরাতন সুখ-চিত্র আনিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল। একটা স্বর্গীয় শিশুর চিত্র তাহাকে বিব্রত করিল। তাহার পাপের জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতার মাঝে এক একবার তাহার বাবুয়ার চিত্র, তাহার মৃতা স্ত্রীর চিত্র তাহাকে বিব্রত করিত। সে তাহাদের ভুলিতে পারে নাই। পাপের দ্বারা শান্তি পায় নাই। ইহাদের মুমুর্ষু শিশু দেখিয়া আজ তাহার পুরাতন সুপ্ত সত্ত্বাটুকু জাগিয়া উঠিল। পাষণ্ড তস্করের চক্ষেও জল আসিল। তখনও বিরাজমোহনের টাকার থলি তাহার নিকট ছিল। সে দরজা ঠেলিল। বিস্মিত হইয়া বিরাজমোহন দ্বার খুলিয়া দিল। তাহাকে দেখিয়া তাহারা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

মিঠ্‌ঠু বলিল—'বাবু চেঁচিও না। আমি চুরি করতে এসেছিলাম, ঐ ছেলেটা আমায় জব্দ করেছে।'

তাহারা চোরের দিকে চাহিল। চীৎকার করিলে যদি অনিষ্ট করে! তাহাদের আর আছে কি?

মিঠ্‌ঠু টাকার থলি খুলিয়া তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া বলিল—'বাবু তোমার টাকা নাও। একটু অপেক্ষা কর আমি দুধ নিয়ে আসি।'

বিরাজমোহন মণিমালার দিকে চাহিল। ইত্যবসরে মিঠ্‌ঠু ছুটিল। প্রাচীর বহিয়া গেল না, দ্বার খুলিয়া সাধুর মত গেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুধ আনিয়া দিল। বিস্মিতা মণিমালা শিশুর মুখে দুধ দিল। শিশু স্থির হইল।

মিঠ্‌ঠু সকল কথা বলিল। বলিল—'বাবু আজ থেকে এ ব্যবসা ছাড়্‌লাম। কাল সকালে তোমার গলির মোড়ে পানের দোকান খুল্‌ব। আর এই বাবুয়াকে কোলে পিঠে করে মানুষ করে দেব। কি বল মা?'

মণিমালা কিছু বলিতে পারিল না। কৃতজ্ঞ নয়নে তাহার দিকে চাহিল। তস্কর পাগলের মত তাহাদের রুগ্ন শিশুটীকে অতি যত্নে ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতে লাগিল,—তাহার বাবুয়ার জন্য, তাহার অতীত জীবনের জন্য!

বিরাজমোহন ও মণিমালা বিস্মিতনেত্রে এই অদ্ভুত চোরের দিকে চাহিয়া রহিল।

অর্চ্চনা, ১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

চিদাভাস।

[লেখক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার।]

তিনটী সূত্র।

চিৎ ও অচিৎ এই দুই তত্ত্বের মধ্যে সর্ব্বপদার্থকে আনিয়া ফেলা যায়। ইহাই অদ্বৈত শাস্ত্রের মূলসূত্র। চিৎ অচিতে এই বিভাগ ঠিক দ্বন্দ্ব-ভাবাপন্ন বিভাগ নহে যাহাকে ইংরাজিতে division by dichotomy বলে। সমস্ত পদার্থকে যেরূপ মনুষ্য ও মনুষ্যেতর, বৃক্ষ ও বৃক্ষেতর, অশ্ব ও অশ্বেতর প্রভৃতি দ্বন্দ্বে ভাগ করা যায়, ঠিক সেরূপ চিৎ ও অচিতে ভাগ করা যায় না। কতকগুলি পদার্থ চিৎ ও তদ্ব্যতিরিক্ত অপর সকল পদার্থ অচিৎ, ইহা নহে ; পরন্তু পরিদৃশ্যমান জগতে প্রত্যেক পদার্থই কখনও চিদ্রূপে ও কখনও অচিদ্রূপে প্রতীয়মান হয়। চিদ্রূপে পদার্থ দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, ভোক্তা, কর্ত্তা ইত্যাদি এবং অচিদ্রূপে পদার্থ ভোগ্য।

অদ্বৈত শাস্ত্রের দ্বিতীয় সূত্র হইতেছে, অচিদ্রূপী ভোগ্যের অস্তিত্ব চিদ্রূপী ভোক্তার প্রয়োজনার্থ ; অর্থাৎ, চিদ্রূপী ভোক্তার প্রয়োজন থাকিলেই অচিদ্রূপী ভোগ্য থাকে, ভোক্তার প্রয়োজন না থাকিলে ভোগ্য থাকে না।

অদ্বৈত শাস্ত্রের তৃতীয় সূত্র হইতেছে শুদ্ধচিৎ জ্ঞানস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, স্বাধীন, পূর্ণ ও নিত্য। সুতরাং চিতের কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না।

অচিতের অবস্তুত্ব।

এই তিন সূত্র হইতে অচিৎ ভোগ্যজগতের মিথ্যাত্ব অর্থাৎ অবস্তুত্ব সরলভাবে প্রতিপন্ন হয়। যথা, চিতের যদি কোনও প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে চিৎ ভোক্তা হইতে পারে না। সুতরাং চিতের যে ভোক্তৃত্বের জন্য ভোগ্যের অস্তিত্ব, সেই ভোক্তৃত্ব মিথ্যা। চিতের ভোক্তৃত্ব যদি মিথ্যা হয় তাহা হইলে জগতের ভোগ্যত্বও মিথ্যা। জগতের ভোগ্যত্ব মিথ্যা হইলে ভোগ্য জগৎও মিথ্যা বা অবস্তু হইল।

এইরূপে, চিৎ ও অচিৎ, এই দুই তত্ত্বের মধ্যে এক তত্ত্বের, অর্থাৎ অচিতের, অবস্তুত্ব বা পারমার্থিক অসত্ত্বা প্রতিপন্ন হইলে, কেবল এক তত্ত্বই রহিল—চিৎ তত্ত্ব। জগৎ পরমার্থতঃ চিৎ ভিন্ন আর কিছুই নহে, অচিৎটা

ভ্রান্তিমাত্র। "একমেবাদ্বিতীয়ম্", "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বচনে শাস্ত্র এই কথাই বলিয়াছেন।

জড় জগৎকে এইরূপ বিচার দ্বারা সহজে উড়াইয়া দিলেও, বাস্তবিকপক্ষে ব্যবহারতঃ উহা আদৌ উড়িবার জিনিষ নহে। চিৎ দ্রষ্টা মাত্র, ভোক্তা নহে, একথা বিচার দ্বারা বুদ্ধিগ্রাহ্য হইলেও, প্রতি জীবের ভোক্তৃত্ব সকলের প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

ভোগ্য জগতের ব্যবহারিক সত্তা।

কোন্ ব্যক্তি আছে যে বলিতে পারে,—আমি ভোগ করি না? পরমহংস পরিব্রাট্ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি দুর্বৃত্ত দস্যু তস্কর পর্য্যন্ত সকলেই জড়-জগৎ ভোগ করিতেছে। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, প্রভৃতি পদার্থ সকলের নিকটেই আকাশ, বায়ু, অগ্নি। কিন্তু এক চিন্মাত্রই যদি থাকিত আর অচিৎ না থাকিত, তাহা হইলে ত আকাশ, বায়ু, প্রভৃতি কোনও বস্তু থাকিত না। এইরূপে চিতের ভোক্তৃত্ব ও ভোগ্য জড়জগতের অস্তিত্ব ব্যবহারক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না। বিরাট জগৎটা চক্ষু বুজিয়া নাই বলিলেই নাই হইয়া যায় না। প্রতি পদেই জীবকে জগতের অস্তিত্ব ভোগ করিতে হয়। মনে কর, খুব ভাবিতেছ "জগৎটা মিথ্যা, এক চিৎই সত্য," এমন সময়ে পায়ে একটা বড় পিপীলিকা কামড়াইয়া দিল। তখন কোথায় গেল জগতের মিথ্যাত্ব, কোথায় গেল চিতের ভোক্তৃত্ব-ভাব—তোমার চৈতন্য তখন পিপীলিকার বিষের জ্বালায় ছট্ফট্ করিতে লাগিল এবং কিসে ঐ জ্বালার শান্তি হয় তাহার জন্য ব্যগ্র হইল। এইরূপে জীব অহরহঃ জগতের অস্তিত্ব অনুভব করিতেছে ও ভোক্তা হইয়া জগজ্জন্য সুখদুঃখ ভোগ করিতেছে।

তবে কি চৈতন্য যথার্থই ভোক্তা ও জড়জগৎ সত্যই তাহার ভোগ্য? তাহাই বা বলা যায় কিরূপে? চৈতন্য ভোক্তা হইলে তাহার চৈতন্যত্বই লোপ পাইল। "সুখদুঃখাভিমানাখ্যো বিকারো ভোগউচ্যতে," অর্থাৎ সুখদুঃখে অভিমানরূপ যে বিকার তাহাকে ভোগ বলে। চৈতন্য অবিকারী, সুতরাং তাহার ভোগরূপ বিকার থাকিতে পারে না। যে সুখদুঃখের ভোক্তা তাহার সুখদুঃখের অভাব আছে, যাহার অভাব আছে সে পূর্ণ নহে—চৈতন্য পূর্ণ না হইলে তাহার জ্ঞান-স্বরূপত্বের অপলাপ হইল, জ্ঞান-স্বরূপত্বের অপলাপ হইলে চৈতন্যের চৈতন্যত্বেরও অপলাপ হইল। তবে উপায় কি? চিৎ কিছুতেই ভোক্তা হইতে পারে না, অথচ চিতের ভোক্তৃত্ব সর্ব্বত্র বিদ্যমান, প্রত্যক্ষ, অনুভবসিদ্ধ। এ সমস্যা কিরূপে পূরণ হয়?

ভোক্তৃত্বের সমস্যা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, চিৎ ও অচিৎ, এই দুই তত্ত্ব লইয়া জগৎ। অচিৎ পরমার্থতঃ অবস্তু হইলেও, ব্যবহারিক হিসাবে খুব সত্য বস্তু। অচিতের

চিদাভাস ভোক্তা।

এই ব্যবহারিক সত্যতা-স্থাপনের জন্য চিৎকেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একটু খাট হইতে হয়, ভোক্তা হইয়া দাঁড়াইতে হয়। চিৎ খাট হইলেই সে আর ঠিক চিৎ রহিল না, পূর্ণ জ্ঞান স্বল্প হইয়া গেল, অজ্ঞানের বা অচিতের ধর্ম্ম তাহাতে কতক পরিমাণে প্রবেশ করিল। কিন্তু নিত্য অপরিণামী, জ্ঞানস্বরূপ চিতে অচিতের ধর্ম্ম-প্রবেশ অসম্ভব। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে অনিত্য, পরিণামী, অজ্ঞানস্বরূপ অচিতেই চিতের ধর্ম্ম কতকটা প্রবেশ করে, অর্থাৎ, চিতের সংসর্গে অচিৎ কতকটা চিতের আভাস প্রাপ্ত হয়। অচিতে এই চিতের আভাসকে দার্শনিক ভাষায় চিদাভাস বা চিৎপ্রতিবিম্ব বলে। এই চিদাভাসই ভোক্তা ও কর্ত্তা। দর্পণে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য যেমন দর্পণের মালিন্যাদি গুণসহযোগে মলিন প্রভৃতি হয়, অথবা চঞ্চল জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র যেমন চঞ্চলতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি অচিতে প্রতিবিম্বিত চিৎ অচিতের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ-সহযোগে সুখী ও দুঃখী হয়। পুনশ্চ, সূর্য্য যেমন নিজের আলোক দ্বারা দর্পণ বা জলাশয়কে কতকটা উদ্ভাসিত করিয়া তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি চিৎ অচিৎকে নিজের চেতনত্বের দ্বারা কতকটা উদ্ভাসিত করিয়া তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। এই উদ্ভাসনের ফলে সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক জড় ত্রিগুণ বুদ্ধি, মন প্রভৃতি চেতনরূপ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে চিৎ অচিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ও চিতের ধর্ম্ম অচিতে সংক্রমিত হইয়া ভোক্তৃ-ভোগ্য ভাবাপন্ন জগৎ চলিতেছে। কিন্তু যেমন প্রতিবিম্বসূর্য্যের মলিনত্ব হেতু বিম্বসূর্য্যের নির্ম্মলত্বের হানি হয় না, তেমনি চিদাভাসের ভোক্তৃত্বহেতু বিম্বচৈতন্যের নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবের হানি হয় না।

"ত্রিষু ধামসু যদ্‌ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভবেৎ।
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ॥
এবং বিবেচিতে তত্ত্বে বিজ্ঞানময়শব্দিতঃ।
চিদাভাসো বিকারী যো ভোক্তৃত্বং তস্য শিষ্যতে॥"

পঞ্চদশী ৭।২১৫-২১৬

অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থায় যাহা ভোগ্য, যাহা ভোক্তা ও যাহা ভোগ তাহাদিগের হইতে পৃথক্ চৈতন্যস্বরূপ আনন্দময় সাক্ষীই

আমি। এইরূপে আত্মতত্ত্ব বিবেচিত হইলে, বিজ্ঞানময় নামে অভিহিত যে বিকারী চিদাভাস অবশিষ্ট থাকে সেই ভোক্তা।

চিদাভাসকে বিজ্ঞানময় বলা হয়, কারণ জীবের জড়জগৎ-সম্বন্ধীয় যে কিছু জ্ঞান তাহা তাহার অন্তঃস্থ চিদাভাস হইতেই হয়। বিজ্ঞান শব্দের অর্থ এস্থলে জড়-জগতের জ্ঞান, অচিতের উপলব্ধিমূলক জ্ঞান। জড়জগতের অনিত্যতা বশতঃ বিজ্ঞানও অনিত্য। জড়জগৎ বিকারী, সুতরাং বিজ্ঞানও বিকারী। শুদ্ধজ্ঞানের বিকার নাই, উহা নিত্য, সত্য। জ্ঞান সমক্ষে অনিত্য, বিকারী, অসত্য জগতের অস্তিত্ব নাই। এই জগতের অস্তিত্ব বিজ্ঞান সমক্ষে। চৈতন্য যেমন জ্ঞানময়, আভাস চৈতন্য বা চিদাভাস তেমনি বিজ্ঞানময়। চৈতন্য ও চিদাভাসে যে সম্বন্ধ, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানেও সেই সম্বন্ধ। চিদাভাস যেমন অচিতে চিতের একটা ভাণ-মাত্র, বিজ্ঞান তেমনি অজ্ঞানে জ্ঞানের একটা ভাণমাত্র। অচিতে চিতের যে আভাস বা ভাণ হয় তাহা অবশ্য চিৎ আছে বলিয়াই হয়, কিন্তু চিৎ সত্য আছে বলিয়া যে তাহার আভাসও সত্য হইবে তাহা নহে। দর্পণস্থিত প্রতিবিম্ব সূর্য্য যেমন সত্য নহে, অচিৎস্থ আভাস চৈতন্যও তেমনি সত্য নহে। প্রতিবিম্ব সূর্য্য যেমন বাস্তবিক নাই, আভাস-চৈতন্যও তেমনি বাস্তবিক নাই।

চিদাভাস বিজ্ঞানময়, বিকারী, মিথ্যা।

বলিতে পার, যাহা নাই তাহা কিরূপে বিজ্ঞানময় ভোক্তা হয়? তাহা হইতে পারে। আভাস-চৈতন্যে সত্য-চৈতন্যের সত্যতা অধ্যস্ত হইলে হইতে পারে। যাহাতে যাহা নাই তাহাতে তাহার আরোপের নাম অধ্যাস। আভাস চৈতন্যে চৈতন্যের সত্যতা নাই, অতএব উহা মিথ্যা পদার্থ, উহা ভোক্তা, কর্ত্তা প্রভৃতি হইতে পারে না। কিন্তু উহাতে যদি চৈতন্যের সত্যতা অধ্যস্ত বা আরোপিত হয় তাহা হইলে উহা কর্ত্তা, ভোক্তা হইতে পারে। মনে কর একটী ঘরের এক কোণে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে ও তাহার সম্মুখে একটু দূরে একখানি লাল-বর্ণের দর্পণ আছে। দর্পণে প্রদীপের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে ও দর্পণের সম্মুখস্থ সমস্ত পদার্থ লালবর্ণ ধারণ করিয়াছে। একজন পথিক দূর হইতে দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব দেখিল কিন্তু দর্পণখানি দেখিতে পাইল না। সে তখন ঐ প্রতি-বিম্বকেই সত্য বলিয়া মনে করিল। সে ভাবিল যে, একটী লাল দীপশিখা জ্বলিতেছে এবং তজ্জন্য গৃহাভ্যন্তর লাল হইয়াছে। এইরূপে মূল দীপের সত্যতা প্রতিবিম্বদীপে অধ্যস্ত হইল। প্রতিবিম্বদীপ এইরূপে সত্য বলিয়া

চিদাভাসে চিতের সত্যতার অধ্যাস।

প্রতিভাত হইলে দর্পণের লালবর্ণও ঐ দীপশিখায় আরোপিত হইল। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিবিম্ব দীপটী মিথ্যা, ভ্রান্তি মাত্র; মূলদীপের আলোকই দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া ঘরখানি আলোকিত করিতেছে এবং মূলদীপের আলোক লাল না হইলেও লালবর্ণ দর্পণের সংসর্গে আসিয়া লাল দেখাইতেছে। এইরূপ, অচিতে চিতের প্রতিবিম্ব পড়িলে সেই প্রতিবিম্বচৈতন্যে বা চিদাভাসে চৈতন্যের সত্যতা অধ্যস্ত হইয়া চিদাভাসকে সত্য বলিয়া প্রতিভাত করে, এবং অচিতের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ ঐ চিদাভাসের সহিত মিলিত হইয়া উহাকে সুখী দুঃখী করে। এইরূপে চিদাভাসের কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি সিদ্ধ হয়। প্রকৃতপক্ষে, চৈতন্যই সত্য, চিদাভাস মিথ্যা; চিদালোকেই জগৎ আলোকিত, কেবল সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মক অচিতের সংসর্গে এই আলোক কর্ত্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা প্রভৃতি মিথ্যা রূপে প্রতিভাত হয়।

চিদাভাসকে যে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব বলা হয় ও জাগতিক প্রতিবিম্বের সহিত তুলনা করা হয়, ইহা কেবল উহার মিথ্যাত্ব, অবস্তুত্ব ও কিয়ৎ পরিমাণে চৈতন্যধর্ম্মিত্ব বুঝাইবার জন্য। প্রতিবিম্বে এই সকল ধর্ম্ম আছে, এইজন্য চিদাভাসকে প্রতিবিম্বের সহিত তুলনা করা হয়। দৃষ্টান্তে ও দার্ষ্টান্তিকে এই পর্য্যন্তই সমধর্ম্মিত্ব। দৃষ্টান্তের অর্থাৎ প্রতিবিম্বের, অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত দার্ষ্টান্তিকের, অর্থাৎ চিদাভাসের, সমধর্ম্মিত্ব নাই। প্রতিবিম্ব-সৃষ্টির জন্য বিম্ব ও দর্পণের মধ্যে একটা ব্যবধান থাকা প্রয়োজন, কিন্তু চৈতন্য ও অচিতের মধ্যে এমন কোন ব্যবধান নাই; কারণ জগতে চিৎ ও অচিৎ উভয়েই সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে একত্র বিদ্যমান। পুনশ্চ, দর্পণের রক্ত-পীতাদি বর্ণ আলোকরশ্মিরই অন্তর্গত বর্ণ। আলোকবিজ্ঞান যাঁহার জানা আছে তিনিই জানেন যে, কোনও পদার্থ যদি লাল দেখায় ত বুঝিতে হইবে যে ঐ পদার্থের অভ্যন্তরে আলোকরশ্মি প্রবেশ করিয়া পুনরায় বহির্গত হইলে উহা ঐ রশ্মির অন্তর্গত লালবর্ণের রশ্মিটী ভিন্ন অন্যান্য বর্ণের রশ্মিগুলি চাপিয়া রাখিয়া কেবল লাল রশ্মিটীই বাহির হইতে দেয়। সূর্য্যের শ্বেত আলোকরশ্মি সাতটি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন রশ্মির একত্র সম্মিলনে গঠিত। যে পদার্থের মধ্যে এই সাতবর্ণের রশ্মিগুলি প্রবেশ করিয়া পুনরায় অবিকৃতভাবে বহির্গত হইতে পারে সেই পদার্থের বর্ণ শ্বেত হয়। যে পদার্থের মধ্যে সমস্ত রশ্মিগুলি চাপিয়া যায় সেই পদার্থ কাল হয়। যে পদার্থের মধ্যে অন্যান্য বর্ণের রশ্মিগুলি চাপা পড়িয়া গিয়া কেবল লাল রশ্মিটীই

চিদাভাস মানে কি?

বাহির হইতে পারে সেই পদার্থ লাল হয়। এইরূপে আলোকরশ্মির অন্তর্গত বর্ণ লইয়াই পদার্থের বর্ণ। কিন্তু অচিতের যে সত্ত্বরজস্তমোগুণোদ্ভূত ধর্ম্ম চিদাভাসে সংক্রমিত হইয়া ভোক্তৃত্বাদিরূপ ধারণ করে তাহা আদৌ চৈতন্যের ধর্ম্ম নহে। পুনশ্চ, প্রতিবিম্বস্থলে প্রতিবিম্বের দ্রষ্টা দীপ, প্রতিবিম্ব ও দর্পণ হইতে ভিন্ন, কিন্তু চিদাভাসস্থলে চিদাভাসই ভোক্তা। এই সকল কারণে বুঝিতে হইবে যে, চিদাভাসকে যে চিৎপ্রতিবিম্ব বলা হয় সে কেবল চিদাভাসের সহিত প্রতিবিম্বের কতকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া, ফলতঃ সূর্য্য ও সূর্য্য-প্রতিবিম্বে যে সম্বন্ধ, চৈতন্য ও চিদাভাসে যে ঠিক্ ঠিক্ সেই সম্বন্ধ তাহা নহে। পাছে কোন পাঠক চিদাভাস-সম্বন্ধে প্রতিবিম্ব শব্দের বহুল ব্যবহার দেখিয়া একটা ভ্রান্ত ধারণা করিয়া বসেন সেইজন্য এই কথাটা এত বিস্তারিত ভাবে বলিলাম। চিতের সংস্পর্শে অচিতে যে একটা মিথ্যা অর্দ্ধ-চিৎ—অর্দ্ধ-অচিৎ পদার্থ উদ্ভূত হইয়া এই জগদ্ব্যাপার পরিচালন করিতেছে সেই পদার্থের স্বরূপ ও ক্রিয়া বুঝাইবার জন্য প্রতিবিম্ব প্রভৃতির সহিত উহার তুলনা করা হয় মাত্র।

"ঈষদ্ভাসনমাভাসঃ প্রতিবিম্বস্তথাবিধঃ।
বিম্বলক্ষণহীনঃ সন্ বিম্ববদ্ভাসতে স হি॥
সসঙ্গত্ববিকারাভ্যাং বিম্বলক্ষণহীনতা।
স্ফূর্ত্তিরূপত্বমেতস্য বিম্ববদ্ভাসনং বিদুঃ॥"

পঞ্চদশী ৮।৩২,৩৩

অর্থাৎ, ঈষৎ ভাসন বা অল্পপ্রকাশকে আভাস বলে। প্রতিবিম্বও সেইরূপ। বিম্বলক্ষণহীন হইয়াও উহা বিম্বের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সসঙ্গত্ব ও বিকার থাকার দরুণ চিদাভাস বিম্বচৈতন্যলক্ষণহীন, পরন্তু উহার স্ফূর্ত্তিরূপত্বহেতু উহা বিম্বচৈতন্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

চৈতন্য জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞান জ্যোতিঃস্বরূপ। চৈতন্যের জ্ঞানজ্যোতিঃ জগন্ময় বিস্তারিত রহিয়াছে। এই জ্যোতির সংসর্গে অচিতে যে চিদাভাস বা চৈতন্যাভিমান হয় তাহাতে উহার স্ফূর্ত্তিরূপ বা প্রকাশরূপ ধর্ম্ম আরোপিত হওয়ায় ঐ চিদাভাস ভোক্তা, কর্ত্তা প্রভৃতি চেতনরূপ ধারণ করে। কিন্তু এই সকল রূপ বিকারী ও সসঙ্গ; অর্থাৎ অচিতের সঙ্গযুক্ত, সুতরাং চিৎ হইতে ভিন্ন। ফলতঃ, চিতের সংসর্গে অচিতে এমন একটা ভাবের উদয় হয় যে জন্য অচিৎ ভোগ্য হয় এবং যাহা নিজে চিৎ-সত্যতার অধ্যাস বশতঃ ভোক্তা হয়। এই ভাব চিদাভাস। ইহাকে চিদাভাস বলা হয়, কারণ ইহাতে চিৎ-সত্যতা অধ্যস্ত হইলে ইহা চিদ্বৎ হয়।

অতঃপর প্রশ্ন হইতে পারে, চিদাভাস মানি কেন? সত্য চৈতন্যই যখন রহিয়াছে, তখন মিথ্যা চিদাভাস মানিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন পূর্ব্বে বলিয়াছি। অচিতের ব্যবহারিক সত্যতা-স্থাপনের জন্য চিদাভাস না মানিয়া উপায় নাই। চিৎ ভোক্তা হইতে পারে না, অথচ জগতে ভোক্তা চৈতন্য বিদ্যমান। এই ভোক্তা চৈতন্যই চিদাভাস। বলিবে, চিদাভাসও মিথ্যা। অচিৎও ত মিথ্যা। মিথ্যা ভোগ্যের ভোগের জন্য মিথ্যা ভোক্তাই হইয়া থাকে। যেমন শ্রাদ্ধ তাহার তেমনি মন্ত্র। অচিৎ পরমার্থতঃ মিথ্যা হইলেও ব্যবহারিক হিসাবে খুব সত্য। চিদাভাসও পরমার্থতঃ মিথ্যা হইলেও ব্যবহারিক হিসাবে অতীব সত্য, কারণ ইহার প্রয়োজনার্থই এই সাধের বিরাট জগৎটা আছে ও চলিতেছে। অচিৎ পরার্থ, চিদাভাসই এই পর। কেহ কেহ বলেন যে, চিতের সংসর্গে অচিৎই সচেতনবৎ হউক, সুতরাং পৃথক্ চিদাভাস মানিবার প্রয়োজন নাই। ইহার উত্তর এই যে "সচেতন অচিৎ" কথাটাতেই একটা ভাবের গোলমাল আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ, দুইটা পৃথক্ পৃথক্ ভাবকে একত্র করিয়া একটা অস্পষ্ট মিশ্র-ভাবের সৃষ্টি করা হয়। চিৎ ও অচিৎ পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী পদার্থ—চিৎ অচিৎ হইতে পারে না, অচিৎ চিৎ হইতে পারে না। যদি বল অচিৎ চিদ্বৎ হইতে পারে, তাহার উত্তর এই যে অচিৎ চিদ্বৎ হইলে যতক্ষণ তাহাতে চিতের ধর্ম্ম আরোপিত থাকে ততক্ষণ আর তাহাতে অচিতের ধর্ম্ম আরোপিত হইতে পারে না, সুতরাং এরূপ অবস্থায় অচিতের একদিকে জ্ঞাতৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্ম ও অপরদিকে পরিণামত্ব, ভোগ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্ভবে না। অতএব এই দ্বিবিধ ধর্ম্মকে বজায় রাখিবার জন্য "চেতনবৎ অচিৎ"কে দুইটী পৃথক্ পৃথক্ পদার্থে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন—"অচিৎ" পদার্থ ও "চৈতন্যবৎ" পদার্থ। এই "চৈতন্যবৎ" পদার্থই চিদাভাস। অতএব চিদাভাস না মানিয়া উপায় নাই। চিদাভাস ও অচিৎকে একত্র ধারণা করিলেই "চেতনাবৎ অচিৎ" হয়, কিন্তু তাই বলিয়া চিদাভাস উড়িয়া যায় না।

চিদাভাস মানি কেন?

পূর্ব্বে বলিয়াছি, চিদাভাস বিজ্ঞানময়, অর্থাৎ, অচিৎ ভোগ্যজগৎ সম্বন্ধে জীবের যে জ্ঞান হয় তাহা জীবের অন্তরস্থিত চিদাভাস হইতে হয়। চিদাভাস স্বল্পজ্ঞান, সেইজন্যই তাহার নিকটে অবাস্তব অচিৎ বাস্তব বলিয়া প্রতিভাত হয়। প্রত্যুত, চিদাভাসের নিকটেই জড়জগতের সত্তা। পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ চিতের নিকটে

চিদাভাসের অচিদনুভূতি ও চিতের অচিদনুভূতি।

জড়জগতের সত্তা নাই, পূর্ণজ্ঞান ভোগ্য জড়জগতের সত্তা উপলব্ধি করে না। বলিতে পার, চিৎ যদি জড়জগতের উপলব্ধি করিতে না পারে, তাহা হইলে চিতের পূর্ণজ্ঞানস্বরূপত্বের হানি হইল। ইহা ভুল। চিদাভাসরূপ মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা যে মিথ্যা জড়জগতের উপলব্ধি হয়, চিদ্রূপ সত্যজ্ঞান দ্বারা তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না। সত্যজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হইলে ভোগ্য জড় জগতের উপলব্ধিরও নাশ হয়। চিদ্রূপ সত্যজ্ঞানে মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট, সুতরাং চিতে ভোগ্য জড়জগতের উপলব্ধি হয় না। উন্মত্ত বা বিকারগ্রস্ত রোগী যাহা যাহা অনুভব করে, উন্মাদ বা বিকার সারিয়া গেলে কি সে সব আর তাহার মনে থাকে? সত্যের নিকট মিথ্যার প্রসঙ্গই থাকিতে পারে না।

চিদাভাস জড়ের জ্ঞাতা ও ভোক্তা হয় কিরূপে?

অতঃপর বুঝিতে হইবে, চিদাভাস ভোগ্য জড়জগতের উপলব্ধি করে বা জ্ঞাতা হয় কিরূপে। চিদাভাসরূপ মিথ্যাজ্ঞান চিদ্রূপ সত্যজ্ঞানের আভাস, সুতরাং চিদ্রূপ সত্যজ্ঞানই চিদাভাসরূপ মিথ্যাজ্ঞানের মূল। অতএব জগদুপলব্ধির মূলে চিৎ বর্ত্তমান। কোনও জড় পদার্থে চৈতন্যের আভাস পড়িলেই, অর্থাৎ চিতের সংসর্গে কোন জড় পদার্থে ভোগ্যত্ব ও ভোক্তৃত্বের উন্মেষের উপযোগী ভাবের উদয় হইলে, সেই পদার্থে জ্ঞাতত্ব ধর্ম্ম, অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবার উপযোগিতারূপ ধর্ম্ম জন্মে। চিদাভাসের ভোগের জন্যই অচিৎ জ্ঞাত হয়, সুতরাং চিদাভাস না থাকিলে তাহার জ্ঞাতত্ব থাকে না এবং চিদাভাসের উৎপত্তি হইলেই তাহার জ্ঞাতত্ব জন্মে। ফলতঃ অচিতে চিদাভাসের উৎপত্তিই উহার জ্ঞাতত্ব। চিৎ নিত্যপদার্থ, আর এই জ্ঞাতত্ব অনিত্য; সুতরাং চিৎ হইতে এই জ্ঞাতত্ব আসে না। চিৎ হইতে যদি জড় পদার্থের জ্ঞাতত্ব আসিত তাহা হইলে জড়পদার্থ নিত্য জ্ঞাত হইত। কিন্তু চিৎ চিদাভাসজনিত জড়পদার্থের জ্ঞাতত্বকে প্রকাশিত করে, অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবার উপযোগিতাপ্রাপ্ত জড়কে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করে। উপরে বলিয়াছি, অচিতে চিদাভাসের উৎপত্তিই উহার জ্ঞাতত্ব। চিদাভাসের এই উৎপত্তি প্রকাশিত না হইলে জড় জ্ঞাত হইতে পারে না—জড়ে চৈতন্যের আভাস পড়িলেই জড় জ্ঞাত হয় না, জ্ঞাত হইতে গেলে জ্ঞানের দ্বারা উহার জ্ঞাতত্ব ধর্ম্মকে, অর্থাৎ অচিতে চিদাভাসের উৎপত্তিকে প্রকাশিত হইতে হয়। চিদাভাস জ্ঞান নহে, চিৎই জ্ঞান; সুতরাং চিৎই জড়ের জ্ঞাতত্বকে, অর্থাৎ চিদাভাসের উৎপত্তিকে প্রকাশ করিয়া জড়কে জ্ঞাত করে। যেমন লাল দর্পণে প্রতিবিম্বিত দীপাভাস গৃহকে লাল বর্ণ প্রদান করে, কিন্তু মূলদীপের আলোকই

সেই লালবর্ণকে প্রকাশ করে, সেইরূপ অচিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস অচিৎকে জ্ঞাতত্ব প্রদান করে, কিন্তু চিদালোকই সেই জ্ঞাতত্বকে প্রকাশ করে। অতঃপর বিবেচ্য এই যে, চিৎ জড়ের জ্ঞাতত্বধর্ম্মকে প্রকাশ করিয়া জড়কে কাহার নিকটে জ্ঞাত করে? অবশ্য চিদাভাসের নিকটে, কারণ চিতের জড়জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব চিৎ জড়ের জ্ঞাতত্ব ধর্ম্মকে প্রকাশ করিলেও চিদাভাসই তাহার জ্ঞাতা হয়। কিন্তু চিদাভাস জ্ঞাতা হয় কিরূপে? পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, চিতের সত্যতাধর্ম্ম চিদাভাসে অধ্যস্ত হইয়া মিথ্যা চিদাভাসকে সত্য বলিয়া প্রতিভাত করে। সেইরূপ চিতের জ্ঞানরূপত্ব চিদাভাসে অধ্যস্ত হইলে চিদাভাস জ্ঞাতা হয় এবং তখন জড়পদার্থ তাহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া জ্ঞাত হয়। এইরূপে, জড়পদার্থ দ্বিগুণ চৈতন্যের দ্বারা স্ফুরিত হইয়া জ্ঞাত হয়। প্রথমতঃ, জড়ে চৈতন্য আভাসিত হয় ও তজ্জন্য উহাতে জ্ঞাত হইবার উপযোগিতা আসে, অনন্তর চৈতন্য এই উপযোগিতাকে প্রকাশ করিয়া জড়কে জ্ঞাত করে এবং চৈতন্যের সত্যতা ও জ্ঞানরূপত্ব চিদাভাসে অধ্যস্ত হইলে চিদাভাসকে ভোক্তা ও জ্ঞাতা করে। অতএব, চিদাভাস, চিদাভাসের জ্ঞাতৃত্ব, জড়ের জ্ঞাতত্ব ও জ্ঞাতত্বের প্রকাশ, এই সকলের মূলেই চিৎ, এবং কেবল জড়ের জ্ঞাতত্বের মূলে চিদাভাস। বলিতে পার, অচিৎ যখন মিথ্যা তখন অচিতের জ্ঞাতত্বও মিথ্যা ও ঐ জ্ঞাতত্বের প্রকাশও মিথ্যা, সুতরাং সত্য চিৎ মিথ্যা জ্ঞাতত্বকে প্রকাশ করিবে কিরূপে? সত্য। পারমার্থিক হিসাবে অচিৎ নাই, অচিতের জ্ঞাতত্ব নাই এবং জ্ঞাতত্বের প্রকাশ নাই। কিন্তু ব্যবহারিক হিসাবে অচিৎ আছে, অচিতের জ্ঞাতত্ব আছে ও উহার জ্ঞাতত্বের প্রকাশ আছে। এই সকল ব্যবহারিক অস্তিত্বের স্থাপনার জন্য ব্যবহারিক চিদাভাসের অবতারণা। চিদাভাসের দ্বারা অচিতের জ্ঞাতত্বের ব্যবহার স্থাপিত হয়, আর চিতের দ্বারা এই জ্ঞাতত্বের প্রকাশের ব্যবহার স্থাপিত হয়। চিৎই একমাত্র জ্যোতিঃ, সুতরাং প্রকাশের কথা বলিলেই বুঝিতে হইবে যে, তাহার মূলে চিৎ আছে। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি", অর্থাৎ, দীপ্ত চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে অনুসরণ করিয়াই সর্ব্বপদার্থ দীপ্ত হয়, তাহার দীপ্তিদ্বারা পরিদৃশ্যমান সর্ব্বপদার্থ প্রকাশিত হয়। পুনশ্চ, চিদাভাস যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জড় পদার্থে জ্ঞাতত্বধর্ম্ম উৎপন্ন করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহা অজ্ঞাত থাকে, কারণ জড় নিজে প্রকাশিত হইতে পারে না। সুতরাং জড়পদার্থের জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব, অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবার উপযোগিতা ও জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবার অনুপযোগিতা, এই দুই ধর্ম্ম আছে। চিৎ

নিজের অচিন্ত্য ও অনন্ত শক্তির দ্বারা এই উভয় ধর্ম্মকেই প্রকাশ করে। পুনশ্চ, কোনও জড়পদার্থে চিদাভাসের উৎপত্তিই যেমন উহার জ্ঞাতত্ব, তেমনি উহাতে চিদাভাসের অনুৎপত্তিই উহার অজ্ঞাতত্ব। এক ব্যক্তি যদি আর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি ঘট জান ?" ও এই প্রশ্নের উত্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, "আমি ঘট জানি না", তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রথম ব্যক্তির উচ্চারিত, "তুমি ঘট জান ?" শব্দ এই প্রশ্নে দ্বিতীয়ের চিদাভাস হইলেও এবং সেই চিদাভাস জ্ঞাতা হইয়া প্রশ্নের স্বরূপ উপলব্ধি করিলেও, ঘট পদার্থে সেই চিদাভাসের ব্যাপ্তি হয় নাই। কিন্তু এই অব্যাপ্তি ঐ চিদাভাসে প্রকাশিত, কারণ সে বলিতেছে "আমি ঘট জানি না"। চিৎ ঘটে চিদাভাসের অনুৎপত্তিকে, অর্থাৎ ঘটের অজ্ঞাতত্বধর্ম্মকে, প্রকাশ না করিলে,উক্ত চিদাভাসে, "আমি ঘট জানি না",এই অজ্ঞতার জ্ঞানের উদয় হইতে পারিত না। বলিতে পার, চিৎ যেমন ঘটের জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব ধর্ম্মকে প্রকাশ করে, তেমনি সোজাসুজি ঘটকেই প্রকাশ করুক না কেন ? না, তাহা করিতে পারে না। কারণ, চিতের নিকট ঘট নাই, যাহা নাই তাহাকে উহা প্রকাশ করিবে কিরূপে ? চিদাভাসের ভোক্তৃত্ব-নিষ্পাদনের জন্য উহাতে কখনও কখনও ঘটাকার একটা জ্ঞান হয় এবং কখনও কখনও হয় না। এই জ্ঞানের ও অজ্ঞানের মূলীভূত ঘটস্থ জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব ধর্ম্ম লইয়া ঘটের জ্ঞেয়ত্ব বা জ্ঞানযোগ্যত্ব, এই দুই ধর্ম্মকে বাদ দিলে ঘট আর জ্ঞেয় থাকে না। চিৎ এই দুই ধর্ম্মকে প্রকাশ করিয়া চিদাভাসের উপকার করে। চিদাভাস যখন ঘটকে ভোগ করে, অর্থাৎ ঘটজ্ঞান জন্য সুখী বা দুঃখী হয়, তখন ঘটের জ্ঞাতত্বধর্ম্ম প্রকাশিত হয়, আর যখন ঘটকে ভোগ না করে, অর্থাৎ ঘট-সম্বন্ধে অজ্ঞানতা বশতঃ সুখী বা দুঃখী না হয়, তখন ঘটের অজ্ঞাতত্বধর্ম্ম প্রকাশিত থাকে। "ইহা ঘট", এই বাক্যগত ভাব চিদাভাস হইতে হয়, অর্থাৎ চিদাভাস ঘটের জ্ঞাতত্বধর্ম্ম জন্মায়; "আমি ঘট জানিয়াছি" চিদাভাসে এই বাক্যগত ভাব চিতের অনুগ্রহে হয়, অর্থাৎ, চিৎ ঘটের জ্ঞাতত্বধর্ম্মকে প্রকাশ করিয়া চিদাভাসকে জ্ঞাতা করে; ও "আমি ঘট জানি না", চিদাভাসে এই বাক্যগত ভাবও চিৎ হইতে হয়, অর্থাৎ, চিৎ ঘটের অজ্ঞানত্বধর্ম্মকে প্রকাশ করে। এইরূপে চিতের আনুকূল্যে চিদাভাস জড়জগতের উপলব্ধি করে বা জ্ঞাতা হয়। জড়ের জ্ঞাতা হওয়া ও জড়কে ভোগ করা একই কথা, কারণ ত্রিগুণাত্মক জড় সুখ-দুঃখরূপেই জ্ঞাত হয়। সুতরাং, জ্ঞাতৃত্ব বলিলেই বুঝিতে হইবে তাহার মধ্যে ভোক্তৃত্ব অনুস্যূত এবং ভোক্তৃত্ব হইতে কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম আসে।

এইরূপে চিদাভাসের জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদি কিরূপে আসে ও ভোগ্য জড়ের জ্ঞেয়ত্ব, ভোগ্যত্বাদি কিরূপে আসে তাহা বোঝা গেল। বোঝা গেল, ভোগ্য জড়ে চৈতন্যের আভাস পড়িলে, সেই চিদাভাস জ্ঞাতা, ভোক্তা প্রভৃতি হয় এবং জড় জ্ঞাত, ভুক্ত প্রভৃতি হয়। অতঃপর প্রশ্ন হইতেছে, ভোগ্য জড়ে চৈতন্যের আভাস পড়িলে উহা জ্ঞাত হয় কি প্রণালীতে, ও কাহার প্ররোচনায় উহাতে চৈতন্যের আভাস পড়ে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে ভোগ্য জড় কি? শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—ভোক্তা ইহাদিগকেই ভোগ করে। সুতরাং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ যে সকল জড়ের আছে তাহারাই ভোগ্য। জগতে অতি সূক্ষ্ম (attenuated) পদার্থ আকাশ (ether) হইতে অতি স্থূল (solid) পদার্থ পৃথিবী (earth in which are induded all solids like stones and metals) পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থে এই সকল শব্দাদি গুণ বিদ্যমান। কিন্তু এই সকল পদার্থে যে এই সকল গুণ বিদ্যমান তাহা জানি কিরূপে? ইহা জানিবার জন্য দুই প্রস্ত করণ বা যন্ত্র আছে—বহিষ্করণ ও অন্তঃকরণ। বহিষ্করণ—কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা। অন্তঃকরণ—মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি। বহিষ্করণকে সাধারণতঃ "বহিরিন্দ্রিয়" বা কেবল "ইন্দ্রিয়" বলে, ও অন্তঃকরণকে "অন্তঃকরণ" বা "অন্তরিন্দ্রিয়" বলে। "বহিরিন্দ্রিয়ের" বা "ইন্দ্রিয়ের" আর এক নাম অক্ষ। যে ইন্দ্রিয়ের সহিত ভোগ্যের যে গুণের মিলন হয়, সেই গুণকে সেই ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বলে। কর্ণের প্রত্যক্ষ শব্দ, ত্বকের প্রত্যক্ষ স্পর্শ, চক্ষুর প্রত্যক্ষ রূপ, জিহ্বার প্রত্যক্ষ রস ও নাসিকার প্রত্যক্ষ গন্ধ। চক্ষু কোনও পদার্থের রূপ প্রত্যক্ষ করিলে সেই রূপকে অন্তঃকরণে পৌঁছাইয়া দেয় এবং সেখানে উহা জ্ঞাত হয়। অন্তঃকরণ প্রথমে ঐ রূপকে মনন (consider and examine) করে এবং তৎপর উহার বিষয়ে নিশ্চয় হয়। মনে কর, চক্ষু একটা হাতীর রূপ অন্তঃকরণের কাছে পৌঁছাইয়া দিল। অন্তঃকরণ উহাকে মনন করিয়া পরে নিশ্চিত হইল যে উহা হাতীর রূপ। সুতরাং অন্তঃকরণের দুইটী কাজ আছে মনন করা ও নিশ্চয় করা। "এটা কিসের রূপ?" এইরূপ সংশয় হইতে মনন হয়। অন্তঃকরণের যে অংশে এইরূপ সংশয় হয় তাহাকে মন বলে ও যে অংশে নিশ্চয় হয় তাহাকে বুদ্ধি বলে। সুতরাং শেষ বুদ্ধিতে যাইয়াই রূপটী ঠিক্ জ্ঞাত হয়। রসাদি অন্যান্য জ্ঞেয় পদার্থ সম্বন্ধেও এই কথা। বুদ্ধিতে যাইয়াই যখন ভোগ্য জড় জ্ঞাত হয় তখন বুঝিতে হইবে

কি প্রণালীতে ভোগ্য জ্ঞাত হয়?

যে, ভোগ্য জড়ে চিদাভাস পড়িলে উহার যে জ্ঞাতৃত্বধর্ম্ম জন্মে সেই জ্ঞাতৃত্বধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে বুদ্ধিস্থ হইলে প্রকাশিত হয়। এইরূপে কর্ণাদি বহিরিন্দ্রিয়ের এবং মন ও বুদ্ধি, এই দুই অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে চিদাভাস জড়কে ভোগ করে। এস্থলে আর এক প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় যে এত কার্য্য করে উহারা কি তবে জড় নহে ? জড় বই কি। স্বপ্নে যখন বহিরিন্দ্রিয়ের লোপ হয় ও সুষুপ্তিতে অন্তরিন্দ্রিয়ের লোপ হয় তখন উহারা জড় ভিন্ন চিৎ হইতে পারে না, কারণ চিৎ অবিনাশী ও জড়ই বিনাশী, অনিত্য। তবে ভোগ্য শব্দ-স্পর্শাদির ন্যায় ইহারাও চিদাভাস ও চিতের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়া চিদাভাসের উপকার করে। ইহারা জ্ঞেয় নহে, কারণ শব্দ-স্পর্শাদি গুণ ইহাদের নাই। সুতরাং ইহাদের জ্ঞাতৃত্ব ও অজ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম নাই। জ্ঞেয়ে চিদাভাস পড়িলে ইহারা সেই আভাসের ও চিতের সাহায্যে স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া জ্ঞেয়কে জ্ঞাত করে। এইজন্য ইহাদিগকে স্বপ্রকাশ বলা যাইতে পারে।

ভোগ্যে চৈতন্যের আভাস পড়িলে ঐ ভোগ্য কি প্রণালীতে জ্ঞাত হয় তাহা বোঝা গেল। কিন্তু কাহার প্ররোচনায় ভোগ্যে চৈতন্যের আভাস পড়ে ? সুষুপ্তির নিদ্রা স্বপ্নহীন—শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ, কর্ণ-ত্বক্‌-চক্ষু-জিহ্বা-নাসিকা, মন-বুদ্ধি সমস্তই নিদ্রাগতের নিকট লোপ পাইয়াছে—সমস্ত জগৎটা উড়িয়া গিয়াছে। এ নিদ্রা ভাঙ্গে কেন ? আবার কেন জগতের উপলব্ধি হয়, শব্দ-স্পর্শাদিতে চৈতন্যের আভাস পড়ে ও ইন্দ্রিয় সকল উদ্ভূত হইয়া তাহাদিগকে জ্ঞাত করায় ? এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে, প্রথমে বুঝিতে হইবে, লোকে শব্দ-স্পর্শাদি ভোগ করে কেন। লোকে শব্দ-স্পর্শাদি ভোগ করে, কারণ শব্দ-স্পর্শাদি ভোগ করিবার বাসনা লোকের আছে। বাসনাই ভোগের কারণ। বাসনা তৃপ্তির জন্যই শব্দ-স্পর্শাদি জ্ঞাত হয়। বাসনার সঙ্গে আবার অহঙ্কার (egotism, sense of individuality) বর্ত্তমান। অহঙ্কার বা আমিত্ব না থাকিলে ভোগের বাসনা হইতে পারে না। পুনশ্চ, অজ্ঞান হইতে বাসনা ও অহঙ্কার আসে—চিৎস্বরূপের অনবগতির জন্যই "আমি ভোগ করিব" এইরূপ বাসনা জন্মে। অতঃপর প্রশ্ন হইতে পারে, অজ্ঞান কোথা হইতে আসে ? এ প্রশ্নের উত্তর হইতেছে যে, ব্যবহারিক জগতে অজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ। পারমার্থিক হিসাবে একমাত্র শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ চিৎই আছে—সৎ পদার্থ ; অজ্ঞান নাই—অসৎ পদার্থ। অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব—অভাব অসৎ পদার্থ।

কাহার প্ররোচনায় ভোগ্যে চৈতন্যের আভাস পড়ে ?

সৎ বা ভাব পদার্থ হইতে অসৎ বা অভাব পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না। অসৎ বা অভাব পদার্থ হইতেই অসৎ বা অভাব পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে। সুতরাং অজ্ঞানরূপ মৌলিক অভাব পদার্থ হইতে সমগ্র অসৎ জগতের উৎপত্তি। ব্যবহারিক হিসাবে এই অসৎ জগৎ সম্পূর্ণ সৎ ও উহার মূল অজ্ঞানও সম্পূর্ণ সত্য, চিরসত্য, অনাদি। অহঙ্কার ও বাসনারূপে অজ্ঞান ভোগের কারণ হয়। সুতরাং অজ্ঞানের প্ররোচনাতেই ভোগ্য জড়ে চৈতন্যের আভাস পড়ে। সুষুপ্তিতে অহঙ্কার ও বাসনা অজ্ঞানে লীন থাকে, এবং অজ্ঞান অব্যক্ত, অর্থাৎ, অপ্রকটিত থাকে। অতঃপর ভোগের কাল আগত হইলে, অজ্ঞানে চৈতন্যের আভাস পড়িয়া উহাকে প্রকটিত করে। তখন উহা হইতে অহঙ্কার ও বাসনা উদ্ভূত হয়। ইহাদের তাড়নায় ভোগ্য জড়ে চিৎপ্রতিবিম্ব পড়ে। ভোগ্যজড়ে চিৎপ্রতিবিম্ব পড়িলে বহিরিন্দ্রিয় উহাকে মনের সম্মুখে স্থাপিত করে। অনন্তর মন উহাকে বিচার করিয়া বুদ্ধির কাছে ধরিয়া দেয়। বুদ্ধিতে অহঙ্কার ও বাসনা চিদাভাস-সাহায্যে প্রকটিত হইয়া ঐ চিদাভাসকে অহঙ্কারধর্ম্মী ও ভোক্তা করে।

এইরূপে অনাদি অহঙ্কার ও বাসনার তাড়নায় জড় ভোগ্য হয় ও চিদাভাস উহাকে ভোগ করে। চিদাভাসই ভোক্তা জীব। বাসনার ভেদ অসংখ্য সুতরাং জীবও অসংখ্য। চিৎ ও অচিতের সহিত চিদাভাসের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। চিৎ হইতে চিদাভাসের উৎপত্তি হয়, এবং অচিৎ অজ্ঞানের প্ররোচনায় অচিৎ ইন্দ্রিয় সকলের সাহায্যে অচিৎ ভোগ্যে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস অচিৎ ভোগ্যের জ্ঞাতা ও ভোক্তা হয়। সুতরাং চিৎ, চিদাভাস ও অচিতের সমষ্টিই জীব। জীবের অন্তঃস্থ ও জীবত্বের আভাসকরূপে অবস্থিত চিৎকে কূটস্থ চিৎ বা প্রত্যাগাত্মা বা আত্মা বলে। চিদাভাস ভোক্তৃচৈতন্য, জীবাত্মা। কূটস্থ চৈতন্য ও ভোক্তৃচৈতন্য, এই দ্বিবিধ চৈতন্যের দ্বারা জীবত্ব নিষ্পাদিত হয়।

জীব।

ভোক্তৃচৈতন্য চিদাভাস মিথ্যা, অনিত্য, অবিনাশী। অজ্ঞান নিষ্ক্রিয় কিংবা বিনষ্ট হইলে উহার নাশ হয়। প্রতিদিন সুষুপ্তিকালে প্রতি জীবের চিদাভাস থাকে না। রোগীর মূর্চ্ছায় ও যোগীর সমাধিতে চিদাভাস থাকে না। কিন্তু সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও সমাধিতে অজ্ঞান নিষ্ক্রিয় থাকে মাত্র, বিনষ্ট হয় না, সুতরাং পুনরায় ভোক্তৃচৈতন্যের উৎপত্তি হয়। কূটস্থ চিৎস্বরূপের জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে জীব জীবন্মুক্ত হয় ও তৎপরে বর্ত্তমান দেহের নাশ হইলে অজ্ঞানের

আত্যন্তিক নিবৃত্তি হেতু জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইহার নাম বিদেহ মুক্তি। বিদেহমুক্তিতে চিদাভাসের আত্যন্তিক বিনাশ হয়। মিথ্যা অচিতের, মিথ্যা ভোগের জন্য, মিথ্যা চিদাভাস বাসনাদৃপ্ত অহঙ্কারের সমীপে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই অহঙ্কার নাশ হইলে, মিথ্যা আর সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় না। অচিৎ ও চিদাভাস লইয়া যে জগৎ তাহা আর থাকে না। জীব ব্রহ্ম অর্থাৎ চিন্মাত্র হইয়া যায়।

"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব ন সংশয়ঃ।"

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥" কঠ ১।৩।১

"ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥" কঠ ১।৩।৪

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥" কঠ ১।৩।১২

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥" ১।৩।১৫

কুল-লক্ষ্মী।

[লেখক—শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল, বি-এ।]

১

অনেক চেষ্টার পর যে দিন হুগলীর শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্রের পুত্র শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সহিত বসুজার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী ললিতাসুন্দরীর বিবাহ হইয়া গেল, সেদিন বসুজা ভাবিলেন,—আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

কিন্তু মানুষ আপনাকে নিশ্চিন্ত ভাবিলে কি হইবে, বিধাতা বসুজার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই। বসুজা ইহা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই। বসুজা ত মানুষ; বিধাতার বিধান মানুষের লক্ষ্যের অতীত। তাই বসুজা ভাবিতে

পারেন নাই যে, এত আনন্দের মধ্যে গভীর বেদনা লুক্কায়িত আছে; এত নিশ্চিন্ততার মধ্যে চিন্তার এমন বৃশ্চিক-দংশন আছে; এমন সুখের স্বপ্ন ইহারই মধ্যে টুটিয়া যাইবে! তাই বিবাহের চারি মাস পরে যখন সংবাদ আসিল যে, বসুজার একমাত্র কন্যা ললিতাসুন্দরী বিধবা হইয়াছে, তখন তিনি যেন হঠাৎ আকাশ হইতে পড়িলেন। তাঁহার মনে হইল,—পৃথিবীটা যেন তাঁহার পদতল হইতে সরিয়া যাইতেছে! দুই হাতে মাথা চাপিয়া বসুজা মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার চোখের সম্মুখে অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া গেল। একটা অসম্ভাবিত আশঙ্কায় তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তার পর চোখের আঁধার একটু কাটিয়া গেলে তিনি চিঠিখানি পড়িলেন—"হঠাৎ বিসূচিকা-রোগে শ্রীমান্ নরেন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে।"

সেই দিনই বৈকালে বসুজা ললিতার শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। ললিতা শুনিল,—পিতা আসিয়াছেন। সে রুক্ষকেশে, সাশ্রুনয়নে ধীরে ধীরে আসিয়া পিতার পদধূলি গ্রহণ করিল। পিতা দেখিলেন,—তাঁহার একমাত্র আদরের কন্যা ললিতার অঙ্গে আভরণ নাই; তাহার পরণে থান; তাহার সীমন্তের সিন্দূর-বিন্দু—সৌভাগ্যের প্রধান চিহ্ন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে! বসুজা ভাবিলেন,—কোন নির্ম্মম এই প্রস্ফুটোন্মুখ কুসুমকে বৃন্তচ্যুত করিল! কাহার অভিশাপে তাহার সিঁথার সিঁদুর ঘুচিল, কোমল পদের অলক্তক-রাগ মুছিয়া গেল, সৌভাগ্যের গাঙ্গে ভাঁটা পড়িল! তিনি আর ভাবিতে পারিলেন না; কন্যাকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রেই বসুজা ললিতাকে লইয়া যাইবেন শুনিয়া, রামবাবু বৈবাহিকের হাত দু'টী ধরিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—"নরেন আমায় ফাঁকি দিয়ে গিয়েছে; এ সময়ে তা'র স্ত্রীকে—আমার বৌমাকে কিছুদিনের জন্য এখানে থাকৃতে দিন।" বসুজা গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,—"এখানে থাকৃলে আমার কন্যা বাঁচ্‌বে না। আমি আজই তা'কে নিয়ে যাব।"

বিদায়কালে ললিতার শাশুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রবধূর মাথায় হাত দিয়া বলিলেন,—"মা এখন আমার ছেলেমেয়ে সবই তুই। যেখানেই থাকিস্ আমাদের ভুলিস্ না, এ সংসার তোর নিজের সংসার!" বহির্বাটীতে বুকের উপর হাত দু'টী রাখিয়া রামবাবু দাঁড়াইয়াছিলেন। ললিতা প্রণাম করিলে তিনি শুধু তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "মা! মনে করেছিলেম, তোমাকে দেখে আমার নরেনের শোক অনেকটা ভুল্‌ব। মা তুমি ছেলে মানুষ। তবু তোমার বুড়ো

শ্বশুরের দুটা কথা মনে রেখো। যদি কখনও এ বুড়োর জন্য প্রাণ কাঁদে নিঃসঙ্কোচে এখানে এসো ; নরেন গেলেও এ সংসারে, তুমি সকলের উপরে থাক্‌বে ; কারণ তুমি আমার বড় ছেলের বৌ ; আর তুমি হিঁদুর ঘরের ঘরণী।"

২

এই ঘটনার পর দুই বৎসর গত হইয়াছে। এই দুই বৎসরে ললিতার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রথমতঃ স্ত্রীর ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও বসুজা কন্যাকে বিধবাবেশ ধারণ করিতে দেন নাই। বিধবার আচার শিক্ষা দেন নাই। সুতরাং সে সাজিয়া গুজিয়া বেড়াইত ; গহনা পরিত ; চুল বাঁধিত ; পান খাইত। তবে বসু গৃহিণী মেয়েকে মাছটা কখনও খাইতে দেন নাই। পিতা কন্যার শিক্ষার জন্য গৃহে এক শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন কন্যা যদি পাঠে ও শিল্পকার্য্যে মনোনিবেশ করে, তাহা হইলে অতীতের চিত্র তাহার মন হইতে মুছিয়া যাইবে। কিন্তু বিধাতার কোন্ সময়ে কাহার হৃদয়ে অন্যের অজ্ঞাতে কি চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেন কে বলিতে পারে ! পিতা ভাবিলেন, কন্যা সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বালিকা সব ভুলিয়াছিল, কেবল সেই ফুলসজ্জার রাত্রি ভুলিতে পারে নাই। সেই এক অপরিচিতের অথবা চিরপরিচিতের সাদর আহ্বান !—ইহা সে ভুলিতে পারে নাই। যখন কোনও কাজ হাতে না থাকিত, তখন সেই রাত্রের সেই উজ্জ্বল-আলোকোদ্ভাসিত মুখখানি জোর করিয়া তাহার হৃদয়ে উঁকি মারিত !

সেদিন ফাল্গুনের প্রভাত। চারিদিকে বিহগের কাকলী। তরুশীর্ষে উষার কনকরাগ প্রতিফলিত হইয়াছে। সমস্ত প্রকৃতি যেন নূতন জীবনে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। চারিদিকে নূতন আনন্দ। ললিতা গৃহবাতায়নে নিদ্রালস-নেত্রে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিল। একটা কথা তাহার মনে জাগিতেছিল,—গত কল্য তাহার মাতা পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "আগামী সপ্তাহে ললিতার দেবরের বিয়ে, ললিতা যাবে কি না।" কিন্তু পিতা বলিলেন,—"ললিতাকে শ্বশুর-বাড়ীতে পাঠান হইবে না।"

ললিতা এই কথা ভাবিতেছে, এমন সময়ে নিম্নতল হইতে কে ডাকিল,—"মা কোথায় গো !" কি মধুর সম্বোধন ! ললিতার বোধ হইল,—এ ত অপরিচিত স্বর নহে—কোথায় সে যেন ইহা শুনিয়াছে ! সহসা নাট্যশালার যবনিকার ন্যায় তাহার হৃদয়-রাজ্যের এক আবরণ সরিয়া গেল। তাহার মনে হইল সেই দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা। এক বৃদ্ধ এমনই মধুর স্বরে বিরাট আনন্দের মধ্যে

তাহাকে আহ্বান করিয়া নিজ বাটীতে লইয়া গিয়াছিল। আবার এমনই মধুর স্বরে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায়কালে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল,—"তুমি হিঁদুর ঘরের ঘরণী !"

স্পন্দিত হৃদয়কে সবলে চাপিয়া ধরিয়া কম্পিতপদে ললিতা অগ্রসর হইয়া শুনিল,—তাহার পিতা বলিতেছেন, "না আমি মেয়ে পাঠা'ব না !"

"সে কি ? অদৃষ্ট দোষে পুত্র হারিয়েছি বলে কি কর্ত্তব্যও ভুলেছি ! আমার জ্যৈষ্ঠ পুত্রবধূই আমার সংসারের ভাবী কর্ত্রী।"

"সে সম্বন্ধ আপনার পুত্রের সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে।"

"অসম্ভব ; হিন্দুর বিবাহ বালির বাঁধ নহে যে, এক পশলায় মুছে যাবে। এ পাষাণে রেখাপাত, লুপ্ত হ'বার নয়।"

বসুজা ঈষৎ রুষ্টভাবে বলিলেন, "মাপ করবেন, আমার মত বদলাবে না।"

"বেশ আমার মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দিন, তাকে শুধু একবার দেখে যা'ব।"

বসুজা বলিলেন "আমার ইচ্ছা নয় যে, ললিতার মনে পূর্ব্বকথা কোনও প্রকারে জাগিয়ে দেওয়া হয়।"

এবার বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইল। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তবে কি—এ জনরব সত্য যে আপনি আপনার কন্যার—আমার পুত্রবধূর আবার বিবাহের উদ্যোগ করছেন ?"

বিবাহের কথায় ললিতার হৃদয়ে কে যেন সবলে আঘাত করিল। একখানি মুখ তাহার মনে পড়িল। মনে পড়িল,—তাহার যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে যে এইমাত্র শুনিল,—বিবাহ বালির বাঁধ নহে—এ পাষাণে রেখাপাত ! তবে তাহার পিতা কেন এ গর্হিত কার্য্যে উদ্যত ? পিতা কি জানেন না যে, এ দেহ অন্যের ক্রীত ! সে আজ সম্মুখে নাই বলিয়া কি তাহার অধিকার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ! সে ভাবিল, নিজ কর্ম্মফলে যাহা হারাইয়াছি তাহার জন্য যাহা আছে তাহা হইতে বঞ্চিত থাকি কেন ? অমন স্নেহময় শ্বশুর, স্নেহময়ী শাশুড়ীকে কেন পরিত্যাগ করিব ? আমি আমার নিজ গৃহে যাইব।

৩

ললিতা নীচে আসিয়া দেখিল,—শ্বশুর চলিয়া গিয়াছেন। কোনও কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে নিজ কক্ষে যাইয়া শুইয়া পড়িল। সে অন্তর্দৃষ্টিতে এক মৃত্যু-মলিন মুখ দেখিতে পাইল ! সে মুখ যেন পলকহীননেত্রে তাহার পানে চাহিয়া

আছে। যেন তাহাকে বলিতেছে—"ইহারা সকলে আমায় ভুল্‌তে পারে; কিন্তু তুমি যেন ভুলো না!"

পর দিন মধ্যাহ্নে সে এক পত্র পাইল। পত্রখানি তাহার শাশুড়ীর। তিনি লিখিয়াছেন,—"বউ মা! আমার বিশ্বাস তুমি আমাদের ভুল নাই; ভুলিতে পারিবে না। সেই জন্যই তোমায় আনিতে তোমার শ্বশুরকে পাঠাইয়াছিলাম। তোমাকে পাঠাইতে তোমার পিতার মত নাই; কিন্তু আমি তোমার মত জানিতে চাহি, সেই জন্যই এই পত্র লিখিতেছি। তোমার সংসার তুমি যদি না বুঝিয়া লও তাহার জন্য তুমি দায়ী। সেই জন্য কাল আবার তোমার শ্বশুরকে তোমার নিকট পাঠাইব। সাক্ষাতে লজ্জা না করিয়া সমস্ত বলিবে। আমি তোমায় কন্যার ন্যায় ভালবাসি বলিয়াই তোমাকে আমার নিকটে আনিবার জন্য এত জিদ্‌ করিতেছি। আশীর্ব্বাদিকা—তোমার মা।"

এক ঘণ্টা পরে ললিতার মা দেখিল,—বাহ্য সৌন্দর্য্যের আবরণ—অলঙ্কাররাশি ত্যাগ করিয়া মুখে এক অপূর্ব্ব গরিমা মাখিয়া কন্যা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। প্রথমে তিনি নিজ চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। পরে যখন শুনিলেন কন্যা বলিতেছে—"মা! আমি শ্বশুরবাড়ী যা'ব"—তখন তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। বেদনাপ্লুতকণ্ঠে বলিলেন,—"সেখানে তোর কি আছে অভাগিনী!"

"তবু যা আছে তাহা হইতে বঞ্চিত থাকি কেন মা!"

এমন সময় ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, দিদিমণির শ্বশুর আসিয়াছেন। ক্রন্দনরতা মাতাকে প্রণাম করিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে রামবাবুর পদতলে প্রণাম করিয়া ললিতা এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "বাবা আপনি আমাকে নিয়ে চলুন!"

পতনশীল দুই বিন্দু অশ্রু ক্ষিপ্রহস্তে মুছিয়া ফেলিয়া বৃদ্ধ বলিল,—"তুমি মা আমার কুল-লক্ষ্মী।"

বসুজা কন্যার বিদায়কালে শুধু তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; কথা কহিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না,—কোন্‌ শক্তিবলে কন্যা তাহার পিতাকে ছাড়িয়া গেল!

জীবের জন্মজাত সংস্কার।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

সঙ্গীতজ্ঞ হইতে হইলে মানুষকে প্রতিবাসীর বিরক্তি-ভাজন হইয়া সা রে গা মা সাধিতে হয়, কোকিল কিন্তু যৌবনে পদার্পণ করিলেই কুহু-তানে বনভূমি মাতাইতে পারে। বসন্তের সমীরণ তাহার গাত্রস্পর্শ করিলেই হইল। তাহার প্রাণে মিলনের ইচ্ছা জাগিলেই যথেষ্ট। তাহাকে গলা সাধিতে হয় না, ওস্তাদজীর মুখবিকৃতি দেখিতে হয় না, নানা প্রকার অশ্রাব্য কুশ্রাব্য সুর সাধিয়া শেষে মধুর সুর বাহির করিতে হয় না। কুহুতান পিকের সংস্কারজাত, বনের মাঝে শত শত পাখীর কূজন শুনিলেও সে এক কুহু-তান ভিন্ন অপর তানের লহর তুলিতে পারে না। প্রিয়ার মনোরঞ্জন করিতে হইলে কুহু কুহু বলিয়া চীৎকার করিতে হয় এ বুদ্ধি তাহার সহজাত, এ জ্ঞান তাহার নিরপেক্ষ। মধুচক্রে যে কত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা কে না জানে? মৌমাছির ছয়-কোণা ঘরগুলা যে মেজের উপর নির্ম্মিত, সে মেজে রম্বাস্ আকারের তিনখানা টালি পাতা। সেই রম্বাসের কোণের মাপ লইয়া একদিন বিলাতে গণিতাচার্য্য-দিগের মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়াছিল—সে কথার পরিচয় "জীবজন্তুর বাসস্থান"* নামক প্রবন্ধে প্রদান করিয়াছি। শুধু মৌমাছি কেন, পোকা-মাকড়, উই, পিঁপড়া, বাঘ, ভালুক, টুনটুনি, বাবুই পাখী, খরগোস, শৃগাল প্রভৃতি সকল শ্রেণীর জীবের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার বিশিষ্ট শক্তির পরিচয় 'অর্চ্চনা'র পাঠক-দিগকে দিয়াছি। কেবল বাসস্থান-নির্ম্মাণে কেন, সকল বিষয়ে প্রত্যেক জীবের জাতি ধরাতলে জীবনলীলা আরম্ভ করিয়াই নানা প্রকার বিশেষ বিদ্যার পরিচয় প্রদান করে। সেই সকল বিদ্যা তাহাদের জাতীয় সকল জীবের মধ্যে সমভাবে বর্ত্তমান থাকে। তাই আমরা বলি সে জ্ঞানগুলা তাহাদের সহজাত, তাহাদের সে বিদ্যা শিক্ষামূলক নহে, সংস্কারমূলক। বানর শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই গাছের ডাল ধরিতে শেখে, মাতার ক্রোড়ে বসিয়া তাহার লোম ধরিয়া ঝুলিতে পারে। মানব শিশু তাহা পারে না কিন্তু স্তন্যপান করিতে পারে। এ সকল বৃত্তি জীবের সহজাত, ইংরাজিতে বলিতে গেলে বলিতে হয় ইহা তাহাদের instinct.

* অর্চ্চনা ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১৭৯ পৃষ্ঠা।

জীবের সহজাত বুদ্ধির সহিত মানুষের অর্জ্জিত জ্ঞানের একটা বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের অর্জ্জিত জ্ঞান ব্যক্তিবিশেষে বিভিন্ন, এমন কি একই ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপে প্রকটিত হয়। বাবুই পাখী যৌবনে উপনীত হইলেই সংসারী হয়, বাবুই বধূর সন্ধানে মাঠে মাঠে, তাল গাছে তাল গাছে শিস্ দিয়া বেড়ায়, বধূ জুটিলেই তালবৃক্ষে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। এ বিদ্যা তাহাকে শিক্ষা করিতে হয় না। তাই এ বিদ্যার ক্রমোন্নতি নাই, বাবুইয়ের শিল্পের অভিব্যক্তি নাই। বাবুই যুবক প্রথম বাসাটী যেরূপ দক্ষতার সহিত নির্ম্মাণ করিবে, বৃদ্ধ বয়সে মরিবার পূর্ব্ব দিনও যদি বাসা তৈয়ারি করে ঠিক সেইরূপ দক্ষতার সহিত সেইরূপ আকারের সেইরূপ দোদুল্যমান বাসস্থান কেবল তাল গাছেরই ডালে বাঁধিবে। আমাদের মনুষ্য-সমাজের মিস্ত্রিপুঙ্গবদের বিধি কিন্তু একেবারে অন্য প্রকার। স্যার আশুতোষ বা স্যার গুরুদাস যত বড়ই সুপণ্ডিত হউন, হাতে ধরিয়া তাঁহাদিগকে গৃহনির্ম্মাণ করিতে না শিখাইলে তাঁহাদের দ্বারা একখানি অতি দীন কুটীরও নির্ম্মিত হইবার উপায় নাই। শুধু তাহাই নহে, আমাদের গৃহনির্ম্মাতা প্রথমে যে শ্রেণীর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা পরে যে গৃহ নির্ম্মাণ করে তাহা অধিক মনোরম হয়। তাহার শিল্পজ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, আবার সামান্য শিল্প শিক্ষা করিয়া কোকেন খাইতে শিখিলে তাহার শক্তির হ্রাস হয়। আমাদের সংস্কারের বশে অল্প কাজই হইয়া থাকে। অধিকাংশ কাজই শিক্ষার দ্বারা হয়, অভ্যাসের দ্বারা হয়। আমাদের সহজাত বুদ্ধি অল্প; জীব-সমাজে তাহা অত্যধিক। প্রত্যেক জাতীয় জীবের এক একটা বিশিষ্ট সহজাত বুদ্ধি আছে। আমাদের সেগুলা কেবল আহারাদি সামান্য বৃত্তিমাত্রে আবদ্ধ—তাই ইংরাজ কবি Wordsworth প্রকৃতির সহজাত পুলক দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

"If this belief from heaven be sent.
If such be Nature's holy plan
Have I not reason to lament
What man has made of man ?"

কবি যাহা বলেন বলুন, আমরা কিন্তু ইহাতেই জীবজগতে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করি। মানুষ মানুষকে ছাগল ভেড়া বাঘ ভল্লুক হনুমান জাম্বুবান আবার অপ্সর কিন্নর ও দেবতা গড়িতে পারে—ইহাই মনুষ্যত্বের বিশেষত্ব।

অবশ্য এ স্থলে আমরা প্রত্যেক জীবশ্রেণীর বিশেষ সংস্কারের পরিচয় দিতে চাহি না। জীবজগতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে প্রত্যেক প্রাণীর জাতীয় বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া দুরূহ নহে। কিন্তু সাধারণ প্রবৃত্তি ব্যতীত প্রত্যেক শ্রেণীর জীবের কতকগুলা সহজাত ইন্দ্রিয়জ্ঞান জন্মে; সেগুলা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ না করিলে ধরিতে পারা যায় না। নৈয়ায়িকের সিংহাবলোকন ন্যায়ের, সিংহের ঐরূপ বিশিষ্ট অবলোকন-বৃত্তি পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা নামকরণ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ছুটিতে ছুটিতে কেশরী দাঁড়ায় এবং পশ্চাদ্দিক অবলোকন করে। অচিরে বৃষ্টি হইবে কি না একথা অনেক জীব সংস্কার দ্বারা জানিতে পারে। বৃষ্টির পূর্ব্বে ভেকের কলরব বঙ্গবাসী মাত্রেরই বিদিত। যখন মৌমাছি মধুচক্র হইতে অনেক দূরের বনে মধু আহরণ করিতে যায়, তখন নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে জল-বৃষ্টির সম্ভাবনা নাই। বৃষ্টির পূর্ব্বে রাসভগণ একটু অতিরিক্ত চীৎকার করে এবং তাহাদের লম্বা কর্ণ দুইটী নীচু করিয়া সম্মুখে পশ্চাতে দুলাইতে থাকে। বৃষ্টির পূর্ব্বে গর্দ্দভ জাতিকে প্রাচীরে গা ঘসিতে দেখা যায়। যখন জলের খেলার জুয়া চলিত তখন অবশ্য মনুষ্য-গর্দ্দভদিগের সহিত ইহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত না, কিন্তু প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়া দিলে লম্বকর্ণদিগেরই জয় হইত সন্দেহ নাই। বৃষ্টির পূর্ব্বে কোনও কোনও বিড়ালকে হাঁচিতে দেখা যায়; কিন্তু এ কথাটা সর্ব্ববাদিসম্মত যে বৃষ্টির পূর্ব্বে তাহারা নিজের লাঙ্গুলকে পশুর মত তাড়া করিয়া ধরিবার চেষ্টা করে না বা লাঙ্গুল কামড়াইয়া ক্রীড়া করে না। বাদলের হাওয়ায় কুকুরে ঘাস খাইবার চেষ্টা করে এবং একটু গম্ভীর হয়। যখন ভেড়ার দল বাতাসের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়ায়, যখন ময়ূর একটু অধিক কেকারব করে, যখন অশ্ব গলা লম্বা করিয়া বাতাসের ঘ্রাণ লয়, যখন পিপীলিকা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বাসার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপ থাকিলেও শীঘ্র বৃষ্টি হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা বাদুড়েও বেশ বুঝিতে পারে। বৃষ্টির সম্ভাবনা বুঝিলে তাহারা পুরাতন অট্টালিকার ঠাকুর দালান, জীর্ণ অট্টালিকার নিভৃত স্থল প্রভৃতি সুবিধা মত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং চীৎকার করে। বলীবর্দ্দও বৃষ্টি-বাদলের পূর্ব্বে সম্মুখের পায়ে মৃত্তিকা খনন করে। খুব বৃদ্ধ চাষারা বলিয়া থাকে—"ডান কাতে শোয় ষাঁড়, বিষ্টির জলে পূরাও ভাঁড়"।—ষণ্ড দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শুইলে বৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। এ সকল দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি প্রদান করা যাইতে পারে। এক এক জাতীয় জীবের এক একটা সংস্কার আছে তাহা জন্মগত। তাহাদের

সহজাত জ্ঞান বৃদ্ধ যুবায় সমভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, বহুদর্শিতায় সে জ্ঞান বৃদ্ধি পায় না, বহুদর্শিতার অভাবে সে জ্ঞান লোপ পায় না।

কিন্তু এই জীববুদ্ধি খুব অধিক মাত্রায় সীমাবদ্ধ থাকিলেও জীবজগতে বুদ্ধিমত্তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, এক শ্রেণীর দুইটী জীবের বুদ্ধির তারতম্য নাই—এ ধারণা আজকাল প্রাণতত্ত্ববিদ্‌দিগের মধ্যে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। পিপীলিকা আহার লইয়া সারি বাঁধিয়া গমন করে, প্রথমটী ঠিক যে পথে চলে অপরগুলি সে পথ ছাড়ে না। কিন্তু একবার পিঁপড়ার সারি ভাঙ্গিয়া দিয়া বেশ উত্তমরূপে তাহাদের গন্তব্য পথে দাগ মুছিয়া দিলে তাহারা প্রথমে একটু পথভ্রান্ত হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে; কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আবার অদূরে একটা পথ আবিষ্কার করিয়া লয়। একবার এক প্রাণ-তত্ত্ববিদ্‌ সাহেব দেখিয়াছিলেন, একদল পিপীলিকা একটা রেলপথ পার হইয়া খাদ্য আহরণ করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে রেল আসিলে অনেক পিপীলিকা রেলের চাকার তলায় পড়িয়া মৃত্যুমুখে পড়িতেছিল। অমনি সেই পিপীলিকা-সমাজের মুরুব্বির দল নানারূপ গবেষণা করিয়া স্থির করিল যে, এরূপ বিপদ-সঙ্কুল রেলপথে যাওয়া তাহাদিগের ক্ষুদ্র সমাজের পক্ষে অহিতকর। তাহারা রেলের তলায় সুরঙ্গ খুঁড়িয়া পার হইবার একটা পথ নির্ম্মাণ করিল। অবশ্য আমাদের অভ্যাস-জনিত সংস্কারের মত জীবের জন্মগত সংস্কার থাকে বটে, কিন্তু আমাদের এ জীবন-লব্ধ সংস্কারও যেমন নূতন অভ্যাসের দ্বারা পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়, জীবজন্তুর সহজাত বুদ্ধিরও তেমনি পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। নিম্নশ্রেণীর জীব যে কেবল কলের পুতুলের মত কার্য্য করে অথবা নাট্যশালার রাজা-উজীরের মত শিক্ষিত ভূমিকা আবৃত্তি করিয়া যবনিকার অন্তরালে চলিয়া যায়, সে ধারণা ভ্রান্তিমূলক। খুব বেশিমাত্রায় চিন্তাশক্তি না থাকিলেও তাহারা যে একেবারে অজ্ঞান, একথার মূলে সত্য নাই। জীবজাতির কর্ম্মের প্রধান প্রবর্ত্তক অবশ্য তাহাদের সহজাত বুদ্ধি, কিন্তু তাহা হইলেও পিয়ারে হুবার সাহেবের কথায় বলিতে হয় যে, তাহাদের প্রত্যেক কর্ম্মে "বিচার ও যুক্তির ছিটে ফোঁটা আছে।"

জীবের সংস্কারজাত বুদ্ধি যে অলঙ্ঘনীয় নহে তাহা গৃহে জীবজন্তু পুষিলে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য অহি ও নকুল একত্রে পুষিয়া দেখি নাই; কিন্তু অহিনকুল-সম্পর্কীয় জীবের মধ্যে প্রভূত সৌহৃদ্য দেখিয়াছি। এ বিষয়ে সার-মেয়ের বুদ্ধিমত্তাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। আমি "জীবজন্তুর সৌহৃদ্য" * নামক

* অর্চ্চনা ১১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১০৭—১০ পৃষ্ঠা।

প্রবন্ধে এ বিষয়ে অনেকগুলা উদাহরণ দিয়াছি। সে প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম—"কুকুর, বিড়াল গৃহপালিত হইলে উহাদের ভিতর একটা বড় অদ্ভুত গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা ঠিক বুঝিতে পারে, কোন্ জীব তাহাদের নিজের প্রভুর। খাদ্য-খাদকের সম্বন্ধ থাকিলেও প্রভু-পালিত জীবের তাহারা কোন অনিষ্ট করে না। পায়রার কাছে বিড়াল থাকিতে দেখিয়াছি, কুকুরের খাবার গিনিপিগ্, খরগোস, সাদা ইঁদুর প্রভৃতিকে কাড়িয়া খাইতে দেখিয়াছি"। নিজের জ্ঞান হইতে এ বিষয়ে অনেক উদাহরণ দিয়াছি। এস্থলে আবার কেন এসব কথার উল্লেখ করিলাম, তাহা পরে বুঝাইব। আপাততঃ বলিবার উদ্দেশ্য যে গৃহে পালন করিলে অভ্যাসের দ্বারা জীবের হিংসারূপ বিশেষ সংস্কারও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

অভ্যাসের দ্বারা জীবের সহজাত বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে; সে বিষয়ে আরও দুই চারিটা উদাহরণ দিব। অভিব্যক্তিবাদীদিগের মতে সহজাত বুদ্ধি বা Instinctএর উদ্ভবের কারণ সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে সহজাত বুদ্ধি পরিবর্ত্তিত হয়, এক কথাটার উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। দুই একজন প্রাণতত্ত্ববিদ্ নানা প্রকার পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এ কথার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ডিমে তা দিবার বুদ্ধি পক্ষীদিগের সহজাত। ঠিক কয়দিন অণ্ডের উপর বসিয়া থাকিতে হয়, অণ্ড ফাটিয়া শাবক বাহির হইলে ঠিক কত দিন তাহাদিগকে লালন-পালন করিতে হয়, এসব বুদ্ধি বিহঙ্গমদিগের সংস্কারলব্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন যে, সে বুদ্ধি একেবারে স্বাধীনতা-বর্জ্জিত বা সীমাবদ্ধ নহে। মোরগীর নিজের ডিম্ব অপসারিত করিয়া তাহাদিগের স্থলে কৃত্রিম অণ্ড দিয়া স্পলাডিং সাহেব দেখিয়াছেন যে,মোরগী শাবক বাহির হইবার আশায় বহুদিন সেই কৃত্রিম অণ্ডে তা দিয়াছে। সকল মোরগী কিন্তু তাহা করে নাই। কেহ প্রবঞ্চিত হইয়াছে, কেহ সে প্রবঞ্চনার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ইহার দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, যেমন মানুষদিগের মধ্যে সাধারণ বিষয়ে বুদ্ধির তারতম্য আছে; ইতর শ্রেণীর জীবদিগের মধ্যেও কতক পরিমাণে বিচারশক্তির স্বাধীনতা আছে। দুইটী মোরগী এক সঙ্গে অণ্ড প্রসব করিয়াছিল। প্রসবের তিন দিন পরে স্পলাডিং সাহেব দুইটীরই নীড় হইতে ডিম তুলিয়া লইয়া সদ্যজাত কুক্কুটশাবক রক্ষা করিয়াছিলেন। একটী কুক্কুটী তাহাদিগকে পরের সন্তান বুঝিয়া একেবারে নীড় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, অপরটী প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে

শাবকগুলিকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছিল। রোমেন্স সাহেব একটী বড় অদ্ভুত পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি একটী কুক্কুটীর বাসায় তিনটী ভাম-জাতীয় ফেরেট নামক শ্বাপদের বাচ্ছা দিয়াছিলেন। কুক্কুটী তাহাদিগকে নিজ সন্তানভ্রমে পালন করিয়াছিল। সাহেব যখন তাহাদিগকে দুধ খাওয়াইতেন, তখন সে সন্তুষ্টচিত্তে ধীরভাবে সে অদ্ভুত প্রক্রিয়া নিরীক্ষণ করিত। কুক্কুটশাবক কর্ত্তৃক দুগ্ধ পান তাহার সহজাত-জ্ঞানের বিরোধী হইলেও সে ঐরূপ প্রক্রিয়া অসম্ভব মনে করিয়া শাবকগুলিকে পরিত্যাগ করে নাই। অবশ্য মোরগ-শাবকের মত ফেরেটের বাচ্ছাগুলা পালয়িত্রী মাতার সহিত ইতস্ততঃ ছুটিতে পারিত না। তাই কুক্কুটী স্থানান্তরে গমন করিলেই তাহারা কাতরভাবে আর্ত্তনাদ করিত। অমনি কুক্কুটী ছুটিয়া আসিয়া তাহাদিগকে পক্ষের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বসিত।

গৃহপালিত হইয়া জীবের সহজাত বুদ্ধির ব্যত্যয় ঘটে, ইহাতে সংস্কারের উদ্ভবের কারণ পাওয়া যায়। যেমন আদিম কেলেগোলা পায়রা হইতে গৃহ-পালিত হইয়া অনেক শ্রেণীর পারাবতের সৃষ্টি হইয়াছে * যেমন নেকড়ে বাঘ হইতে কুকুরের অভিব্যক্তি হইয়া নানা শ্রেণীর কুকুরের আবির্ভাব হইয়াছে, সেইরূপ এক প্রকারের নীড় নির্ম্মাণ করিবার সহজাত বুদ্ধি বা ডিমে তা দিবার সংস্কার নানা প্রকার গৃহনির্ম্মাণবুদ্ধিতে অশেষ প্রকারে ডিম ফুটাইবার প্রবৃত্তিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। যেমন এক আদিম সরল আকারের জীব অভিব্যক্ত হইয়া নানা প্রকার জটিল † দেহবিশিষ্ট জীব ধরণীর শ্যাম ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সেইরূপ অতি সরল মাত্র আত্মরক্ষা ও সন্তান-উৎপত্তির প্রবৃত্তি হইতে এত অশেষ প্রকার সংস্কার এত অশেষ প্রকার জীবশ্রেণীর প্রাণে গ্রথিত হইয়াছে। বংশগত গুণ ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ‡ হইতে এত প্রকার সহজাত জ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে। কথাটা বুঝাইয়া বলিতে গেলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধের সারাংশের পুনরুল্লেখ করা অনিবার্য্য।

জীবজগতে দুইটা বিচিত্র নিয়ম দৃষ্ট হয়। প্রথম নিয়ম এই যে, সন্তানে পিতামাতার গুণ পাইবার একটা প্রবৃত্তি আছে। আর দ্বিতীয় নিয়মটা এই যে, পিতৃগুণ সন্তানে জন্মিলেও প্রত্যেক সন্তানের পিতামাতা হইতে বিভিন্ন হইবার একটা প্রবৃত্তি আছে। পৃথিবীতে অহরহঃ জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে।

* অর্চ্চনা—১০ম বর্ষ ১২১ পৃষ্ঠা।

† অর্চ্চনা ১০ম বর্ষ ৪৩৩ পৃষ্ঠা।

‡ অর্চ্চনা ১০ম বর্ষ ১৮৭ পৃষ্ঠা।

যাহার একটু নূতন গুণ থাকে, সে সেই গুণের আশীর্ব্বাদে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করে। যে গুণের বলে জীব অপরকে পরাভূত করে, সে সেই গুণটাই বাড়াইতে চেষ্টা করে। ক্রমশঃ পিতা-পুত্রে রূপ-গুণের পার্থক্য সমুদ্ভূত হয়। এইরূপে পার্থক্য বর্দ্ধিত হইয়া এক শ্রেণীর জীব হইতে অপর শ্রেণীর জীবের উদ্ভব হয়। এই রহস্যের বলে জগতে এত বিভিন্ন শ্রেণীর জীব-জন্তুর আবির্ভাব হইয়াছে। পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদীদিগের মতে জীব-জগতের শ্রেণিবিভাগের মূলে এই রহস্য নিহিত।

ঠিক যে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এক শ্রেণীর জীব অন্য শ্রেণীর জীবে পরিণত হয়, ঠিক সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এক প্রকারের সহজাত বুদ্ধি অপর প্রকারের সহজাত বুদ্ধিতে পরিণত হয়। জীবজন্তু যেমন বংশানুক্রমে জাতীয় সংস্কার লাভ করে, তেমনি নিয়তই তাহাদের সহজাত সংস্কারে একটু নূতন রকমের পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। সেরূপ ঘটে নানা কারণে। সেই পার্থক্যগুলা কোনও জীবে বংশপরম্পরাক্রমে বেশ ফুটিয়া উঠিলে তাহার সন্তান-সন্ততির মনে নূতন সংস্কার জন্মাইয়া দেয়। যেমন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও বংশগত গুণের দ্বারা জীবের অবয়বের বিভিন্নতা উৎপন্ন হয়; এতদুভয় কারণে জীবের সহজাত বুদ্ধিরও বিভিন্নতা জন্মে।

সারমেয় জাতির উদাহরণ গ্রহণ করিয়া ডারবিন সাহেব তাঁহার উপরোক্ত মতের পোষণ করিয়াছেন। এক শ্রেণীর কুকুর আছে, তাহারা বনের মধ্যে শিকার দেখিতে পাইলে স্থির হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে। ইহাতে কুকুর-স্বামীর দৃষ্টি সেই শিকারের উপর পতিত হয়। তিনি বলেন, হয়ত কোনও একটা কুকুর-শাবক দৈবক্রমে ঐরূপ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিল; বুদ্ধিমান মানুষ তাহাকে যত্ন করিয়া তাহার ঐ গুণটাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। তাহার সেই গুণটুকু আবার তাহার সন্তানে জন্মিয়াছিল। সেই সন্তানে ঐ গুণটা বর্দ্ধিত করিয়া ক্রমে উক্ত গুণবিশিষ্ট পয়েণ্টার জাতীয় কুকুরের অভিব্যক্তি হইয়াছিল।

কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়িয়া আসে—এ নিয়ম আমাদের দেশে সর্ব্বত্র। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার কোনও কোনও কোকিল নিজে নীড় বাঁধিয়া অণ্ড প্রসব করে। তাহা হইলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কোকিলের আধুনিক পরের বাসায় ডিম পাড়িবার সহজাত বুদ্ধিটা ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে। বোধ হয়, পুরাকালে কোনও এক অলস কোকিল কোনও কাকের

বাসায় ডিম পাড়িয়াছিল। সেই বায়স-গৃহে পালিত কোকিলের নিকটে সে জ্ঞানটা সংস্কাররূপে আবির্ভূত হইল। ক্রমশঃ তাহার সন্তানসন্ততি সকলেই কাকের বাসায় ডিম পাড়িবার প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইল। এদিকে যে সকল কোকিল নিজের বাসায় অণ্ড প্রসব করিল, বোধ হয় কোনও প্রবল শত্রু তাহাদিগের অণ্ড বা সদ্যজাত শাবকগুলাকে নষ্ট করিতে লাগিল। কাক বড় ধূর্ত্ত। তাহার নীড়ে যে সকল কোকিল প্রতিপালিত হইল, তাহারাই জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিল—যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন হইল—প্রকৃতির বাছাই কাজে বায়স-গৃহে পালিত কোকিলেরই অস্তিত্ব রহিল; অপর শ্রেণীর কোকিলের ধ্বংস হইল। তাই কোকিল-সমাজের ঐ সংস্কারটার অভিব্যক্তি হইল।

নানা দৃষ্টান্তের দ্বারা ডারবিন-প্রমুখ অভিব্যক্তিবাদিগণ বুঝাইয়াছেন যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও কুলগত গুণলাভের প্রবৃত্তি হইতে জীব-জগতে এত প্রকারের সহজাত বুদ্ধি অভিব্যক্ত হইয়াছে।

সাহিত্য-কথা।

বিদ্যাসাগর-স্তোত্র।

[লেখক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।]

হে বিদ্যাসাগর! তোমার আজ তিরোধানের দিনে তোমার পুণ্যস্মৃতির পূজা উপলক্ষ্যে তোমার চরণ-উদ্দেশে শ্রদ্ধা-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। —গ্রহণ কর!

তুমি বাঙ্গালার গৌরব, বাঙ্গালীর গৌরব! প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে বাঙ্গালার মানস-সরোবরে যে কয়টী সরসীরুহ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার মধ্যে তোমার সৌরভ সকলের অপেক্ষা মনোরম,—তোমার শোভা সকলের অপেক্ষা মনোহর! অতএব হে বাঙ্গালীশ্রেষ্ঠ! তোমাকে আজ প্রণাম করিতেছি।

হে দয়ার সাগর! ভারতের আজি এই ঘোর দুর্দ্দিনে তোমার কথাই কেবল মনে জাগিতেছে। আর্ত্তের—বুভুক্ষিতের অশ্রুমোচন করিতেই তুমি ইহসংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তোমার দানের তুলনা হয় না। তুমি

অর্থোপার্জ্জন করিতে, কেবল দরিদ্রের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য। অতএব হে দানবীর বাঙ্গালার দাতাকর্ণ! তোমাকে প্রণাম করিতেছি।

হে পুরুষসিংহ! 'যে সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তুমি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলে, কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই মেরুদণ্ড নমিত করে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ—সমাজের ভ্রূকুটী-ভঙ্গী তোমার কর্ত্তব্য-বুদ্ধির স্রোতকে কখনও বিপরীত মুখে ফিরাইতে পারে নাই।' অতএব হে কর্ত্তব্যপরায়ণ মানব-দেবতা! তোমাকে প্রণাম করিতেছি।

'পাঠশালায় প্রবেশ-লাভের পর বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, বোধোদয়, সীতার বনবাস প্রভৃতি পুস্তক-পরম্পরার শুভ্র মলাটের উপর একই নাম অঙ্কিত দেখিয়া,হে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর! তোমাকেই আমাদের গুরু বলিয়া স্থির জানিয়াছি।—তুমিই আমাদের সাহিত্য-গুরু! তোমাকে প্রণাম করিতেছি।

হে মহাত্মন! 'ভারতবর্ষীয় মহাকবির তুলিকায় মনুষ্যত্বের যে চিত্র অঙ্কিত দেখিয়াছি, তোমার চরিত্র-চিত্র তাহারই অনুরূপ। তোমার হৃদয় বজ্রের ন্যায় কঠোর ও কুসুমের ন্যায় কোমল। তোমাকে আজ প্রণাম করিতেছি।

হে কর্ম্মযোগি! সভাস্থলকেই তোমার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র, এবং বাগ্মিতা ও আবেদন-কুশলতাকেই জীবনের মহাব্রত বলিয়া তুমি কখনও মনে কর নাই। তুমি মুখে যাহা বলিয়াছ, কাজে তাহাই করিয়াছ। ভাবের ঘরে লুকোচুরি খেলা করিতে তুমি জানিতে না। মুখর গর্ব্বিত বাঙ্গালীর তুমি মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ। তোমাকে প্রণাম করিতেছি।

হে মহাপুরুষ! 'বিপুল প্রাজ্ঞতার সহিত গভীর সহৃদয়তা, বিচিত্র কর্ম্ম-শীলতার সহিত অটল প্রশান্তি মিশ্রিত হইয়া তোমার সমস্ত জ্ঞান, চিন্তা ও চেষ্টার ঊর্দ্ধভাগে একটী নির্ম্মল মনুষ্যত্বের জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া যে একটী উন্নত উজ্জ্বল উদার আদর্শের সৃষ্টি হইয়াছে, মুখসর্ব্বস্ব বাঙ্গালীকে তাহার চরণ-প্রান্তে প্রণত হইতে আহ্বান করিতেছি। আমাদের তুমি আশীর্ব্বাদ কর।

সাহিত্যে আবর্জ্জনা।

'নারায়ণ' পত্রে 'কথানাট্য' যখন বাহির হইতে আরম্ভ হয়, তখন আমি 'নায়কে' উহার সর্ব্বপ্রথম নিন্দা করিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম যে, এই নীতি-

বিরুদ্ধ ও রুচি-বিগর্হিত রচনা 'নারায়ণে'র অঙ্গ কলুষিত করিতেছে। এখন দেখিতেছি, অনেকেই সে কথার প্রতিধ্বনি করিতেছেন।—অনেক কাগজেই উহার নিন্দাবাদ বাহির হইতেছে।

তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এ নিন্দায় 'নারায়ণে'র কোনই উপকার হয় নাই। এ কাগজের যিনি সম্পাদক, তিনি এই এত বড় একটা দোষকে মস্ত গুণ মনে করিয়া উহার মূলে বারিসেচন করিতেছেন। শ্রাবণ মাসের 'নারায়ণে'ও দেখিলাম, "হাসির দাম" নামে একটা অতি জঘন্য, অতি কুৎসিত রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। মা-বোন লইয়া যাহারা ঘর করে, তাহাদের ঘরে এ জিনিষ রাখা যায় না।

* *
*

চোখে আঙ্গুল দিয়া না দেখাইলে যাঁহারা দেখিতে পান না, তাঁহাদের জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক-আধটা নমুনা এখানে দিতেছি।—গল্পের এক স্থানে আছে, একটা লোক এক বেশ্যাকে বলিতেছে,—"খুব পারবে মাণিক মাইরি, কি ঠোঁট মাইরি, বুকের কাপড়টা একটু সরাও না, উঃ! মাইরি মাইরি।"—শুধু ইহাই নহে। লোকটা আবার "হাতের লাঠি দিয়া বেশ্যার বুকের কাপড় খোঁচা দিয়া সরাইয়া দিতেছে।"—শুনিতে পাই, ইহার মধ্যেও নাকি আর্ট আছে!—হইবেও বা! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মার পবিত্র মন্দিরে যদি আর্টের দোহাই দিয়া এমন পৈশাচিকী লালসার জীবন্ত রঙ্গভঙ্গময় চিত্র আমদানী করা যায়, তাহা হইলে বাজারে 'ফ্রেঞ্চ কার্ড' বিকাইতে দোষ কি? তা' ছাড়া, বাস্তবেওত এমন ঘটনা ঘটে বলিয়া মনে হয় না যে, একটা অপরিচিত লোক রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া লাঠির খোঁচা দিয়া বেশ্যার বুকের কাপড় সরাইয়া দিতেছে!

* *
*

একদল বাস্তববাদী আছেন, তাঁহারা এ সকল কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। উপেক্ষার ভরে গোঁফ ফুলাইয়া তাঁহারা বলেন যে, কাব্য কি তবে চাণক্য শ্লোক হইবে?—না, আমরাও তাহা বলি না! বাস্তববাদের (Realism এর) আমরা বিরোধী নহি। ইহার আবশ্যকতা বুঝি। ইহার মধ্যেও যে সৌন্দর্য্য আছে, তাহা জানি। কিন্তু তা' বলিয়া এমন কথা কখনও বলিব না যে, পুরীষেরও চিত্র

আঁকা উচিত। জীবনের সকল কথাই, কিছু সকলকে শুনান যায় না। যাঁহারা মানুষের গুণের অংশ চাপা দিয়া, স্ত্রী-পুরুষকে অতি কদর্য্য অবস্থায় স্থাপন করিয়া কেবল তাহারই ছবি আঁকেন, তাঁহারা বাস্তববাদের মর্ম্ম বুঝেন না।—তাঁহারা ঝুঁটা বাস্তববাদী। তাঁহারা Real ও অশ্লীল এ দুইটাকে এক করিয়া ফেলিতে চাহেন;—যেন Real হইলেই অশ্লীল। তাঁহারা 'nude' ও 'naked'এর পার্থক্য বুঝেন না;—natural ও undressedএর তফাৎ ধরিতে পারেন না! তাঁহাদিগকে artist (কলা-কৌশল-নিপুণ) বলিলে, art জিনিষটাকে অপমান করা হয়। বঙ্কিম যথার্থই বলিয়াছেন যে, "মনুষ্য-হৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তি যেমন কাব্যের সামগ্রী, নিকৃষ্ট বৃত্তিও তদ্রূপ। কিন্তু নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলের কোন্ ভাগ বর্জ্জনীয়, কোন্ ভাগ অবলম্বনীয়, তাহা যিনি বুঝিতে না পারেন, তাঁহার গ্রন্থ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।"

* * *

আদি রসই যে সকল রসের সেরা, একথা কে না জানে? বঙ্কিম বলিতেছেন,—"প্রকৃত আদিরস জগতের একটী দুর্ল্লভ পদার্থ। ইহা পবিত্র, বিশুদ্ধ, অমূল্য। সংস্কৃত নানা গ্রন্থে এই আদিরস চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ইংরাজিতে নানাস্থানে চমৎকার আদিরস পাওয়া যায়। অন্ধ কবি মিল্টন যখন ইদন উদ্যান মধ্যে প্রথম নর-দম্পতিকে স্বজন করিয়া, মনোহর গন্ধবাহী প্রভাতকালে তাহাদিগের দৃশ্য উন্মোচন করিয়াছেন, তখন তাহাতে কি অপূর্ব্ব আদিরস সঙ্ঘটিত হইয়াছে! সরলা নিষ্পাপা লোক-মাতা নিদ্রা যাইতেছেন, আদিপুরুষ প্রত্যেক লোমকূপে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, অলকাবলীর উপর প্রভাত-সমীরণ নৃত্য করিতেছে, নিমীলিত নয়নোপরি অলকাবলী ঝলমল করিতেছে, আদম যতনে তাহা সরাইয়া দিতেছেন; এই চিত্র সমধিক মনোহর, ইহা অতুল্য, অমূল্য। সেইজন্য আদিরসের প্রধানত্ব। কিন্তু এই অপূর্ব্ব রসের বিকৃতি আছে; পৈশাচিকী বিকৃতি আছে। একটা সামান্য কথায় বলে যে, মন্দ দ্রব্য কোনরূপে সেবন করা যায়, কিন্তু ভাল দ্রব্য মন্দ হইলে তাহা একেবারে অসহ্য হয়। ঘোল খাওয়া যায়, কিন্তু দুধ ছিঁড়িয়া গেলে, তাহা আর কাহার সাধ্য যে গলাধঃকরণ করে? আদিরস সম্বন্ধেও সেইরূপ।" তাই আমরা "হাসির দাম"কে ঘৃণা করি,—ইহার নিন্দা করি। ইহার ভিতরে আদিরসের যে কুৎসিত বিকৃতি আছে, তাহা অমার্জ্জনীয়।

এদেশের শুধু বঙ্কিম গিরিশ নহেন, বিদেশেরও বহু বড় বড় ভাবুক লেখক ইন্দ্রিয়পরতাকে সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। টলষ্টয় ও হার্ব্বাট স্পেন্সর প্রভৃতি মহারথীদিগের অভিমত এই যে, যে অশ্লীলতা লালসার পুষ্টিকর, সাহিত্যের পুণ্যক্ষেত্রে তাহার স্থান নাই। এমন কি, সমালোচক-শ্রেষ্ঠ জার্ভাইনাস্‌ও (Gervinus) সেক্সপীয়রের পরমভক্ত হইয়া "Venus and Adonis"এর রুচির নিন্দা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও 'কবি বলরাম দাস' সম্বন্ধে তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছেন,—"যে অশ্লীলতা লালসার পুষ্টিকর, বলরামে তাহা নাই। তথাপি যাহা আছে,তাহা বলরামের শিক্ষা ও সময় বিবেচনা করিয়া মার্জ্জনা. করিতে পারিলেও, তাঁহার কবিত্ব গৌরবানুরোধে মার্জ্জনা করিতে পারিলেও, আধুনিক কবির রচনায় তাহার মার্জ্জনা করিতে পারি না।"—কিন্তু মহাজনগণের এই সকল মহাবাক্যকে বাঙ্গালায় জনকয়েক লেখক ছুড়িয়া ফেলিতে চাহেন। ইঁহারা ভাবেন—টলষ্টয়-স্পেন্সার প্রভৃতির কথা মানিতে যাইব কেন?—আমাদের কি বিচার-শক্তি কম? কিন্তু এতগুলি মহাজনের বিচারের নিকট যিনি মস্তক অবনত না করেন, তিনি যত বড় লোকই হউন না কেন, তাঁহার ঔদ্ধত্য নিশ্চয়ই লজ্জার বিষয়!

* *
*

'প্রবাসী' বা 'সবুজপত্র' প্রভৃতি কাগজে এমন রচনা ছাপা হইলে, আমরা বিশেষ কিছু বলিতাম না। কিন্তু শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়, নানাগুণে আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।—তাঁহার কাগজে এ অন্যায় অনাচার সহ্য করিতে পারি না। তাঁহার দেখাদেখি পাছে অন্য সম্পাদকেরাও বাঙ্গালায় মাসিক-রাজ্যে এই বিষ ছড়াইতে আরম্ভ করেন, এই আশঙ্কায় এত কথা বলিলাম। আশা করি, এ কথাগুলি 'অরণ্যে রোদন' হইবে না! আমাদের উক্তিতে যদি কোনও ভুল আছে কেহ মনে করেন, তাহা হইলে তাহা দেখাইয়া দিলে পরম আনন্দিত হইব।—আমরা এ বিষয়ে তর্ক করিতে প্রস্তুত আছি।

সহযোগী সাহিত্য।

নানকের বাণী।

[লেখক—শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।]

দিল্লীর এক্সট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার শ্রীযুত খাজান সিং "History and philosophy of the Sikh religion" অর্থাৎ "শিখধর্ম্মের ইতিহাস ও শিখধর্ম্মতত্ত্ব" নামক একখানি ইংরেজী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পুস্তকখানি দুই খণ্ডে সমাপ্ত ; গত বর্ষের শেষাশেষি লাহোর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

পুস্তকখানিতে শিখধর্ম্মের ইতিহাস ও শিখধর্ম্মতত্ত্বের সুবিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। যাঁহারা শিখধর্ম্মের ইতিবৃত্ত ও উহার মূলতত্ত্ব জানিতে চান, উপরোক্ত গ্রন্থপাঠে তাঁহাদের সে উদ্দেশ্য সফল হইবে।

আমরা শিখধর্ম্মের আলোচনা করিতে আপাততঃ চাহি না ; তবে শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক গুরু নানকের কতিপয় উক্তি পাঠকগণের গোচর করিতে চাহি। ভারতবর্ষের অতি দুর্য্যোগের দিনে যিনি সম্প্রদায়-সংগঠন করিয়া উহাকে শৌর্য্য-বীর্য্য-পরাক্রমে এবং চারিত্র ও নৈতিকবলে জগতে অতুলনীয় করিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষের বাণী সকলেরই আলোচ্য।

সকল মানুষই ভাই-ভাই, সকল মানুষই সেই "একমেবাদ্বিতীয়ং" জগদীশ্বরের সন্তান,—ইহাই গুরু নানকের উপদেশের সার মর্ম্ম। এইজন্যই তিনি জাতিভেদ মানিতেন না, এবং সকল জাতিকেই একভাবে সম্বোধন করিতেন। হিন্দু হউক, মুসলমান হউক বা অন্য জাতিই হউক,—সকলকেই তিনি সমানভাবে আহ্বান করিতেন।

গুরু নানক একেশ্বরবাদী ছিলেন। তাঁহার ঈশ্বর এক ভিন্ন দুই নহে ; তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী। তিনি এই পৃথিবীর সর্ব্বময় কর্ত্তা ; পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটে, সকলই তাঁহার আদেশে। তাঁহার কখনও ভ্রম-প্রমাদ হয় না। এইটুকু বুঝিয়া ও বিশ্বাস করিয়া সকলেরই ঈশ্বরের হস্তে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা উচিত।

তিনি কর্ম্মফলে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার মতে যে যেমন কর্ম্ম করে, সে তেমনই ফল ভোগ করে। জন্মজন্মান্তরেও মানুষকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়।

অতি বাল্যকাল হইতেই নানক মুখে যাহা বলিতেন, কাজেও তাহাই করিতেন। তিনি অতি ধীর ও নম্রস্বভাব ছিলেন। তাঁহার ক্রোধ বা রুক্ষ 'মেজাজ' ছিল না। কেহ তাঁহার সহিত রূঢ় ব্যবহার করিলেও তিনি তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইতেন না।

তিনি সত্যপথের পথিক এবং ন্যায় ও সত্যের উপাসক ছিলেন। ভয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি দেশের সর্ব্বত্র সত্য প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার যুক্তি-তর্কের ধনিয়াদ এরূপ দৃঢ় ছিল যে, কেহ তাহা টলাইতে পারিত না।

গুরু নানক পরিব্রাজক ছিলেন। ভারতের বাহিরেও তিনি সত্য প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষেই তাঁহার প্রধান 'আখ্‌ড়া' ছিল। অতীত যুগে যে দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পরাবিদ্যা-আলোচনার শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল এবং যে দেশ পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্ম্মের জন্মস্থান,—সেই দেশকেই তিনি প্রধান কর্ম্মস্থল ক'রিয়া লইয়াছিলেন।

দারিদ্র্যের গর্ব্বে, নিঃস্বত্বের মহিমায় তিনি সর্ব্বদাই উন্নত-শির ছিলেন। সে শির ধনৈশ্বর্য্যের নিকটে কখনও নমিত হয় নাই। কত রাজা তাঁহাকে জায়গীর দিতে চাহিয়াছিলেন, নিষ্কর ভূমি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, বহু মুদ্রা দান করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন,—কিন্তু নানক সে সকলের প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

এমনাবাদে বাবর তাঁহাকে বহু ধন-রত্ন দান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সে সকল দ্রব্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। এই দান-প্রত্যাখ্যানের সময়ে গুরু নানক বাবর মীরকে (রাজা) সম্বোধন করিয়া বলেন :—

একমাত্র জগদীশ্বরই আমাদিগকে পর্য্যাপ্ত দান করিয়াছেন ;
সেই দানের উপরে নির্ভর করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি ;
কেবল ঈশ্বরই দাতা এবং সমগ্র জগৎ গ্রহীতা ;
এমন মহান্ দাতাকে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অপরের নিকট যাচ্ঞা করে, তাহার সমগ্র আত্ম-সম্মান ও মান-সম্ভ্রম বিনষ্ট হয় ;
সম্রাট্ এবং রাজগণ তাঁহারই সৃষ্টি ;
কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহে ;
যে ব্যক্তি মানুষের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করে, আত্মবিশ্বাস এবং জগতের বিশ্বাস দুই-ই তাহার নষ্ট হয়।

[নানক বলিতেছেন,—বাবর মীর তুমি শুন, যে ব্যক্তি তোমার নিকটে যাচ্ঞা করে,—সে অতি মূর্খ ভিক্ষুক।]

গুরু নানকের এই স্পষ্টবাদিতা মর্ত্ত্যে দুর্লভ। কাঞ্চন-কৌলীন্যের মাথায় তিনি যে ভাবে পদাঘাত করিয়াছেন, তাহা বস্তুতই তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভব।

তিনি প্রকৃত সাম্যবাদী এবং বৈষম্য ও ভেদনীতির চিরদিনই বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন,—গুরু ও শিষ্যগণের মধ্যে কোনও বৈষম্য থাকিবে না। আমার উত্তরাধিকারি-নির্ব্বাচনে গুণের বিচার অগ্রে হইবে ; জন্ম বা রক্তের সম্পর্কের কোনও অনুরোধ বা খাতির এ ব্যাপারে রক্ষিত হইবে না। এই জন্য তিনি আপন পুত্র ও আত্মীয়স্বজনকে নিজ গদীতে বসান নাই ; একজন বাহিরের লোককে এই পদ দিয়াছিলেন।

গুরু নানক লোকশিক্ষা-বিস্তারে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি গুরুমুখী ভাষার সৃষ্টি করেন।

তিনি হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন :—

যাঁহার মন হইতে সংশয় গিয়াছে, তাঁহার নিকটে হিন্দু মুসলমান—দুই-ই সমান।

এইবার আমরা গুরু নানকের অসংখ্য উক্তি হইতে কতিপয় মাত্র উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

১। ঈশ্বর এক ; তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্ত্তা। তিনি সত্য। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি সর্ব্বভূতে এবং সকল স্থানে বিদ্যমান। তিনি অজাতশত্রু, নির্ভীক এবং অমর। তিনি জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন হইতে মুক্ত। তিনি স্বয়ম্ভু ; অন্ধকার নাশক এবং দয়াময়।

২। যখন জগতে কোনও কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না, সেই সময়ে ঈশ্বরই একমাত্র সত্য ছিলেন ; সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনিই সত্যস্বরূপ বর্ত্তমান ছিলেন। হে নাশক! এখনও তিনি সত্য-রূপেই অবস্থান করিতেছেন এবং যখন সৃষ্টি লোপ পাইবে, তখনও তিনি সত্যরূপে বিদ্যমান থাকিবেন।

৩। নিমেষ ও মুহূর্ত্তে কালের বিভাগ হয়। ঘণ্টা, প্রহর সপ্তাহ, মাস এবং চন্দ্রের পরিবর্ত্তন হয়। ঋতুও অনেক। কিন্তু সূর্য্য এক। নানক বলিতেছেন,—সেইরূপ জগদীশ্বর এক ; কিন্তু তিনি বহুরূপে প্রকাশিত হন।

৪। জগদীশ্বরের দ্বারে এই কথাই লেখা আছে,—এক ব্যতীত দুই ঈশ্বর নাই।

[কিন্তু নানারূপে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ হয়। এ সম্বন্ধে নানকের উক্তি এই :—]

৫। তাঁহার (জগদীশ্বরের) দ্বারে লক্ষ লক্ষ মহম্মদ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ ও রামচন্দ্র লক্ষ লক্ষ প্রকার-পদ্ধতিতে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছে। লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মচারী, সত্যসন্ধ ও সন্ন্যাসী, লক্ষ লক্ষ গোরখ ও মোহান্ত ; কোটি কোটি দেব-দেবী ও দনু ; লক্ষ লক্ষ পীর, পয়গম্বর ও আউলিয়া ; এবং লক্ষ লক্ষ কাজি, মোল্লা ও সেখ বিদ্যমান আছেন। তাঁহাদের সকলেরই প্রভু—এক পরমেশ্বর ; তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা ; তাঁহার নামই সত্য।

৬। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তিনিই ইহার পর্য্যবেক্ষণ করেন। আর কাহারও সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। একমাত্র তিনিই ইহার শাসনকর্ত্তা।

৭। ভক্ত ও ফকীরেরা জগদীশ্বরের এই সৃষ্ট-রাজ্যের দেওয়ান ; পীর ও সাধু ব্যক্তিরা ইহার সীকদার ; ভগবানের অনুচরগণ ইহার ফিরেস্তাকার এবং তাঁহার প্রিয়পাত্রগণ লোকের সু ও কু-কর্ম্মের বিচার করেন। পাপীদিগকে যিনি শৃঙ্খলে বাঁধিয়া আনেন,—তাঁহার নাম আজরাইল। তিনি নির্ম্মম ও দুষ্টদিগকে কঠোর শাসন করেন।

৮। সকলেরই ভ্রম হয় ; কেবল পরমেশ্বর সকল ভ্রমের অতীত।

৯। যদি [ভব-] নদী পার হইতে হয়, তবে যাঁহারা পার হইতে জানেন, তাঁহাদের নিকট উপদেশ লইবে। তাঁহারা পরম জ্ঞানী ; তোমাকে পারে লইয়া যাইবেন। নদীতে চোরা পাহাড় আছে, চড়া আছে, ঘূর্ণাবর্ত্ত আছে। প্রকৃত গুরুর সাহায্য গ্রহণ কর ; তাহা হইলে নৌকার চড়ায় ঠেকিবার ভয় থাকিবে না।

১০। যদি হাতে, পায়ে বা গায়ে ধূলা লাগে, তাহা হইলে জল দিয়া ধুইলে তাহা যায়। যদি মলমূত্রের দ্বারা কাপড় নষ্ট হয়, তাহা হইলে সাবান দিয়া ধুইলে পরিষ্কার হয়। যদি পাপ কার্য্য দ্বারা মনে ময়লা পড়ে, তাহা হইলে ভগবানের নামে সে ময়লা দূরীভূত হয়।

১১। একটী মাত্র সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন সমগ্র বন দগ্ধ করে, তেমনই একবার মাত্র ভগবানকে স্মরণ করিলে কোটি কোটি পাপ দগ্ধ হয়।

১২। কেবল আত্ম-বিশ্বাসেই ভগবানকে পাওয়া যায় ; জ্ঞান বা অভিজ্ঞতায় কোনও ফল হয় না।

১৩। তুমি (আত্মা) নিরাকার, নির্লিপ্ত ; দেহেরই কেবল আকার আছে। এই দেহ কিছুই নহে, ইহা তোমার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারে না—ইহা সার তত্ত্বজ্ঞান। তোমাকে (আত্মাকে) অস্ত্রে ছেদন করিতে পারে না, পাবকে পুড়াইতে পারে না। তোমার (আত্মার) মৃত্যু নাই, ধ্বংস নাই। গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই রহস্য ভেদ করিয়া লও। দেহকেই কেবল আগুনে দগ্ধ করা যায়, কর্ত্তিত করা যায়। ইহা তৈয়ারী হয়, ধ্বংস হয় এবং আবার তৈয়ারী হয়। আত্মা অবিনশ্বর। অতি অল্প লোকেই একথা জানে।

গুরু নানকের অন্যান্য বাণীর আলোচনা পরে করিব।

শিশুপালন।

[লেখিকা—শ্রীমতী নলিনী ব্রেন্নার এল, এস্, এ, (ইংলণ্ড)
ও শ্রীমতী জানকী মজুমদার বি, এ।]

আমাদের দেশে শিশুর মৃত্যু-সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। প্রতি বৎসরেই শত শত শিশু কালের কবলে পতিত হয়। দেখা যায়, অধিকাংশ শিশুই ভূমিষ্ঠ হইবার পর তিন মাস কাল মধ্যেই জীবলীলা শেষ করে। কিন্তু সামান্য চেষ্টা করিলেই যে এই অকাল-মৃত্যুর হাত হইতে শিশুদের রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না।

দেখা গিয়াছে, যে ছেলেগুলি হৃষ্টপুষ্ট হইয়া জন্মায়, তাহাদেরই অকাল মৃত্যুর সংখ্যা অধিক। এ অকাল-মৃত্যুর কারণ এই যে, সন্তানের জীবন-মৃত্যুর জন্য যাহারা দায়ী, সেই জননীর দল আপন সন্তানের প্রতি উপযুক্ত যত্ন লইতে জানেন না, এবং জীবনধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু হইতেও তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখেন।

প্রাচীন এক বিলাতী গল্পে আছে, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে, মনুষ্যের আহ্বানে পরীগণ স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও সাফল্যের ডালি লইয়া উপস্থিত হইত। আমাদের অদ্যাপি যদি ইহা দেখিতে বাসনা থাকে তাহা হইলে কি প্রকার পরীর আমরা অন্বেষণ করিব? (১) বিশুদ্ধ বাতাস (fresh air) (২) উত্তাপ (৩) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ; এই তিনটী জিনিষকে পরী বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

১। বিশুদ্ধ ও মুক্ত বাতাস—শিশুদিগের জীবনধারণের নিমিত্ত ইহা একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু। পরিণত-বয়স্ক লোকের অনুরূপ বাতাস

পাওয়া শিশুগণেরও দরকার। যদিও ইহারা পরিণত-বয়স্ক ব্যক্তির অপেক্ষা অতি অল্প পরিমাণে বাতাস শ্বাসরূপে গ্রহণ করে; কিন্তু ইহারা খুব দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া করিয়া থাকে। তোমার শিশুটির প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই সহজে বুঝিবে যে, তাহারা কিরূপ দ্রুতগতিতে এই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে; এবং কেনই বা শিশু জন্মগ্রহণ মাত্র ক্রন্দন করিয়া উঠে। তাহাদের নবজাত ফুসফুস্ যন্ত্রের বিকাশের জন্য বেশী পরিমাণে বাতাস আবশ্যক। সুতরাং সাধারণ ভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস শিশুটির পক্ষে যথেষ্ট নয় বলিয়াই শিশুটি কাঁদিয়া উঠিতে বাধ্য হয়। অতএব প্রথম নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু নির্ম্মল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু প্রায়ই সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ গৃহাভ্যন্তরে বহুলোক-সমাকীর্ণ দূষিত বায়ুপূর্ণ কক্ষে শিশু-সাধারণকে ভূমিষ্ঠ হইতে দেখা যায়। উপযুক্ত পরিমাণে বায়ুর অভাব না ঘটে, এজন্য শিশুর বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত এবং এইজন্য একটী স্বতন্ত্র বিছানা নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। শিশু যদি তাহার মাতার সহিত এক বিছানায় থাকে, তাহা হইলে মাতার পরিত্যক্ত নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। অন্ততঃ এক সপ্তাহ পরে শিশুকে ঘরের বাহিরে যাইতে দেওয়া উচিত। একমাস পরে শিশুকে যথেচ্ছা লইয়া যাইতে পারা যায়।

২। উত্তাপ—শিশু জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে মাতৃজঠরে অত্যন্ত "গরম ভাবে" রক্ষিত হয়। অতএব তাপ-পরিমাণকারী যন্ত্র (গাত্রচর্ম্ম) জন্মের পর এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঠিক কর্ম্মপটু হয় না। সুতরাং এই সময়ে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবনা। অতএব শিশুটীর আচ্ছাদন বেশ গরম অবস্থায় রাখা দরকার এবং পদতল ঠাণ্ডা হইতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ শীতল পদতল হইতে ঠাণ্ডা রক্ত প্রবাহিত হইয়া কোমল ও সূক্ষ্ম দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আরামের ব্যাঘাত উৎপাদন পূর্ব্বক নানারকম ব্যাধির সৃষ্টি করে। শরীরের অনুপাতে শিশুর গাত্রাবরণ অধিক। সুতরাং শিশুর বহির্ভাগস্থ গাত্রচর্ম্মকে নিয়মিত ভাবে উত্তপ্ত রাখিবার জন্য বেশী উত্তাপের প্রয়োজন।

৩। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা—গাত্রচর্ম্ম যদি সর্ব্বদা পরিষ্কৃত না হয় তাহা হইলে লোমকূপগুলি একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া যায়। পরিত্যক্ত বস্তুর নির্গমের সহায়তা করাই আমাদের গাত্রচর্ম্মের প্রধান কার্য্য। অতএব ছিদ্রগুলি অবরুদ্ধ হইয়া যাইলে এবং পরিত্যক্ত বস্তু দেহাভ্যন্তরে আবদ্ধ হইলে রোগের কারণ হওয়া অসম্ভব নয়। গাত্রচর্ম্মের দ্বিতীয় প্রয়োজন এই যে, ইহা

দেহের উত্তাপ নিয়মিত করিবার একটী যন্ত্রবিশেষ। গ্রীষ্মের দারুণ উত্তাপে অতিরিক্ত পরিমাণে এবং শীতের সময় খুব অল্প পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত হয়। এই কারণেও আমাদের গাত্রচর্ম্মকে খুব পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন।

শিশুকে স্নান করাইবার জন্য (soft water) লঘুভার জল অর্থাৎ যাহাতে সাবান শীঘ্র গলে, তাহাই ব্যবহার করা উচিত। গুরুভার জল অর্থাৎ যাহাতে সাবান শীঘ্র গলে না (hard water) তাহাকে লঘুভার করিবার নিয়ম এই যে, একটী ভূষি-পূর্ণ পুঁটুলি জলের উপর কিছুক্ষণের নিমিত্ত রাখিবে এবং পরে ঐ জলকে ঈষৎ উষ্ণ করিয়া তোমার কনুইএর দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। কারণ, হস্ততল অপেক্ষা কনুই অধিক পরিমাণে উষ্ণতা উপলব্ধি করিতে পারে।

সাবান খানি খুব ভাল হওয়া দরকার। ইহা যেন অল্প দামের রং কিম্বা সোডামিশ্রিত না হয়। গামছাখানি বেশ বড় হইবে। একখানি বড় গামছা কতকগুলি ছোট গামছা হইতে অনেক বেশী কাজে লাগে। তোমার শিশুকে স্নান করাইবার পূর্ব্বে সমুদায় স্নানের উপকরণ প্রস্তুত কি না দেখিয়া লওয়া দরকার।

কোনও বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে পাউডার অনাবশ্যক। Talc Powder, Starch (শ্বেতসার), Boric acid এবং Zinc oxideএর সংমিশ্রণ যে উৎকৃষ্ট এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সরিষার তৈল কিম্বা কোনও পরিষ্কার তৈল নিতম্বে মর্দ্দনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

চক্ষু। চক্ষুর জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। অন্ততঃ এক-টুকরা ছোট ন্যাকড়া একটীর পর আর একটী চক্ষু পরিষ্কার করিবার জন্য প্রয়োজন। যদি চক্ষুতে কোনও রূপ ঠাণ্ডা লাগিবার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে চিকিৎসক দেখানই যুক্তিযুক্ত।

কর্ণ। সমস্ত কর্ণ অবয়বটী সম্পূর্ণ শুষ্ক রাখিবে। যদি কর্ণাভ্যন্তরে জল জমে, তাহা হইলে শিশু শ্রবণ-শক্তিহীন হইতে পারে। কর্ণাভ্যন্তর বেশ ভাল করিয়া এক টুকরা ন্যাকড়া দিয়া পরিষ্কার করিবে।

মুখ। প্রত্যেক দিন দুইবার এক টুকরা ন্যাকড়া দ্বারা অঙ্গুলিগুলিকে আবৃত রাখিয়া ও ন্যাকড়াটুকু গরম জলে ভিজাইয়া শিশুর জিহ্বা, দন্তমূল এবং মুখাভ্যন্তর পরিষ্কার করিবে।

নিতম্ব। প্রত্যেকবার মলত্যাগের পর শিশুর পশ্চাৎ ভাগ ধৌত করা দরকার।

প্রত্যেকবার স্নানের সময় এবং নিদ্রার পর শিশুকে মলমূত্র ত্যাগ করিতে শিক্ষা দিয়া, তাহাদিগকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভ্যাস করাইবে। তাহা হইলে ক্রমে তাহারা শৈশব হইতেই আত্মসম্মান এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা করিবে।

রসো বৈ স

[লেখক—শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

১

"রসো বৈ সঃ"—সেই পরমব্রহ্মই রসস্বরূপ। শাস্ত্রকারগণ রসের স্বরূপ বুঝাইতে পারেন নাই; আলঙ্কারিক-সম্প্রদায় কত চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সেই সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্য চিত্ত-চমৎকারক রসের লক্ষণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কেহ বা আনন্দবিশেষকে, কেহ বা আনন্দের জনক জ্ঞানাদিকে রস বলিয়াছেন। কেহ বা বলিয়াছেন, ভগ্নাবরণা চিৎই রস। যে রসের ছায়াপাত হইলে হৃদয় বিহ্বল হইয়া উঠে, যে রস হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হইলে অন্য কোনও বস্তুর জ্ঞান আর হৃদয় অধিকারের সামর্থ্য লাভ করিতে পারে না, যে রসের প্রাথমিক স্পর্শে বিশ্ববাসী আত্মহারা হইয়া কি-যেন-কি-এক অজানা পথে ধাবমান হয়, কই, শাস্ত্র পড়িয়া—লক্ষণ মিলাইয়া সেই রসের অনুভব ত করিতে পারি না!

বেদ সেই পরমব্রহ্মের নিরূপণ করিতে পারেন নাই, পুরাণ সংহিতায় তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, দার্শনিকগণ ব্রহ্মের কথা বলিতে গিয়া নানা ভঙ্গীর—নানা জটিল বিচারের অবতারণা পূর্ব্বক জিজ্ঞাসুর অন্তঃকরণকে আরও মোহাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন। যাঁহার জন্ম জন্মান্তরের শুভাদৃষ্ট সঞ্চিত আছে, তিনিই অকস্মাৎ সেই ব্রহ্মবস্তুর আস্বাদ পাইয়া পাগল হইয়া উঠেন—বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। এই রসও তেমনই বিদ্যুদ্-বিকাশের ন্যায় যাঁহার অন্তস্তল স্পর্শ করিতে পারে, তিনিই কি-এক অনির্ব্বচনীয় ভাববিশেষের উন্মাদনায় বিভোর হইয়া উঠেন। সেই জন্যই "রসো বৈ সঃ"। ব্রহ্মই রস স্বরূপ। যদি হৃদয়ে বাস্তবিক রসসঞ্চারের সৌভাগ্য লাভ করিতে পার, তবে সেই পরম ব্রহ্মকেও পাইতে পারিবে। যদি প্রকৃতই রস-সমুদ্রে ডুবিতে পার, তবে এক দিন না এক দিন সেই রসস্বরূপ ভগবান্‌কে লাভ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইবে।

এই রস নয় প্রকার,—শৃঙ্গার, করুণ, শান্ত, রৌদ্র, বীর, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস।

"শৃঙ্গারঃ করুণঃ শান্তো রৌদ্রো বীরোঽদ্ভুতস্তথা।
হাস্যো ভয়ানকশ্চৈব বীভৎসশ্চেতি তে নব ॥"—(রসগঙ্গাধর)

কেহ কেহ বলেন যে, নটাদিতে শান্তরসের স্থায়ী ভাব বৈরাগ্যের উদয় সম্ভবপর নহে, সুতারং রস অষ্টবিধ। শান্তরূপ নবম রসবাদিগণ ইহার উত্তরে বলিয়া থাকেন যে, নটে বৈরাগ্যের উদয় হয় না বলিয়া শান্ত যে রসের অন্তর্গত নহে, এরূপ নির্দ্দেশ যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, রসাভিব্যক্তি নটে স্বীকৃত হয় না; করুণাদি রসের অভিনয়-দর্শনে শোকাদির আবির্ভাবের ন্যায় শান্ত-রসের অভিনয়-কালেও সামাজিকদিগের হৃদয়ে বিবেক উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং শান্তকে রস বলিব না কেন? নটের শমগুণ নাই বলিয়া সে শান্ত রসের অভিনয় কিরূপে করিবে—এ কথা বলিতে পার না। তাহা হইলে নটের ক্রোধাদির অসদ্ভাব নিবন্ধন তৎকর্ত্তৃক রৌদ্রাদি রসের অভিনয়-প্রকাশও অসঙ্গত হইয়া উঠে। নটের প্রকৃত ক্রোধাদি না থাকিলেও সে যখন অভ্যাস এবং শিক্ষার বশে কৃত্রিম বধবন্ধনাদি কার্য্য করিয়া থাকে, তখন অবিবেকী নট কর্ত্তৃক শান্তরসের অভিনয় করাও অসম্ভব নহে। বারাঙ্গনা নটী সীতা সাজিয়া অভিনয় করিলে যেমন শোকাদির উদ্রেক করিতে পারে, মদ্যপায়ী লম্পট নট বুদ্ধদেবের বা গৌরাঙ্গের অভিনয় করিলেও হৃদয়ে সেইরূপ নির্ব্বেদের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই জন্যই "সঙ্গীত-রত্নাকরে"র অন্তিম অধ্যায়ে শান্তরসের অস্বীকার-পক্ষ খণ্ডিত হইয়াছে;—

"অষ্টাবেব রসা নাট্যেষ্বিতি কেচিদচূচুদন্।
তদচারু যতঃ কঞ্চিন্ন রসং স্বদতে নটঃ।"

"কাব্যপ্রকাশ"-কার মম্মট ভট্টও লিখিয়াছেন,—

"নির্ব্বেদস্থায়িভাবোঽস্তি শান্তোঽপি নবমো রসঃ। (৪র্থ উল্লাস, ৩৫ শ্লোক)

এই সকল কারণেই সাহিত্য-রসিকগণ শান্তরস-প্রধান "প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ে"র নাটকত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

এই নববিধ রসের নয়টী স্থায়ী ভাব;—

"রতিঃ শোকশ্চ নির্ব্বেদক্রোধোৎসাহাশ্চ বিস্ময়ঃ।
হাসো ভয়ং জুগুপ্সা চ স্থায়িভাবাঃ ক্রমাদমী ॥"—(রসগঙ্গাধর)

শৃঙ্গার রসের প্রেম, করুণ রসের শোক, শান্তরসের বৈরাগ্য, রৌদ্ররসের ক্রোধ, বীর রসের উৎসাহ, অদ্ভুত রসের বিস্ময়, হাস্য-রসের হাসি, ভয়ানক

রসের ভয় এবং বীভৎস রসের জুগুপ্সা স্থায়ী ভাব। প্রেম, শোক প্রভৃতি চিত্তবৃত্তিবিশেষ, সুতরাং ইহাদের পারমার্থিক স্থিরতা সম্ভবপর না হইলেও রত্যাদির মুহুর্মুহুঃ অভিব্যক্তির নামই স্থায়িত্ব।

শৃঙ্গার দ্বিবিধ,—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। প্রেমভরা হৃদয় লইয়া যুবক-যুবতি যখন পরস্পরের দর্শন-স্পর্শনে বিভোর হইয়া থাকে, তখন তাহাকে 'সম্ভোগ' শৃঙ্গার বলা হয়। যথা,—

"শূন্যং বাসগৃহং বিলোক্য শয়নাদুত্থায় কিঞ্চিচ্ছনৈ
নির্দ্রাব্যাজমুপাগতস্য সুচিরং নির্ব্বর্ণ্য পত্যুর্ম্মুখম্।
বিস্রব্ধং পরিচুম্ব্য জাতপুলকামালোক্য গণ্ডস্থলীং
লজ্জানম্রমুখী প্রিয়েন হসতা বালা চিরং চুম্বিতা॥"—(কাব্যপ্রকাশ)

"শয্যা হ'তে তুলিল ধীরে শির
নেহারি' কেহ নাহি ক গৃহে আর,
চাহিয়া র'ল মুখের পানে বালা
কপট ঘুমে বিভোর বঁধুয়ার।
আবেগ-ভরে যেমতি চুম্বিল
কপোলে দেখে ফুটিল শিহরণ,
সরমে তা'র আনত মুখখানি
হাসিয়া বঁধু করিল চুম্বন।"

যেখানে হৃদয়ভরা প্রেম, কিন্তু তাহা পরিপূর্ণ করিবার উপায় নাই, তখন উহাকে 'বিপ্রলম্ভ' শৃঙ্গার নামে অভিহিত করা হয়। যথা,—

"বাচো মাঙ্গলিকীঃ প্রয়াণসময়ে জল্পত্যনল্পং জনে
কেলীমন্দিরমারুতায়নমুখে বিন্যস্তবক্ত্রাম্বুজা।
নিশ্বাসগ্লপিতাধরোপরিপতদ্বাষ্পার্দ্রবক্ষোরুহা
বালালোলবিলোচনা শিব শিব প্রাণেশমালোকতে॥"—(রসগঙ্গাধর)

"প্রবাসে যাইবে পতি, পুরাঙ্গনাগণ
আরম্ভিল নানাবিধ মঙ্গলাচরণ।
এ হেন সময়ে বালা হৃদয়ের দুখে,
গেল কেলি-মন্দিরের বাতায়ন-মুখে;
ঘন শ্বাসে পরিম্লান অধর বহিয়া
অজস্র অশ্রুর রাশি ভাসাইছে হিয়া,
যতক্ষণ যায় দেখা—আকুল পরাণে
চেয়ে র'ল একদৃষ্টে প্রাণেশের পানে!"

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থ-সমালোচনা।

চন্দ্রহাস-বিষয়া।—শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায় প্রণীত। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র। পুস্তকখানিকে সাধারণের পসন্দমত করিবার জন্য নগেন্দ্রবাবু যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। এ পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন, বাঁধাই, কাগজ ও চিত্রগুলি অতি মনোরম, উপহার দিবার উপযোগী। আখ্যানবস্তুর তো কথাই নাই

'চন্দ্রহাস' হরিভক্ত সাধু মহাজন
'বিষয়া' আদর্শ সতী রমণী রতন—

ইহাঁদের পৌরাণিক কাহিনী হিন্দু পাঠক-পাঠিকার নিকট উপাদেয় হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আজকাল তরুণ বয়স্ক বালক বালিকাদিগের চিত্তবিনোদনের জন্য যাঁহারা উৎকৃষ্ট কাগজে চটকদার মলাটে বাঁধাইয়া কল্পিত, সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর, ছুঁচো, রাক্ষস, খোক্কসের গল্প লিখেন তাঁহারা নিজেদের দগ্ধ উদরের জন্য দেশের অনেকের ঘর পুড়াইবার ব্যবস্থা করেন। চন্দ্রহাস বিষয়ার মত শিক্ষাপ্রদ পৌরাণিক কাহিনীর যত প্রচার হয় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। নগেন্দ্রবাবুর গল্প বলিবার ভঙ্গিমাটুকুও বেশ। তবে তাঁহার ভাষা মোটে প্রাঞ্জল হয় নাই। পুস্তকের ভাষা অত গম্ভীর না করিয়া খুব প্রাঞ্জল করিলে নগেন্দ্রবাবুর পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত।

তর্পণ।—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি-এ প্রণীত মূল্য ৸৹। ইহাতে শতাধিক 'সনেট' সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেক সনেটটি বাঙ্গালা দেশের এক একটি পরলোকগত মহাজনের গুণ বর্ণনা। প্রথমে কবি বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব, রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষিদিগের তর্পণ করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ লাইনে ইঁহাদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট গুণের পরিচয়। 'তর্পণ' নেহাত তিল তর্পণ নহে—সনেট গুলিতে ইঁহাদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথা অনেক আছে। তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে কবি তুচ্ছ সাম্প্রদায়িক গণ্ডী কাটাইয়া মনীষা মাত্রেরই পূজা করিয়াছেন। তাহার পর প্রাচীন কবিদিগের তর্পণে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি দুই একজন মহাকবি ব্যতীত প্রায় সকলের সম্বন্ধে সনেট লিখিত হইয়াছে। গদ্য সাহিত্যরথী, কবি ও নাট্যকার, সমাজহিতৈষী শাস্ত্রপ্রকাশ হিতৈষীদিগের উদ্দেশে সনেট রচিত হইয়াছে। প্রায় সকলেরই কথা গ্রন্থে আছে তবে কবিদিগের মধ্যে রঙ্গলালের নামোল্লেখ না করিয়া কবি অন্যায় করিয়াছেন। শিক্ষা-প্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে ৺গৌরমোহন আঢ্যের নাম নাই। দেশসেবক ও প্রতিভাবান মনীষিদিগের তালিকাও যথাসম্ভব সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এ গ্রন্থে প্রায় তর্পিত সকল ব্যক্তির চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে।

যে গ্রন্থ খুলিলে এক সঙ্গে এতগুলি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির নাম ও চিত্র পাওয়া যায় সে পুস্তক বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করুক ইহাই আমাদের বাসনা। ব্যক্তি বিশেষের গুণ সমন্বিত সংক্ষিপ্ত কবিতা, কাব্য-হিসাবে প্রত্যেকটির উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে বোধ হয় কোনও কবি পারেন না। কবি নবকৃষ্ণ আপনার গ্রন্থখানিকে যথাসম্ভব মনোরম করিয়াছেন এবং অতিশয় কৃতিত্বের সহিত প্রত্যেকের গুণবর্ণনা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পুস্তকখানি অতি যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং পাঠে পরিতোষ লাভ করিয়াছি।

কপিলের তেজ।—এই পৌরাণিক নাটকখানি অষ্টাদশ বর্ষীয় কবি শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের প্রথম উদ্যম। প্রথম উদ্যমে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গ্রন্থ—বিশেষ নাটক—রচনা করা অসামান্য প্রতিভা ব্যতিরেকে অসম্ভব। শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথের নাটকে অনেক দোষ আছে। কিন্তু ইহাতে শক্তিরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। যত্ন ও অধ্যবসায় থাকিলে ভবিষ্যতে শ্রীমান্ সাহিত্য-জগতে নাম কিনিবেন এরূপ আশা আমাদের যথেষ্ট আছে।

নারায়ণ।

[লেখক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার, বি-এ।]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

দক্ষদুহিতা মূর্ত্তির গর্ভে ধর্ম্মের নর ও নারায়ণ নামে ভগবান্ বিষ্ণুর অংশে ঋষিশ্রেষ্ঠ প্রশান্ত দুই পুত্র জন্মে। পবিত্র সাধুসেবিত বৃক্ষলতাদিসমাকীর্ণ কুসুমরাজিসুশোভিত বিহঙ্গমকূজিত হিমালয়পৃষ্ঠস্থ বদরিকাশ্রমে তাঁহারা উভয়ে উগ্র তপস্যা করেন। নারায়ণের উৎকট তপশ্চরণে শঙ্কিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র ভাবিলেন, ইনি তপস্যা দ্বারা আমার ধাম গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব তিনি তাঁহার তপোভঙ্গের নিমিত্ত কামদেবকে সপরিবারে বদরিকাশ্রমে যাইতে আদেশ করিলেন। দেবরাজের আদেশে অনঙ্গদেব অপ্সরোগণ ও মৃদু মধুর বসন্তবায়ুকে সঙ্গে লইয়া নারায়ণের সমীপে উপনীত হইলেন। অনন্তর রম্ভোরু দিব্যসৌন্দর্য্যশালিনী অপ্সরোগণ বিবিধ হাবভাব ও কটাক্ষবাণ দ্বারা ঋষিকে ব্যথিত করিতে চেষ্টা পাইল। মৃদু বসন্তসমীরণ কোমলস্পর্শে তাঁহার ইন্দ্রিয়সকলকে উত্তেজিত করিতে প্রয়াস পাইল। কিন্তু জিতেন্দ্রিয় পরমার্থদর্শী ঋষি তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। ইহা দেখিয়া কামদেব ও তাঁহার অনুচরবর্গ ঋষির তপঃপ্রভাব বুঝিতে পারিয়া শাপভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন। তখন সৌম্যমূর্ত্তি তত্ত্বজ্ঞ ঋষি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মদন! হে সমীরণ! হে দেববধূগণ! তোমরা ভীত হইও না, আমার আতিথ্য গ্রহণ কর। তাঁহার মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবতারা লজ্জাভরে অবনতশির হইয়া সেই পরম কারুণিককে বলিলেন, "বিভো! আপনি মায়ার অতীত, সুতরাং অবিকৃত। আত্মারাম ধীর সুধীগণ সর্ব্বদা আপনার পাদপদ্মে প্রণত থাকেন। অতএব আপনাতে এরূপ করুণা ও ক্ষমাগুণ বিচিত্র নহে। যাহারা আপনাকে সেবা করে ও সুরলোক অতিক্রম করিয়া আপনার পরমপদে বিচরণ করে, সুরগণ বলিলোপভয়হেতু তাহাদের বহু বিঘ্ন উৎপাদন করেন। আর যাহারা সুরগণকে নিজ নিজ বলি ভাগ প্রদান করে, তাহারা তাঁহাদিগের

নিকট হইতে কোনও রূপ বিঘ্ন প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু আপনি যাহার রক্ষাকর্ত্তা, সে বিঘ্নের মস্তকে পদাঘাত করে। কেহ কেহ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব, লোভ, কামভোগ ত্যাগ করিয়াও আপনাকে আশ্রয় করে না বলিয়া ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া গোষ্পদে নিমজ্জিত হয় এবং বৃথা সুদারুণ তপস্যা নষ্ট করে।” দেবতারা এইরূপে স্তুতি করিলে বিভু নারায়ণ তাঁহাদের দর্পনাশের নিমিত্ত যোগদ্বারা অদ্ভুতদর্শনা শুশ্রূষাকারিণী অলঙ্কারভূষিতা রমণীসকল সৃজন করিলেন। সেই সকল রমণী মূর্ত্তিমতী শ্রীসদৃশা। চন্দ্রোদয়ে নক্ষত্রগণ যেরূপ নিষ্প্রভ হয়, সেইরূপ ইহাদের আবির্ভাবে কন্দর্পাদি দেবতারা শ্রীহীন হইলেন। তখন দেবদেবেশ নারায়ণ হাসিয়া দেবতাগণকে বলিলেন, তোমরা এই সকল বরস্ত্রীর মধ্য হইতে একজনকে স্বর্গের অলঙ্কারস্বরূপ লইয়া যাও। এই অনুজ্ঞা পাইয়া দেবতারা উর্ব্বশীকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া সুরপুরে গমন করিলেন এবং তথায় দেবরাজ ইন্দ্রের সমীপে যথাযথ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। নারায়ণের যোগবলের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শক্রের অন্তঃকরণ যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইল। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৪)

অনন্তর সহস্রলোচন, নারায়ণের যোগবিভূতি দেখিবার জন্য, স্বয়ং বদরিকাশ্রমের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আশ্রম নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি দূর হইতে দেখিতে পাইলেন ঋষি ধ্যানে নিমগ্ন। তাঁহার দিব্য বপু হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া আছে। এই জ্যোতিরালোকে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, পাতাল সমস্ত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দেবরাজ আরও কিছু অগ্রসর হইয়া ঋষির সমীপবর্ত্তী হইলেন। তখন শুনিলেন, ঋষির মুখ হইতে অপূর্ব্ব স্তোত্র নির্গত হইতেছে। ঋষি বলিতেছেন, “সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ পুরুষ, তিনি ভূমিকে বিশ্বতঃ আবৃত করিয়া দশাঙ্গুল অতিক্রম করিয়া অবস্থিত আছেন।

পুরুষই এই সমস্ত, যাহা ভূত এবং যাহা ভব্য, এবং অমৃতত্বের ঈশান; কারণ তিনি জীবের কর্ম্মফলভোগ-সম্পাদনের নিমিত্ত স্বকীয় কারণাবস্থাকে অতিক্রম করিয়া পরিদৃশ্যমানা জগদবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অতীতানাগত বর্ত্তমান জগৎ পুরুষের মহিমা, তিনি ইহা অপেক্ষা অনেক মহীয়ান্। বিশ্বভূত সকল তাহার এক পাদ। তাঁহার অমৃতস্বরূপ ত্রিপাদ দ্যোতনাত্মক স্বপ্রকাশস্বরূপে অবস্থিত।

ত্রিপাদ পুরুষ ঊর্দ্ধে সংসারের বহির্ভাগে অবস্থিতি করেন। তাঁহার আর

এক পাদ মায়াতে পুনঃ পুনঃ অধিষ্ঠান করে এবং চেতন ও অচেতনরূপে বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়।

তাঁহা হইতে বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডদেহ উৎপন্ন হয়। বিরাট্কে অধিকরণ করিয়া তদ্দেহাভিমানী পুরুষ উৎপন্ন হন। তিনি জাত হইয়া দেবতির্য্যক্ মনুষ্যাদি জীবরূপে বর্দ্ধিত হন এবং পশ্চাৎ ভূমি ও তৎপরে শরীর সৃষ্টি করেন।

দেবগণ যখন পুরুষরূপ হবি দ্বারা মানস যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন, তখন বসন্ত সেই যজ্ঞের আজ্য হইল, গ্রীষ্ম ইধ্ম হইল ও শরৎ হবি হইল।

সর্ব্বাগ্রে জাত, যজ্ঞসাধনভূত সেই পুরুষকে দেবগণ মানসযজ্ঞে প্রোক্ষিত করিলেন। সৃষ্টিসাধনযোগ্য দেবগণ এবং যাঁহারা ঋষি তাঁহারা সেই পুরুষ দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন।

সেই সর্ব্বহুৎ যজ্ঞ হইতে পৃষদাজ্য সম্পাদিত হইল, এবং বায়ুদৈবত আরণ্য ও গ্রাম্য পশু সকল উৎপাদিত হইল।

সেই সর্ব্বহুৎ যজ্ঞ হইতে ঋক্ সকল ও সাম সকল উৎপন্ন হইল, তাহা হইতে ছন্দসকল উৎপন্ন হইল এবং তাহা হইতে যজুঃ উৎপন্ন হইল।

তাহা হইতে অশ্বগণ ও অন্য যে সকল পশু দুই পংক্তি দন্তবিশিষ্ট তাহারা জন্মিল। তাহা হইতে গো সকল জন্মিল ও তাহা হইতে অজাবি সকল জন্মিল।

দেবগণ যখন পুরুষকে বিধান করিলেন তখন তাঁহাকে কি কি রূপে কল্পিত করিলেন? তাঁহার মুখ কি? বাহুদ্বয় কি? উরু কি? পাদদ্বয়ই বা কি উক্ত হইয়াছে?

ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ হইয়াছিল, রাজন্য বাহুদ্বয় হইয়াছিল। তখন বৈশ্য তাঁহার উরু হইয়াছিল এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল।

মন হইতে চন্দ্রমা জন্মিয়াছিল। চক্ষু হইতে সূর্য্য জন্মিয়াছিল। মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণ হইতে বায়ু জন্মিয়াছিল।

নাভি হইতে অন্তরীক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল। মস্তক হইতে দ্যুলোক উৎপন্ন হইয়াছিল। পাদদ্বয় হইতে ভূমি ও শ্রোত্র হইতে দিক্ সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। এইরূপে দেবগণ লোকসকলও কল্পিত করিয়াছিলেন।

দেবগণ পুরুষকে পশুরূপে বন্ধন করিয়া যে যজ্ঞ বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার সপ্তসংখ্যক পরিধি হইয়াছিল এবং একবিংশতি সমিৎ হইয়াছিল।

দেবগণ সংকল্পরূপ মানসযজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞস্বরূপ পুরুষকে পূজা করিয়াছিলেন।

তাহাতে জগদ্ধারক মুখ্য পদার্থ সকল সৃষ্ট হইয়াছিল। বিরাট্ পুরুষোপাসক পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেবগণ যে বিরাট্ প্রাপ্তিরূপ স্বর্গে অবস্থিত আছেন, বিরাড়ুপাসক মহাত্মারা সেই স্বর্গ প্রাপ্ত হন।" (পুরুষসূক্ত—ঋগ্বেদ ১০।৯০)

এই সুমহান্ স্তোত্র শ্রবণ করিয়া দেবরাজ স্তম্ভিত হইলেন ও ঋষিপ্রবরের মহত্ত্ব কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিলেন। অতঃপর তিনি লোক-পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গিয়া প্রশ্ন করিলেন, ভগবন্! বদরিকাশ্রমে এক সৌম্য-মূর্ত্তি ঋষি তপস্যা দ্বারা জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছেন। আমি তাঁহার মুখনিঃসৃত যে বাণী শুনিয়াছি তাহা অমৃততুল্য। আমার মনে হইতেছে, উনিই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী পরমপুরুষ, জীবের হিতার্থ দেহধারণ করিয়াছেন। উঁহার বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইতেছে, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে তাহা বলুন। দেব পদ্মযোনি উত্তর করিলেন, দেবরাজ! তুমি যাহা অনুমান করিয়াছ তাহা সত্য। পৃথিবীর ও স্বর্গের উদ্ভাসনকারী, মহাসত্ত্ব, তেজঃপুঞ্জ, মহাপরাক্রম নর ও নারায়ণ ঋষি সকলকে ব্যাপিয়া অতিক্রম করিয়াছেন। স্বকীয় তপস্যা দ্বারা তেজস্বী হইয়া ইঁহারা মনুষ্যলোক হইতে ব্রহ্মলোকে সমাস্থিত হইয়াছেন। হে শক্র! কর্ম্মদ্বারা ইঁহারা লোকসমূহের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। মহাপ্রাজ্ঞ এই দুই পরন্তপ অভেদ হইলেও অসুরকুল বিনাশার্থ দ্বিধাভূত হইয়াছেন। (মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব ৪৯ অধ্যায়)। নারায়ণই সূর্য্যাদি দ্যোতকগণের প্রকাশক, অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ, প্রধান পুরুষ ও জগৎকারণ; তিনিই বিশ্বের আত্মা এবং বিশ্বই তাঁহার মূর্ত্তি। যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে তিনি কালাগ্নিস্বরূপ হইয়া ভূর্ভুবাদি ত্রিলোক ধ্বংস করেন। সেই অগ্নিতাপে তাপিত হইয়া মহর্লোকনিবাসী মহাত্মাগণ জনলোকে গমন করেন। অনন্তর অন্তরীক্ষে ঘোরনিনাদকারী, বিদ্যুন্মালাবিস্তারী, প্রচণ্ড জলধরসকল সমুত্থিত হইয়া দিঙমণ্ডল আচ্ছাদিত করতঃ অবিশ্রাম বারিবর্ষণ করিতে থাকে। এই বারি দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায় ও সর্ব্বস্থান জলপূর্ণ হয়। চতুঃসহস্র যুগাবসানে ত্রিলোক এইরূপে একার্ণব হইলে সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ নারায়ণনামা অতীন্দ্রিয় বিরাট্ পুরুষ ফণাসহস্রভীষণ শুভ্রকান্তি শেষসর্পরূপ পালঙ্কোপরি শয়ন করেন। সেই বিভু ভগবান্ নারায়ণ তখন জলধিমধ্যে ভোগিশয্যায় শয়ন করতঃ নিশাসম্বন্ধীয় তিমিরে পরিব্যাপ্ত স্বকীয় রাত্রি করিলেন। পরে সত্ত্বগুণের উদ্রেকে প্রবুদ্ধ হইয়া দেখিলেন, লোক প্রাণিসঞ্চারশূন্য রহিয়াছে। এস্থলে নারায়ণ শব্দের নিরুক্তির জন্য বিদ্বদ্গণ

বলিয়া থাকেন—জল সকল নরের পুত্র, এইজন্য জলকে নার বলে ; সেই নারকে পূর্ব্বে আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া নারায়ণ নাম হইয়াছে। পণ্ডিতগণ এই বাক্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন—নর অর্থাৎ পুরুষোত্তম বিষ্ণু কর্তৃক জল প্রথম সৃষ্ট হইয়াছে, এই নিমিত্ত জলের নাম নার ; প্রলয়কালে জল বিষ্ণুর অয়ন অর্থাৎ বাসস্থান হয়, এই নিমিত্ত বিষ্ণুর নাম নারায়ণ (বিষ্ণুপুরাণ ১।৪।৬ শ্রীধর স্বামীর টীকা)। নরগণের অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়স্থান হেতুকও তিনি নারায়ণ (মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব ৬৯ অধ্যায়)। সেই নারায়ণ প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত যেমন ধ্যান করিলেন, অমনি তাঁহার নাভি হইতে এক পদ্ম উত্থিত হইল এবং সেই পদ্ম হইতে আমি ব্রহ্মা বিনিঃসৃত হইলাম। এইরূপে গুণত্রয়ভেদে প্রজাপতি ঈশ্বরের তিন অবস্থা হইয়াছে ও তাঁহার ব্রহ্মমূর্ত্তি হইতে বিশ্বের উৎপত্তি, বিষ্ণুমূর্ত্তি হইতে পালন এবং রুদ্রমূর্ত্তি হইতে সংহার হইয়া থাকে।

(মহাভারত বনপর্ব্ব ২৭১ অধ্যায় ও বিষ্ণুপুরাণ ১।৩,৪)

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ ! নির্গুণ, অপ্রমেয়, শুদ্ধ, বিমল আত্মার সৃষ্টিকর্তৃত্ব কিরূপে সম্ভবে ? ব্রহ্মা বলিলেন, এই জগতে শক্তিমাত্রই অচিন্ত্য ও বুদ্ধির দ্বারা অনির্ব্বচনীয়। পাবকে যেমন উষ্ণতা, নির্গুণ আত্মায় তেমনি সৃষ্টি-কর্তৃত্বাদি শক্তি বিদ্যমান আছে (বিষ্ণুপুরাণ ১।৩)। অনন্তর ব্রহ্মা বলিলেন, ঋষিগণ যাঁহাকে সহস্রশীর্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রচক্ষু, সহস্রবাহু, সহস্রমুকুট, সহস্রবদন দ্বারা উজ্জ্বল, বিশ্বাশ্রয়, সূক্ষ্ম সকলের মধ্যে সূক্ষ্মতম, সমস্ত স্থূল বস্তু মধ্যে স্থূলতম, গরীয়ান্ পদার্থ মধ্যে গরিষ্ঠ এবং শ্রেয় পদার্থদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ; যিনি বাক্, অনুবাক্, নিষৎ, উপনিষৎ এবং সত্যস্বরূপ, সামবেদ মধ্যে সত্য ও সত্যকর্ম্মা বলিয়া স্তুত হইয়া থাকেন ; সাধকগণ ব্রহ্ম, জীব, মন ও অহঙ্কার এই চারিটী অধ্যাত্মতত্ত্বের বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিটী পরমগুহ্য দিব্য নাম উচ্চারণ করতঃ, নিয়ত বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত ও ভক্তাধীশ্বর জানিয়া, যাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন এবং যাঁহার প্রীতিসম্পাদনার্থ স্বধর্ম্মরূপ তপস্যা আচরণ করিয়া থাকেন ; যাঁহা হইতে ঐ আচরিত তপঃপ্রভাব চিত্তে আসিয়া উপস্থিত হয় সেই চৈতন্যস্বরূপ সর্ব্বোৎপাদক সর্ব্বেশ্বরই লোকমধ্যে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের অধিকার ও মাহাত্ম্য-বিস্তারের জন্য নর ও নারায়ণরূপে বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিতেছেন। যোগিগণ জ্ঞান সাধন দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী বিষয়স্থিত জ্ঞানকে ঐ সকল বিষয় হইতে পৃথক করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানমাত্র আত্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া

যাঁহাকে প্রাপ্ত হন, সেই জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাই এই নারায়ণ। (ভীষ্মপর্ব্ব ৪৭ অধ্যায়)

ব্রহ্মার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল এবং তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে নারায়ণের মাহাত্ম্য চিন্তা করিতে করিতে প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে সুরপুরে গমন করিলেন।

পূর্ব্বকালে দম্ভোদ্ভব নামে এক মহাপরাক্রমশালী সার্ব্বভৌম নরপতি সসাগরা বসুন্ধরার একাধিপত্য সম্ভোগ করিতেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, এই পৃথিবী মধ্যে এমন কোন্ শস্ত্রধারী পুরুষ বিদ্যমান আছে যে সমরে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা আমার তুল্য হইতে পারে? একদা কতকগুলি অদীনসত্ব অকুতোভয় ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ঐরূপ আত্মশ্লাঘা করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু সেই ধনমদগর্ব্বিত নরপতি বারংবার নিষিধ্যমান হইয়াও বিপ্রদিগকে প্রত্যহ উক্তরূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তখন ঐ তেজস্বী ব্রাহ্মণগণ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া বলিলেন, অহে ভূপতে! এই পৃথিবীতে বহুসমরবিজয়ী দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ বিদ্যমান আছেন। তুমি কদাচ তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। আমরা শুনিয়াছি মহাত্মা নর ও নারায়ণ তপস্যাপরায়ণ হইয়া এই মনুষ্যলোকে আগমন পূর্ব্বক গন্ধমাদন পর্ব্বতে ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত আছেন। তুমি তাঁহাদিগেরই সহিত যুদ্ধ কর।

রাজা দম্ভোদ্ভব তৎক্ষণাৎ ষড়ঙ্গিনী মহতী সেনা সঙ্গে লইয়া সেই অপরাজিত নর-নারায়ণের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন এবং অতিশয় বন্ধুর ভয়ঙ্কর গন্ধমাদন-শিখরে উপনীত হইয়া তথায় তাপসদ্বয়কে সন্দর্শন করিলেন। দেখিলেন, তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায় নিরতিশয় কৃশাঙ্গ এবং শীত, বাত ও আতপ দ্বারা কর্শিত হইয়া রহিয়াছেন। অনন্তর রাজা তাঁহাদিগের সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক প্রণাম ও কুশল প্রশ্ন করিলেন এবং তাঁহারাও আসন, জল ও ফলমূলাদি দ্বারা তাঁহার অতিথিসৎকার করিয়া বলিলেন, তোমার কোন্ প্রয়োজন নিষ্পন্ন করিতে হইবে বল। এই কথায় রাজা বলিলেন, আমি নিজ ভুজবলে সমগ্র পৃথিবী পরাজিত করিয়াছি, এক্ষণে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় এই শৈলদেশে আগমন করিয়াছি; অতএব আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে এই চিরাভিলষিত আতিথ্যটী প্রদান করুন।

নর-নারায়ণ কহিলেন, হে রাজন্! এ তপস্যার আশ্রম। এখানে সকল জীবই সত্ত্বাশ্রিত। ক্রোধ, লোভ এমন কি কোনও রূপ কুটিলতা এখানে

আসিতে পারে না। যুদ্ধ বা অস্ত্রশস্ত্রের কোনও প্রসঙ্গই এই তপোবনে উত্থাপিত হইতে পারে না। অতএব তুমি এস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যুদ্ধাভিলাষ কর। জগৎমধ্যে অনেক ক্ষত্রিয় আছেন যাঁহারা তোমার এই অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিবেন।

তাপসদ্বয় পুনঃ পুনঃ এইরূপে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেও তিনি কিছুতেই নিজের নির্ব্বন্ধ পরিত্যাগ না করিয়া বারম্বার তাঁহাদিগকে সমরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন নর ঋষি রোষকষায়িতলোচনে এক মুষ্টি কাশতৃণ হস্তে লইয়া কহিলেন, অহে যুদ্ধার্থী ক্ষত্রিয়প্রবর! এস যুদ্ধ কর, আমি তোমার সমর-শ্রদ্ধা অপনীত করিব। এই কথা শুনিয়া দম্ভোদ্ভব সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে শরবর্ষণ করতঃ দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু অপরাজেয় ঋষিবর ইষিকাস্ত্র দ্বারা সেই সকল ভয়ানক অস্ত্র ছিন্ন ও ব্যর্থ করিলেন এবং মায়াবলে কেবল ইষিকাদ্বারা রাজার সমস্ত সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। দম্ভোদ্ভব এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন এবং 'আমার মঙ্গল হউক' বারংবার এই কথা বলিতে লাগিলেন। তখন শরণাপন্নার্ত্তত্রাণকর্ত্তা নর ঋষি ক্রোধসংবরণ করিয়া কহিলেন, হে নরপতে! তুমি অদ্যাবধি ধর্ম্মাত্মা ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হও, দর্পাবিষ্ট হইয়া কদাচ কাহারও অবমাননা করিও না। এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া রাজা দম্ভোদ্ভব ঋষিদ্বয়ের পাদবন্দনা পূর্ব্বক স্বপুরে প্রত্যাগমন করিলেন ও তদবধি নিরন্তর ধর্ম্মাচরণে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। (মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব ৯৬ অধ্যায়)।

নরঋষি এই যে কার্য্য করিয়াছিলেন, ইহা যে নিতান্তই সুমহৎ তাহাতে সন্দেহ নাই। নারায়ণ আবার তাঁহা অপেক্ষাও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এতৎসম্বন্ধে একটী অতি পুরাতন কাহিনী কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

পুরাকালে গন্ধমাদন পর্ব্বতে ধর্ম্মযানে আরূঢ় হইয়া নর ও নারায়ণ অক্ষয় তপঃসাধন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে দক্ষযজ্ঞ হয়। সেই যজ্ঞে দক্ষপ্রজাপতি রুদ্রের ভাগ কল্পনা না করায় দেবদেব রুদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া যজ্ঞ বিনষ্ট করেন। তিনি ক্রোধ বশতঃ এক প্রজ্বলিত শূলের সৃষ্টি করিলেন। সেই শূল দক্ষযজ্ঞ ভস্মীভূত করিয়া বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণের সন্নিধানে আগমন করিল ও মহা বেগে নারায়ণের বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। নারায়ণের কেশ সকল সেই শূল-তেজে মুঞ্জবর্ণ ধারণ করায় তিনি মুঞ্জকেশ হইলেন। অতঃপর সেই শূল মহাত্মা নারায়ণের হুঙ্কার দ্বারা আহত ও পরাভূত হইয়া শঙ্করের করে প্রত্যাবর্ত্তন

করিল। শূল শিবের করস্থ হইলে তিনি সেই তপস্যান্বিত নর-নারায়ণ ঋষি-দ্বয়ের নিকট ধাবিত হইলেন। রুদ্রদেব উড্ডীন হইয়া আগমন করিলে বিশ্বাত্মা নারায়ণ করদ্বারা তাঁহার কণ্ঠ ধারণ করিলেন। কৃষ্ণবর্ণ নারায়ণের করস্পর্শ জন্য রুদ্রের কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হওয়ায় তিনি শিতিকণ্ঠ হইলেন। অনন্তর নর রুদ্রের বিনাশার্থ ইষিকা উত্তোলন করিয়া মন্ত্রপূত করায় তাহা অতিমহান্ পরশু হইল। সেই পরশু নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র নারায়ণ তাহাকে খণ্ডিত করিলেন। এইজন্য লোকে তাঁহাকে খণ্ডপরশু বলে। অনন্তর রুদ্র ও নারায়ণ ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে সহসা লোকসকল উদ্বিগ্ন হইল। যজ্ঞকালে অগ্নি উত্তমরূপে শিখাবিস্তার করতঃ হবি গ্রহণ করিল না, বেদসকল রজঃ ও তমোগুণে সমাবৃত হওয়ায় আত্মজ্ঞ ঋষিগণের মানসে প্রতিভাত হইল না। বসুধা কম্পিত হইতে লাগিল, তেজঃপদার্থ সকল নিষ্প্রভ হইল, সমুদ্র শুষ্ক ও হিমবান্ বিশীর্ণ হইতে লাগিলেন, আকাশমণ্ডল বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল, এমন কি ব্রহ্মা আসনচ্যুত হইলেন। এইরূপে মহান্ বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবগণ ও ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া সংগ্রামস্থলে আগমন করিলেন এবং যুক্তকরে রুদ্রকে বলিলেন, লোক সকলের মঙ্গল হউক। হে বিশ্বেশ্বর! জগতের হিতকামনা-হেতু অস্ত্রত্যাগ করুন। যাঁহাকে অক্ষর অব্যক্ত ঈশ্বর লোকভাবন কূটস্থ কর্ত্তা নির্দ্বন্দ্ব এবং অকর্ত্তা বলিয়া সকলে জানে তাঁহারই ব্যক্তভাব নিবন্ধন এই শুভা মূর্ত্তি; ইনি ধর্ম্মের বংশ-বর্দ্ধনার্থ নর-নারায়ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা সুমহৎ তপস্যান্বিত মহাব্রত এবং সমস্ত সুরগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। আমি এই নারায়ণের প্রসাদ হইতে জন্মিয়াছি এবং আপনিও নিত্য হইয়াও পূর্ব্বসর্গে তাঁহার ক্রোধ হইতে জন্মিয়াছেন। সম্প্রতি সুরগণ, মহর্ষিগণ ও আমার সহিত অবিলম্বে এই বরদাতা দেবকে প্রসন্ন করুন, লোকসকলের শান্তি হউক। ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া রুদ্র ক্রোধ পরিহার করতঃ সর্ব্বশক্তিসমন্বিত বরদাতা আদিকর্ত্তা প্রভু নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ক্রোধবিজয়ী জিতেন্দ্রিয় ঋষি প্রসন্ন হইয়া রুদ্রের সহিত মিলিত হইলেন এবং স্থিরগম্ভীরস্বরে সর্ব্বতত্ত্বের সারভূত তত্ত্ব তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। নারায়ণ বলিলেন, যিনি তোমাকে জানেন, তিনি আমাকে জানেন; যিনি তোমার নিকটে আছেন, তিনিই আমার সন্নিহিত; আমাদিগের উভয়ের কোন প্রভেদ নাই; অতএব তোমার বুদ্ধি অন্যথা না হউক। (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৪২ অধ্যায়)। অজ্ঞ লোকেরাই মায়ায় মুগ্ধ ও কামক্রোধাদির বশীভূত হইয়া স্বস্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিতে

পারে না। জ্ঞানী শোভন কর্ম্ম, সুমহান্ তপস্যা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও তত্ত্ববিচার দ্বারা আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি করিলে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। তখন তিনি মায়ার অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-নাশক্ষম হন। সর্ব্বশক্তিসমন্বিত হওয়ায় তিনি লোকহিতার্থ বিবিধ আকার ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হন এবং নানাবিধ উপায়ে লোকশিক্ষা ও লোকরক্ষার বিধান করেন। হে কপর্দ্দী রুদ্র! বিপুল তপস্যা ও নিরন্তর পরম পুরুষের ধ্যান করিয়া আমার মোহপাশ ছিন্ন হইয়াছে। আমি তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তন্ময় হইয়াছি। আমিই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করি এবং যুগে যুগে সংসারে ধর্ম্মবিপ্লব হইলে ধর্ম্মরক্ষার্থ ধরণীতলে অবতীর্ণ হই। আমিই সর্ব্বজীবের হৃৎপদ্মে চৈতন্যস্বরূপ বিরাজ করি। দেব, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, নাগ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মানবগণ যে সমস্ত বিধিযুক্ত হব্যকব্য প্রদান করেন তৎসমুদয় আমার চরণ-যুগলে উপস্থিত হয়। অব্যভিচরিতবুদ্ধিশালী ঐকান্তিকভক্তিনিষ্ঠ মানবগণ যে সমুদয় কার্য্য করেন তৎসমুদয় আমাতেই অর্পিত হয়। আমি ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়েরই অতীত। চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক বিশ্ব আমাতেই অবস্থিত রহিয়াছে।

নারায়ণের এই সকল বাক্য শুনিয়া রুদ্রদেব বিস্ময়ে আপ্লুত হইলেন ও তাঁহার চরণে প্রণিপাত করতঃ কৈলাশে গমন করিলেন ও তথায় ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবং।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী॥

জীব ও ব্রহ্মে পরমার্থতঃ অভেদ। মাঝখানে মায়া আসিয়া কেবল ব্যবহারিক হিসাবে উহাদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ভেদ আনয়ন করে। জীব মায়াধীন ও ব্রহ্ম মায়াতীত বা মায়াধীশ। মায়াতীত ভাবে ধরিলে ব্রহ্ম নির্গুণ ও মায়াধীশ ভাবে ধরিলে ব্রহ্ম সগুণ বা ঈশ্বর। জগৎ যতক্ষণ আছে, মায়াধীন জীব যতক্ষণ বর্ত্তমান, অথবা মায়াসংবলিত জগতের অস্তিত্বজ্ঞান যতক্ষণ আমার আছে ততক্ষণ ব্রহ্ম সগুণ। জগৎ যখন থাকিবে না, মায়াধীন জীবের যখন লয় হইবে, অথবা মায়ার স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধি হইলে যখন জগৎ আমার নিকট ব্রহ্মের সত্তামাত্রে পর্য্যবসিত হইবে তখন ব্রহ্ম নির্গুণ। ব্রহ্মের এই সগুণ ও নির্গুণ লক্ষণ কেবল গুণের দিক্ দিয়া ব্রহ্মে আরোপিত হয় মাত্র। গুণক্রীড়া তুলিয়া লও, ব্রহ্ম সর্ব্বলক্ষণ নির্ম্মুক্ত। ত্রিগুণাত্মক মায়ার হাত এড়াইতে পারিলে, জীবের ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রাপ্তি হয়। মায়া মায়া, যখন আছে তখন পাকা

আছে ; যখন নাই তখন কিছুই নাই। এই "আছে" ও "নাই"এর মধ্যে আর একটা স্তর আছে যাহাতে মায়া আছেও বটে নাইও বটে, মায়া অধীন হইয়া মায়াত্ব হারাইতেছে। "মায়া আছে" অবস্থা সাধারণ জীবের, "মায়া নাই"এর অবস্থা ব্রহ্মের ও "মায়া আছেও বটে নাইও বটে"র অবস্থা ঈশ্বরের। যেমন, ভেল্‌কী। ভেল্‌কীর জিনিষ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আছে ; যখন নাই, তখন নাই। অজ্ঞ দর্শকের নিকট ভেল্‌কীর জিনিষ সত্য—জীব এই অজ্ঞ দর্শক-স্থানীয়। ভেল্‌কীওয়ালার নিজের কাছে ভেল্‌কীর জিনিষ নাই—ব্রহ্ম এই ভেল্‌কী-ওয়ালার স্থানীয়। কিন্তু অজ্ঞ দর্শকের ভেল্‌কীর দিক্ দিয়া ভেল্‌কীওয়ালার নিকট ভেল্‌কীর জিনিষ আছেও বটে নাইও বটে—ঈশ্বর এই হিসাবে ভেল্‌কীওয়ালার স্থানীয়। অজ্ঞ দর্শক যদি ক্রমে ক্রমে ভেল্‌কীর মোহে ঠেকিয়া ঠেকিয়া ভুগিয়া ভুগিয়া ভেল্‌কীর স্বরূপ জানিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র হন, তাহা হইলে তিনি অবিরত ভেল্‌কীর ক্ষণস্থায়িত্ব ভঙ্গুরত্বাদির বিচার করিয়া ভেল্‌কীর মিথ্যাত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। অথবা তিনি যদি আকুল হইয়া ভেল্‌কী-ওয়ালাকে ধরিয়া পড়েন ও তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারেন তাহা হইলে ভেল্‌কী-ওয়ালাই তাঁহাকে ভেল্‌কীর মিথ্যাত্ব বুঝাইয়া দিয়া তাহার মোহ হইতে মুক্ত করিতে পারেন। জীবসম্বন্ধেও অনেকটা এই কথা। দুঃখত্রয়াভিঘাত দ্বারা অহরহঃ পীড়িত হইয়া জীব মুমুক্ষু হইলে, অর্থাৎ মায়ামোহ হইতে মুক্ত হইবার জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত হইলে, সে শাস্ত্রোদ্ভাসিত বুদ্ধি দ্বারা তত্ত্ববিচার করিয়া, অথবা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া ঈশ্বরানুগ্রহে জীবন্মুক্তি লাভ করে। কিন্তু চিত্তের যে সকল মলিন সংস্কার আছে, শুদ্ধ সংস্কার দ্বারা সেগুলি দূরীভূত হইয়া চিত্তশুদ্ধ না হইলে, তত্ত্ববিচার হয় না বা ঈশ্বরের একান্ত শরণাপন্ন হওয়া যায় না। পরন্তু কর্ম্মভিন্ন উপযুক্ত শুদ্ধসংস্কার অর্জ্জিত হয় না। অতএব সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরোপাসনা, যম, নিয়ম প্রভৃতি দ্বারা চিত্তকে শুদ্ধ করা প্রয়োজন। চিত্ত শুদ্ধ হইলে জীব জ্ঞান ভূমিকায় আরোহণ করিয়া অদ্বৈততত্ত্বের আলোচনা ও নির্গুণ ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভূতির দ্বারা, অথবা জ্ঞানসহকারে ঈশ্বরে অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ দ্বারা মায়ার অন্ধকার বিদূরিত করিয়া নিজেকে চৈতন্য-ময় জ্যোতিঃস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। এই উপলব্ধিই জীবন্মুক্তি।

এইরূপ কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞানদ্বারা মুক্তি হয়। অতএব জীবের মুক্তিশৃঙ্গে উঠিবার সোপানের দুইটী স্তর আছে—একটী কর্ম্মস্তর ও একটী জ্ঞানস্তর। কর্ম্মস্তরে কর্ম্ম প্রধান ও জ্ঞান স্বল্প, এবং জ্ঞানস্তরে জ্ঞান

প্রধান ও কর্ম্ম স্বল্প। কর্ম্মস্তরের সাধক নর ও জ্ঞানস্তরের সাধক নারায়ণ। নর ঋষি কর্ম্মস্তরের শ্রেষ্ঠ ভূমিকায় অবস্থিত জীব ও নারায়ণ জ্ঞানস্তরের শ্রেষ্ঠ-ভূমিকায় অবস্থিত জীবন্মুক্ত, ঈশ্বরপ্রতিম, সৃষ্টিস্থিতিলয়ক্ষম পুরুষ। দুইজনেই ধর্ম্মের পুত্র, তন্মধ্যে কর্ম্মী নর জ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানী নারায়ণ কনিষ্ঠ। কর্ম্মী নরের দ্বৈতবুদ্ধি তিরোহিত না হওয়ায় তিনি ক্রোধী ও নারায়ণের অদ্বৈতবুদ্ধি প্রস্ফুটিত হওয়ায় তিনি ক্ষমাশীল। নারায়ণে জীব ও ব্রহ্ম এক হইয়া গিয়াছে। বিরাটের উপাসনা করিয়া নারায়ণ বিরাট্‌রূপী হইয়াছেন। ব্রহ্মলোকে অবস্থিত থাকিয়া বিদেহ মুক্তি তাঁহার করস্থ হইলেও, তিনি সৃষ্টিস্থিতিলয়রূপ সংসারলীলায় প্রবৃত্ত হন ও জীবের হিতার্থ অবতাররূপ গ্রহণ করেন। তিনিই নির্গুণ, তিনিই সগুণ। নির্গুণোপাসক ও সগুণোপাসক উভয়েই তাঁহার পরম পদ প্রাপ্ত হয়। তিনিই সাধকের হৃদ্দেশে অবস্থিত হইয়া করুণাবারি সিঞ্চন দ্বারা চিত্তমল বিধৌত করেন। তিনিই শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণপরায়ণ। দুঃখী জীব, সংসারতাপক্লিষ্ট জীব তাঁহার চরণে আশ্রয় লউক, শীতল হইবে।

পরাজয়।

[লেখক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।]

১

"শ্রীচরণ কমলেষু,

ঠাকুর মা, পাঁচ বছর পরে তোমায় চিঠি লিখ্‌ছি। আমার আর লিখ্‌বার মুখ নাই, কাজেই লিখি নি। কিন্তু আজ আর না লিখ্‌লে নয়। আমার কষ্টের কথা জানাতে তুমি ছাড়া জগতে আর কেউ নাই। আমরা বড় কষ্টে পড়েছি। উনি বাতে জ্বরে আজ ছ'মাস শয্যাগত, চাকরীটি গেছে। এতদিন গহনাপত্র বেচে কোনও রকমে চালিয়েছি, কিন্তু আর চলে না। তিন মাসের বাড়ী ভাড়া বাকী, চারদিকে দেনা। খোকার অসুখ, পয়সার অভাবে চিকিৎসা হচ্চে না। এ সময়ে তোমার বিবেচনায় যা হয় ক'রো। তুমি কেমন আছ, সিদু কাকা কেমন আছে লিখ্‌বে। ইতি

তোমার স্নেহের ইন্দু।"

পত্রপাঠ শেষ হইলে তারাসুন্দরী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার শান্ত মুখমণ্ডলে ক্রোধ ও ঘৃণার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল; ললাটের শিরা স্ফীত, নাসাগ্র কুঞ্চিত হইল। তিনি পত্রখানাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া

ছিঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। আপন মনে বলিলেন, "একটা পয়সাও না।"

সিদ্ধু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার চিঠি এল বড় মা?"

"ইন্দুর।"

"কি লিখেছে?"

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "লিখ্‌বে আর কি মাথামুণ্ড; কষ্টে পড়েছি, খেতে পাই না, কিছু দাও।"

মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে সিদ্ধু বলিল, "তা বড় মা, কিছু দিলে ভাল হ'তো না?"

"ভাল হ'তো?" রোষে গর্জ্জন করিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "ভাল হ'তো? তোর মত আহাম্মকের কাছে ভাল হয় বটে, কিন্তু আমার কাছে নয়। সেই এক রত্তি মেয়ে, তার কাছে আমি মাথা হেঁট করব? কিছুতেই নয়।"

সিদ্ধু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "তা বটে, তবে কিনা বড় কষ্টে পড়েছে।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "কষ্টে পড়েছে তা আমার কি? গেল কেন? এতই যদি কষ্ট, তবে এখানে এল না কেন? এলে কি আমি তাড়িয়ে দিতাম? তা নয়, অহঙ্কার, এখনও সেই অহঙ্কার! আমার কাছে আস্‌বে না, আমার ভিটেয় জলগ্রহণ কর্‌বে না। বেশ, অহঙ্কার নিয়েই থাক্, আমি একটা পয়সা দিয়েও সাহায্য কর্‌ব না।"

সিদ্ধু বড় মাকে বেশ চিনিত। বড় মা একবার 'না' বলিলে আর তাহা 'হাঁ' হয় না। অগত্যা সে সাহায্যের প্রস্তাব ত্যাগ করিয়া বলিল, "যদি রাগ না কর বড় মা, তবে একটা কথা বলি।"

তারাসুন্দরী হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তোর কথায় রাগ! এমন কি কথা রে সিদ্ধু?"

বড় মার মুখে হাসি দেখিয়া সিদ্ধু সাহস পাইয়া বলিল, "অনেক দিন মাকে দেখিনি, একবার দেখে আস্‌তে ইচ্ছা হয়।"

তারাসুন্দরীর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল আবার বিরক্তির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তিনি বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন; রোষক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "ইচ্ছা হয় যেতে পার, কিন্তু আর এ মুখো হ'ও না। সবাই যখন গেছে, তখন তুমিই আর থাক্‌বে কেন? নেমকহারাম, সংসারে সব নেমকহারাম।"

ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে তারাসুন্দরী সে স্থান ত্যাগ করিলেন। সিদ্ধুও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপনার কাজে চলিয়া গেল।

ইন্দুর কষ্ট শুনিয়া সিদ্ধু প্রাণে বড় আঘাত পাইল। হায়, সে যে ইন্দুকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সে নীচ-জাতি হইলেও ইন্দু যে তাহার মুখের খাবার কাড়িয়া খাইয়া মানুষ হইয়াছে। সেই ইন্দু যখন অভিমানে তাহার পৈতৃক গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন সিদ্ধুর প্রাণে যে কি আঘাত লাগিল, তাহা অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কে বুঝিবে? সিদ্ধুর ইচ্ছা হইল, সেও ইন্দুর সঙ্গে ছুটিয়া যায়। কিন্তু বড় মাকে ফেলিয়া সে যাইতে পারিল না।

তারপর কতদিন চলিয়া গিয়াছে। এত কাল পরে পত্র লিখিয়া ইন্দু পিতামহীর নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছে। যাহার পৈতৃক বিষয় ভোগ করিবার লোক নাই, ব্যয়ের অভাবে যাহার টাকায় ছাত্‌লা ধরিতেছে, সে আজ অন্যের সাহায্য প্রত্যাশী, এক মুষ্টি অন্নের কাঙ্গাল!

ইন্দুর কষ্টে মর্ম্মাহত হইয়া সিদ্ধু যখন বড়মাকে অনুরোধ করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইল, তখন সে স্থির করিল, সে নিজে একবার ইন্দুর নিকট যাইবে, তাহাকে বুঝাইয়া এখানে লইয়া আসিবে। ইন্দু যদি একবার আসিয়া তারাসুন্দরীর সম্মুখে দাঁড়ায়, তাহা হইলেই তাঁহার রাগ পড়িয়া যাইবে, সব গোল মিটিয়া যাইবে। এইরূপ ভাবিয়াই সিদ্ধু বড়মার নিকট একবার ইন্দুর কাছে যাইবার অনুমতি চাহিল; কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তারাসুন্দরী সে অনুমতি দিলেন না। বিনানুমতিতে সিদ্ধু বড় মাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। সে যে বড় মার নিকট সুদৃঢ় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ! সে আজ কত দিনের কথা। যে দিন একটী দ্বাদশবর্ষীয় বালক পিতার তাড়নায়, বিমাতার অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া আশ্রয়ের আশায় সংসার-অরণ্যে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, সে দিন যে তারাসুন্দরীই অভয় দিয়া তাহাকে আপনার স্নেহ-শীতল ছায়ায় আশ্রয় দিয়াছেন, অজস্র স্নেহধারায় অভিষিক্ত করিয়া তাহার নির্জ্জীব প্রাণকে সজীব করিয়া তুলিয়াছেন। সে কত দিনের কথা। তাহার পর সংসারে কত প্রলয় ব্যাপার ঘটিয়াছে, কত পরিবর্ত্তন রহিয়াছে, কিন্তু বড়মার সে স্নেহ, সে করুণার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।

এমন স্নেহময়ী করুণাময়ীকে ছাড়িয়া সে কোথাও যাইতে পারে না! গেলে তাহার নরকেও স্থান হইবে না।

স্নেহের শত অনুরোধ, হৃদয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্বেও সিদ্ধু বড় মাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিল না।

২

স্বামী, পুত্র, পুত্রবধূ সকলেই যখন একে একে সংসারের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেল, তখন তারাসুন্দরী বড় আগ্রহেই তিন বৎসরের পৌত্রী ইন্দুকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। ধরিয়া শোকসন্তপ্তা বিধবা শোকে একটা গভীর সান্ত্বনা পাইলেন, শূন্য সংসারে আবার পূর্ণতার ছায়া দেখিলেন, ছিন্নপ্রায় সংসার-বন্ধন আবার তাঁহাকে মমতার দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল।

স্বামী হরবল্লভ রায় মৃত্যুকালে বার্ষিক তিন চারি হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তা ছাড়া দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ছিল। সুতরাং অন্নবস্ত্রের ভাবনা ছিল না। পুরাতন ভৃত্য সিদু বা সিদ্ধেশ্বরের কার্য্যপটুতায় সাংসারিক কার্য্যের দিকেও ফিরিয়া চাহিতে হইত না। কেবল ইন্দুর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া, আদর-যত্ন দেখাইয়া, আর গৃহ-দেবতা রাধানাথের সেবা করিয়া তারাসুন্দরী জীবনের নীরস দিনগুলাকে বেশ সরসভাবেই কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। যদি কখনও কোনও বিনিদ্র নিশীথে আর একখানি সমুজ্জ্বল সংসারচিত্র স্মৃতিফলকে ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে তিনি সুষুপ্ত ইন্দুর ক্ষুদ্র মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেন, "সেগুলা স্বপ্ন, আর এইটাই সত্য।"

এইরূপে তারাসুন্দরী আপনার হৃদয়ের সকল আগ্রহ, সকল কামনা ঢালিয়া দিয়া ইন্দুকে লইয়া নূতন সংসারপথে চলিতে লাগিলেন।

পিতামহীর অজস্র স্নেহধারায় অভিষিক্ত হইয়া, সিদু কাকার অবাধ ভালবাসা ভোগ করিয়া ইন্দু দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিল। তারাসুন্দরী যথেষ্ট সমারোহ-সহকারে ইন্দুর বিবাহ দিলেন। তিনি ইন্দুকে পরের হাতে তুলিয়া দিলেন বটে, কিন্তু পরের ঘরে যাইতে দিতে পারিলেন না। জামাতাকে ঘরে রাখিয়া দিলেন। পরের ঘরে যাইতে না দিলেও ইন্দু যে পর হইয়া গেল, ইহা তাঁহার স্নেহমুগ্ধ হৃদয় বুঝিয়াও বুঝিল না।

জামাতা রমেশচন্দ্র দরিদ্রের সন্তান, কিন্তু সদ্বংশজাত। স্বভাব-চরিত্রও ভাল। এণ্ট্রান্স্ পাশ করিবার পর মাতৃপিতৃহীন হওয়ায় আর পড়াশুনার সুযোগ হয় নাই। তারাসুন্দরীও সেজন্য দুঃখিত নহেন। আর বেশী পড়িয়া কি হইবে? তাহাকে তো আর চাকরী করিয়া খাইতে হইবে না।

নাতিনী নাতজামাই লইয়া কিছুদিন বড় সুখেই কাটিল। তাহাদের

পরস্পর আন্তরিক ভালবাসা দেখিয়া, উভয়ের প্রণয়-কলহে মধ্যস্থতা করিয়া তারাসুন্দরী যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে একটী ক্ষুদ্র শিশু আসিয়া তাঁহার অন্ধকারময় গৃহ আলোকিত করিল। তারাসুন্দরীর সুখের সীমা রহিল না। এত শোক, এত দুঃখের পর যে এমন স্বর্গীয় সুখের আবির্ভাব হইবে ইহা কে জানিত? তারাসুন্দরী রাধানাথের সম্মুখে মাথা কুটিয়া বলিতেন, "ঠাকুর তোমার দয়া অসীম। শেষের কয়টা দিন এইরূপেই কাটাইয়া দাও দয়াময়!"

ঠাকুর বুঝি অলক্ষ্যে একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছিলেন। কেন না কিছু দিন পরেই তারাসুন্দরী বুঝিতে পারিলেন, সংসারে সুখ কোথায়? যাহাকে তিনি শান্তির স্নিগ্ধ উৎস স্থির করিয়াছিলেন, তাহা অশান্তির উষ্ণ প্রস্রবণ মাত্র। হায় নির্ম্মম সংসার!

৩

দরিদ্র-সন্তান রমেশ যখন দেখিল, সে তারাসুন্দরীর এতটা বিষয়ের একমাত্র মালিক, তখন আর সে আপনাকে ঠিক রাখিতে পারিল না। গ্রামের অনেক যুবক ও প্রৌঢ় আসিয়া অযাচিতভাবে তাহার শুভানুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইল, এবং তাহাকে সম্রাট্ অপেক্ষা উচ্চ আসনে বসাইয়া আপনাদের স্বার্থসাধনের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। অপকবুদ্ধি রমেশের মাথার ভিতরে কেমন গোলমাল হইয়া গেল, পাঁচ জন শুভানুধ্যায়ীর সহিত মিশিয়া সে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে পদার্পণ করিল।

কথাটা চাপা রহিল না, তারাসুন্দরীর কাণে গেল। তারাসুন্দরী রমেশকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু ফল কিছু না পাইয়া তাহার মতি পরিবর্ত্তনের জন্য ঠাকুরের নিকট মাথা কুটিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে রমেশ ও ইন্দু একপ্রাণ ছিল, কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই, ক্রমে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিতে লাগিল। দুশ্চরিত্র স্বামীকে পাপপথ হইতে নিবৃত্ত করিতে গিয়া ইন্দু নিত্য তিরস্কৃত ও অবমানিত হইতে থাকিল। ইহা ছাড়া মনোমালিন্যের আরও একটা কারণ ছিল। রমেশের এখন নিত্য নূতন অভাব। যে অভাবের তাড়নায় রাজ্যেশ্বরের রাজকোষ উড়িয়া যায়, রমেশ এখন সেই অভাবের তাড়নায় পড়িল। সে তারাসুন্দরীর নিকট মাসিক যাহা কিছু পাইত, তাহা তো খরচ হইতই, তাহা ছাড়া ইন্দু যাহা পাইত, তাহাও লইত। কিন্তু এ সকলই সমুদ্রের নিকট শিশিরবিন্দু মাত্র। রমেশের এখন

সম্পত্তিতে কোন অধিকার নাই, সুতরাং কেহ টাকা ধার দিতে চাহিত না। অগত্যা রমেশ টাকার জন্য ইন্দুকে উৎপীড়ন করিত; কিন্তু ইন্দু টাকা কোথায় পাইবে? সে তো স্বামীর দুষ্কর্ম্মে ব্যয়ের জন্য পিতামহীর নিকট টাকা চাহিতে পারে না! মূর্খ রমেশ তাহাই করিতে বলিত, ইন্দু ইহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় স্বামীর নিকট যথেষ্ট লাঞ্ছিত হইত।

এ লাঞ্ছনার কথা ইন্দু গোপনে রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহার সদাপ্রফুল্ল মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়া ঘনীভূত দেখিয়া তারাসুন্দরী সকলই বুঝিলেন, বুঝিয়া হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন।

তারাসুন্দরী কিন্তু এ আঘাতের কোনই প্রতিকার করিতে পারিলেন না। রমেশকে তিরস্কার করিতে গেলেই ইন্দু সজলনেত্রে রুদ্ধকণ্ঠে বলিত, "তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুর মা, ওকে কিছু ব'লো না। ও বড় অভিমানী।"

ইন্দুর এই কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তারাসুন্দরী শুধু মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হইতেন।

কোনও প্রতিবন্ধ না পাওয়ায় রমেশের অত্যাচার দিন দিন বাড়িতে লাগিল। একদিন সে মদ খাইয়া সঙ্গীদের সহিত বৈঠকখানায় আসিয়া হল্লা করিতে লাগিল। পবিত্র দেবমন্দিরে ভূতের এই তাণ্ডব নৃত্য সিদুর সহ্য হইল না; সে গিয়া রমেশকে দুই চারি কথা শুনাইয়া দিল। রমেশের হাতে চাবুক ছিল, সেই চাবুক সিদুর পিঠে সপাসপ বসাইয়া দিল।

সিদু ছুটিয়া আপনার ঘরে গিয়া লুকাইল, কিন্তু তাহার বেত্রক্ষত পৃষ্ঠদেশ কোথায় লুকাইবে খুঁজিয়া পাইল না।

সিদু না বলিলেও তারাসুন্দরীর উহা শুনিতে বাকী রহিল না। শুনিয়া তিনি ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ইন্দু তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিল, "ওঁর কোন দোষ নাই ঠাকুর মা, পাঁচজনে ওঁকে অমন করেছে।"

সে কথায় তারাসুন্দরীর ক্রোধাগ্নি শান্ত হইল না, বরং দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। তবে সে অগ্নিতে তিনি রমেশকে দগ্ধ করিলেন না, নিজেই দগ্ধ হইতে লাগিলেন; আর মাথায় হাত চাপড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হতভাগা সিদুকে না মেরে আমায় মার্‌লে না কেন? সিদু যে আমার পেটের ছেলের চেয়েও বেশী।"

শেষে সিদু আসিয়া পায়ে হাতে ধরিয়া তাঁহাকে শান্ত করিল।

৪

অপরাহ্নকালে তারাসুন্দরী রাধানাথের সান্ধ্য আরতির উদ্যোগ করিতেছিলেন। খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া ইন্দুও তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিল। সে

একখানা পাটের কাপড় পরিয়া, বঁটির উপর আসনপীড়ি হইয়া বসিয়া ফল ছাড়াইতেছিল, আর এক বৎসর বয়স্ক খোকার বিষম দুর্ব্বৃত্ততার নানা উদাহরণ দিয়া ঠাকুরমার নিকট অনুযোগ করিতেছিল। তারাসুন্দরী পঞ্চপ্রদীপ সাজা-ইতে সাজাইতে ইন্দুর এই অনুযোগ শুনিতেছিলেন, আর এক একবার স্নেহসজল-নেত্রে ইন্দুর হাসিভরা মুখখানির দিকে চাহিতেছিলেন।

সহসা জুতার মস্মস্ শব্দে চারিদিক্ কাঁপাইয়া রমেশ প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরমা ও নাতনী উভয়েই বিস্মিতদৃষ্টিতে তাহার দিকে একবার চাহিল। ইন্দু তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিল।

রমেশ আসিয়াই ব্যস্তভাবে ইন্দুকে ডাকিয়া বলিল, "এদিকে এস।"

ইন্দু মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিল। রমেশ তীব্র কণ্ঠকে আরও তীব্র করিয়া বলিল, "আর ঘোমটা টান্‌তে হবে না। আমার দাঁড়াবার সময় নাই, কলকাতার ট্রেণ ধর্‌তে হবে; তাগা জোড়া কোথায়?"

তাহার দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "তাগা? তাগা কি হবে রমেশ?"

"কি আর হবে? আমার দরকার।"

"ইন্দুর তাগায় তোমার কি দরকার?"

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া রমেশ বলিল, "কি দরকার সে কথা ফিরে এসে বল্‌ব। উঠ্‌লে না?"

রমেশ যে তাহার ঘৃণিত অভাব-পূরণের জন্য ইন্দুর অলঙ্কারে হাত দিয়াছে, তারাসুন্দরী তাহা এই প্রথম জানিতে পারিলেন। জানিয়া ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠে ডাকিলেন, "রমেশ!"

সে ক্রুদ্ধ আহ্বান রমেশের কানে গেল না, সে তখন কল্পনায় হীরামন বিবির বেহাগের মধুর ঝঙ্কার শুনিতেছিল। কার্য্যসিদ্ধির বিলম্বতায় অধীর হইয়া রমেশ পুনরায় উচ্চকণ্ঠে বলিল, "এখনও উঠলে না? পায়ের ঢেঁকী কি হাতে ওঠে?"

ইন্দু লজ্জায় ঘৃণায় মরমে মরিয়া গেল; সে অৰ্দ্ধ-কৰ্ত্তিত ফলটী হাতে লইয়া অবনতমস্তকে নীরবে বসিয়া রহিল।

রমেশের আর সহ্য হইল না, সে স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া জুতা পায়ে হুড়মুড় করিয়া ঠাকুর-ঘরের দরজায় উঠিয়া পড়িল। তারাসুন্দরী বাধা দিবার জন্য হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন। ক্রোধোন্মত্ত রমেশ তাঁহাকে ঠেলিয়া দিয়া ইন্দুর

হাত ধরিয়া টান দিল। বঁটিটা উল্‌টাইয়া পায়ের উপর পড়িল। রক্তধারায় মন্দিরতল সিক্ত হইতে লাগিল।

তারাসুন্দরীর নেত্রদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল, ভূকম্পনে পর্ব্বতচূড়ার ন্যায় দেহ একবার কাঁপিয়া স্থির হইল। তিনি জ্বলন্ত দৃষ্টিতে রমেশের দিকে চাহিয়া কুলিশ-কঠোর কণ্ঠে ডাকিলেন, "রমেশ!"

সে ভীষণ কণ্ঠস্বরে রমেশ শিহরিয়া উঠিল; একবার তারাসুন্দরীর জ্বলন্ত দৃষ্টির দিকে চাহিয়াই মন্ত্রমুগ্ধবৎ মস্তক নত করিয়া দাঁড়াইল। তারাসুন্দরী কত্রীর অলঙ্ঘ্যসূচক স্থির গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমি এখনই এবাড়ী হ'তে দূর হ'য়ে যাও, আমি তোমার মত চণ্ডালের মুখ দেখ্‌তে চাই না।"

রমেশ মুখ তুলিয়া চাহিল, দীপ্তকণ্ঠে বলিল, "বেশ! এখনই?"

"এখনই, এই মুহূর্ত্তে। তোমার জিনিসপত্র যে কিছু আছে নিয়ে এখনই দূর হও! এবাড়ীতে যদি তোমার আর সূর্য্যাস্ত হয়, তবে তুমি ব্রাহ্মণের সন্তান নও।"

রমেশ শুধু একবার ভ্রূকুটী করিয়া চাহিল, তারপর ইন্দুর হাত ছাড়িয়া দিয়া সগর্ব্ব পদক্ষেপে চলিয়া গেল।

ইন্দু কাঁপিতে কাঁপিতে পিতামহীর পদতলে বসিয়া পড়িল। তারাসুন্দরী এক পা পিছাইয়া দাঁড়াইলেন; গম্ভীরস্বরে আদেশ করিলেন, "বারণ করছি ইন্দু, ও হতভাগার জন্য আর কোন অনুরোধ ক'রো না।"

ইন্দু কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া দাঁড়াইল; তারপর ধীর পদে আপনার ঘরের দিকে চলিল। তারাসুন্দরী পুনরায় ঠাকুর-ঘর ধুইয়া মুছিয়া আরতির উদ্যোগ করিয়া মালা হাতে দরজার নিকট বসিলেন। তাঁহার হাতের মালা আজ বড় ঘন ঘন ঘুরিতে লাগিল। এইরূপে তিনি আপনার অশান্ত মনটাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

৫

ইন্দু আসিয়া পিতামহীকে প্রণাম করিল। তাহার কোলে খোকা। তারা-সুন্দরী সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একি ইন্দু?"

খোকার পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ইন্দু একটু ইতস্ততঃ করিয়া, একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, "আমরা চল্‌লাম।"

তারাসুন্দরীর মালা ঘোরা বন্ধ হইয়া গেল। বিস্ময়-স্তম্ভিত কণ্ঠে বলিলেন, "তুই—তুই কোথায় যাবি?"

ইন্দু কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিল, "ওঁর সঙ্গে।"

তারা। ওর—ওই হতভাগার সঙ্গে? ও কে?

ইন্দু। আমার স্বামী।

তারাসুন্দরীর বুকের উপর যেন দুম্ করিয়া একটা মুগুরের ঘা পড়িল। ঐ পাপিষ্ঠ, যে মুহূর্ত্তপূর্ব্বে তাহাকে যার-পর-নাই লাঞ্ছিত করিয়াছে, সে হইল আপনার। ইন্দু লাঞ্ছিত, প্রহৃত হইয়াও তাহার সঙ্গ ছাড়িবে না; আর যে এতদিন বুকের উপর রাখিয়া, আপনার হৃদয়ের সমগ্র স্নেহ. সমগ্র মমতা ঢালিয়া দিয়া তাহাকে মানুষ করিয়াছে, সে কেহই নহে, ইন্দু তাহাকে তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে! হায়, অকৃতজ্ঞ সংসার! অভিমানে, লজ্জায় তারা-সুন্দরীর হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি ইন্দুর দিকে না চাহিয়াই পরুষকণ্ঠে বলিলেন, "যাও।"

খোকা তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "দা, দা!"

তারাসুন্দরী সেদিকে ফিরিয়া চাহিলেন না, তিনি দাঁতে দাঁত চাপিয়া, নিঃশ্বাস রোধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। হাতের মালা আবার দ্রুত ঘুরিতে লাগিল।

ইন্দু মৃদুপাদবিক্ষেপে প্রাঙ্গণে নামিল। তারাসুন্দরী বলিলেন, "যাও, কিন্তু মনে রেখো, এ বিষয়ের একটী পয়সাও তুমি পাবে না।"

মৃদু হাসিয়া ইন্দু বলিল, "বিষয়ে আমার দরকার কি ঠাকুর মা।"

তাঁরাসুন্দরী আর কিছু বলিলেন না, ইন্দু চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই একখানা গরুর গাড়ীর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ উঠিল, ক্রমে শব্দ দূর দূরান্তে মিলাইয়া গেল। তারাসুন্দরী নিষ্পন্দ প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ বসিয়া রহিলেন।

তখন সূর্য্যাস্ত হইয়াছে, সন্ধ্যার ছায়া একটু একটু করিয়া পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিতেছে। পথিক পথ বাহিয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে,—

"যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি তারাও চাহে না আমারে।"

তারাসুন্দরীর বক্ষঃপঞ্জর ঠেলিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইল। তিনি উঠিয়া ঠাকুরঘরে ঢুকিলেন, প্রদীপ জ্বালিলেন। অন্ধকারময় গৃহ আলোকিত হইল। দীপের সমুজ্জ্বল রশ্মিরেখা রাধানাথের মুখের উপর পড়িল; কৃষ্ণোজ্জ্বল গণ্ডে সে সুবর্ণরেখার প্রতিভাস বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। তারাসুন্দরী সেই আলোক-সমুজ্জ্বল শান্ত-গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পগদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "রাধানাথ! সংসারে কেউ আপনার

নয়। যাদের আপনার ভেবে তোমায় ভুল্‌তে বসেছিলাম, তারা সব একে একে আমায় ফেলে চলে গেল। এখন ঠাকুর! তুমিই আমার আপনার, তুমিই আমার সব।"

তারাসুন্দরী আপনার দুঃখতপ্ত হৃদয় ভবদুঃখহারীর চরণপ্রান্তে ঢালিয়া দিলেন।

সিদু আসিয়া ডাকিল, "বড় মা!"

"কি?"

"সব চ'লে গেল?"

"হাঁ।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সিদু জিজ্ঞাসা করিল, "ফিরিয়ে আন্‌ব বড় মা?"

দৃঢ়প্রতিজ্ঞার স্বরে তারাসুন্দরী উত্তর করিলেন, "না।"

সিদু আর কিছু বলিতে পারিল না; সে নীরবে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাঙ্গণমধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল।

৬

দুই মাস পরে কলিকাতা হইতে ইন্দুর পত্র আসিল। ইন্দু লিখিয়াছে;— "আমরা এখানে এসে একখানা বাড়ী ভাড়া নিয়ে আছি। বাড়ীটা মন্দ নয়। ওঁর একটী চাকরী হয়েছে। আপনি আমাদের জন্য ভাববেন না, আমরা এক রকম সুখে আছি। খোকা ভাল আছে।"

পত্রখানা পড়িয়া তারাসুন্দরীর অভিমান ও ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। পত্রে একটুও ক্ষমাপ্রার্থনা নাই, এতটুকুও অনুতাপের গন্ধ নাই, আছে কেবল অহঙ্কার—"আমরা সুখে আছি।" এটা কি নিষ্ঠুর উপহাস নয়? হায় অকৃতজ্ঞতা! হায় নির্ম্মমতা! তারাসুন্দরী পত্রখানা কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন!

ইন্দুকে ভুলিবার জন্য তারাসুন্দরী প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি রাধানাথের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিলেন, দাস-দাসী ছাড়াইয়া দিয়া সংসারের সকল কাজ নিজের হাতে লইলেন। বাড়ীতে তিনি আর সিদু ছাড়া কেহ রহিল না।

ভুলিবার সঙ্কল্প করা যত সহজ, ভোলা তত সহজ নয়। বিশেষতঃ, যাহাকে ভুলিবার জন্য বেশী চেষ্টা করা যায়, তাহার কথাই বেশী মনে আসে। স্মৃতির তীব্র দংশনে তারাসুন্দরী জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। ইন্দু অপেক্ষা

খোকার কথা মনে পড়িলে তিনি অধিকতর বিচলিত হইতেন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িত। মুহূর্ত্ত পরেই তিনি চোখের জল মুছিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতেন, "দূর হউক মায়া! যাকে বুকের রক্ত দিয়ে ষোল বৎসর মানুষ করলাম, সে আপনার হ'লো না, আর এই এক বৎসরের একটা রক্তের ডেলার জন্য ভাবনা! ধিক্ আমাকে!"

তারাসুন্দরী অহরহঃ হৃদয়ের সহিত প্রবল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন, আর দিনরাত ঠাকুরের সম্মুখে মাথা কুটিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "সব ভুলিয়ে দাও রাধানাথ, সব ভুলিয়ে দাও; এ মহাপাপিনীকে উদ্ধার কর। তুমি ছাড়া সংসারে আমার আর কেউ নাই।"

প্রার্থনা পূর্ণ হইল। দীর্ঘ চারি বৎসরের অবিরাম সংগ্রামে তারাসুন্দরী হৃদয়ের উপর জয়লাভ করিলেন।

ইহার আরও এক বৎসর পরে ইন্দুর যে পত্র আসিল, প্রথম পরিচ্ছেদে তাহার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু তারাসুন্দরীর হৃদয় তখন বিজয়গর্ব্বে স্ফীত, সুতরাং ইন্দুর দুঃখদৈন্যের সংবাদ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি ভাবিলেন, "আর কেন মায়ার বাঁধন? ইন্দু আমার কে? রাধানাথ ছাড়া আর কেউ আমার আপনার বলিতে নাই।"

৭

আরও একটা বৎসর কালস্রোতে ভাসিয়া গেল। এক বৎসর পরে রমেশের একখানা পত্র আসিল। রমেশ লিখিয়াছে,—

"শ্রীচরণেষু,

ইন্দু মৃত্যুশয্যায়। আপনাকে একবার দেখিবার জন্য তাহার বড় আগ্রহ। টাকা পয়সা চায় না, শুধু একবার দেখা। তাহার শেষ বাসনা অপূর্ণ রাখিতে পারিলাম না বলিয়াই বাধ্য হইয়া আপনাকে পত্র লিখিতে হইল। আপনার যদি তাহাকে দেখিবার বা দেখা দিবার পক্ষে কোনও আপত্তি না থাকে, সত্বর আসিবেন। বিলম্বে আসা বৃথা। ইতি

শ্রীরমেশচন্দ্র।"

তারাসুন্দরী দেখিলেন, পত্রখানা ৮ই তারিখের লেখা, আজ ১০ই। তাঁহার হাতের পত্রখানা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "সিদু!"

সিদু আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল; বড়মার মুখের দিকে চাহিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল; ব্যগ্রভাবে বলিল, "কি হয়েছে বড় মা?"

তারাসুন্দরী ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "কলকাতা যাবার গাড়ী কখন্ আছে?"

সিদু বলিল, "সন্ধ্যের গাড়ী চলে গেছে, কাল সকালে ৭টার গাড়ী।"

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "একখানা গরুর গাড়ী ঠিক ক'রে রাখ্‌বি, যেন রাত ৪টায় আসে।"

সিদু সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে বড় মা? ও কার চিঠি?"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "রমেশের চিঠি, ইন্দুর অসুখ।"

সিদুর সম্মুখে পাছে আপনার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, এতদিনের কঠোর সংগ্রামের এই করুণ পরিণাম পাছে কেহ দেখে, এই আশঙ্কায় তারাসুন্দরী সিদুর সম্মুখ হইতে তাড়াতাড়ি সরিয়া গেলেন।

হায় মানুষের দুর্ব্বলতা! হায় ব্যর্থ আত্মাভিমান!

রমেশের বাসার দরজায় একখানা ঠিকা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। সিদু গাড়ীর চালের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দরজা খুলিয়া দিল। তারাসুন্দরী কম্পিতপদে স্পন্দিত বক্ষে গাড়ী হইতে বাহিরে আসিলেন। আসিয়াই দেখিলেন, দরজার পাশে একটা জলভরা মাটীর ভাঁড় আর একটা সরায় আগুন। তারাসুন্দরী কাঁপিতে কাঁপিতে দরজার পাশে বসিয়া পড়িলেন; রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন, "ইন্দু! ইন্দু!"

পশ্চাতে কে হাঁকিল, "বল হরি হরিবোল!"

তারাসুন্দরী ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন সে রমেশ। তিনি উন্মাদকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "ইন্দু, ইন্দু, আমি এসেছি, আমি এসেছি।"

ইন্দুর কোনও উত্তর আসিল না; শুধু রমেশ উচ্চকণ্ঠকে আরও উচ্চে তুলিয়া ডাকিল, "বল হরি হরিবোল!"

প্রাচীন ভারতের সহিত ইউরোপের বাণিজ্য-সম্পর্ক।

[লেখক—শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল, বি-এ।]

রোম ও ভারতবর্ষ।—খৃষ্ট জন্মের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে রোমান জাতি মিশর জয় করে। এই মিশর-শাসন-কালে তাহারা ভারতের সহিত

পরিচয়সূত্রে আবদ্ধ হয়। ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, তাহারা বাণিজ্য অপেক্ষা যুদ্ধ ভালবাসিত; আর তরবারি-সাহায্যেই রোমান জাতি অর্দ্ধেক পৃথিবী নিজ পদানত করিয়াছিল। এই মিশর-জয় হইতে ইহাদের মধ্যে প্রাচ্য বিলাসিতার প্রভাব বিস্তৃত হইতে থাকে। সম্পদের শীর্ষে অবস্থান করিত বলিয়া তাহাদের কিছুই অপ্রাপ্য ছিল না—পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের বণিকগণ তাহাদের তৃপ্তির জন্য সমস্ত উৎকৃষ্ট দ্রব্য সংগ্রহ করিত। মিশর ও সিরিয়া দেশের বণিকগণ প্রাচ্যের মহার্ঘ রত্নরাজি রোমানদিগকে সরবরাহ করিবার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করিত।

রোমে যখন সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল, সেই সময়ে পশ্চিম ভারতের সহিত রোমের বাণিজ্য আরম্ভ হয়। এই সময়ে প্রাচ্য বিলাসিতা রোমক জাতিকে এমন মুগ্ধ করিয়াছিল যে, সমাজের নেতারা ইহা দূর করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। প্লিনী বলেন যে, বাৎসরিক প্রায় ৪৫,০০,০০০ মুদ্রা শুধু ধনীদের বিলাস-ব্যসন-পরিতৃপ্তির ফলস্বরূপ দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইত। বস্তুতঃ সম্রাট নিরোর মৃত্যু পর্য্যন্ত রোমনগরে এই বিলাস-প্রবাহ সমভাবে বহিয়াছিল।

স্বদেশে ভারতজাত দ্রব্যাদির এত আদর দেখিয়া রোমীয় বণিকগণ এদেশে আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আফ্রিকার তীরভূমি লক্ষ্য করিয়া ভারতে আগমন মোটেই সুগম ছিল না। ইহাতে অনেক সময় লাগিত; বিশেষতঃ তীরে বাণিজ্যপোত রাখিলেই দস্যুদল তাহা লুঠপাট করিয়া লইত। ক্রমে তাহারা ভারত-সমুদ্রের বায়ুপ্রবাহের গতি আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। মিশরের নাবিকগণ বহুদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝিল যে, ভারত-সমুদ্রে বৎসরে দুইবার মাত্র বায়ুর গতি পরিবর্ত্তিত হয়। বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে ও কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত উত্তর-পূর্ব্ব হইতে সমুদ্রে বায়ু প্রবাহিত হয়। রোমকর্ত্তৃক মিশর-জয়ের প্রায় আশী বৎসর পরে হিপেলাস্ নামক নাবিক এই বায়ুর সাহায্যে মালবার উপকূলস্থ মুজিরিস বন্দরে উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য, বণিকগণ এই অনুকূল বায়ুর আবিষ্কারে এত সন্তোষলাভ করে যে, তাহারা ঐ বায়ুপ্রবাহকে হিপলাস্ বায়ু নামে অভিহিত করিয়াছিল। এখন হইতে ভারতের সহিত রোমের বাণিজ্য সহজসাধ্য হইল। বাণিজ্য-পোতসকল বেরেনিস্ হইতে ত্রিশ দিনে আরব্য উপসাগরে আসিত, তৎপরে এই বায়ুর সাহায্যে চল্লিশ দিনে মুজিরিস্ পৌঁছিত। তৎকালীন ইতিহাসকার-

গণ বলেন যে, ঐ বন্দর বাণিজ্যপোত-রক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল না। সমুদ্রের অগভীরতার জন্য দূরে পোত রক্ষা করিতে হইত; আর জলদস্যুর ভয়ে সর্ব্বদা জাহাজে তীরন্দাজ সৈন্য রাখিতে হইত। প্লিনী বলেন, রোমীয়গণ দক্ষিণ ভারতে পৌণ্ড্র রাজার অধিকৃত বেকারী বন্দরে পর্য্যন্ত জাহাজ লইয়া যাইত। ডিসেম্বর মাসে জাহাজ সকল স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়া এক বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। প্রাচীন মুদ্রাতত্ত্ববিৎগণ বলেন যে, ভারতের সহিত রোমের বাণিজ্য যে চলিত, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; কারণ মাদ্রাজের কইম্বাটুর ও মাদুরায় এখনও রোমের প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায়। টলেমী ও প্লিনীর মতে এই সকল দেশ হইতে রোমীয় বণিকগণ, মরিচ, দারুচিনি, লঙ্কা, সুগন্ধি দ্রব্য, হস্তিদন্ত, মসলিন ও অন্যান্য সূক্ষ্মবস্ত্র ও বহুমূল্য রত্নাদি দেশে লইয়া যাইত।

ভারত অপেক্ষা চীনদেশের রেশম উৎকৃষ্ট হইলেও বার্ডউড্ সাহেবের মতে "কোয়ান" জাতীয় বিখ্যাত রেশম ভারত হইতে যাইত। ইহা হইতে এত সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত যে, উহা পরিধান করিলে অঙ্গের বর্ণ পর্য্যন্ত দেখা যাইত। রোম দেশের গায়িকাগণ ও বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত স্ত্রীপুরুষ মধ্যে এই পরিচ্ছদ অত্যন্ত আদরণীয় ছিল। সাধারণের এই কুরুচি-সংশোধনের জন্য টাইবারাস্ সিজার প্রচার করেন যে, কেহ রেশমের পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে পাইবে না। ভারতীয় গন্ধদ্রব্যও তথায় বহুমূল্যে বিকাইত। এই প্রকার অপব্যয় হইতে দেশের অর্থরাশি-রক্ষার জন্য সময়ে সময়ে নগর মধ্যে বৈদেশিক গন্ধদ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ হইত বটে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সকলে গোপনে বহুমূল্যে ইহা ক্রয় করিত। রোমকেরা নিজ বাসগৃহ, পোষাক-পরিচ্ছদ, এমন কি তৈজসপত্র পর্য্যন্ত সুগন্ধে অভিষিক্ত করিত,—মৃতের সৎকারকালে ধূপ প্রভৃতি জ্বালাইবার প্রথা ছিল। প্লিনীর মতে আরবজাত বহুমূল্য রত্নরাজি রোমে বিক্রীত হইলেও ভারতের রত্ন পাইবার জন্য রোমমহিলাগণ লালায়িত হইত।

পেরিপ্লাস বা সমুদ্র-বৃত্তান্ত * ।—তৎকালীন এই বাণিজ্যের কথা আমরা পেরিপ্লাস নামক পুস্তকে পাই। ইহাতে নানা দেশে পৌঁছিবার সুগম পথ ও প্রত্যেক স্থানের পণ্যদ্রব্যের তালিকা আছে। জনৈক নাবিক ইহার প্রণেতা। মোক্ষমুলার-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইহা লিখিত হয়। এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে আমরা গুর্জ্জর হইতে সিংহল দ্বীপের

* cf Vincent's Periplus.

বিবরণ পাই। রোমান বণিকগণ সিন্ধুনদের মোহানায় 'বারবারাইক' নামক স্থানে সর্ব্বাগ্রে জাহাজ লইয়া আসিত ও পণ্যাদির বিনিময় করিত। তখন সিন্ধুনদের একটী মাত্র শাখামধ্যে বড় জাহাজ চলিতে পারিত। এখানে রেশমী সূতা, গঁদ্, নীল, তূলা, কাঁচের বাসন, ধূপ, ধুনা, সুরা, প্রবাল এবং নীল, পীত ও অয়স্কান্ত-মণি বিক্রয় হইত। পরে বণিকগণ কচ্ছ উপসাগর অতিক্রম পূর্ব্বক সৌরাষ্ট্র (গুর্জ্জর) দেশে গমন করিয়া শস্য ও তূলা সংগ্রহ করিত। কথিত আছে যে, এ স্থানের অধিবাসিগণ অতীব সুদর্শন ছিল। পরে একটী অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া নর্ম্মদার ত্রিশ মাইল উত্তরে বারিগজ (ব্রোচ) নগরে আসিত। এই নগর পশ্চিম ভারতের বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। জুলাই মাসে এখানে এক বৃহৎ মেলা বসিত; তথায় টিন্, পিত্তল, সীসা, সার্সি, সাদা কাঁচ, কৃষ্ণবর্ণ সীসা, গন্ধদ্রব্য, সুরা, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, প্রবাল, পোকরাজ প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ আসিত ও বণিকগণ তৎকালীন সমৃদ্ধিশালী নগরী উজ্জয়িনী হইতে আনীত রেখালমণি, মৃন্ময় পাত্রাদি, সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত বস্ত্র, তূলা, গন্ধদ্রব্য, গজদন্ত, আবলুস কাষ্ঠ, গন্ধরস, রেশম, মরিচ ও হীরকাদি ক্রয় করিত। পেরিপ্লাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার পরের স্থানকে দক্ষিণাবর্ত্ত বলা হইত। এখানে শুধু বিস্তীর্ণ প্রান্তর, পর্ব্বত ও মরুভূমি ছিল। প্লিথন ও তাগর নগরদ্বয়ের নাম এখানে পাওয়া যায়। (প্লিথন বোধ হয় সম্রাট শালীবাহনের রাজধানী বিখ্যাত পৈথন নগর—ইহা গোদাবরীর বামপার্শ্বে অবস্থিত, কিন্তু তাগর কোথায় তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই)। পরে বোম্বাই সহরের বিপরীত দিকে অবস্থিত কল্যাণ বন্দরের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এ স্থল দস্যুর আবাসভূমি বলিয়া লিখিত হইয়াছে। তৎপরে টিণ্ডিস্, মুজিরিস্ ও নীলকন্দ নামক বন্দর-সমূহে জাহাজ যাইত। এই নীলকন্দের নিকট 'লালপাহাড়ে'র উল্লেখ পাওয়া যায়; বলা বাহুল্য, এখনও 'কুইলনে'র দক্ষিণে এই গৈরিক পাহাড় বর্ত্তমান আছে।

ইহার পরে রোমীয় বণিকগণ আর অগ্রসর হয় নাই। অবশিষ্ট স্থান-সমূহের বিবরণ তাহারা শুনিয়া লিখিয়াছে। তাহারা বলে, 'লালপাহাড়' অতিক্রম করিয়া কলোকস্ ও কোমার নগরদ্বয়ে যাওয়া যাইত। এই কোমার ভারতের সীমান্তরূপে অভিহিত। এ স্থানের মঠে চিরকুমার নরনারী অবস্থান করিত। ইহার পর পেলিসাইমন্দা (সিংহল দ্বীপ)। (পেরিপ্লাস-লেখক এদেশ দেখেন নাই।) লেখক তৎপরে করমণ্ডল উপকূলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

দিয়াছেন। এখানে মসলিয়া ও আরগল নগর ছিল। সর্ব্বশেষে গঙ্গার ব-দ্বীপ; অতীব সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য এ অঞ্চল বিখ্যাত। এই বাণিজ্যের কেন্দ্র লইয়া যথেষ্ট মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। কেহ বলেন চট্টগ্রাম, কেহ বলেন যশোহর, আবার অনেকে বলেন যে, বর্ত্তমান সোনারগাঁয়ের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন বঙ্গের রাজধানীতে এই বাণিজ্য হইত। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা বর্ত্তমান চুঁচূড়ার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানকে বুঝায়।

গঙ্গার পরেই টলেমির 'অরোরা সারস্‌নিসাস্‌' অর্থাৎ স্বর্ণময় দেশ।

ষ্ট্রাবো।—ষ্ট্রাবোর ভূগোল-বৃত্তান্ত হইতেও আমরা বাণিজ্যের বিষয় কিছু কিছু জানিতে পারি। তিনি অতি সুন্দরভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় পৃথিবীর ভৌগোলিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভারতের বৃত্তান্তও ইহার একাংশে স্থান পাইয়াছে। তিনি বলেন যে, তাঁহার সময়ে প্রায় ১২০ খানি বাণিজ্যপোত মেয়স হারমস্‌ হইতে ভারতে আসিত। * তবে পূর্ব্ব-ভারতের বৃত্তান্ত তাঁহার পুস্তক হইতে ভাল পাওয়া যায় না।

প্লিনী।—ইঁহার বিখ্যাত প্রাকৃতিক ইতিহাসের বোধ হয় পরিচয় দিতে হইবে না। অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তার সহিত ইনি ভারত-সম্বন্ধে ইঁহার পূর্ব্বানুবর্ত্তিগণের ও স্বকীয় বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানিতে হইলে এই পুস্তকের সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্থানে স্থানে ইনি ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে অনেক অসম্ভব গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। প্লিনীই প্রথম আমাদিগকে সিংহল দ্বীপের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রীকগণ এই দেশকে আর একটী পৃথিবী বলিয়া জানিত। আলেকজান্দারের সময় হইতে ইহা দ্বীপরূপে প্রচারিত হয়। মেগাস্থানিস্‌ বলিয়াছেন, ভারত অপেক্ষা এখানে স্বর্ণ, প্রবাল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে প্লিনী বলেন যে, ইহা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এখানে পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার জীবজন্তু পাওয়া যাইত। বৃক্ষাদিও অতীব বৃহৎ হইত। এত বড় শরগাছ জন্মিত যে, উহার দুই গ্রন্থির মধ্যস্থিত স্থানে তিনজনের উপযুক্ত ভেলা প্রস্তুত হইত। ভারতে এক জাতীয় মানব ছিল, তাহাদের স্ত্রীলোকেরা পঞ্চ বৎসর বয়সে গর্ভবতী হইত; আর সকলে অষ্টম বৎসরের অধিক জীবিত থাকিত না! †

---

* cf. Strabo II, V, 12.

† Natural History VII. 2.

তিনি এক প্রকার জীবের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের হরিণের ন্যায় মস্তক, হস্তীর ন্যায় পদ, বরাহের ন্যায় পুচ্ছ ও অন্যান্য অঙ্গ অশ্বের মত ছিল! গঙ্গার জলে চারিহস্ত পরিমিত গলদা চিংড়ি ও দুই শত হস্ত দীর্ঘ বান মৎস্য পাওয়া যাইত! *

ভারতের উদ্ভিদ্ ও বৃক্ষাদির এবং নানাপ্রকার খনিজ পদার্থের বিস্তৃত তালিকা এই পুস্তকে পাওয়া যায়। এস্থানের হীরকাদি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চমূল্যে বিকাইত। আবলুস কাষ্ঠ, মরিচ, আদা প্রভৃতি বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইত।

এলিয়ান-বর্ণিত ভারতের জীবজন্তু।—ইনি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার মতে ভারতে বানর, কুকুর, ব্যাঘ্র, হস্তী, মেষ, ছাগল, পক্ষযুক্ত বৃশ্চিক ও সর্প, তোতাপাখী, কুক্কুট প্রভৃতি জীব ছিল। ইনি বলেন, গঙ্গার কোনও শাখা ছিল না, নানা নদনদী আসিয়া ইহাতে মিলিত হইত—গঙ্গাবক্ষে বড় বড় দ্বীপ ছিল।

টলেমি।—টলেমি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই প্রথম গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে ভূগোল প্রণয়ন করেন। আলেকজান্দ্রা সহর টলেমির জন্মস্থান; সুতরাং বাল্যকাল হইতে তিনি নানাদেশীয় নাবিকের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত অবগত হইতেন। ইহার মতে তখন ভারতবর্ষ আফ্গানিস্থান (গান্ধার) হইতে চীনের পদপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই প্রকাণ্ড ভূভাগের বিবরণ টলেমি সুন্দরভাবে দিয়াছেন। প্রথমে আমরা সিন্ধুনদের কথা পাই। তার পর সৌরাষ্ট্র ও মঙ্গোল। কচ্ছ উপসাগর পার হইয়া আরিয়াকী (বর্ত্তমান মহারাষ্ট্র) দেশ ছিল। এখানে সৌপর ও বাইজেন্টাইন নগর ছিল। অনেকে বলেন, এই সৌপরই সোলেমানের ওফির আর বাইজেন-টাইনের সহিত বস্ফারাস্-তীরস্থ উক্ত নামীয় সহরের নামসাদৃশ্যদর্শনে অনেকে বলেন যে, প্রাচীন গ্রীকগণ নিশ্চয় ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। পরে প্লিনী-কথিত মুজিরিস্ বন্দর ও বাকারী সহর। ইহার দক্ষিণে কমোরীণ উপদ্বীপ ও পরে 'কোরি' উপদ্বীপ (ইহাই রামায়ণ-কথিত রামধনু)। টলেমী বলেন,—এস্থানে কাবেরী নদী বহিত। ইহার পর উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলে মইসোলিয়া (মসুলিপত্তন) ও পরে উড়িষ্যা দেশে আসা যাইত। উড়িষ্যার যে সমস্ত স্থানের নাম টলেমি দিয়াছেন তন্মধ্যে শুধু কনারকের নাম পাওয়া যায়। সর্ব্বশেষে তিনি গঙ্গার 'ব-দ্বীপের' বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন।

* N. H. IX. 2.

বস্তুতঃ ইহার পূর্ব্বে পাশ্চাত্যজাতির নিকট 'ব-দ্বীপের' বিশেষ বিবরণ অজ্ঞাত ছিল। তখন গঙ্গা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া সাগরে মিলিত। তৎকথিত পশ্চিম প্রান্তস্থিত কাম্বিসন নদীই বর্ত্তমান হুগলী; কিন্তু অনেকে বলেন, ইহা সুবর্ণরেখা—ভ্রমক্রমে গঙ্গার শাখারূপে লিখিত হইয়াছে। টলেমিই প্রথম বিন্ধ্যপর্ব্বতের উল্লেখ করেন। তাঁহার সারডোনক্স বোধ হয় সাতপুরা পর্ব্বত। যমুনা, নর্ম্মদা, মাহি প্রভৃতি নদীরও নাম পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত নগরগুলি তৎকালে বর্ত্তমান ছিল:—লোবেকা (লাহোর), সাগল (ইহা লাহোরের ত্রিশ ক্রোশ উত্তরে ছিল, আলেক্‌জান্দার এ সহর অধিকার করেন), ইন্দ্রবারা (ইন্দ্রপ্রস্থ), মাতুরা (মথুরা), প্রাসিকী (প্রাচ্য), সম্বলক (সম্বল-রোহিল-খণ্ডে), কোনাগরা (কনোজ), অবিরিয়া (ইহা সিন্ধুনদের মুখে অবস্থিত), সিরাষ্টিনী (সৌরাষ্ট্র—গুর্জ্জর), বারিগজ (ব্রোচ্), ওজিনী (উজ্জয়িনী), নাসিক, পলিমবত্র (পাটলীপুত্র), তামলিতস্ (তমলুক্, এ স্থান হইতে সিংহল দ্বীপে বাণিজ্য জাহাজ যাইত), মুদ্গল, পৌনাত ও মাতুরা (ইহা পৌণ্ড্র দেশের রাজধানী ছিল)।

ফিলষ্ট্রেন-লিখিত এপোলেনিয়াসের ভ্রমণ-কাহিনী।—ইহাকে কাহিনী বলিলাম, কারণ ইনি যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে তক্ষশিলায় আসিয়া ইনি একটী হস্তী দর্শন করেন। ঐ হস্তীটী আলেক্‌জান্দারের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, সুতরাং সে নিশ্চয়ই এই লেখককে দেখা দিবার জন্য প্রায় চারিশত বৎসর জীবিত ছিল! তিনি আরও বলেন যে, ভারতীয় রাজা গ্রীক ভাষায় তাঁহার সহিত কথা কহেন। নগর-বাহিরে এক মর্ম্মর-নির্ম্মিত মন্দির ছিল। ঐ মন্দির-গাত্রে তাম্রফলকে আলেক্‌জান্দারের সহিত পুরুরাজের যুদ্ধের চিত্র অঙ্কিত ছিল। দেশের সর্ব্বত্র গ্রীকরাজের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বিজয়-তোরণ নির্ম্মিত করা হইয়াছিল। এদেশে এক প্রকার মাছ পাওয়া যাইত; তাহাদের পুচ্ছ স্বর্ণনির্ম্মিত আর উহারা ইচ্ছামত ঐ পুচ্ছ বিস্তৃত করিতে পারিত।

ভারতে খৃষ্ট ধর্ম্মপ্রচারক।—কালচক্রের পরিবর্ত্তনে রোমের পতন হইল। গথ্ প্রভৃতি অর্দ্ধসভ্যজাতি তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিল। জগতের ইতিহাসে রোমের প্রাধান্য নষ্ট হইল। তবে রোমের দুর্দ্দিনেও ভারতের পণ্যাদি তথায় যাইত। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে, ৪০৮ খৃঃ অব্দে আলারিক তিন হাজার পাউণ্ড মরিচের পরিবর্ত্তে নগর-লুণ্ঠনে ক্ষান্ত থাকিতে

প্রতিশ্রুত হন। রোমের পরই কনস্টাণ্টিনোপলের উন্নতি হইতে লাগিল। জাস্টিনিয়ানের শাসনকাল পর্য্যন্ত ইহাই প্রাচ্য বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। কারণ ক্যারাকালার নিষ্ঠুর উৎপীড়নে আলেকজান্দ্রিয়া নিজ সম্পদরাশি হারাইয়াছিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে কস্‌মস (Cosmos Indikopleustes) ভারতের বৃত্তান্ত লিখেন। তিনি বলেন যে, তৎকালে দক্ষিণ ভারতে ও সিংহল দ্বীপে অনেক গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কথিত আছে যে, সেণ্ট্ টমাস্ দক্ষিণ ভারতে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকল্পে আগমন করেন ও ৬৮ খৃঃ অব্দে মাদ্রাজে নিজ দেহ ত্যাগ করেন। কস্‌মসের ইতিবৃত্ত হইতে বুঝা যায় যে, খৃষ্টের অন্তর্ধানের অতি অল্পদিন পরেই দক্ষিণ ভারতে উক্ত ধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করে। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, ইংলণ্ডরাজ এলফ্রেড্ ৮৮৩ খৃঃ অব্দে এই সেণ্ট্ টমাসের স্মৃতিকল্পে ভারতে পচুর উপহার পাঠান। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে শুধু বাণিজ্য লইয়া ভারতের সহিত পাশ্চাত্য জাতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেও খৃষ্ট-জন্মগ্রহণের পরে ধর্ম্মযাজকগণ নবীন ধর্ম্মপ্রচারকল্পে এদেশে আসিতে আরম্ভ করেন।*

সাহিত্য-কথা

[লেখক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।]

বর্দ্ধমান-অধিপতি ও সাহিত্য-সম্মিলন।

বর্দ্ধমান-অধিপতি মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ বাহাদুরের জয় হউক!—তিনি আগামী বর্ষের সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির আসন-গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া যশোহরের প্রবীণ উকীল রায় শ্রীযুত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরের আমন্ত্রণ-পত্রের যে উত্তর দিয়াছেন,তাহা পাঠে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। যে দেশে ত্যাগের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াও সুরেন্দ্রনাথ মাথায় মুকুট ধারন করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই, যে দেশে ধর্ম্মোপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াও ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ পরের হাতের মালা লইবার জন্য নিজের গলা বারংবার বাড়াইয়া দিয়াছেন, সেই

* 'Hindustan Review' নামক মাসিকে প্রকাশিত 'European Intercoruse with India after the Christian Era' শীর্ষক প্রবন্ধাবলম্বনে লিখিত।—লেখক।

দেশের লোকই সভাপতির পদ প্রত্যাখ্যান করিতেছেন,—মুগ্ধ হইব না ? তাও কি আবার বুড়া বয়সে ! যে বয়সে এদেশের লোক ছাপার অক্ষরে নাম দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে,—নামজাদা হইবার জন্য পারে না হেন কাজ নাই, সেই বয়সে মহারাজা স্বেচ্ছায়—সাধ করিয়া সভাপতির পদগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন !—বাঙ্গালা-জীবনে এ ঘটনা এ যুগে নূতন নহে কি ?

যদুবাবু যদিও 'হিন্দু-পত্রিকা'র সম্পাদক, যদিও হিন্দুধর্ম্মের ফেরী করেন, তথাপি উকীল ত বটেন ! তাই সাহিত্যিক ও শাস্ত্রবিদ্ সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করিয়া তিনি লক্ষ্মীর বরপুত্র বর্দ্ধমান-অধিপতিকে সভাপতি নির্ব্বাচন করেন ! কিন্তু মহারাজ ত মেকী নহেন ;—মোসাহেবীর মূল্য তিনি বিলক্ষণই বুঝেন ! তাই তিনি সদ্য সদ্য জবাব দিয়া জানাইয়াছেন যে, অমন পতিগিরিতে তাঁহার কাজ নাই ! বাস্তবিক, সে মোসাহেবীর বহর মনে করিলে এখনও আমাদের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। রাজাকে আড়ে আড়ে দেখা, আর ছুটাছুটি করা, সে দৃশ্য কি ভুলিবার ! একদিকে জলধর ও ব্যোমকেশ দুইজন দুইজনকে পাল্লা দিয়া দৌড়াইতেছেন, অন্যদিকে সভাপতির আসনে দাঁড়াইয়া হরপ্রসাদ চীৎকার করিয়া বলিতেছেন,—"রাজার আহ্বানে বাঙ্গালা সাহিত্য কৃতার্থ হইয়াছে !"—এ সব কি মহারাজা ভুলিতে পারেন ! তিনি ভাবিলেন, সভাপতির আসনে না বসিতেই যখন জননী-বঙ্গসাহিত্যের অদৃষ্টে এত লাঞ্ছনা,—এত অপমান, তখন সভাপতি হইলে ত মাতার আমার রক্ষা নাই। বাঙ্গালার হরপ্রসাদগণ হয়ত তখন বলিবেন,—'মহারাজের সভাপতিত্বে ভাষা-জননী আনন্দে আটখানা হইয়া নৃত্য করিতেছে।'—এই সকল কেলেঙ্কারীর ভয়েই মনে হয়, মহারাজা সাহিত্য-সম্মিলনকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া সভাপতির আসন হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

* *
*

মহারাজা সভাপতির পদগ্রহণে আপত্তির যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেশের মোসাহেব জাতির ও মুচিরাম গুড়গণের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইবে কি না, বলিতে পারি না। তবে বাঙ্গালায় যে দুই-চারিটী খাঁটি লোক আছেন, তাঁহারা যে উহা পাঠে আনন্দে অধীর হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহাদেরই আনন্দবর্দ্ধনের জন্য, মহারাজার পত্রের দুই এক

অংশ 'অর্চ্চনা'য় আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। মহারাজা লিখিয়াছেন,—"আমার মতে, এই জাতীয় সভায় সভাপতির পদে—যাঁহারা সাহিত্যের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতের উচ্চতম আসনে সমাসীন, এইরূপ একজনকে বরণ করাই একান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং আমি আপনাকে ঐ পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি না।" —এমন সত্যবাদিতা এদেশের সাহিত্য-সংসারে সুদুর্লভ! মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী, মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ, জষ্টিশ আশু চৌধুরী, ব্যারিষ্টার প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি কত অল্প-সাহিত্যিক, অ-সাহিত্যিক সভাপতি হইয়াছেন,—কিন্তু কাহারও মুখ হইতে এমন সত্য বাণী বাহির হইতে শুনি নাই। বুড়া চন্দ্রশেখর এক কোণে পড়িয়া আছেন, ভুলিয়াও কেহ তাঁহার নাম করে না। বৃদ্ধ অমৃতলালের অবস্থাও তথৈবচ। গিরিশচন্দ্রের মত 'একঘরে' হইয়া তিনিও জীবন কাটাইতেছেন, কেহ মুখ ফুটিয়াও তাঁহার কথা বলে না। দীনেশচন্দ্র সেন ও শশধর রায় সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক হইলেও এ আসরে তাঁহারা কল্কে পান না। কেন?—কে জানে! আর বিপিনচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র ও পাঁচকড়ির কথা এখানে উত্থাপন না করাই ভাল! -চারিদিক হইতেই তাঁহাদিগকে চাপিয়া রাখিবারই চেষ্টা চলিতেছে। সকলেই প্রায় মনে মনে পাঁচকড়ি-সুরেশের মৃত্যু কামনা করে, পরোক্ষে নিন্দা করে, এবং প্রত্যক্ষে পায়ে ধরে। পরিষদের দল ইঁহাদের ভয়ে সদাই শঙ্কিত। কাজেই এ তিন জনও সভাপতির আসন হইতে দূরে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন! অথচ এ তিন জনের মত বলিয়ে ও লিখিয়ে লোক বাঙ্গালা দেশে এখন আর একটীও আছেন কিনা সন্দেহ।

মহারাজার পত্রে আরও একটী চমৎকার কথা আছে। তিনি লিখিয়াছেন,—"এই সাহিত্য-সম্মিলনের দুইটী অধিবেশনে যোগদান করিয়া—যথার্থই হউক আর অযথার্থই হউক, আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এইরূপ সভা-সমিতির সভাপতিত্ব করিতে হইলে, কেবল বিচক্ষণতার বা অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য্য থাকিলেই চলে না; পরন্তু তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা, শুষ্ক ও কঠিন বিষয়সমূহ বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিবার শক্তি এবং স্বীয় গভীর গবেষণা-প্রচারের সামর্থ্য থাকা একান্ত আবশ্যক। আমার মত সীমাবদ্ধ জ্ঞানবিশিষ্ট লোকের এইরূপ দাবী করা অনুচিত।"

—মহারাজের এ উক্তিও সাক্ষাৎ দর্শনের স্থির সিদ্ধান্ত। বিগত সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ-পাঠের সময় শ্রোতাসকল যেরূপ ঘন ঘন হাই তুলিয়াছিলেন, তাহা মনে করিলে এখনও চোখে জল আসে। তুষানলের ব্যবস্থাও বোধ করি ইহার চেয়ে ছিল ভাল। মহারাজা নিজের উপর দিয়া সেই কথাই ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এ ইঙ্গিতের মর্ম্ম এদেশে কে বুঝিবে! সকলেই যে নিজেকে এক-একটা Genius বলিয়া মনে করেন!

পরিশেষে আমরা সহযোগী 'বাঙ্গালী'র ভাষায় বলিতে চাহি যে, "মহারাজ 'এক ঢিলে দুই পাখী মারিয়াছেন', এবং 'ঝিকে মারিয়া বউকে শিখাইয়াছেন'! আশা করি, বাঙ্গালা-সাহিত্যে মহারাজাধিরাজের এই গূঢ় ইঙ্গিত কখনও ব্যর্থ হইবে না। মহারাজাধিরাজ চল্লিশ হাজার টাকা বরবাদ করিয়া এক পাল সাহিত্যিককে মিহিদানা, সীতাভোগ, মৎস্য, মাংস ভোগ দিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া, যে অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যের অন্তঃপ্রকৃতির যে অভিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সাহিত্যকে তাহার আলোকে গন্তব্যপথ দেখাইয়া দিয়াছেন। মহারাজ যে সম্প্রদায়ের চূড়ামণি, সেই সম্প্রদায়ের দুর্ব্বলতা সম্মান-লোলুপতা তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। তিনি রায়বাহাদুর নামক 'ঝিকে মারিয়া' বাঙ্গালার ধনী নামক 'বৌ'কে শিক্ষা দিয়াছেন! এ শিক্ষা যেন ব্যর্থ না হয়।"

যোগেন্দ্রচন্দ্র।

১২ই ভাদ্র যোগেন্দ্রচন্দ্রের বার্ষিক স্মৃতি সভা হইয়া গিয়াছে। যোগেন্দ্রচন্দ্রকে চক্ষে কখনও দেখি নাই। মানুষটা তিনি কেমন ছিলেন,—হৃদয় তাঁহার কিরূপ ছিল, তাহা কিছুই জানি না। তবে তাঁহার সাহিত্যিক-মূর্ত্তি আজ মানস-নয়নে দিব্য দেখিতে পাইতেছি। তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে যে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল্য আছে, তাহার মর্য্যাদা আছে। সেজন্য বাঙ্গালাদেশ তাঁহাকে চিরকাল কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে।

* * *

এই ভাদ্র মাসে, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের আর একজন বড় প্রতিষ্ঠাতারও মৃত্যু ঘটে। তাঁহার নাম—দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ। দ্বারিকানাথ 'সোমপ্রকাশ' পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার "নিকট ভাষা অনেক পরিমাণে ঋণী। তিনি উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে সম্পাদিত সংবাদপত্র প্রকাশ ও অনেক নূতন শব্দের ও প্রয়োগের সৃষ্টি করিয়া ভাষাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে পুরাবৃত্ত রচনা করেন।" *

* বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য—৺রাজনারায়ণ বসু।

* *
*

কিন্তু ভাষার প্রসারকল্পে যোগেন্দ্রচন্দ্রের 'বঙ্গবাসী'র কৃতিত্ব আমার মনে হয় সকল সংবাদপত্রের চেয়ে বেশী। 'বঙ্গবাসী'র পূর্ব্বে যে কোনও সংবাদপত্র ছিল না, তাহা নহে। কিন্তু সে সকল কাগজ কতকটা বিজাতীয় ভাবের ছিল বলিয়া বাঙ্গালী তাহা পড়িতে পারিত না,—পছন্দ করিত না। 'বঙ্গবাসী' প্রকাশিত হইবার পর হইতে বাঙ্গালায় পাঠকের সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িয়া যায়। গ্রামের মুখুয্যে বাঁড়ুয্যে, ঘোষজা বোসজাকে খবর কাগজ পড়িবার নেশা 'বঙ্গবাসী'ই সর্ব্বপ্রথম ধরাইয়া দেয়। 'বঙ্গবাসী'র পূর্ব্বে যে কয়খানা কাগজ ছিল, তাহারা যে শুধু বাঙ্গালী পাঠকের ভাবনা ভাবিতে জানিত না, তাহা নহে; বাঙ্গালী পাঠকের বোধগম্য করিয়া বাঙ্গালা ভাষাও লিখিতে পারিত না। কেহ ফিরিঙ্গী-বাঙ্গালা লিখিত, কেহ বা কট্‌কটে সংস্কৃত-বাঙ্গালা লিখিত। ফলে যাহারা ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাহারা সে বাঙ্গালা পড়িত না,—পড়িলে বুঝিতে পারিত না। 'বঙ্গবাসী' কিন্তু সেই অভাব দূর করিয়াছিল। যাহারা ইংরেজি জানে না, সংস্কৃতও জানে না; অথচ যাহারা মতিরায়ের যাত্রা, নীলকণ্ঠের গান, দাশরথীর পাঁচালী বুঝিত, কাশীরাম ও কৃত্তিবাস পড়িয়া বুঝিতে পারিত, সেই সকল পাঠকের মুখ চাহিয়া 'বঙ্গবাসী' কাগজই প্রথম বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে আরম্ভ করে। কথকতার স্থান বঙ্গবাসীই প্রথম অধিকার করিয়া বসে।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের আর একটা কীর্ত্তি—তাঁহার রচিত উপন্যাসসমূহ। তিনি আজীবন ধরিয়া তাঁহার কাগজে ও পুস্তকে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। উদ্দেশ্যমূলক বা সমাজের পক্ষে উপকারী

বলিয়াই যে তাঁহার উপন্যাসের সুখ্যাতি করিতেছি, তাহা নহে। সে উপন্যাস-পাঠে আনন্দলাভও যথেষ্ট হয়। গিরিশচন্দ্র বলিতেন,—"কেবল আনন্দ-দানে কলাবিদ্যা-বিশারদের তৃপ্তি নহে। তাহার আজীবন উদ্যম, কিরূপে আনন্দস্রোত মানব-হৃদয় স্পর্শ করিয়া মানবের উন্নতিসাধন করিতে পারে"। একথা যোগেন্দ্রচন্দ্রের সম্বন্ধে অন্বর্থ হইতে পারে। তাঁহার উপন্যাসাবলী শিক্ষা দান যেমন করে, আনন্দদানও তেমনি করে। ঔপন্যাসিকের অনেক গুণই তাঁহাতে ছিল। কল্পনা, রসিকতা, সুবিচার-শক্তি, মানব-প্রকৃতিতে জ্ঞান—এ সমস্তই তাঁহার ছিল। ইহার উপর ছিল, তাঁহার ভাষা। অমন রস-পরিপূর্ণ সুমিষ্ট ভাষা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। আজ তাঁহার স্মৃতির দিনে এই সকল কথাই কেবল মনে জাগিতেছে। বঙ্গদেশে যোগেন্দ্রচন্দ্র 'পাঠক-পড়ান' ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন!

হিন্দুর দেবতত্ত্ব।

শ্বেতকালী বা মৃত্যুনাশিনী।

[লেখক—শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।]

হিন্দুর দেবতত্ত্ব বড়ই রহস্যময়। কালভেদে এবং দেশভেদে কত দেবতা পূজিত হইয়াছেন এবং হইতেছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? হিন্দুর দেবতা যে কত প্রকার, এ বিষয়ের মীমাংসাও মানবশক্তির অতীত।

উপনিষদে পুরাণে তন্ত্রে দেবতার বহুত্ব অসংখ্যত্ব প্রভৃতি মতের উল্লেখ দেখা যায়। তন্মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্রেই ইঁহাদের অধিকতর শ্রেণীবিভাগ উক্ত হইয়াছে। কালী তারা প্রভৃতি দশটী মহাবিদ্যা সাধারণ হিন্দুর নিকট সুপরিচিত। অনেকের দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, এই দশটীর অতিরিক্ত মহাবিদ্যার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু তন্ত্রবিশেষে নবলক্ষ মহাবিদ্যার উল্লেখ দেখা যায়, যথা—"নবলক্ষ মহাবিদ্যা কোটিতন্ত্রেষু গোপিতা।"

কুলচূড়ামণিতন্ত্রে আবার কালী প্রভৃতি প্রত্যেক দেবতার অসংখ্যত্ব বিঘোষিত হইয়াছে অর্থাৎ এই তন্ত্র স্পষ্টভাষায় উপদেশ দিতেছে যে, ত্রিপুরা প্রভৃতি প্রত্যেক দেবতার প্রকার-ভেদ-নিরূপণ অসম্ভব। যথা—

"অসংখ্যা ত্রিপুরাদেবী অসংখ্যাতাচ কালিকা।
বাগীশ্বরী তথা সংখ্যা তথা চ স্বকুলাকুলা॥
মাতঙ্গিনী তথাপূর্ণা বিমলা চণ্ডনায়িকা।
ত্রিপুরৈকজটা দুর্গা যাচান্যা কুলসুন্দরী॥

অত্রোক্ত একজটা তারাদেবীর প্রকারভেদ, সুতরং একটী মাত্র দেবতার অন্তর্গত দেবতা-বিশেষের প্রকারভেদে আকৃতি-বিশেষ-নিরূপণ যে সর্ব্বতোভাবেই অসম্ভব, তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। হিন্দুর দেবতা যেমন অনন্ত, দেবতার স্বরূপ-জ্ঞাপক তন্ত্রও তেমনই অনন্ত।

কুলচূড়ামণিতন্ত্রে ভৈরবের মুখে কোটি কোটি তন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। ভৈরব চতুঃষষ্টিসংখ্যক প্রধান-শক্তি-তন্ত্রের উল্লেখ করিয়া দেবীকে বলিয়াছেন, হে ভৈরবি! তুমি এই চতুঃষষ্টিখানা প্রধান মাতৃতন্ত্র শ্রবণ করিয়াছ, এবং অন্যান্য কোটি কোটি তন্ত্র শ্রবণ করিয়াছ, কুত্রাপি তোমার আনন্দ সঞ্জাত হয় নাই।

"এষ মেতানি তন্ত্রাণি তথান্যান্যপি কোটিশঃ।
শ্রুত্বা দেবি! নকুত্রাপি জাতানন্দাসি ভৈরবিঃ॥" ১।১৩।

অগাধতন্ত্রজলধির সমগ্র বিষয় অবগত হইয়া দেবতার স্বরূপ-নিরূপণ নিতান্তই অসম্ভব। সমগ্র পৃথিবীর ত কথাই নাই, এই বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন বিভাগে পূজ্য দেবতার ইয়ত্তা করাও নিতান্ত সহজ বলিয়া মনে হয় না। এক দেশের পূজ্য দেবতা অপর দেশে সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আজ "মৃত্যুনাশিনী কালী" মাতার বিবরণটি পাঠক মহোদয়দিগের সন্নিধানে প্রকাশিত করিব।

এই দেবতা আমাদের পূর্ব্ব ময়মনসিংহ প্রদেশে, শ্রীহট্টে এবং ত্রিপুরা জেলার কতক স্থানে পূজিত হইয়া থাকেন। উত্তর বঙ্গে এবং দক্ষিণ বঙ্গে এই দেবীর পূজার পরিচয় পাওয়া যায় না। মারীভয়নিবারণকামনায় ইঁহার পূজা হয়। নীলতন্ত্রানুসারে ইঁহার অর্চ্চনা হইয়া থাকে। ইঁহার ধ্যানোক্ত রূপটি বড়ই বৈচিত্র্যময়। ইনি কালী নামে অভিহিতা, অথচ ইঁহার বর্ণ শরদিন্দুর ন্যায় শুভ্র, বদন তিনটী, চক্ষু নয়টী, (মস্তক) জটামুকুট-মণ্ডিত, দন্ত মনোহর, ইনি দ্যুতি-শালিনী, রক্ষণকারিণী, ইঁহার পরিধানে রক্তবস্ত্র, ইনি ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত, ইঁহার ছয়টি ভুজ, তন্মধ্যে দক্ষিণ দিকের ভুজে ক্রমে খড়্গ, অমৃত পাত্র, এবং কর্ত্তৃকা (কাতা) বামদিকের ভুজে অঙ্কুশ ডমরু এবং চক্র

বিন্যস্ত, ইনি মুণ্ডমালার দ্বারা শোভিতা ; সমুন্নত মনোহর কুচ ধারণ করিতেছেন, এবং শবের উপরে স্থিত হইয়া কৃতান্তকে মর্দ্দন করিতে উদ্যত আছেন।

"শরদিন্দু-নিভাং শুভ্রাং বদন-ত্রিতয়ান্বিতাম্।
নব-লোচন-সংযুক্তাং জটামুকুট-মণ্ডিতাম্॥
সুচারু-বদনাং দেবীং রক্ষাং রক্ষণ-কারিণীম্।
রক্তবস্ত্র-পরীধানাং বাসবাদিভি রর্চ্চিতাম্॥
ষড় ভুজা মসিপীযূষকর্ত্তৃকাঃ সব্যতঃ ক্রমাৎ।
বামতোঽঙ্কুশডমরু-চক্রাণি ক্রমশোস্তমেৎ॥
মুণ্ডালিস্রগ্বিরাজন্তীং পীন-চারু-কুচাবহাম্।
শবোপরিসমাসন্নাং কৃতান্তমর্দ্দনোদ্যতাম্॥"

ইহার "মৃত্যুনাশিনী" এই নামটিতে শ্লেষের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। সাধকের মৃত্যুর অর্থাৎ মরণের নাশ (নিবারণ) করেন ; সুতরাং মৃত্যুনাশিনী ; এবং সাধকের আক্রমণকারি মৃত্যুর (কৃতান্তের) নাশ (অদর্শন) ঘটান বলিয়াও মৃত্যুনাশিনী নামে অভিহিতা হইতে পারেন। ধ্যানোক্ত পীযূষধারণের অভিপ্রায় ভক্তকে চিরজীবী করা, এবং বিবিধঅস্ত্রধারণের অভিপ্রায় কৃতান্তকে সাধকের সন্নিধান হইতে বিতাড়িত করা বলিয়া বোধ হয়। ডমরু বাজাইয়া যেন এই ফলভেদ ঘোষণা করিতেছেন।

সহযোগী সাহিত্য

দস্যু।*

[ব্রহ্মদেশীয় নাটক]

প্রথম অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য।

কাশীর রাজা ও অমাত্যগণ রাজসভায় বসিয়া আছেন। সকলেই ঐশ্বর্য্য ও পদগৌরবে উন্নতশির। "রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং"—মন্ত্রীদিগের মুখে রাজা রাজ্যের সমাচার শুনিতেছেন ; মধ্যে মধ্যে আলোচনাও করিতেছেন।

তাঁহার রাজ্যে অত্যাচার ও অবিচার লাগিয়াই আছে, সুতরাং প্রজাদের বড় কষ্ট।

রাজা কোতোয়ালী-সচিবকে কোতোয়ালীর দপ্তর দাখিল করিতে আদেশ দিলেন। সচিব দপ্তর পাঠ করিয়া বলিলেন,—এই সহরের বিখ্যাত ধনী দানকাওতলের পুত্র সাওরাবলের অত্যাচারে প্রজারা অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। সাওরাবল দস্যু।

রাজা ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। তখনই জলদগম্ভীরস্বরে রাজাদেশ প্রচারিত হইল,—"যে কেহ সাওরাবলকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে, তাহাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।"

* "সাওরাবল" নামক বিখ্যাত নাটকের উপাখ্যানভাগ। অগষ্ট (১৯১৫) মাসের The Theosophist পত্রে "A Burmese Drama" নামক প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তার পর সভা ভাঙ্গিল ! রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। মন্ত্রীরা রাজার হুকুম ঢোল-সহরৎ দ্বারা রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে বলিলেন। সাওরাবলের মা—দানকাওতলের পত্নী। তিনি ঢোল-সহরৎ শুনিলেন। শুনিয়া তাঁহার চক্ষু কপালে উঠিল।

তিনি সাওরাবলকে বনে গিয়া লুকাইয়া থাকিতে বলিলেন। পলাইবার ও বনে থাকিবার উপযোগী টাকাকড়ি জিনিষপত্র সমস্তই তাহার সঙ্গে দিলেন। সাওরাবল বনে পলাইল।

তৃতীয় দৃশ্য।

সাওরাবল অনুচরবর্গের সহিত বনে বিচরণ করিতেছে। তাহার আস্ফালনে বনস্থলী কম্পিত। সে ঈশ্বরকে ভয় করে না,—মানুষ ত কোন্ ছার।

[নাটকের এই দৃশ্যে হাস্যরসের প্রচুর সমাবেশ আছে। সাওরাবল ও তাহার অনুচরেরা হাস্যরসের অভিনেতা। দর্শকেরা এই দৃশ্যের অভিনয়-দর্শনে হাসিয়া হাসিয়া অস্থির হয়।]

দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য।

[এই দৃশ্যে ব্রহ্মদেশের প্রাচীন-যুগের চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে]

ধনী দানকাওতল ও তাহার পত্নী একত্র বসিয়া আছেন ; উভয়েই চিন্তাকুল ও ম্রিয়মাণ। দানকাওতল স্ত্রৈণ ; স্ত্রীর শাসনের ভয়ে অস্থির। আবার স্ত্রী তাহার নয়ন-মণি। পত্নীকে তিনি প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসেন।

স্ত্রী স্বামীর অপেক্ষা বয়সে বড় এবং বড় বুদ্ধিমতী।

দানকাওতলকে তাহার পত্নী বলিল,—"দেখ গা আমার সতীনের মেয়ের সঙ্গে আমার সাওরাবলের বিয়ে দিতে চাই ; তোমার কি মত ?"

মেয়েটী দানকাওতলের প্রথম পক্ষের পত্নীর গর্ভজাত।

দানকাওতল ইঙ্গিতে সম্মতি দিলেন। তাঁহার বুদ্ধিমতী পত্নী মা-পা-জা সাওরাবলের সহিত মেয়েটীর বিবাহ দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। মেয়েটীর নাম শান্তনোকুমারী।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মা-পা-জা তাহার এই অভিপ্রায় শান্তনোকুমারীর নিকটে ব্যক্ত করিবার উপায় স্থির করিল। এইজন্য সে মেয়েটীকে ডাকিয়া আদর করিয়া বলিল,—"দেখ্ মা ! আজ কেশপ্রসাধনের পর্ব্ব। চল্ আমরা নদীতে 'মাথা ঘষ্‌তে' যা'ব। তাহার হৃদয়ে মাতৃ-স্নেহের যে কত বড় ভাণ্ডার লুকানো আছে, তাহা শান্তকে দেখাইবার জন্য যে নানারূপে স্নেহের অভিনয় করিতে লাগিল। অবশেষে মেয়েটী বাধ্য হইয়া তাহার বিমাতার সহিত নদীতে স্নান করিতে গেল। সেখানে সে তাহার বিমাতার মতলবের কথা শুনিল।

শান্ত এই প্রস্তাবে বিস্মিত হইল। কিন্তু ব্রহ্মদেশীয় কুমারী-সুলভ সরলতার সহিত বলিল,—"মা আমি যে ছেলেবেলা থেকে সাওরাবলকে দাদা ব'লে জানি এবং তাঁ'কে দাদা বলে ভক্তি করি। তাঁকে আমি কেমন ক'রে বিয়ে করব ?"

সাওরাবলের নামেই লোকের মনে ঘৃণা ও ভয়ের উদ্রেক হইত। তবুও কিন্তু শান্তা তাহাকে আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতই ভক্তি করিত। সে তাহাকে ভয়ও করিত না, ঘৃণাও করিত না।

শান্তনোকুমারীর অসম্মতি দেখিয়া মা-পা-জা রাগে কাঁপিতে লাগিল। তাহাকে অনেক গালি দিল, অভিসম্পাত প্রদান করিল। তার পর তাহার সম্মতি-গ্রহণের জন্য তাহাকে অনেক তাড়না ও যথেষ্ট প্রহারও করিল।

কিন্তু শান্ত কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত হইল না।

তখন বিমাতা তাহাকে নদীতে ফেলিয়া দিল। সে মরিল, কি বাঁচিল,—মা-পা-জা আর ফিরিয়াও তাহা দেখিল না। সে কিন্তু বেশ মায়া কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয় অঙ্ক।

এক সন্ন্যাসী ও তাহার চারিজন 'চেলা' নির্জ্জন বনে থাকে। লোকালয় হইতে তাহাদের বসতি অনেক দূরে। তাহারা নদীর ধারে বায়ুসেবন করিতে আসিয়াছে। হঠাৎ নদী-গর্ভ হইতে নারী-কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইল,—'ওগো কে কোথায় আছ, আমাকে রক্ষা কর।'

নদীতে প্রবল স্রোত। চেলা চারিজন চাহিয়া দেখিল,—সেই প্রবল স্রোতে এক অনিন্দ্য-সুন্দরী তরুণী মৃত্যুর সহিত প্রবল সংগ্রাম করিতেছে। সেই কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে,—"আমায় রক্ষা কর।" চেলারা মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিল। কিন্তু কেহ রমণীকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইল না।

অবশেষে সন্ন্যাসী নদীগর্ভ হইতে শান্তকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন। চেলারা গুরুর পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল। গুরু তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন। তার পর ভগবানের নাম করিয়া নদীতে ঝাঁপ দিলেন।

[ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বে চারিজন শিষ্য তাহাদিগকে তাঁহার 'গদী'র উত্তরাধিকারী করিয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছিল। নিমজ্জমানা রমণী অপেক্ষা তাঁহার জীবন যে বহুমূল্য, তাহাও তাহারা জানাইতে কৃপণতা করে নাই। ইহাদের অভিনয়ে যথেষ্ট হাস্যরস উদ্রিক্ত হয়।]

সন্ন্যাসী শান্তাকে উদ্ধার করিয়া তীরে আনিলেন। সে সুস্থ হইয়া সন্ন্যাসীকে সকল ঘটনা বিবৃত করিল। বালিকার পরিচয় পাইয়া চেলারা বলিতে লাগিল,—'আমি ওকে বাড়ী দিয়ে আসব।' তাহাদের পরোপকার-বৃত্তি তখন দেখে কে!

কিন্তু শান্তনোকুমারী বাড়ীতে যাইতে চাহিল না। সে ভাবিল,—বাড়ীতে যাইয়া করিব কি? সেখানে বিমাতার নির্য্যাতন। আবার এদিকে সন্ন্যাসী তাহাকে বাড়ীতে যাইতে বলিতেছেন। সাধু-সন্ন্যাসীর আদেশও ত অলঙ্ঘ্য। তার উপর বাড়ীতে গেলে আবার বিবাহের আশঙ্কা।

তখন শান্ত একটা উপায় স্থির করিল। সে সন্ন্যাসী বলিল, 'আপনি আমায় বিবাহ করুন।' সন্ন্যাসী ত মানুষ—তাঁহারও ত রক্ত-মাংসের শরীর। তিনি বিবেকের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করিলেন; শেষে তরুণীর আবেদনই সার্থক হইল। সন্ন্যাসী শান্তনোকুমারীকে বিবাহ করিলেন।

বিবাহের সময়ে সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব ভাবান্তর হইল। তিনি গৈরিক অঙ্গবাস ত্যাগ করিয়া রাজবেশ ধারণ করিলেন এবং নৃত্য-গীতে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

চতুর্থ অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য।

এইবার নব-দম্পতী সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা 'জারক-জল' বিক্রয় করিতে লাগিলেন। একদিন তাহারা দুইজনে সেই 'জারক-জল' বেচিতে বেচিতে দানকাওতলের বাটীতে উপস্থিত। মা-পা-জা শান্তকে চিনিতে পারিল।

আবার সেই মায়া-কান্না! আবার সেই স্নেহের অভিনয়। মা-পা-জা আপনার গা হইতে সোনার গহনা খুলিয়া শান্তকে পরাইয়া দিল। তার পর বলিল,—"মা তুই আমার সঙ্গে আয়। তোর মত বয়সে আমি যত গহনা পরতাম, তোকে আমার সব গহনা দিব।"

সরলা শান্ত বিমাতার সঙ্গে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। স্বামী বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। বিমাতা শান্তকে বাটীর ভিতরে লইয়া গিয়া একটা ঘরে চাবি দিয়া রাখিল; তার পর তাহার স্বামীকে তাড়াইয়া দিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

একদিন রাত্রির অন্ধকারে মা-পা-জা তাহার পুত্র সাওরাবলকে লুকাইয়া বাড়ীতে আনিল। সে শান্তকে ধরিয়া বনে লইয়া গেল। সেখানে সাওরাবল তাহাকে বলিল,—"তুই আমায় বিয়ে কর্।" শান্ত সে কথা অগ্রাহ্য করিল। সাওরাবল অনেক ভয় দেখাইল, যন্ত্রণা দিল; কিন্তু শান্ত কোনওক্রমেই সম্মত হইল না।

নিরুপায় হইয়া সাওরাবল তাহার অনুচরদিগকে বলিল, "দেখ্ তোরা এর ওপর নজর রেখে দে, যেন কোথাও সরে না পড়ে।"

তৃতীয় দৃশ্য।

ঘটনাচক্রে শান্তর স্বামী সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তখন সাওরাবলের প্রহরীরা ঘুমে অচেতন। শান্তা বলিল, "আমায় এদের হাত থেকে উদ্ধার করুন। এই দেখুন, আমার দেহ প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তবু আমি ওর ঘৃণিত প্রস্তাবে রাজি হইনি।"

দুইজনে কথাবার্তা চলিতেছে; এমন সময়ে সাওরাবল হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইল। সে শান্তর স্বামীকে গাছের সহিত বাঁধিয়া রাখিল। তার পর তাহার অনুচরদিগকে আদেশ করিল,—"রাত্তিরে একে খুন করিস্।"

পঞ্চম অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য।

"বিপদে মধুসূদন", তিনিই বিপদে সাধুদিগকে রক্ষা করেন। তাঁহার মায়াবলে সাওরাবলের অনুচরগণ নিদ্রামগ্ন ও সংজ্ঞাহীন রহিল। সন্ন্যাসী বন্ধন-মুক্ত হইলেন। শান্ত ও সন্ন্যাসী দৈবী-মায়ার দানকাওতলের বাটীতে নীত হইল। গভীর অরণ্যে যে বৃক্ষে সন্ন্যাসী রজ্জুবদ্ধ ছিল, মা-পা-জা সেই বৃক্ষে আবদ্ধ হইল। রাত্রিতে সাওরাবলের অনুচরগণ তাহাকে সন্ন্যাসি-ভ্রমে হত্যা করিল।

সাওরাবল শেষে দেখিল, সন্ন্যাসীর পরিবর্ত্তে তাহার মাতা নিহত হইয়াছে। সে দুঃখে, ক্ষোভে, ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তার পর সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্ম পিতার গৃহে উপস্থিত হইল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সাওরাবল বাড়ীতে গিয়া শান্তকে ধরিল। তাহার কেশ ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। দেবতা আসিয়া তাহাদের মাঝে দাঁড়াইলেন। তিনি বলিলেন,—

"একে হত্যা করো না। ন্যায়পথে চল। মৃত্যুর পর তোমার কি অবস্থা হ'বে—ভেবে দেখ।" দেবতার কথাও সাওরাবল গ্রাহ্য করিল না। সে শান্তকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র তুলিল। তখনই দৈবী শক্তিতে পৃথিবী দ্বিধা হইল এবং সাওরাবল তাহার মধ্যে অদৃশ্য হইল।

তৃতীয় দৃশ্য।

গভীর রাত্রি। পিতার সুরম্য অট্টালিকার সুন্দর কক্ষে শান্ত নিদ্রিত। স্বামী তাহার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিয়াছেন।

সহসা জগৎ-রঙ্গমঞ্চের অভিনয় একে একে তাহার মিথ্যা বলিয়া মনে হইল। জগতের অনিত্যতার চিন্তায় সে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। শান্তির আশায় তাহার চিত্ত ব্যাকুল হইল।

বুদ্ধের আদর্শ তাহার হৃদয়সমক্ষে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। তিনি শান্তির জন্য, আশ্রয়ের জন্য ব্যগ্র হইলেন। অবশেষে বুদ্ধের চরণে, সংঘের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন।

তাঁহার বিলাস-ব্যসন পড়িয়া রহিল; নৃত্যগীত পড়িয়া রহিল; সাধের পত্নী—সৌন্দর্য্যে অতুল, রূপে অতুল, পাতিব্রত্যে অতুল এবং সতীত্বের গৌরবে গরীয়সী সহধর্ম্মিণী নিদ্রার কোলে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া রহিল—সন্ন্যাসী স্বামী ধীরপদে গৃহ ত্যাগ করিলেন।

নাটকের আখ্যায়িকা শেষ হইল; অভিনয়ের যবনিকা পড়িল।

স্বর্গীয় যতীশচন্দ্র সমাজপতি।

অকালমৃত্যু বাঙ্গালাদেশে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' করিয়াছে। গত ২০শে ভাদ্র সোমবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র, "সাহিত্য"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির কনিষ্ঠ সহোদর যতীশচন্দ্র সমাজপতি পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪২ বৎসর হইয়াছিল।

যতীশচন্দ্র বহুদিন ধরিয়া নানা জটিল রোগে ভুগিতেছিলেন; ভ্রাতা সুরেশচন্দ্র একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিয়তির হাত এড়াইবার নহে। যতীশ চন্দ্রের বৃদ্ধা জননী শোকে আত্মহারা; ভ্রাতা সুরেশচন্দ্রের বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ভগবান ইঁহাদিগকে ও অন্যান্য পরিজনবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

যতীশচন্দ্রে নানা সদ্‌গুণের সমাবেশ ছিল। তিনি তেজস্বী ছিলেন। এ যুগের 'ন্যাকামি' তাঁহাতে একেবারেই ছিল না। যতীশচন্দ্র পরের দুঃখে বিচলিত হইতেন; তাঁহার গুপ্ত দানও যথেষ্ট ছিল। 'স্বদেশী' আন্দোলনের সময়ে তিনি যে কিরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা দেশের লোকে হয়ত জানেন না,—কিন্তু 'স্বদেশী'র পাণ্ডারা তাহা বিশেষরূপেই জানেন।

যতীশচন্দ্র সাহিত্যের অনুরাগী সেবক ছিলেন। বাঙ্গালা বেশ লিখিতে পারিতেন; কিন্তু লেখকরূপে তিনি কোনও দিনই আপনাকে জাহির করিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার অনেক রচনাই লোকের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল।

যতীশচন্দ্র কর্ম্মী ছিলেন। অনেক নূতন কার্য্যে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যে যাহাতে বাঙ্গালীর ছেলেদের মতিগতি হয়, সে পক্ষে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন।

বাঙ্গালীর ছেলেরা যাহাতে ব্যায়াম চর্চ্চা করে, দৈহিক বলের উন্নতি সাধন করে, এজন্য তিনি হাতে কলমে অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন।

যতীশচন্দ্রের মাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃভক্তি অতুলনীয় ছিল। 'সাহিত্য'-পরিচালনায়ও তাঁহার বড় অল্প কৃতিত্ব ছিল না। ভগবান যতীশচন্দ্রের আত্মার সদ্গতি বিধান করুন।

দুর্গাপূজা।*

আশ্বিন মাসে, মাটিতে প্রতিমা গড়িয়া কি পূজা করি? দুর্গা। কিন্তু দুর্গা কে? এ বিষয়ে নানা মত আছে।

১ম। বেদে দুর্গাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া কথিত আছে। এ কি জ্ঞানের পূজা?

২য়। বেদের অন্যত্র ইঁহাকে রাত্রিস্বরূপা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইনি কি রাত্রিদেবী?

৩য়। ভাদ্র মাসে সিংহরাশিতে সূর্য্য অবস্থিতি করেন, তাহার পরে আশ্বিন মাসে কন্যারাশিতে গমন করেন। সিংহের পর, অথবা সিংহ-পৃষ্ঠে কন্যা। আমরাও পূজা করি, সিংহপৃষ্ঠে কন্যা। আমরা কি নক্ষত্র মাত্র পূজা করি?

৪র্থ। পৌরাণিক মতে ইনি দেবীবিশেষ—হিমাচলকন্যা—শিবের জায়া, এবং গণেশের জননী। এইটি সাধারণ-গৃহীত মত।

৫ম। সাংখ্যমতে, জগতে প্রকৃতি আর পুরুষ। পুরুষ নিশ্চেষ্ট, প্রকৃতিই জগতের মূল। এই প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি। কেহ কেহ বলেন, ইনি সাংখ্যের সেই প্রকৃতি মাত্র। সেইজন্য ইঁহাকে আদ্যাশক্তি বলিয়া থাকে।

হয়ত সকল মত মিশাইয়া এই দশভুজা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি কথা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। সঙ্গে অসুর কেন? ইহা পৌরাণিক মতে সঙ্গত,—পুরাণে দুর্গা মহিষমর্দ্দিনী। কার্ত্তিকেয়, গণেশ, ইঁহারাও পুত্র। কিন্তু সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী কি জন্য? পৌরাণিক মতানুসারেও দুর্গার সঙ্গে ইঁহাদের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। ইঁহাদের পৃথক্ পূজাও হইয়া থকে। ইঁহারা এ সঙ্গে কেন?

যাহাই হউক, এ প্রতিমা কখন মিথ্যা বিষয়ের প্রতিমা নহে—তাহা হইলে এত দিন ধরিয়া, এত কোটি লোকে, এত উল্লাসের সহিত কখন ইহা পূজা করিত না। যাহা মনুষ্যহৃদয়ে বদ্ধমূল, তাহা কখন মিথ্যা নহে—বঞ্চনার

* প্রবন্ধটী স্বর্গীয় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত "ভ্রমর" নামক মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটীর নিম্নে কোনও লেখকের নাম নাই। অনেকের বিশ্বাস, ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা। কিন্তু বঙ্কিমের গ্রন্থাবলীতে ইহা নাই।—'অর্চ্চনা'-সম্পাদক।

উপায়মাত্র নহে। বেদ পুরাণ তন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিব না—তাহাতে এ তত্ত্বের অন্ত পাওয়া যায় না। মনুষ্যহৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিব। কে এ.? জগৎশক্তি। সর্ব্বময়ী, সর্ব্বকর্ম্মকারিণী, সর্ব্বধর্ম্মধারিণী, সর্ব্বসংহারিণী। সিংহের আজ্ঞাকারিতায় এবং অসুরের নিপীড়নে লোকে সেই অনন্ত শক্তিরই পরিচয় দেখিয়া থাকে। শক্তি হইতে যে বিঘ্ননাশ এবং শত্রুর নিপাত, তাহা গণপতি কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তি সূচিত করে। কিন্তু বাঙ্গালী কেবল শক্তিপূজায় সন্তুষ্ট নহে। নিজে শক্তিহীন; কেবল শক্তিমাত্র আরাধ্যা হইলে বাঙ্গালীর ঘোর দুর্দ্দশা হইত। শক্তি যেমন সর্ব্বলোকপূজ্যা, আর দুইটি বিষয় বাঙ্গালীর কাছে প্রায় তেমনি পূজ্য। বাঙ্গালী দর্শনশাস্ত্রে শুনিয়াছে, যে জ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স—শক্তিতে নহে। ঐশীশক্তির গুণে, জ্ঞান ব্যতীত আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি না।

আরও বাঙ্গালী দেখে যে, শক্তিই হউক,আর জ্ঞানই হউক, ইহকালের সুখ, দুইয়ের এক হইতেও হয় না। শক্তিশালীও দুঃখ পায়, জ্ঞানবান্‌ও দুঃখ পায়। সেটি ভাগ্যাধীন। অতএব ভাগ্য একটি পৃথক দেবতা। ভাগ্য লক্ষ্মী; জ্ঞান সরস্বতী। বাঙ্গালী তিনটিকে একত্রে পূজা করে। এই বাঙ্গালীর মহোৎসব।

আমরা এমত বলিতেছি না যে, শারদীয়া প্রতিমার আদি এইরূপ। এ কথা সঙ্গত বোধ হয় না। আদি বোধ হয় পুরাণমূলক এবং পুরাণের কল্পনার আদি সাংখ্য। তবে, লোকে যাহা ভাবিয়া এ পূজায় এত অনুরক্ত—তাহাই বলিতেছি। এমনও বলি না যে, এই সকল কথাগুলি কাহারও মনোমধ্যে স্পষ্টতা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যাহা অস্পষ্ট, অজ্ঞাত, অথচ ভিতরে আছে, তাহাই বুঝাইতেছি।

এমত হইতে পারে যে, এই প্রতিমার আর একটি সূচনা আছে। হিন্দুধর্ম্ম ত্রিতয়তাপূর্ণ। প্রাচীন ত্রিমূর্ত্তি, অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য্য। আধুনিক ত্রিমূর্ত্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। ঈশ্বরের বা পুরুষের তিনটি গুণ, সত্ত্ব, রজঃ, তম। সেইজন্য বঙ্গীয় শক্তিভক্ত, শক্তির ত্রিমূর্ত্তি কল্পনা করিবে। স্থূলচক্ষে যাহারা দেখে, তাহারা সংসারে তিনটি শক্তি দেখে—বল, ঐশ্বর্য্য, এবং বিদ্যা—দুর্গা, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। শক্তি, ভাগ্য এবং জ্ঞান।

যে দিগে দেখা যায়, সেই দিগে এ পূজা সাধারণ প্রবৃত্তির অনুকারিণী বলিয়াই লোকের ইহাতে এত অনুরাগ দেখা যায়।

গলগ্রহ।

[লেখক—শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, বি-এ।]

বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে কন্যাদায় অপেক্ষা পুত্রদায় কম দায় নয়; সুতরাং বহু চেষ্টার পর প্রভাস-জননী বিংশতিবর্ষীয় পুত্রের একটী বধূ-গলগ্রহ জুটাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। প্রভাস তখন পোর্ট কমিশনারের অফিসে ১৫৲ টাকা বেতনের একজন কেরানী এবং স্বয়ং তাহার মাতুল রাধানাথ রায়ের গলগ্রহ।

প্রভাসের পিতৃভিটা বালির সন্নিকটে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে। পিতা দেবকী-প্রসাদ মোক্তারী করিতেন; স্বভাবতঃ দয়ার্দ্র-হৃদয় বলিয়া আয়ের অনুপাতে যথেষ্ট গোপন দান ছিল, সুতরাং নিজের হাতে বড় একটা কিছু ছিল না; গৃহিণী কালিকা দেবী সংসার ফেলিয়া স্বামীর অজ্ঞাতসারে সামান্য কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন মাত্র। অকস্মাৎ একদিন বিসূচিকারোগে দেবকীপ্রসাদ গতাসু হইলেন। দেবকীপ্রসাদের অন্যতম ভ্রাতা পূর্ব্বেই সে পথের পথিক হইয়াছিলেন। পিতৃ-গৃহ-সম্পর্কে রাধানাথ বৈ কালিকা দেবীর অন্য কেহ ছিল না; সুতরাং সঞ্চিত দুই সহস্র মুদ্রা ও পুত্র প্রভাসকে লইয়া সেই দিন হইতে কালিকা দেবী ভ্রাতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সে আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। প্রভাস তখন বালি স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়ে, এবং সদ্যঃ-বিপত্নীক রাধানাথ সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে লইয়া বিপন্ন।

রাধানাথ ঘোর সংসারী এবং পূর্ণমাত্রায় হিসাবী। সংসার চালাইবার জন্য একজন প্রবীণা গৃহিণীর অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিলেও, নিঃস্বার্থভাবে তিনি ভগিনীকে আশ্রয় দান করেন নাই—ভগিনীর সঞ্চিত অর্থের দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সে অর্থের পরিমাণ পাঁচ ছয় সহস্রের ন্যূন নহে—এইরূপ জনশ্রুতি ছিল।

রাধানাথ 'বি, এন্, আর্'এ চাকরী করিতেন; পৈত্রিক বাটী ভবানীপুরে। প্রভাস 'এল, এম্, এস্'-এ ভর্ত্তি হইল। এণ্ট্রান্স পাস করিবার পর, রাধানাথ ভগিনীকে বুঝাইয়া দিলেন—"আর পড়ার দরকার নেই, এখনকার বিদ্যা শুধু

অর্থকরী—যা লেখাপড়া শিখেছে তাই যথেষ্ট ;—কিছু টাকা দিয়ে ওকে এখন কোনও স্বাধীন ব্যবসা করাও।—চাকরীতে কি হয় ? ১৫৲।২০৲।৩০৲।৪০৲ এই ত ? ব্যবসা যদি একবার জমে যায় ত সে পয়সা খায় কে ? জান ত, কথাতেই বলে 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'।—যদি তোমার মত হয় কালই আমি ওকে নিয়ে যেতে পারি,—আমার এক বন্ধু কণ্ট্রাক্টার, তার সঙ্গে মিলে কাজ করলে খুব উন্নতি হবে। আপাততঃ হাজার দুই ওকে দাও।"

"মোটেই যে আমার দু' হাজার পুঁজি, দাদা।"

"সে কি ?"

"তোমাকে লুকিয়ে আমার লাভ ? সংসারে তুমিই আমার এখন একমাত্র আশ্রয়। বিশ্বাস না হয় বাক্স খুলে দেখ" বলিয়া কালিকা দেবী দাদার হাতে চাবির গোছাটা ফেলিয়া দিল।

রাধানাথ দমিয়া গেলেন। থতমত খাইয়া বলিলেন—"না না আমি কি তোমায় অবিশ্বাস করছি ? এতে আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসেরই বা কি আছে ? তোমার টাকা তোমারই, তোমার ছেলের জন্য। তা ঐ দু' হাজার টাকা নিয়েই ও আরম্ভ করুক—বরাতে থাকে ওই থেকেই ওর দু'লাখ টাকা হবে।"

ভ্রাতার স্তোকবাক্যে আশান্বিতা হইয়া কালিকা দেবী শুভদিন দেখিয়া ভ্রাতার হস্তে দুই সহস্র মুদ্রা তুলিয়া দিলেন। পুত্র নূতন কর্ম্মে ব্রতী হইল। কথায় কথায় একদিন কালিকা দেবী বলিলেন—"দাদা, প্রভাস ত তোমার বন্ধুর ব্যবসায়ের একজন অংশীদার হ'ল, কিন্তু তাঁর সঙ্গে একটা পাকা লেখাপড়া হওয়া উচিত নয় কি ? টাকার কথা, তাই তোমায় বলছি, অবশ্য তুমি ভাল বুঝ।"

"সে বন্ধু আমার তেমন নয়। এমন ধর্ম্মভীরু কণ্ট্রাক্টার আমি এ পর্য্যন্ত দেখিনি। তাই দেখ্‌ছ না সে আজ সাত আট বছর ধরে কণ্ট্রাক্টারি করেও কল্‌কাতায় একখানা বাড়ী ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লে না। তার কথা এই যে, সৎপথে যে চলে ভগবানের দৃষ্টি তার ওপর থাকে—চাকরী ক'রে যা হোত তার চাইতে এতে ত অনেক বেশী উপার্জ্জন হয়, তাই যথেষ্ট। তা তুমি যদি বল ত না হয় একটা পাকা লেখাপড়ার কথা তাকে বল্‌ব এখন।"

"তবে থাক্, তুমি যখন তাঁকে অমন লোক বলছ তখন আর ও সবে কাজ নেই।"

"আচ্ছা, এমাসে প্রভাস কত পেয়েছে ?"

"৩৫৲ টাকা।"

"মন্দ কি? চাকরী ক'রেও আর কতই বা পেত? তার ওপর এ স্বাধীন
র—নিজের ব্যবসা। কারও জবাবদিহিতে নেই;—যেমন খাটবে তেমনি
। হ্যাঁ দেখ, একটা কথা তোমায় বল্‌ব ভাবছিলাম—এই যে টাকাটা
দ মাসে ও পাচ্ছে, আমি বলি কি এটা মূলধন হিসাবে প্রতিমাসে ও ব্যবসাতে
করে দিক্—তাতে মূলধন যেমন বাড়্‌তে থাক্‌বে লাভের অংশও তেমনই
়বে। তুমি কি বল? ওর বা তোমার ত অন্য কোনও খরচ নেই?"

কালিকা দেবী ভ্রাতার এ সৎযুক্তিতে উৎফুল্ল হইলেন। বলিলেন—"দাদা,
চ খুব ভাল যুক্তি! আপনার লোক নইলে কি আর কেউ এমন আপন
র টানে? তবে ছেলে যখন উপার্জ্জন কর্‌ছে তখন আমাদের খুচরা খরচ
তুমি কেন দেবে? আমাকে তা থেকে মাসে মাসে ৫৲ টাকা করে দিও।"

যুক্তিই স্থির হইল। কয়েক মাসের পর হইতে কালিকা দেবী শুনিতে
গলেন, প্রভাসের আয় ৩৫৲ হইতে ৪০৲, ৪০৲ হইতে ৪২৲ ইত্যাদি ক্রমশঃ
হইতেছে। প্রভাসও শুনিল, সেটা তাহার আফিসের খাতায় জমা হই-
ছ। আসলে মাত্র পঞ্চমুদ্রা প্রতিমাসে তাহার হস্তগত হইতে লাগিল।

চারি বৎসর এইরূপে চলার পর প্রভাসের হাতখরচ ৫৲ হইতে ১০৲ টাকায়
ল, এবং মাতুল রাধানাথ বকুলবাগানে সস্তাদরে খানিকটা জমি কিনিলেন।
নীকে বলিলেন—"কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমিয়েছিলাম। আজকাল যে রকম
গার দর বাড়ছে, তা'তে টাকাটা ব্যাঙ্কে খাটানোর চেয়ে জমীতে খাটানো
ভাল।"

"তা হ'লে প্রভাসের জমানো টাকা থেকে সুবিধামত খানিকটা জমি কিনে
লে ত হয়?"

রাধানাথের মুখ ঈষৎ বিবর্ণ হইল। চকিতে আত্মস্থ হইয়া তিনি বলিলেন
সে ত ভাল কথাই। তবে কি জান সব সময় দাঁও পাওয়া যায় না। আচ্ছা,
ম সন্ধানে থাক্‌ব।"

কালিকা দেবী বলিলেন—"বিশেষ, ওর শীঘ্র বিয়ে দিব ভাব্‌ছি। ওরও
একদিন ঘর সংসার হ'বে। ঈশ্বরেচ্ছায় ছেলে পুলে নিয়ে, ওর নিজের একটা
। গোঁজবার জায়গা থাকে আমার এই ইচ্ছে। সস্তায় জায়গা কেনা থাক্‌লে
। সুস্থে একটা ছোটখাটো বাড়ী পরে ক'রে নিতে পারবে।"

রাধানাথ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—"এত দিন পরে বুঝি আমায় পর মনে কর্‌ছ?
। এ বাড়ীতে কি ও আপনার সংসার নিয়ে থাক্‌তে পারে না?"

"তা বল্‌ছি না, দাদা। আমরা যতদিন আছি ততদিন কোনও কথা নেই। কিন্তু আমরা আর ক'দিন? তোমার এ বাড়ী ত তোমার মেয়ে-জামাইয়ের হ'বে। ঘটনার কথা কিছু বলা যায় না—তাদের সঙ্গে আমার ছেলে বৌর যে চিরকাল বনিবনাও থাকবে কে বল্‌তে পারে, তাই বল্‌ছিলাম। তবে, তুমি আমার বড়, অবিশ্যি তুমি আমার চাইতে ভাল বুঝ।"

ইহার পর হইতে কালিকা দেবী পুত্রের বিবাহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন—অনেক চেষ্টার পর কটকের এক ত্রয়োদশবর্ষীয়া উকীল-কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির হইল। পাত্র পক্ষ বনিয়াদীবংশ, তবে জ্ঞাতি-বিবাদে মামলা মোকদ্দমায় কয়েক বৎসর হইতে কিছু জড়িত। তিন মাস পরে অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ স্থির হইল। রাধানাথ এত শীঘ্র বিবাহে আপত্তি করিয়াছিলেন। কালিকা দেবী কিন্তু এবার দাদার মতে মত দিতে পারিলেন না; উপরন্তু বলিলেন—"দেখ, আমি বুড়া হয়ে পড়্‌ছি—কবে আছি কবে নেই। বিশেষতঃ মেয়ের বাপেরা বড় ঘর,—প্রভাসের আর একটা অভিভাবক হ'বে বলতে গেলে। সেইজন্য দেনা-পাওনার কথা তেমন কইনি, যা' দেবে বলেছে তাতেই রাজী হয়েছি! তার ওপর তোমার এই সংসার, কচি মেয়ে—বৌ এলে সংসারের শ্রী ফিরে যাবে দেখো।" রাধানাথ মৌন হইয়া রহিলেন। প্রভাসও খুব আপত্তি করিয়াছিল। কালিকা দেবী ধমক দিয়া বলিলেন—"আমার কথার ওপর কথা কস্‌নে। আমি তোর পেটে হয়েছি, না তুই আমার পেটে হয়েছিস্? তোর ভাল মন্দ আমি তোর চেয়ে ঢের বেশী বুঝি। সবাই লক্ষপতি হ'য়ে বিয়ে করছে কি না?"

ইহার প্রায় একমাস পরে হঠাৎ একদিন প্রভাসদের কারবার দেউলিয়া হইয়া গেল। প্রভাসের অন্যতম এবং ব্যবসায়ের প্রধান অংশীদার রাধানাথের বন্ধু ভূপেন্দ্রবাবু নাকি অফিসের নামে কোনও রেল কোম্পানীর সহিত কয়লা সরবরাহের কন্‌ট্রাক্ট করিয়াছিলেন,—কয়লার দর অকস্মাৎ নামিয়া যাওয়ায় বিস্তর লোকসান হওয়ায় এই বিভ্রাট ঘটে। ভূপেন্দ্রবাবুই কারবারের 'ম্যানেজিং ডাইরেক্টর' ছিলেন—তাঁহার উপর প্রভাসেরও অগাধ বিশ্বাস ছিল—তাই সে কোনও দিন সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কোম্পানীর আয়-ব্যয়ে হস্তক্ষেপ করে নাই। কিন্তু কয়লার বাজারের অবস্থা তখন সুবিধা নয় সে কথা সে জানিত; সুতরাং জানিয়া শুনিয়া ভূপেন্দ্রবাবু উচ্চহারে কেন কন্‌ট্রাক্ট করিলেন, সে কথা সে বুঝিতে পারিল না। সেদিন সন্ধ্যার সময় সাক্ষাতে ভূপেন্দ্রবাবু বিস্তর দুঃখ

করিলেন, বিশেষ সহানুভূতি দেখাইলেন। অবশেষে বলিলেন—"দু'জনার অবস্থাই ত সমান। এখন কি কর্‌বে ঠিক করছ? বসে থাক্‌লে ত চলবে না। আমি বলি কি, কোনও চাকরীতে ঢুকে পড়, বয়স আছে—উন্নতি ক'রে নিতে পারবে। আমারই অবস্থা শোচনীয়, আমি ত আর নূতন ক'রে এ বয়সে চাকরী করতে পারব না। দেখি এদের গয়না-গাটি যা আছে, তাই বিক্রী করে টিম্‌টাম্‌ ক'রে যা হয় কিছু করব ভাব্‌ছি।" প্রভাস তখন মুহ্যমান; এক অজ্ঞাত আশঙ্কা বিকট রাক্ষসীর ন্যায় তাহার চক্ষের সম্মুখে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছিল।

ইহার কিছুদিন পরে রাধানাথ কটক হইতে এক পত্র পাইলেন। পাত্রীর পিতা লিখিয়াছিলেন—"আপনার কোনও অনুচিকীর্ষু'র নিকট হইতে বেনামী পত্রে অবগত হইলাম, প্রভাস বাবাজী ঘটনার ফেরে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। কথাটা সত্য কি না জানি না, সত্য হইলে বিশেষ দুঃখের বিষয়। যাহা হউক ইহাতে আমরা বিচলিত নহি—বিবাহের সম্বন্ধ স্থিরই আছে জানিবেন।" পত্র পড়িয়া রাধানাথের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। একবার এদিক ওদিক চাহিয়া শত খণ্ডে পত্রখানা ছিন্ন করিয়া অগ্নিমুখে সমর্পণ করিলেন।—ভগিনীর কাছে পত্রের কথা ব্যক্ত করিলেন না। তবে কথায় কথায় একদিন বলিলেন—"দেখ, প্রভাসের বিয়ের সম্বন্ধের কথা পাকাপাকিও হ'ল, আর এই সর্ব্বনাশ ঘট্‌ল। এমনি এক আধটা ইসারা ক'রেই দৈব আমাদের অনেক সময় সাবধান ক'রে দেয়। আমি বলি কি, বিয়ে কিছুদিন পরে দিও—এখনও ত বেকার, আগে ভাল করে উপার্জ্জন করতে শিখুক।"

কালিকা দেবী ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—"দাদা, আমরা যদি তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকি তা হলে অবশ্য আলাদা কথা। তোমার ছেলের যদি এ রকম হ'ত তা হলে কি এ কথা বল্‌তে?" "অবশ্যই বল্‌তাম। তা তুমি যদি মনে অন্য ভাব, তা হলে অবশ্য আর বলবার কিছু নেই।" বলিয়া রাধানাথ রণে ভঙ্গ দিলেন। কথাটা কিন্তু কালিকা দেবীর মনে বিঁধিয়া রহিল। পূজার পর রাধানাথের চেষ্টায় পোর্ট কমিশনারের অফিসে প্রভাসের ১৫৲ বেতনে একটী চাকুরী জুটিল। রাধানাথ ভাবিলেন, সংসারের যেটুকু আর্থিক সাহায্য হয়, তাহাই ভাল। পরবর্ত্তী অগ্রহায়ণ মাসে বিধাতার নির্ব্বন্ধে প্রভাস ইন্দুবালার পাণিগ্রহণ করিল।

(২)

বধূ হইলেই আর 'বধূ নহিলে ঘর অচল' হয়, তাই কালিকা দেবী বৎসরেক

পরেই ইন্দুবালাকে ঘরবসতে আনাইয়া সংসারের এবং ভ্রাতৃকন্যা লীলার ভার তাহার উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

ইন্দু ধীরে ধীরে সংসারের কাজকর্ম্ম বুঝিয়া লইল; কালিকা দেবী একটু বেশীমাত্রায় শুচিবায়ুগ্রস্তা হইলেও, অবস্থামত ব্যবস্থায় সে ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। শুধু স্বামীর কাছে তার সঙ্কোচটুকু গেল না। যথাসাধ্য সে তাঁর সেবাযত্ন করিত, কিন্তু সে 'সরমে জড়িত আঁখি' চাহি চাহি করিয়াও সে মুখের দিকে চাহিতে পারিত না, সে 'অর্দ্ধস্ফুট বাণী' আর পূর্ণস্ফুট হইবার অবকাশ পাইত না। প্রভাস তাহাতে অনুযোগ করিলে, লজ্জারুণ আনত মুখে বালিকা মৃদুস্বরে বলিত—"আমার লজ্জা করে!" মুগ্ধ প্রভাস সেই "লজ্জা করে" কথাটী শুনিবার জন্য প্রতিদিন কত কৃত্রিম অনুযোগ, কত মান-অভিমান করিত। এইরূপে বৎসরেক কাটিয়া গেল। তখনও প্রভাস সেই ১৫৲ বেতনের কেরানী।

কালিকা দেবী একদিন দুঃখ করিয়া বলিলেন—"দাদা, অভিভাবক দেখে বিয়ে দিলাম, কৈ বেয়াইরা ত জামাইয়ের কিছু করলে না। অন্য শ্বশুর হ'লে জামাইয়ের একটা না একটা হিল্লে করতই। অদৃষ্টদোষে যে সব উড়ে পুড়ে গেল, নইলে কি আর বল্‌তাম? ছেলেকে সেদিন বল্লাম, সে কি উত্তর দিলে জান? বল্লে—'মা, তুমি বড়লোক শ্বশুর দেখে ছেলে দিয়েছ, শ্বশুরও ত একটা হাত-পা-ওলা জামাই দেখে মেয়ে দিয়েছে। সে কন্যাদায় থেকেই উদ্ধার হয়েছে—তোমার ছেলের ভার নেবার জন্য ত মেয়ে দান করেনি?"

"আজকালকার ছেলেদের কথাই ঐ কালি! বলি, ছেলে জামাই কি পর? তবে সবার উপরকার কথা কি জান বোন?—ভাগ্য! কথাতেই বলে 'ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র।' বৌমাটি বাপু তোমার আদৌ পয়মন্ত নয়; তা নইলে বিয়ের সম্বন্ধ হ'তে না হ'তে আর এমন করে পুঁজিপাটা যায়? আর এই দেড় বছর ধরে ছেলে সেই ১৫৲ টাকায় পচে মরে?—সবই বিধির নির্ব্বন্ধ!"

কালিকা দেবীর মনে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাটা তোলাপাড়া করিতে লাগিল। শেষে তিনি বলিলেন—"সত্যি, এমন অলক্ষণে বৌও ঘরে এনে-ছিলাম! সবই অদৃষ্ট!"

ইহার পর হইতেই ইন্দুবালা মাঝে মাঝে শ্বশ্রূর বিরক্তির কারণ হইতে লাগিল। বালিকা সে, সাংসারিক কাজকর্ম্মে মাঝে মাঝে এক আধটু ত্রুটী হইত; কিন্তু পূর্ব্বে যে সকল ত্রুটী শ্বশ্রূ 'বোকা মেয়ে' বলিয়া মৃদু হাসিয়া

সারিয়া লইতেন, এখন সেই সব ত্রুটীতে তিনি অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া পড়েন। ইন্দু লজ্জায় ভয়ে তাড়াতাড়ি ত্রুটী সারিতে গিয়া বিপদ আরও ঘনাইয়া তুলে। ধৈর্য্যচ্যুতা হইয়া কালিকা দেবী এক একদিন বলেন—"সংসার করা তোমার কাজ নয়,মা। যারা বৌকে পুঁতুল ক'রে রাখে, তাদের ঘরেই তোমার সাজ্‌ত।" ইন্দু এক গা ঘামিয়া উঠিয়া, লজ্জায় মাটিতে মিশাইয়া যাইত। ছলছল ভাসা-ভাসা চোখ দুটী মাটীতে নামাইয়া বলিত—"আমি ত ভাল ক'রে সব কাজ জানিনে মা। আপনি শিখিয়ে দিন, আমি আপনার মত করে সব শিখ্‌ব।"

"দেড় বচ্ছর ধরেও ছাই শিখ্‌লে না ত, আর কবে শিখবে বৌমা ?" বলিয়া কালিকা দেবী চলিয়া যাইতেন। বালিকা ভয়ে জড়সড় হইয়া যাইত, মনে মনে ভাবিত—"কেন এমন হয় ? উনি শুন্‌লে কি ভাব্‌বেন ?" অতঃপর সে আরও সাবধানে প্রাণপাত পরিশ্রমে সংসারে খাটিতে লাগিল। তবু শ্বশ্রূর নিকটে ত্রুটীর নিন্দা হইতে অব্যাহতি পাইল না। এইখানে বলিয়া রাখি, ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে রাধানাথ পঞ্চমবর্ষীয়া লীলার বিবাহব্যয়সংস্থানের কথা-উপলক্ষে ভগিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া একমাত্র দাসীকেও বিদায় দিয়াছিলেন—দাসীর কার্য্যের সমুদায় ভার যে অতঃপর ইন্দুবালার উপরে পড়িল, সে কথা বোধ হয় বলাই বাহুল্য।

এই অনভ্যস্ত দারুণ পরিশ্রমেও ইন্দু একদিনও মনে কিছু ভাবে নাই। সামর্থ্যে কুলাইত না বলিয়া স্বাস্থ্যের উপর টান পড়িত—তবু সে যে স্বামীর কাছে আছে, তাঁরই সংসারে সেবা করিতেছে, সেই সুখেই তাহার চিত্তে অতুল শান্তি ছিল। বিদায়ের সময় জননী বলিয়া দিয়াছিলেন—"মা যেখানে যাচ্ছ সেই স্ত্রীলোকের তীর্থ; পতি-দেবতাই স্ত্রীলোকের সব চেয়ে বড় দেবতা!" যখন তখন তা'র সেই কথাই মনে হইত। আর এক শান্তি ছিল—লীলা। দিবারাত্র পরিশ্রমের মধ্যেও কোনও দিন সে তা'র অযত্ন হইতে দেয় নাই; ক্ষুদ্র হৃদয়ের গভীর স্নেহ দিয়া মাতৃহারার সকল অভাব সে পূর্ণ করিয়াছিল।

কিন্তু আপাত সুখের গৃহে অকস্মাৎ কোথা হইতে একদিন বিপদের কাল মেঘ ঘনাইয়া আসিল,—শেষরাত্রে লীলা দারুণ বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হইল। চিকিৎসা, সেবা, যত্ন, কিছুরই ফল হইল না; কাল রাক্ষসী দ্বিপ্রহরে বালিকাকে গ্রাস করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। ইন্দুর বদ্ধ বাহুপাশ হইতে অতিকষ্টে ছাড়াইয়া রাধানাথ সে বৃন্তচ্যুত স্বর্ণকোরককে শ্মশানভূমে ভস্ম করিয়া আসিলেন।

অতঃপর রাধানাথের যত আক্রোশ পড়িল ইন্দুবালার উপর। ভগিনীকে

বলিলেন—"কোথা থেকে এক ডান রাক্ষুসীকে বাড়ীতে এনেছিলে, কালি ?" রাধানাথ বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই গলাটা একটু চড়াইয়াছিলেন—পার্শ্বের কক্ষে কর্ম্মনিরতা ইন্দুর কর্ণে সে কথা বজ্রের ন্যায় যাইয়া বিঁধিল; মুহূর্ত্তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে ঘুরিয়া উঠিল! ব্যাত্যোচ্ছিন্নমূল তরুর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িয়া সে বলিয়া উঠিল—"হা ভগবন! তবে কি আমারই পাপ অদৃষ্টের জন্য সে গেল ?" নীচে, বসিবার ঘরে, প্রভাসের কাণেও সে কথা গিয়াছিল। ঘৃণায় লজ্জায় অর্দ্ধস্ফুটস্বরে সে বলিল—"কি অন্যায় অত্যাচার! তার অপরাধ কি ?" কিন্তু প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিতে তার সাহসে কুলাইল না।

বধূর প্রতি কালিকা দেবীর মেজাজ রুক্ষ হইতে রুক্ষতর হইয়া উঠিতেছিল। ইন্দুবালা নীরবে তার সমস্ত তীক্ষ্ণতা, সমস্ত বেদনা সহ্য করিয়া যাইত। এই কয়েক দিনে তাহার অনেক শিক্ষা হইয়াছিল। সংসারের প্রতি তা'র টানও শ্লথ হইয়া আসিতেছিল। স্নেহের, কর্ম্মের, সেবার গণ্ডী দিয়া যে সংসারকে সে এতদিন জড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছিল,—আজ সে ভাবিতেছিল সে সংসারে ত তা'র কোন অধিকার নাই, সে সংসারের সে ত কেহ নয়; এখানে, যেখানে সে গণ্ডী দিতে চায় সেইখানেই নূতন ছিদ্র দেখা দেয়, যাহাকে সে মায়া দেখাইতে যায় সে-ই ভস্ম হইয়া যায়! জীবনের প্রভাত-অরুণে সংসারে সে যে বিচিত্র রামধনু রচনা করিতেছিল, অকস্মাদাগত মাধ্যন্দিন সূর্য্যের খরকিরণে বিচ্ছিন্ন জলদজালের সঙ্গে সঙ্গে এ জন্মের মত মুহূর্ত্তে সে জীবন-বৈচিত্র্য কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে!

স্বামীকে কিন্তু এ কথা সে কিছু জানাইল না। তবে, এত দিনে তা'র মুখ ফুটিল। মনের ভাব ঢাকিতে গিয়াই তাহাকে বাহিরের সেবা-যত্ন বেশী করিয়া করিতে হইল, সাধারণ কথা দিয়াই অন্তরের কথা ঢাকিতে হইল; নহিলে বদ্ধ ব্যথা যে রুদ্ধ থাকে না! প্রভাস পত্নীর এ ব্যবহারে কিছু বিস্মিত হইল। একদিন বলিল—"কলা বৌর মুখ খুল্‌ছে যে!" হাসিয়া ইন্দু উত্তর করিল—"পরপারের ডাক আসবার সময় হ'ল, এখনও কি আর কচি খুকিটী আছি ?" সাদরে পত্নীর চিবুকখানি ধরিয়া প্রভাস বলিল—"যাক্, শুনেও সুখী হ'লাম যে আর কচি খুকী নেই—গিন্নী হয়েছ!" ইন্দু মৃদু হাসিল;—অনব্যক্ত প্রচ্ছন্ন-গভীরবিষাদরেখোদ্ভিন্ন সে হাসি প্রভাসের হৃদয় স্পর্শ করিল। সাগ্রহে পত্নীকে বুকে টানিয়া আনিয়া হাসি-ব্যথা-মাধুরী-বিজড়িত কম্পিত ওষ্ঠপুটে সে গাঢ় চুম্বন করিল। ইন্দুর সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল—শতদল শিশিরের

ন্যায় ছলছল চক্ষে ধীরে ধীরে অশ্রুবিন্দু টলটল করিয়া উঠিল। স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া সে তাহা মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল,—পারিল না; প্রভাস জিজ্ঞাসা করিল—"চোখে জল কেন ইন্দু ?"

ইন্দু মুখ তুলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় মৃদু হাসিয়া বলিল—"আমার এই বয়েস, আমায় বুড়ী বল্‌লে,—কাঁদ্‌ব না ?" প্রভাস চুম্বনের উপর চুম্বন করিয়া বলিল—"যদি বুড়ী বলে তোমায় এত কাছে পাই, তবে ত্রিসন্ধ্যা তোমায় বুড়ী বল্‌ব।" ইন্দু হাসিয়া, স্বামীর বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইয়া ছুটিয়া পার্শ্বের কক্ষে গেল। সেখানে গিয়া আর তাহার কৃত্রিম সংযম বাঁধ মানিল না,—উপাধানে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সে কাঁদিল। এতদিনের রুদ্ধ বেদনা আজ দুকূল প্লাবিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে সে বলিতে লাগিল—"স্বামি, জীবন-দেবতা! প্রতারণা ক'রে তোমার কাছ থেকে আদর নিয়েছি। আমি ত তার যোগ্যা নই, আমার ত তা'তে কোন অধিকার নেই! আমি যে রাক্ষসী, তোমাদের সংসার ছারখার করতেই এসেছি!" শ্রান্ত-দেহমনে অবশেষে বালিকা সেইখানেই নিদ্রিতা হইয়া পড়িল। নিদ্রাবস্থায় সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—যেন সে স্বর্ণপক্ষহংসবাহিত এক দিব্য রথে বসিয়া কত বিচিত্রবর্ণের মেঘের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে উর্দ্ধে উঠিতেছে। ঐ দূরে—বহুদূরে—স্বর্ণময় এক তোরণ—তোরণের সম্মুখে কে যেন দাঁড়াইয়া! রথ আরও উঠিতে লাগিল;—তোরণের সম্মুখে—সে যে তার স্বামী! প্রোজ্জল-নয়নে আনন্দ-বিস্ফারিত-মুখে তাহারই দিকে চাহিয়া তাহাকেই তিনি আহ্বান করিতেছেন। ইন্দু দূর হইতে গলবস্ত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তোরণদ্বারে পদার্পণ করিবে এমন সময় কোথা হইতে কর্কশকণ্ঠে কে যেন বলিয়া উঠিল—'সাবধান রাক্ষসি! ওখানে আর ঢুকিস্‌নে। এক সংসার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে—' অকস্মাৎ তাহার নিদ্রা টুটিয়া গেল, ভীতচকিতা ইন্দু শশব্যস্তে উঠিয়া বসিতেই কালিকা দেবীর সপ্তমে বাঁধা স্বর তাহার কানে গেল—"সংসার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিলে—এমন চণ্ডালের মেয়েও ঘরে এনেছিলাম বাপু। নিজে জলটল গিলে নিশ্চিন্তি হয়ে ঘুমুচ্ছেন, আর ঐ শ্বশুর যে সেই সাতটার সময় আফিস থেকে এসে এই এক ঘণ্টা বসে আছে—তাকে খাবার দেবার নামটি নেই। জান ত বাপু, উনি আফিস থেকে এসেই খান। তার ওপর, ঝি-চাকর নেই—ওঁর গাড়ু-গামছা, হাত-পা ধোবার জল—সে সব দেয় কে? খড় তোমার আক্কেল কম বাছা।"

অপ্রস্তুত হইয়া, থতমত খাইয়া, ইন্দু বলিল—"ওঁর গাড়ু, গামছা জল রোজ যেমন রেখে দিই আজও ত তেমনি রেখে দিয়েছি মা। তবে, হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, অন্যায় হয়েছে। কি জানি কেন আজ হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।" আসল কারণটা মনে হওয়ায় মুহূর্ত্তে তাহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল—তার ভাগ্য ভাল তাই হস্তস্থিত তৈলদীপের ক্ষীণ আলোকে শ্বশ্রূ তার মুখের বৈলক্ষণ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন না, নতুবা জেরায় ফেলিয়া কারণটা অনুমান করিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে বিশেষ কঠিন হইত না।—"এর আর কেন অ-কেন কি আছে বাছা? বড়লোকের মেয়ে, একটু খাট্‌তে হ'লেই নেতিয়ে পড়—এই আসল কথা। তা বেশ, কাল প্রভাসকে ব'লে দেব, আমার দুধ আর নিতে হবে না, সেই পয়সায় যেন একটা ঝি রাখে।" ইন্দু স্তম্ভিত, নির্ব্বাক! অতি-কষ্টে চক্ষের জল রোধ করিয়া কম্পিতপদে ধীরে ধীরে সে পাকশালের দিকে অগ্রসর হইল।

(৩)

ইন্দু ধীরে ধীরে সকল সুখ দুঃখ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু শ্বশ্রূর ভ্রূকুটি তিরস্কার নীরবে সহ্য করিলেও স্বামীর অবহেলায় সে উদাসীন থাকিতে পারিত না,—সে ব্যথা তার প্রাণে বড় বাজিত। অবশ্য প্রভাস স্বেচ্ছায় কোনও দিন তাহার মনে ব্যথা দেয় নাই। দৈন্য, দারিদ্র্য, দুরদৃষ্ট, অপরের গলগ্রহতা, মাতার ব্যবহার—সকলে মিলিয়া তাহার জীবনের রসধারা ক্রমশঃ শুষ্ক করিতেছিল। কিছুদিন হইতে সে একটা টিউসনি করিতেছিল, কিন্তু তাহাতে বিশেষ সাশ্রয় হইত না,—প্রাতঃসন্ধ্যা দুই ঘণ্টা খাটিয়া মাসিক পঞ্চমুদ্রা মাত্র! দারুণ দুশ্চিন্তায় যৌবনেই তাহার শরীরে ক্রমে ক্রমে প্রৌঢ়ত্বের ছায়াপাত হইতেছিল। ইন্দু সে আকৃতি দেখিয়া এক একদিন বলিত—"বিয়ে না করলে অর্দ্ধেক ভাবনা-চিন্তার হাত থেকে তুমি মুক্তি পেতে। আমি মরি না কেন?" প্রভাস উত্তর দিত—"সকলই পূর্ব্ব বা ইহজন্মের কর্ম্মফল। অদৃষ্টকে এড়ায় কার সাধ্য, ইন্দু? তবু তোমাকে পেয়ে এ দারুণ দুশ্চিন্তার মাঝেও একটা গভীর শান্তি আছে; জীবনের ব্যর্থতার মধ্যে একটা সার্থকতা, নিরাশার মধ্যেও আশা আছে। তুমি না থাক্‌লে সেটুকুও বুঝি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে।" ইন্দু কোন উত্তর দিত না; সে সব ক্ষণে আবার সংসারের মায়াজাল আসিয়া তাহাকে ঘিরিত, আবার তার বাঁচিয়া থাকিবার সাধ হইত। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অবশেষে সে বলিত—"শুধু তোমারই মায়া যে ছাড়্‌তে পারিনে!"

সেদিন সন্ধ্যার সময় রান্নার অবকাশে ইন্দু পথের দিকের জানালায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বৈকাল হইতে তা'র শরীরটা ভাল ছিল না, কি যেন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য, অবসন্নতা অনুভব করিতেছিল। পথে ট্রামের পর ট্রাম, গাড়ীর পর গাড়ী, জনতার পর জনতা অবিশ্রাম চলিয়াছে,—তাহারই মধ্যে সে একটী ধূলিধূসরিত শ্রান্ত ক্লান্ত মলিন মুখের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সহসা শ্বশ্রূ দূর হইতে গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"এমন নভেলি মেয়ে বাপু ত কাস্মিন্ কালেও দেখিনি! ওদিকে হাঁড়ির ভাত পুড়ে আট্‌কে হয়ে গেল, আর এ দিকে হাঁ করে বরের পথপানে চেয়ে আছেন! এই যাদু ক'রেই ছেলেকে আমার খেলে। বলে —'মা চেয়ে আপনার, তারে বলি ডান।"

তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ইন্দু পাকশালের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইল। সে কি? সে যে সবে হাঁড়িতে চাল দিয়া আসিয়াছে! কিন্তু অধিকদূর তাহাকে যাইতে হইল না, অকস্মাৎ মাথা ঘুরিয়া উঠিয়া সে ভূমিতলে সশব্দে পতিত হইল।

"সে আবার কি?" বলিয়া কালিকা দেবী শশব্যস্তে অগ্রসর হইলেন। ইন্দু তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্যা। শ্বশ্রূ বিপদে পড়িলেন; তাঁর হাতে জপের মালা, পরণে 'কাচা কাপড়',—বধূকে স্পর্শ করেন কিরূপে? রাধানাথ কিছু পূর্ব্বে অফিস হইতে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন; দ্রুত কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সম্মুখে—ধূল্যবলুণ্ঠিতা বিগতচেতনা বিষাদশ্রী কি সে অপূর্ব্ব মাধুরীমূর্ত্তি! রাধানাথ নিস্পন্দ, নিশ্চল! কালিকা দেবী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"দাদা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ কি? দেখ—আছে না গেছে?" চকিত রাধানাথ তাড়াতাড়ি জল আনিতে গেলেন, এমন সময় প্রভাস বাটীতে প্রবেশ করিল।

বিপদের দিনে লৌকিকতার শাসন থাকে না। প্রভাস মুহূর্ত্তে সে মূর্চ্ছিতার শিরোদেশ আপন অঙ্কে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাহার মুখে এবং মস্তকে বারি-সিঞ্চন করিতে লাগিল। কালিকা দেবী জনান্তিকে রাধানাথকে বলিলেন—"কি বেহায়া ছেলেপিলে দেখেছ আজকালকার? গুরুজন মানা নেই!" রাধানাথ গম্ভীরভাবে শুধু উত্তর করিলেন—"হুঁ!"

তখনও ইন্দুর জ্ঞানসঞ্চার হয় নাই। কালিকা দেবী প্রভাসকে বলিলেন—"তুই যে নিজে গেলি বাছা। বৌমা ত এখন উঠ্‌বেন না; তুই আপিসের কাপড়-চোপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এসে না হয় বসিস্—আমি ত এখানে রয়েছি।"

প্রভাস বলিল—"মা, আমি মানুষ—পশু ত নই!" মাতার সাহায্যের পরিমাণ সে প্রথম কয়েক মুহূর্ত্তেই বুঝিয়া লইয়াছিল।

কালিকা দেবী গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"এমনি করে নিজেও মর্‌বে—আমার ছেলেকেও মার্‌বে। যার যা খুসী কর্‌গে যা বাপু" বলিয়া তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন। ইন্দুর তখন ধীরে ধীরে জ্ঞানসঞ্চার হইতেছিল মাত্র, শ্বশ্রূর সে কথা স্পষ্ট তাহার কানে গেল না।

মালা জপ শেষ করিয়া কালিকা দেবী অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে স্বগতঃ বলিলেন—"বৌমা বোধ হয় আজ আর রাঁধতে পার্‌বেন না, যাই আমি নিজেই রান্না দেখিগে; ভাতের হাঁড়িটা ত পুড়ে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে. আমার ছোট পিতলের হাঁড়িটাতেও না হয় দু'বার করে ভাত হ'বে।" ইন্দু উঠিতে গিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল; মৃদুস্বরে প্রভাস বলিল—"আজ আর থাক্, একটা বেলা কোনও রকমে কেটে যা'বে।" মাকে বলিল—"মা,বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম,—আজ আফিসে খাওয়া ছিল, খেয়ে এসেছি।" কথাটা অবশ্য মিথ্যা; কালিকা দেবীর জেরায় প্রভাসকে একটা মিথ্যা ঢাকিতে আরও দুইটা মিথ্যা কহিতে হইল। রাধানাথ কক্ষান্তর হইতে বলিলেন—"কালি, আমার দুধটা আজ বৌমাকে দিও।" কালিকা দেবীর মুখ অপ্রসন্ন হইল।

এখন হইতে মাঝে মাঝে ইন্দুর এইরূপ ঘটিতে লাগিল। প্রভাসের সহপাঠী এক চিকিৎসক একদিন আসিয়া রোগিণীকে দেখিয়া বলিলেন—"দুর্ব্বলতার জন্যই এ রকম হচ্ছে। দিন কতক বিশ্রাম, খোলা হাওয়া, পুষ্টিকর খাবার হ'লে, আর মন ভাল থাক্‌লেই সেরে যাবে, নইলে কোন্ দিন হঠাৎ মারা পড়্‌তে পারেন।"

ডাক্তার চলিয়া গেলে কালিকা দেবী বলিলেন—"আজকালকার ডাক্তারদের ঐ ধরণ, বিশেষ আবার বন্ধু-ডাক্তার কি না? তা, আমাদের গেরস্ত ঘর, এমন বাবুয়ানি চিকিৎসা কোথা থেকে হবে? এ সব মনগড়া রোগ কে দেখ্‌বে বাপু? যাদের মেয়ে তারাই দেখুক গে যাক্।" পরদিনই কালিকা দেবী বৈবাহিকাকে পত্র দিলেন। ডাক্তারের শেষ কথাটায় তিনি একটু শঙ্কিতা হইয়াছিলেন, নতুবা বধূকে পাঠাইবার তাঁ'র ইচ্ছা ছিল না।

যথাসময়ে কটক হইতে উত্তর আসিল—পাঠাইবার একটা দিন স্থির করিয়া দিলেই তাঁহারা আসিয়া কন্যাকে লইয়া যাইবেন। ইন্দু স্বামীকে ধরিয়া বসিল—সে যাইবে না। প্রভাস কত বুঝাইল; ইন্দু বলিল—"দুঃখে কষ্টে যে ভাবেই

থাকি, তোমার কাছে আছি। এ অবস্থায় সেখানে যা'ব না। তার ওপর, কে যেন আমার মন থেকে বলছে, একবার ছাড়াছাড়ি হ'লে এ জীবনে আর দেখা হ'বে না।"

"কি পাগলের মত বল ইন্দু? দেখ, শরীরটা সবার আগে। দিনকতক ঘুরে এস না কেন?"

ইন্দু কিন্তু কিছুতেই রাজী নয়। অগত্যা প্রভাস মাকে সে কথা জানাইল। কালিকা দেবী বলিলেন—"শালগ্রামের ঠাকুর ক'রে সিংহাসনে বসিয়ে রেখে, কে ওঁর অষ্টপ্রহরের রকমারি ভোগের খরচ টান্‌বে?"

রাধানাথ মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন—"তা বৌমার যখন এখন যাবার ইচ্ছে নেই ত থাকুন না, পরে গেলেই হ'বে।"

সেই মর্ম্মে কটকে পত্র লেখা হইল। ইন্দুর মাতা ক্ষুব্ধা হইয়া ইন্দুকে লিখিলেন—"শুন্‌লাম তুমি আমাদের কাছে আস্‌তে চাও না—আমরা কি তোমার এতই পর হয়েছি? নাড়ীর বাঁধন ছেঁড়বার নয়, বিশেষ শুন্‌লাম তোমার শরীর খুব খারাপ। তুমি নিজে ত কিছু জানাও না? তা, না আস, আর আমরা কি বল্‌ব? আমাদের একবার দেখ্‌তেও কি তোমার আর ইচ্ছা হয় না? বিয়ের সঙ্গে বাপ-মায়ের পাওনা সব স্নেহ কি নিয়ে চলে গেছ?"—সে পত্র পড়িয়া ইন্দু—অনেক কাঁদিল; স্বামীকে পত্র দেখাইল; অনেক দুঃখ করিয়া ক্ষমা চাহিয়া তাহার উত্তর দিল; কিন্তু যাইবার প্রস্তাবে জানাইল—পরে যাইবে। মাতা বোধ হয় ক্ষুণ্ন হইলেন, নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেল,—সে পত্রের আর উত্তর আসিল না।

অবসন্ন দেহমন, পিতামাতার উপেক্ষা, শ্বশ্রূর গঞ্জনা—ধীরে ধীরে সে কুসুম-কলিকা শুষ্ক হইয়া আসিতেছিল। চিকিৎসা নামমাত্র হইতেছিল। প্রভাস কিছু বলিলে হাসিয়া সে উত্তর দিত—"মা কেবলি বলেন, তোমার কুষ্ঠীতে দুই বিয়ে লেখা আছে,—তোমার কুষ্ঠীর লেখাও নাকি ঠিক ঠিক ফলে যাচ্ছে। আমাকে বাঁচিয়ে তুমি বিধাতার লিখন কাট্‌বে? তা হতেই পারে না।" এক-দিন প্রভাস বলিল—"দেখ এটা তোমার আত্মহত্যা হচ্ছে।" ইন্দুর মুখ অকস্মাৎ গম্ভীর হইল, ধীরস্বরে সে বলিল—"তুমি ভুল বুঝছ,—হত্যা নয়, আহুতি। আমার একমাত্র সার্থকতা তা'তেই—আমি তা বুঝেছি।"

সেদিন রবিবার। রাধানাথ আহারে বসিয়াছেন, কালিকা দেবী কক্ষান্তরে পূজায় ব্যাপৃতা; ইন্দু, যদি কিছু দরকার হয় বলিয়া, বাহিরে কবাটের

অন্তরালে অপেক্ষা করিতেছিল। রাধানাথ বলিলেন—"বউমা, বাইরে কেন? ভিতরে এসে বস!" ইন্দুর পা উঠিতেছিল না। কিছু পূর্ব্বে পরিবেশনের সময় অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে সে একবার রাধানাথের প্রতি চাহিয়া তাঁহার স্থির দৃষ্টি তাহার প্রতি নিবদ্ধ দেখিয়াছিল। ইন্দু কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইল; রাধানাথ পরিতোষ পূর্ব্বক আহার শেষ করিলেন। আহারান্তে ইন্দু দ্বারপ্রান্তে পানের ডিবা রাখিয়া গমনোদ্যতা হইলে রাধানাথ হাসিয়া বলিলেন—"কেন হাতে দিতে কি ভয় হয়?"

এ কি ভাষা? স্তম্ভিত ইন্দু মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হইয়া দ্রুতপদে একেবারে আপন কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভাসের তখনও আহার হয় নাই; ইন্দুর পাণ্ডুর মুখ, বেপথু দেহলতা দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে?" আসল ব্যাপার শুনিয়া প্রভাস কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। কাল-বৈশাখীর ন্যায় সে গম্ভীর মুখ দেখিয়া ইন্দু প্রমাদ গণিয়া বাধা দিতে আসিল; তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া প্রভাস একেবারে রাধানাথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

"মামা,—আমরা নিরুপায়, দীন দরিদ্র, আপনার আশ্রিত;—সেই কথাটাই কি আমাদের জানাতে চান?"

"কেন হে বাপু? কি হয়েছে?" রাধানাথ গম্ভীরভাবে আপাত নিশ্চিন্ত মনে শয্যায় শয়ন করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন।

"তা নইলে আপনি এদের অপমান করতে সাহসী হতেন না।"

"কথা মাত্রেই স্বভাবে নিলেই সু, আবার কুভাবে নিলেই কু। তা তোমা-দের যদি এমন প্রখর আত্মসম্মানজ্ঞান হয়ে থাকে, তা হলে আর আমার স্কন্ধে চড়ে আছ কেন?"

"সেই কথাটাই শুনতে এসেছিলাম" বলিয়া প্রভাস গমনোন্মুখ হইল, এমন সময় গোলমাল শুনিয়া জপের মালা হস্তে কালিকা দেবী দেখা দিলেন। ভ্রাতা আপন পক্ষ হইতে কথাটা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেই তিনি একেবারে সপ্তমে চড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—"এ্যাঁ, শেষে এমন মানুষের নামে বদনাম? থাকত আজ বেঁচে বৌ ত ঝাঁটাপিটে করে দিত। কোথায় সে হারামজাদি, আমিই আজ তাকে দেখে নেবো।"

"থাক্, অতটায় আর কাজ নেই মা। আজ এক মুহূর্ত্তে পরাধীনতার শিক্ষা আমার খুব হয়েছে। আর নয়। যেখানে থাকি, অনশনে মরি—কালই তাকে নিয়ে আমি এ নরক ছেড়ে যাব।"

"তুই কোথায় যাবি—তার সঙ্গে ?"

"যেখানে হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর ঘর, যেখানে হোক্ তিনি দু'জনকে একটু ঠাঁই দেবেনই।"

"বেশ। কিন্তু মার প্রতি কি তোর কোনও কর্ত্তব্য নেই ? এত দিন বুকে ক'রে মানুষ করলাম, আর আজ একটা বৌয়ের জন্য তুই আমাকে ত্যাগ করবি ? এই তোর ধর্ম্ম হ'ল ?"

'মার্গাচলব্যতিকরাকুলিত সিন্ধু'র ন্যায় প্রভাস ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে বলিল, "মা, তার ইহপরকাল রক্ষা করা উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।"

"বেশ, আর মা বলে কোনও দিন আসিস্ নে। আজ থেকে জানিস্ আমি আর তোর কেউ নই।"

ব্যর্থ রাধানাথ তীব্রকণ্ঠে বলিলেন—"শোন প্রভাস, আজ রাত্রির মধ্যে যেখানে হয় মাগীকে বিদায় ক'রে দিয়ে আসতে চাও।"

প্রভাস কি ভাবিতেছিল। মাতুলের কথায় তার অস্থির চিত্ত সহসা কৃত-সংকল্প হইয়া উঠিল। "বেশ" বলিয়া কামিজটা বারান্দা হইতে টানিয়া লইয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে সে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। ইন্দুর সংজ্ঞাহীন দেহ তখন কক্ষতলে লুটাইতেছিল!

উদ্‌ভ্রান্ত প্রভাস প্রথমেই তাহার সেই বন্ধু-চিকিৎসকের নিকট গেল। কুসীদ-ব্যবসায়ে তাহারা তখন অতুল ধনের অধীশ্বর। প্রভাস আভাসে বর্ত্তমান বিপদের কথা জানাইয়া, দুই তিন মাসের জন্য বিনা ভাড়ায় তাহাদের একটী ক্ষুদ্র একতল বাটী প্রার্থনা করিল। বন্ধুর মুখ গম্ভীর হইল। সে জানাইল, পিতার বিনানুমতিতে সে কিছু করিতে পারে না; তিনি এখন কাশী হইতে অযোধ্যায় না কোথায় গিয়াছেন, মাসান্তে তিনি ফিরিলে যা হয় একটা ব্যবস্থা করিতে পারে, সম্প্রতি সে নিরুপায়, বড় দুঃখিত, ইত্যাদি। প্রভাস বুঝিল। তবু ইহার কাছে এতটা হৃদয়হীনতা সে প্রত্যাশা করে নাই। অতীত জীবনের —পাঠ্যাবস্থার—একটী চিত্র ধীরে ধীরে তাহার মানসচক্ষে ফুটিয়া উঠিল। সেই প্রথম পরিচয়, সেই অভিন্নহৃদয়তা, অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য—কর্ম্মজীবনে এই তার বিকৃত পরিণাম! দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রভাস রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। কোথায় সে যাইবে? এ দুর্দ্দিনে কে তাহাকে আশ্রয় দিবে? রাস্তার অপর পার্শ্বে একটী হিন্দুস্থানী লোহারের দোকান; ক্ষুদ্র একখানি

'খোলার' ঘর,—স্বামী স্ত্রী উভয়ে একত্র দারুণ পরিশ্রম করিতেছিল এবং দুইটি শিশু দ্বারপ্রান্তে খেলা করিতেছিল। কি সে সহজ সুখ, দ্বন্দ্বহীন শান্তির সংসার! লুব্ধ প্রভাস কতক্ষণ সে দিকে চাহিয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল—এতেও ত শান্তি, তবে ভাবি কেন? লোকাচার? বিচার যেখানে নাই সেখানে আবার আচার কি? কিন্তু,—সংস্কার? প্রভাস সংস্কারের প্রভাব এড়াইতে পারিল না। ফিরিয়া, উত্তর পথ ধরিয়া বরাবর ময়দানে আসিয়া পড়িল। কত ফিটন, কত ব্রুহ্যাম, কত মোটর, আরোহিগণের কলহাস্যে রাজপথ মুখরিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে! এত সুনিপুণ প্রসাধন, এত সুরভি-প্রবাহ, বিলাসিতার এত অনাবশ্যক বাহুল্য—শুধু কাঙ্গালের প্রতিই লোকে চাহিতে চায় না!

ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে সে গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মনের মধ্যে তখন তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। এক দিকে জননী,অপর দিকে পত্নী; এক দিকে আবাল্যের স্মৃতি, অপরিশোধনীয় স্নেহ-ঋণ—অপর দিকে ঐকান্তিক নির্ভরতা, অকৃত্রিম সেবা-ঋণ; এক দিকে শ্রদ্ধা ভক্তি, অপর দিকে প্রেম; এক দিকে কর্ত্তব্য,অপর দিকে করুণা।—কোন্ দিকে সে চাহিবে? অস্তোন্মুখ সূর্য্যের বিচিত্র কিরণ পশ্চিমগগনগাত্রে ধীরে ধীরে এক অপূর্ব্ব কুহকজাল রচনা করিতেছিল; জাহ্নবীর তরঙ্গে তরঙ্গে তাহার ছায়া অতীতস্বপ্নস্মৃতির ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রভাস বলিল—"মা, আমার সেই মা! কেন আজ আমার জীবনকে এমন জটিল ক'রে দিলে, মা?" দুইজনে দুইদিকে দাঁড়াইয়া তার জীবনকে দণ্ড করিয়া জীবনের রসসমুদ্র মন্থন করিতেছিল। সে মন্থনে শুধু হলাহলই উঠিতেছিল; নীলকণ্ঠ প্রভাসের ভাগ্যে আর সুধার আস্বাদ ঘটিল না। প্রভাস ভাবিতে লাগিল—"কর্ত্তব্য? কোনও পক্ষেই ত তা ন্যূন নয়! ভাল, জননীরই জয় হোক্। আয় মা লেলিহরসনা বিশ্বগ্রাসিনী করালিনী—তারই জীবন পণ নিয়ে সন্তুষ্ট হ'!" পরক্ষণেই স্ত্রীর সেই কাতর সজল দৃষ্টি, সেই বিষাদ-মাধুরী ছবি, সেই উৎসর্গিত মনপ্রাণ, সেই গভীর অচঞ্চল স্থির প্রেম, সেই নিতান্ত নিঃসহায় ভাব—একে একে তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। এত দুঃখের মধ্যেও সে যে শুধু তারই মুখপানে চাহিয়া বাঁচিয়া আছে! কোন্ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, কোন্ সত্যের খাতিরে সে তাহাকে চিরদিনের মত দূর করিয়া মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিতে পারে?

প্রভাস আর ভাবিতে পারিতেছিল না। সমস্ত দিন উপবাস, দারুণ দুশ্চিন্তা!—তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—

অন্তহীন প্রান্তর হীরকখচিত নীলাম্বরী সাটীর ন্যায় ধরিত্রীর অঙ্গ আবৃত করিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে।

আপন অজ্ঞাতসারেই প্রভাস গৃহাভিমুখে ফিরিল। সন্ধ্যার শীতল বাতাস করুণার হস্তলেপের ন্যায় তাহার ললাটদেশ স্পর্শ করিতেছিল। ধীরে ধীরে তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে গাঢ় কুয়াসাজাল অপগত হইতেছিল। দারুণ দুশ্চিন্তার ভার ক্রমশঃ লঘু হইয়া আসিতে লাগিল। সে তুমুল সংগ্রামের ঝঞ্চনা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল। স্বপ্নচালিতের ন্যায় যখন সে আপন কক্ষে আসিয়া উপনীত হইল, তখন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সুখ-দুঃখ, মায়া-গঞ্জনা সকলের অতীত এক গভীর নির্ব্বিকার ভাব ধীরে ধীরে তাহার চিত্ত অধিকার করিতেছিল!

কক্ষে কেহ আলো দেয় নাই—রাজপথের ক্ষীণ গ্যাস্-আলোকে ঈষদুদ্ভাসিত কক্ষতলে বসিয়া প্রভাস পত্নীর শিরোদেশ আপন অঙ্কে তুলিয়া লইল। কতক্ষণ এই ভাবে কাটিল। অবশেষে গাঢ়স্বরে প্রভাস ডাকিল—"ইন্দু!"

ইন্দু চক্ষু মেলিল।—"এসেছ? আমি তোমারই অপেক্ষা কর্‌ছিলাম। দেখ, স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম যেন অতীত ভবিষ্যতের কোটি কোটি জন্মান্তর নিয়ে আমরা এমনই রয়েছি। আর আমার কোনও দুঃখ নেই; তোমার পায়ের ধূলা দাও।"

ধীরে ধীরে তাহার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল, আর উন্মীলিত হইল না। আপন জীবন আহুতি দিয়া বালিকা তাহার স্বামীর সংসারের সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সমাধান করিল।

নিঃশব্দে একটী ছায়ামূর্ত্তি গৃহে প্রবেশ করিল। অনুতপ্ত রাধানাথ ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। ইন্দু তখন সংসারের ক্ষমা-ঘৃণার বহু ঊর্দ্ধে।

নীলনদের পুরাকাহিনী।

[লেখক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, বি-এ।]

কোটী কোটী যুগ পূর্ব্বে নীলনদ আফ্রিকার মধ্যস্থলে জন্মগ্রহণ করিয়া অনন্ত সাগরের অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। জন্মস্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছপালা দাঁড়াইয়াছিল, আর নীলনদ তাহাদেরই গাত্র স্পর্শ করিতে করিতে

কখনও বা কুলু কুলু সুরে আস্থায়ী এবং কখনও বা বজ্রনির্ঘোষ রবে অন্তরা গায়িতে গায়িতে অনন্তের পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার জন্মস্থানের চারিদিকে কত রকমের গুল্মলতাবৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারই স্তন্যপান করিয়া ভবিষ্যতে কত শত জীবজন্তুর প্রাণধারণের উপায়স্বরূপে দাঁড়াইয়াছিল। তখনও সেখানে কোনও প্রকার জীবজন্তুর উৎপত্তিই হয় নাই—কেবলই গাছ-পালা, ভীষণ অরণ্য। তখন সেখানে যেমন প্রলয়ের ভীষণ বৃষ্টি, তেমনই ভীষণ গরম। সেই বৃষ্টি ও সেই গরমের ভিতর দিয়া নীলনদ আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে করিতে সাগর-পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তার পর যখন নদটী মিশর দেশের ভিতর দিয়া সমুদ্রের কাছাকাছি আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সারা বৎসরের ভিতর তাহাতে একটী ফোঁটাও মেঘের মিষ্ট জল পড়িল না; কিন্তু তবু তাহারই জলে মিশর দেশেরও গাছপালাগুলা জন্মিয়াছিল, আর বাড়িতেছিল।

কত কাল যে এইভাবে তাহার জীবন কাটিয়াছিল তাহার কূলকিনারা কেহই ঠিক করিতে পারে না। যুগের পর যুগ চলিয়া গেল, তাহার পর ধীরে ধীরে ছোট ছোট কীট পতঙ্গ অবধি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তী গণ্ডার প্রভৃতি নানা জীবজন্তু নীলনদেরই কোলে জন্মগ্রহণ করিল, আর বর্দ্ধিত হইল। এইরূপে কত শত প্রাণী যে তাহার স্তন্যজল পান করিয়া জগতের হিতসাধন করিয়া গিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

তাহারও পরে যুগের পর যুগ চলিয়া গেল। ক্রমে নীলনদের উপকূলে মানুষ বিচরণ করিতেছে দেখা গেল। বড় বড় জীবজন্তু হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ম সেই মানুষকে কি ভীষণ সংগ্রামই করিতে হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে মানুষ শস্য বপন করিতে লাগিল এবং সেই শস্য পার্শ্ববর্ত্তী বনজঙ্গল হইতে রক্ষা করিয়া আপনাদের শরীররক্ষার এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ সুন্দর-রূপে উন্মুক্ত করিয়া ফেলিল। তখনকার সেই সকল মানুষের যে কি রকম আকার-প্রকার ছিল, তাহা আজ এই সুদূর কালের ব্যবধানে কি প্রকারে স্থির করিব? এইমাত্র বলিতে পারি যে, তাহারা বুঝিয়াছিল,—নীলনদই তাহাদের ভরণপোষণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় এবং তাহা বুঝিয়া তাহার বিষয়ে কত না ঔৎসুক্য প্রকাশ করিত! তাহারা নীলনদেরই জল পান করিয়া তাহারই উপকূলে বসিয়া কত না চিন্তার স্রোতে আপনার চিত্তকে ভাসাইয়া দিত!

আবার শত শত যুগ পরে আর এক ধরণের মানুষ আসিল। তাহাদের

বিষয় আমরা এক আধটু জানিতে সমর্থ হইয়াছি। তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু সংঘটিত হইলে তাহারা পাথরে গহ্বর কাটিয়া, তাহার উপরে চেপ্টা পাথরের দ্বারা ছাদ প্রস্তুত করিয়া সেই গহ্বরের ভিতরে মৃত ব্যক্তিদিগকে প্রোথিত করিত। তাহাদের দেহ গৌরবর্ণ এবং কেশ ইংরাজদিগের ন্যায় পাটলবর্ণ ছিল। তাহারা নীলনদের উপকূলে বাসস্থান করিয়াছিল এবং তাহার কূলে মৃত ব্যক্তিদিগকে গোর দিত এবং তাহারা ধর্ম্মবিষয়ে এতটা উন্নত হইয়াছিল যে, মানুষের পরলোকে অস্তিত্ব বিশ্বাস করিত, এইটুকু ছাড়া তাহাদের বিষয় আমরা বড় বেশী কিছু জানিতে পারি নাই। তাহারা মৃতব্যক্তিদিগের কবরে কিছু খাদ্যদ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া দিত—আশা যে, মৃতব্যক্তিগণ পরলোকে সেই খাদ্য ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করিবে এবং অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা আত্মরক্ষা করিবে। দশবিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বৃদ্ধ নীলনদ সেই সকল মানুষকে আসিতেও দেখিল, আবার বিলুপ্ত হইতেও দেখিল।

প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর এক জাতির আবির্ভাব দেখিতে পাই। ইহাদের অল্পস্বল্প ইতিহাস পাওয়া যায়। এই জাতি যখন নীলনদের উপকূলে আসিয়াছিল, তখন তাহারা উন্নতির পথে খুবই অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এখানে আসিবার পর অবধি তাহাদের উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতিই দেখা যাইতে লাগিল। কেবল তাহাদের ধর্ম্ম পূর্ব্ববৎ অবিকৃত রহিল।

মিশরদেশ নীলনদকে ছাড়িয়া দাঁড়াইতে পারে না, আবার নীলনদও মিশরদেশকে ছাড়িয়া দাঁড়াইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ! সেই পুরাকালের মিশরবাসিগণ নীলনদকে হাপি বলিয়া ডাকিত। এই হাপিকে আবার তাহারা দেবতাদের পিতা বলিয়া মানিত। তাহাদের মতে হাপি অন্তর্হিত হইলে অন্যান্য দেবতারাও মিশরদেশ হইতে অন্তর্হিত হইবেন। ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। নীলনদের পাংশুবর্ণের বৃহৎ স্রোত তাহাদের জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত দৃষ্টির সম্মুখে নাচিতে থাকিত এবং তাহারই কুলু কুলু গান তাহাদের কর্ণে সর্ব্বদাই সুধাধারা বর্ষণ করিত। তাহারা নীলনদের সেই ঘোলাজলকে গ্রীষ্মকালে হরিদ্বর্ণ ধারণ করিতেও দেখিতে পাইত, আবার বর্ষাকালে রক্তবর্ণ হইতেও দেখিত। শরৎকালে যখন নীলনদ ফুলিয়া উঠিয়া সমস্ত ভূমি ডুবাইয়া দিত, তাহাও তাহারা দেখিত। আবার যখন বসন্তে ও গ্রীষ্মে শুকাইয়া গিয়া দুই উপকূলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িত, তাহাও তাহাদের অগোচর থাকিত না। ইহারই উপকূলবর্ত্তী ডোবা প্রভৃতি হইতে তাহারা মাছ ধরিয়া খাইত,

আর ইহারই তীরবর্ত্তী বনজঙ্গলে তাহারা বন্য কুক্কুট প্রভৃতি পাখী মারিয়া নিজেদের আহারের যোগাড় করিত। আবার এই নীলনদ বহিয়া তাহারা উত্তর দক্ষিণে যাতায়াত করিত।

মোটের উপর বলিতে পারি যে, সেই নীলনদের কাদায় গাঁথা কুটীরে সেই প্রাচীন মিশরবাসিগণ বেশ সুখেই দিনযাপন করিত। যখন বন্যা সরিয়া যাইত আর মাঠগুলো প্রকাশ হইয়া পড়িত, তখন তাহারা শস্যের বীজ ছড়াইয়া দিত আর সেই সকল বীজ থেকে প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিত। মিশরবাসী সেই শস্য কাটিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিত এবং সেই সকল মাঠে গরু চরাইত। এই নীলনদেরই কল্যাণে প্রাচীন মিশরবাসিগণ ধনী হইয়া উঠিয়াছিল এবং কৃষি তাহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল বলিয়াই তাহারা অনেক কাল টিকিয়া গিয়াছিল। মরিবার সময়ে তাহারা এই বিশ্বাসকে আলিঙ্গন করিত যে, তাহারা এমন দেশে যাইতেছে যেখানে প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মে, দিবারাত্রির মধ্যে সূর্য্য অস্তগমন করে না।

নীলনদ পুরাকালে যে কেবলমাত্র সাধারণ মিশরবাসিগণের উপকারে আসিত তাহা নহে; ইহা প্রাচীন মিশরের প্রতাপান্বিত রাজাদিগেরও যথেষ্ট উপকার সাধন করিত। ইহারই বুকের উপর দিয়া রাজারা সুবর্ণমণ্ডিত সুসজ্জিত নৌকাতে ভ্রমণ করিয়া জয়ঘোষণা করিতেন।

তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ রাণী হাটযেপ্ পুরুষের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া থীব্স্ হইতে এই নীলনদের উপর দিয়াই আফ্রিকার তদানীন্তন কোনও অজ্ঞাত প্রদেশে এক নৌ-বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোনই কথা নাই। যে সুয়েজ খালের জন্য বর্ত্তমানে পাশ্চাত্যগণ বড়ই অহঙ্কার করিয়া থাকেন, তাহার কল্পনা নূতন নহে। দুই হাজার বা ততোধিক বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ একটী খালের কথা মিশরদেশের পুরাবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই নৌবাহিনী মর্ম্মর প্রস্তর, মূল্যবান কাষ্ঠ, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি নানাবিধ বস্তুসম্ভার লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, এরূপ দ্রব্যসম্ভার তাহার পূর্ব্বে কোনও দেশে দৃষ্ট হয় নাই বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

এই হাটযেপ্ রাণীই নীলনদের বক্ষের উপর দিয়া আসুয়াগ প্রদেশ হইতে স্ফটিক পাথরের কোণামাথা স্তম্ভ সকল নৌকা-সাহায্যে বাহিয়া আনাইতেন। মিশরদেশস্থ স্তম্ভগুলির মধ্যে সর্ব্বোচ্চ একটী স্তম্ভ (প্রায় একশত ফুট উচ্চ) কর্ণক নামক স্থানে এই রাণী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া আজও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা

করিতেছে। ইহারই একটী প্রাচীরে যে নৌকার চিত্র আজিও রহিয়াছে তাহা দৈর্ঘ্যে ২৭০ ফুট্ এবং প্রস্থে ৯০ ফুট ছিল বলিয়া অনুমিত হয় এবং সেই নৌকাকে তিনটী শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা টানিয়া চলিতেছে দৃষ্ট হয়। নীলনদ ছিল বলিয়াই এইরূপ বৃহৎ স্তম্ভ প্রভৃতি নির্ম্মাণ সম্ভব হইয়াছিল। কথিত আছে যে, নীলনদের বন্যার কালেই পিরামিডের সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সকল তাহাদের বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠাস্থানে আনা হইয়াছিল।

যখন যুদ্ধের কোনও কথা উঠিত না, তখন মিশররাজগণ নীলনদের উপরে আরাম-ভ্রমণে বহির্গত হইতেন।

অবশেষে সেই প্রাচীন মিশরের যুদ্ধ, গৌবব, আমোদ-প্রমোদ সকলই শেষ হইয়া গেল, যখন মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অসিরিয়া সেই সকল প্রতাপান্বিত রাজগণকে স্বীয় ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, আর প্রাসাদে মন্দিরে শোকের মলিন ছায়া পড়িতে লাগিল, তখন এই নীলনদের উপরেই মিশররাজ ফ্যারাও শেষ জলযাত্রা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। নীলনদের পূর্ব্ব উপকূল মিশরবাসীদের মতে জীবনাধার এবং পশ্চিম উপকূল মৃত্যুর রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। শেষ ফ্যারাও এই পশ্চিম উপকূলে মৃত্যুর পর চিরবিশ্রামের জন্য একটী কবর মন্দির সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ পূর্ব্ব উপকূল হইতে পশ্চিম উপকূলে মহাসমারোহে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। অনেক পুরোহিত, রাজকর্ম্মচারী এবং স্ত্রীলোক তাঁহার মৃতদেহের অনুসরণ করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার মৃতদেহ মহাসমারোহে সেই সুসজ্জিত কবরমন্দিরে চিরবিশ্রামের জন্য রক্ষিত হইল। সেই কবরমন্দিরে তিনি সশরীরে পুনরুত্থানের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী বিশ্রাম করিতেছিলেন। কিন্তু আজ বহু শতাব্দী পরে তাঁহাকে যে সেই পবিত্র বিশ্রামস্থান হইতে উঠিয়া বৈজ্ঞানিক ও পর্য্যটক প্রভৃতির হস্তের ক্রীড়নক হইতে হইবে, তাহা কে জানিত?

রবীন্দ্রনাথের উপমা।

[লেখক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।]

(১)

কথা-প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র আমায় একবার বলিয়াছিলেন,—"দেখ বাবা, তোমার রবিবাবুই বল, আর যে বাবুই বল,—এখনকার কবিতা প'ড়ে বড় একটা তৃপ্তি পাই না। মনে হয়, যেন অলঙ্কারের বাহার দেখাইবার জন্যই সে সব কবিতার সৃষ্টি। তাহা চমক দেয় বটে, কিন্তু প্রাণে লাগে না।" কথাটা যখন প্রথম শুনিয়াছিলাম, তখন তেমন বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের কবিতা এখন যত পড়িতেছি, ততই বুঝিতেছি যে, 'আধুনিক কবিতা চমক দেয় বটে, কিন্তু প্রাণে লাগে না'। বুঝিতেছি, রবীন্দ্রনাথকে 'কবিসম্রাট' প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার 'বোলপুর বিদ্যালয়ে'র জনৈক শিক্ষক 'সবুজ পত্রে' লিখিয়াছেন, "উপমা বিষয়ে যাঁহার ঐশ্বর্য্য যত বেশি, কবি-সমাজে তিনি যে তত উচ্চ আসন অধিকার করেন, এ সম্বন্ধে দ্বিমত নাই।"

বাস্তবিক, এখনকার কবিদের যত কিছু ঝোঁক উপমার উপর। পূর্ব্বে ছিল অনুপ্রাসের উপদ্রব, এখন হইয়াছে উপমার উপদ্রব। রবীন্দ্রনাথের কলম হইতে যেদিন বাহির হইল, "কবিতায় বুঝিবার কিছু নাই—এ যে কেবল গন্ধ," সেইদিন হইতে এই উপমার উপদ্রব ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। বাঙ্গালার বালখিল্য কবির দল মনে করেন যে, কতকগুলা ধোঁয়াটে ধরণের উপমা ধরিয়া ছন্দোবদ্ধ করিতে পারিলেই কবিতা রচনা হয়।

কিন্তু তাহা হয় না। উপমা—অলঙ্কার। কবিতার আসনে উহা জোর করিয়া বসিলেও সমজদারেরা উহাকে অলঙ্কার ভিন্ন কবিতা বা আর কিছু মনে করে না। "বিনা উপমায়—অন্ততঃ গদ্যে ব্যবহার্য্য কেবলমাত্র সাধারণ উপমার নামতঃ সাহায্যেও অতি উচ্চদরের কবিতা হইতে পারে। কবিতার মুখ্য উদ্দেশ্য অনুভূতিকে জাগ্রত করা। এই উপমা-বিরহিত সরল অভিব্যক্তি এক বড় কবির হাতে প'ড়ে একটা মহা কবিতায় পরিণত হয়।" বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্,' দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার

দেশ', অক্ষয়কুমারের, গিরিজানাথের ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অনেক কবিতাই এই সম্প্রদায়-ভুক্ত; আসল কথা, কাব্য-অঙ্গের অর্থ জিনিষটার শোভা সম্পাদন করাই উপমার কাজ। ঐ কাজ সম্পাদনেই উহার সার্থকতা; এবং ঐ জন্যই উহার যা' কিছু মর্য্যাদা। যে উপমা তাহা পারে না—ভাব-প্রকাশের সহায়তায় যে উপমা অসমর্থ, সে উপমা কাব্য-কণ্ঠে অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে গলগণ্ড-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সে উপমার উদাহরণের অভাব নাই। বাঙ্গালার মাসিক-পত্রগুলি খুলিয়া দেখিলেই রাশি রাশি অর্থহীন উপমা পাওয়া যায়।

তবে রবীন্দ্রনাথের কথা স্বতন্ত্র। তিনি অসামান্য প্রতিভার অধিকারী, অনন্যসাধারণ কলাকুশল। তাঁহার কবিতা-সুন্দরী অলঙ্কারের আতিশয্যে পীড়িতা হইলেও, সে অলঙ্কারগুলি যে মূল্যবান ও মনোরম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার দুষ্ট উপমাও আছে, স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহার ভাল উপমার তুলনায় সেগুলি নগণ্য। আর মন্দ উপমা নাই কাহার? অমন যে কালিদাস—উপমার ঐন্দ্রজালিক, তিনিও এ দোষ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। অতএব, এজন্য রবীন্দ্রনাথের দোষ দিই না। বরং বলিতে পারি, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গদ্য ও পদ্য রচনায় যে ভাবে দুই হস্তে অজস্র উপমা ছড়াইয়া গিয়াছেন, তেমন আর বাঙ্গালার কোনও কবি পারেন নাই। এ বিষয়ে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য। তাঁহার উপমা দশজনকে দেখাইবার জিনিষ—উপভোগের সামগ্রী। তাই ইচ্ছা করিয়াছি, বাঙ্গালী পাঠককে তাঁহার উপমা-কুসুমের মালা গাঁথিয়া উপহার প্রদান করিব।

তবে উপহার দিবার পূর্ব্বে, উপমার প্রকৃতি-সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটা কথা বলিয়া রাখি। উপমাকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক সামান্য-উপমা; দ্বিতীয় যুক্ত-উপমা। 'সামান্য-উপমাতে কেবল একটী মাত্র বস্তুর সহিত আর একটী বস্তুর সাদৃশ্য নির্দ্দিষ্ট হয়, যথা চন্দ্রতুল্য মুখ। আর যুক্ত-উপমাতে দুইটী বা তদধিক পদার্থের পরস্পরের সম্বন্ধের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হয়।' যেমন—

"কেবা নিরমিল, প্রেম-সরোবর
নিরমল তার জল
দুখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল।
গুরুজন জ্বালা জলের সিহালা
পড়সি জীয়ল মাছে

কুল পানিফল কাঁটায় সকল
সলিল বেড়িয়া আছে
কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়
ছাঁকিয়া খাই লো যদি।"

এইরূপ যুক্ত-উপমারই সৌন্দর্য্য অধিক। রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের উপমাগুলিই আমরা উদ্ধৃত করিব। তবে খুব ভাল পাইলে, তাঁহার সামান্য-উপমাও বাদ দিব না। প্রথমে তাঁহার কৈশোরের রচনা 'ভগ্ন-হৃদয়' কাব্যখানিই ধরা যাউক।

'ভগ্ন-হৃদয়ে'র প্রথম হইতেই উপমার 'হরির লুট' আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমেই এক ফোঁটা 'ভূমিকা' আছে, সেইটুকুই এক চমৎকার উপমা। লেখক লিখিয়াছেন,—

"নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মুল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটী পর্য্যন্ত থাকা চাই। বর্ত্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে।"

তারপর, পুস্তকের 'উপহার'-পত্রেও মন্দ উপমা নাই। কবি তাহাতে "শ্রীমতী হে" বলিয়া এক লম্বা 'ড্যাস' টানিয়া বলিতেছেন,—

"হৃদয়ের বনে বনে সূর্য্যমুখী শত শত
ওই মুখপানে চেয়ে ফুটিয়া উঠেছে যত।
বেঁচে থাকে বেঁচে থাক্, শুকায় শুকায়ে যাক্,
ওই মুখ পানে তারা চাহিয়া থাকিতে চায়,
বেলা অবসান হবে, মুদিয়া আসিবে যবে
ওই মুখ চেয়ে যেন নীরবে ঝরিয়া যায়!"

ইহার পর কাব্য মধ্যে অশান্ত-হৃদয় সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে—

"চরাচরব্যাপী এই ব্যোম-পারাবার
সহসা হারায় যদি আলোক তাহার,
আলোকের পিপাসায় আকুল হইয়া
কি দারুণ বিশৃঙ্খল হয় তার হিয়া!
তেমনি বিপ্লব ঘোর হৃদয় ভিতরে
হ'তেছে দিবস নিশা, জানি না কি তরে!"

এই বিপ্লবপূর্ণ হৃদয়ের অবস্থা দেখুন,—

"নবজাত উল্কা-নেত্র মহাপক্ষ গরুড় যেমন
বসিতে না পায় ঠাঁই চরাচর করিয়া ভ্রমণ,

উচ্চতম মহীরুহ পদভরে ভূমিতলে লুটে,
ভূধরের শিলাময় ভিত্তিমূল বিদারিয়া উঠে,
অবশেষে শূন্যে শূন্যে দিবারাত্রি ভ্রমিয়া বেড়ায়,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ঢাকি ঘোর পাখার ছায়ায়
তেমনি এ ক্লান্ত হৃদি বিশ্রামের নাহি পায় ঠাঁই,
সমস্ত ধরায় তার বসিবার স্থান যেন নাই।"

করুণ হাসির ছবি—

"ও হাসি কোথায় তুই শিখেছিলি বোন?
বিষণ্ণ অধর দুটি অতি ধীরে ধীরে টুটি
অতি ধীরে ধীরে ফুটে হাসির কিরণ।
অতি ঘন মেঘমালা ভেদি স্তরে স্তরে, বালা,
সায়াহ্ন জলদ প্রান্ত দেয় যথা দেখা
ম্লান তপনের মৃদু কিরণের রেখা।"

উদাসীনে আত্ম-সমর্পণ—

"সে কিরে, অবোধ মেয়ে, বারেক দেখিবে চেয়ে?
জানিতেও পারিবে না যাইবে সে চলে,
যূথিকা হৃদয় তোর ধূলি সাথে দোলে।
নিশীথের উদাসীন পথিক সমীর
শূন্য হৃদয়ের তাপে হইয়া অধীর,
কুসুম-কানন দিয়া যায় যবে বোয়ে,
আকুলা রজনীগন্ধ কথাটি না কোয়ে,
প্রাণের সুরভি সব দিয়া তার পায়,
পরদিন বৃন্ত হোতে ঝরে পড়ে যায়।
মেঘের দুঃস্বপ্নে মগ্ন দিনের মতন
কাঁদিয়া কাটিবে কিরে সারাটি যৌবন?"

দুঃখের জীবন—

"যে মেঘ মাঝারে থাকি উদিলি প্রভাতে
সেই মেঘ মাঝে থাকি অস্ত গেলি রাতে।"

সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত জীবন—

"সুখ দুঃখ দিনরাত মিলিয়া উভয়ে
রেখেছে সায়াহ্ন করি এ শান্ত হৃদয়ে।
হেন আলিঙ্গনে তারা রয়েছে সদাই
যেন তারা দুটি সখা, যেন দুটি ভাই!

জোছনা ও যামিনীতে প্রণয় যেমন
তেমনি মিলিয়া তারা রোয়েছে দুজন।"

কপট প্রেম—

"শুনেছি সে বালা, সারাটি জীবন
চড়িয়া পাষাণ-রথে,
চাকায় দলিয়া চলিবারে চায়
হৃদয়-বিছানো পথে।"

তৃষিত হৃদয়—

"সমুদ্র চাহিয়া থাকে আকাশের পানে,
আকাশ সমুদ্রে চায় অবাক্ নয়ানে,
তেমনি দোঁহার হৃদি হেরিবে দোঁহায়।"

প্রণয়িনীর উদ্দেশে—

"সে মোর সন্ধ্যার দীপ, কোথা গেল বল্ !
একটি আঁধার ঘরে একাকী সে জ্বলিত রে
সন্ধ্যার দীপের মত বিষণ্ণ উজ্জ্বল।"

এই 'ভগ্ন-হৃদয়' কাব্যে আরও উপমা আছে, কিন্তু সেগুলি তেমন ভাল নহে। যেগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, সেগুলিও যে অতি চমৎকার উপমা, এমন বলি না। তবে যে বয়সে কবি ইহা লিখিয়াছেন, সে বয়স মনে করিলে এ উপমায় যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়, তা ছাড়া বহিখানি এখন লুপ্ত হইয়াছে,—বাজারেও পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের অনেক ছাইভস্ম যখন পুনর্মুদ্রিত হইতেছে, তখন এ বহিখানি না ছাপার কারণ বুঝিতে পারি না। বহিখানি নীতি হিসাবে মন্দ হইলেও ইহার স্থলে স্থলে এমন চমৎকার কবিত্ব আছে, যাহা অপ্রকাশিত রাখিতে কষ্ট বোধ হয়। সে উপাদেয় অংশ পাঠকের চক্ষুর সম্মুখে একবার ধরিব, ইচ্ছা রহিল। আজ এই পর্য্যন্ত।

স্মরণে।

[লেখক—শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।]

সে দিনের কথা এযে—ঝরেনি সে ফোটা ফুল,
ধ্বনিছে বাঁশরী তান, নহে স্বপ্ন—নহে ভুল!
এখনো সম্মুখে সেই প্রাণভরা প্রীতি, স্নেহ,
কি মত্ততা—মধুরতা—অসীম অপরিমেয়!

আশ্বিন এসেছে ফিরে কালচক্র ভেদ করি',—
ফিরে চাই, তুমি নাই,—আর সব আছে পড়ি।
—কঠোর মানব প্রাণ, নিঠুর নির্ম্মম অতি,
নিমেষে ভুলিয়া যায়, হায় নর মূঢ়মতি!

হেসেছিনু খেলেছিনু এই দিনে গত বর্ষে,—
কহেছিনু কত কথা, হৃদি খুলে প্রীতি-হর্ষে!
তখন ত বুঝি নাই, সেই তব শেষ ভাব,
সেই দেখা শেষ দেখা,—এত শীঘ্র সর্ব্বনাশ!

তুমি নাই—তুমি নাই! আমরা আছিত বেশ,
বিগত বরষা-নিশা বিগত বিরহ-ক্লেশ!
সহযাত্রী অগ্রসরি' গেলে তুমি পুণ্যবান!
মায়া-মোহে বদ্ধ আমি কোথা ত্রাণ, ভগবান!

শিশুপালন।

[লেখিকা—শ্রীমতী নলিনী ব্রেয়ার এল, এস্, এ, (ইংলণ্ড)
ও শ্রীমতী জানকী মজুমদার।]

(২)

গতবারে বিশুদ্ধ বায়ু, উত্তাপ ও পরিচ্ছন্নতা শিশুর পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয়, তাহা আমরা বলিয়াছি। বর্ত্তমান অধ্যায়ে শিশুদিগের পোষাক-পরিচ্ছদ, বিশ্রাম ও নিদ্রার বিষয় বলিব।

পোষাক-পরিচ্ছদ।—দেহের উত্তাপ-রক্ষা যেমন আবশ্যক, পোষাক-পরিচ্ছদও তেমনই দেহের উত্তাপ-রক্ষার উপযোগী হওয়া উচিত। কাপড়-চোপড় খুব শুষ্ক না হইলে উহা শিশুদিগের গায়ে দিতে নাই। শিশুদের মাংস-পেশী ও অস্থি স্বভাবতঃ অপরিপক্ক বা কাঁচা; সুতরাং উহাদের গায়ে গুরুভার

পোষাক-পরিচ্ছদ দেওয়া উচিত নয়। এগুলি যত সাদাসিদা ধরণের ও আল্‌গা হয়, ততই ভাল।

বিশ্রাম।—কচি কচি শিশুরা বিছানাতেই থাকুক, আর কোলেই থাকুক, তাহাদিগকে সর্ব্বদা শোয়াইয়া রাখিবে। উহাদের হাড় কাঁচা এবং মাথাটা দেহের বাকী অংশের চেয়ে ভারী। বিশেষতঃ উহাদের পিঠে ও ঘাড়ে জোর বড় কম। সেইজন্য উহাদিগকে তুলিতে হইলে উহাদের ঘাড়টা ধরিতে হয়; তাহা হইলে মাথাটা একটা ভর পায়। উহাদিগকে তুলিতে হইলে খুব আস্তে আস্তে সে কাজ করা উচিত। কোনও রকমে সামান্য ঝাঁকুনী যাহাতে না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখাও উচিত। বিছানায় শোয়াইবার সময়েও আস্তে আস্তে শোয়ান দরকার, তা' কি জাগন্ত বা কি ঘুমন্ত অবস্থায়। খাইবার সময় না হইলেও যদি কচি ছেলেরা কাঁদে, তাহা হইলে তখনই উহাদিগকে বিছানা থেকে তুলিয়া লওয়া উচিত। কান্নার অভ্যাস করান বড় খারাপ।

নিদ্রা।—কচি কচি শিশুদিগকে সারারাত্রি ঘুমাইতে অভ্যস্ত করা উচিত। রাত্রিতে শিশু অবস্থায় খাবারের জন্য যাহাদের ঘুম ভাঙ্গে, তাহাদের সে অভ্যাস বড় হইলেও যায় না। শিশুদিগকে চিৎ করিয়া না শোয়াইয়া পাশ ফিরাইয়া শোয়ানই ভাল। সামান্য সামান্য গোলমালের মাঝে যাহাতে শিশুর ঘুমের অভ্যাস হয়, সে চেষ্টা করা ভাল। শিশুকে মায়ের বিছানায় শোয়াইবে না; মায়ের বিছানার কাছে আলাদা একটী ছোট বিছানায় তাহাকে শোয়ান উচিত। শিশুরা সারারাত্রি ঘুমাইবে; তা' ছাড়া দিনে যত বেশী ঘুম হয়, ততই ভাল।

বিচ্ছেদে।

[লেখক—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্‌-এ]

(কাপ্তেন ডি.এল্‌. রিচার্ডসন রচিত ইংরাজী কবিতা হইতে)

মিলন মোদের নাহি হ'বে আর,
দীর্ঘ ব্যবধান মাঝেতে, জানি,
শুনিব না আর শ্রীমুখে তোমার
মরমের কথা,—প্রেমের বাণী;—
তথাপি বিরহে—আমরা দু'জন
ভাসিব প্রেমের সোনার স্বপনে,
দ্বিধা বিখণ্ডিত, আকাশে যেমন,
হাসে নবঘন, তপন-কিরণে।

"কৃষ্ণ চরিত্র"।

[লেখক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।]

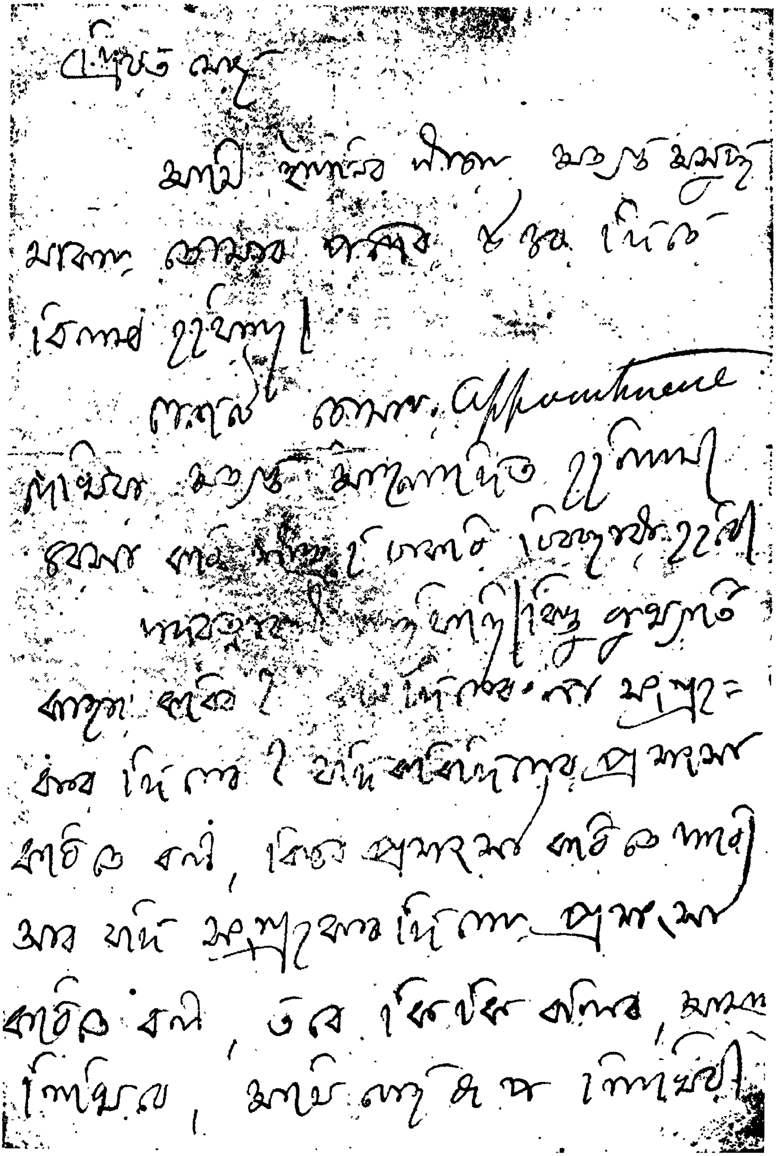
এই রচনার শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের যে একখানি পত্র ছাপা হইয়াছে, তাহা তিনি তাঁহার প্রিয়শিষ্য সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন। পত্রখানি আমরা শ্রীশবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র, আমাদের পরমসুহৃৎ সুলেখক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র মজুমদারের নিকট হইতে পাইয়াছি। এজন্য প্রথমেই তাঁহার নিকট আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

দুইটী কারণে পত্রখানি ছাপা হইল। প্রথম কারণ—বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তাক্ষর বলিয়া। দ্বিতীয় কারণ—'কৃষ্ণ চরিত্রে'র কথা আছে বলিয়া। তাঁহার 'কৃষ্ণ চরিত্রে'র মূল উপাদান কি, তাহা অতি সংক্ষেপে ইহাতে বিবৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণ চরিত্র সম্বন্ধে ইহার পূর্ব্বে কিন্তু বঙ্কিমবাবুর অন্যরূপ অভিমত ছিল। সে অভিমত আমরা তাঁহার তৃতীয় বর্ষের 'বঙ্গদর্শনে' দেখিতে পাই। পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ সে মতটাও এখানে উদ্ধৃত করিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র তখন লিখিয়াছিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় রাজনীতিবিদ্‌ সাম্রাজ্যের গঠন বিশ্লেষণে বিধাতৃতুল্য কৃতকার্য্য—সেইজন্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া কল্পিত। শ্রীকৃষ্ণ ঐশিক শক্তিধর বলিয়া কল্পিত, কিন্তু মহাভারতে ইনি অস্ত্রধারী নহেন, সামান্য জড়শক্তি বাহুবল ইঁহার বল নহে; উচ্চতর মানসিক বলই ইঁহার বল। যে অবধি ইনি মহাভারতে দেখা দিলেন, সেই অবধি এই মহেতিহাসের মূল গ্রন্থি-রজ্জু ইঁহার হাতে—প্রকাশ্যে কেবল পরামর্শদাতা—কৌশলে সর্ব্বকর্ত্তা। ইঁহার কেহ মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, কেহ অন্ত পায় না, সে অনন্ত চক্রে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। ইঁহার যেমন দক্ষতা, তেমনই ধৈর্য্য। উভয়েই দেবতুল্য। পৃথিবীর বীরমণ্ডলী একত্রিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত; যে ধনু ধরিতে জানে সেই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবদিগের পরমাত্মীয় হইয়াও, কুরুক্ষেত্রে অস্ত্র ধরেন নাই। তিনি মানসিক শক্তি মূর্ত্তিমান, বাহুবলের আশ্রয় লইবেন না। তাঁহার অভীষ্ট, পৃথিবীর রাজকুল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, একা পাণ্ডব পৃথিবীশ্বর থাকেন; স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয়ের নিধন না হইলে তাহা ঘটে না; যিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া কল্পিত, তিনি, স্বয়ং রণে প্রবৃত্ত হইলে, যে

পথাবলম্বন করিবেন, সেই পক্ষের সম্পূর্ণ রক্ষা সম্ভাবনা। কিন্তু তাহা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। কেবল পাণ্ডবদিগকে একেশ্বর করাও তাঁহার অভীষ্ট নহে। ভারতবর্ষের ঐক্য তাঁহার উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত; খণ্ডে খণ্ডে এক একটি ক্ষুদ্র রাজা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া পরস্পরকে ক্ষীণ করিত, ভারতবর্ষ অবিরত সমরানলে দগ্ধ হইতে থাকিত। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে এই সসাগরা ভারত একচ্ছত্রাধীন না হইলে ভারতের শান্তি নাই। শান্তি ভিন্ন লোকের রক্ষা নাই, উন্নতি নাই। অতএব এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর বিদ্বেষী রাজগণকে প্রথমে ধ্বংস করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই ভারতবর্ষ একায়ত্ত, শান্ত এবং উন্নত হইবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাহারা পরস্পরের অস্ত্রে পরস্পরে নিহত হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল। ইহারই পৌরাণিক নাম পৃথিবীর ভার মোচন। শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া, এক পক্ষের রক্ষা চেষ্টা করিয়া, কেন সে উদ্দেশ্যের বিঘ্ন করিবেন? তিনি বিনা অস্ত্রধারণে, অর্জ্জুনের রথে বসিয়া, ভারত রাজকুলের ধ্বংস সিদ্ধ করিলেন। এইরূপ, মহাভারতীয় কৃষ্ণ-চরিত্র যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই তাহাতে এই ক্রূরকর্ম্মা দূরদর্শী রাজনীতিবিশারদের লক্ষণ সকল দেখা যাইবে।"

এই মত-পরিবর্ত্তন বঙ্কিমবাবু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াও গিয়াছেন—'কৃষ্ণ চরিত্র' পুস্তকের 'দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনে' তিনি লিখিয়াছিলেন,—"এরূপ মত পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে আমি লজ্জা করি না। আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত-পরিবর্ত্তন করিয়াছি—কে না করে? কৃষ্ণ বিষয়েই আমার মত পরিবর্ত্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণ চরিত্র লিখিয়াছিলাম আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যতদূর প্রভেদ, এতদুভয়ে ততদূর প্রভেদ। মত-পরিবর্ত্তন, বয়োবৃদ্ধি অনুসন্ধানের বিস্তার, এবং ভাবনার ফল। যাঁহার কখনও মত পরিবর্ত্তিত হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞান বিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন। যাহা আর সকলের ঘটিয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে আমি লজ্জাবোধ করিলাম না।" এ স্বীকারোক্তি সাহিত্য-সংসারে দুর্ল্লভ।

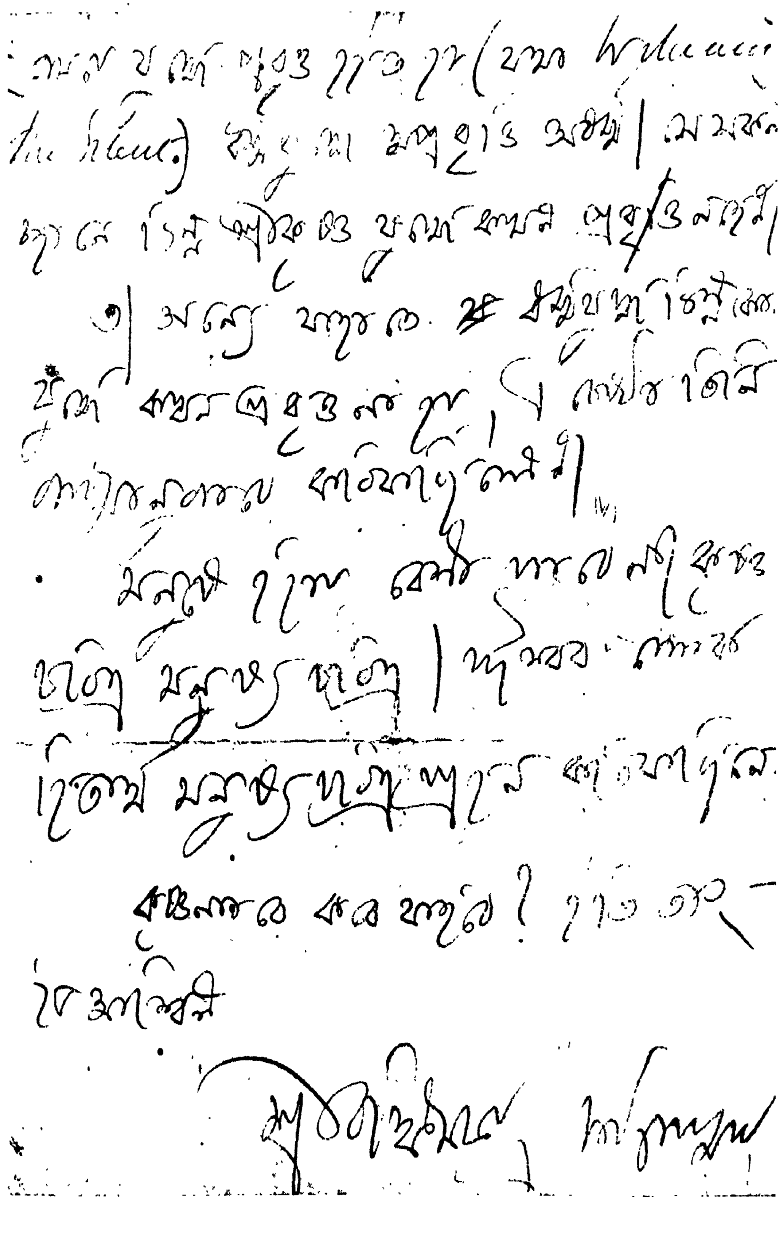


স্বামী এবং [illegible] যখন [illegible]
এমন কি [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] করিবে না, এবং [illegible]
[illegible] [illegible] লিখিয়া রাখিনি। এমনকি
তোমরা যাহার লিখিতে বলিলে,
লিখিলাম।

কাগজ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছ, এখন
আমার উত্তর সংক্ষেপে লিখিয়া দিলাম। আমি
যাহা লিখিয়াছি (প্রবন্ধাদি ও কবিতা) ও যাহা
লিখিব, তাহা [illegible] [illegible] প্রকাশিত
হইবে।

১। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

২। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]





বঙ্কিমচন্দ্র

F. A. P. S. C

উন্মত্ত।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

(১)

"বাবা অসুখ করেছে কেন?"

"ভগবান রাগ করেছেন ব'লে।"

"ভগবান রাগ করেছেন কেন?"

"দোষ করেছি ব'লে। মন্দ কাজ করলে, মন্দ কথা বল্‌লে, মন্দ কথা মনে ভাবলে ভগবান রাগ করেন। তখন অসুখ করে, বেদনা হয়, কষ্ট হয়, সুখ থাকে না? বুঝ্‌লে বাবা?"

তখন আমি পাঁচ বছরের শিশু। রুগ্ন পিতার কথাগুলা সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই, তবু তাঁহার উপদেশের সারাংশ বোধগম্য হইয়াছিল। পিতার আদর্শ চরিত্র ছিল। তিনি সর্ব্বদাই আমাকে উপদেশ দিতেন।

সেই শিক্ষার ফলে পৃথিবীর সকল বিষয়ের এক একটা আদর্শ ছবি আঁকিয়া কাল যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। পিতার মৃত্যুর পর ছোট ভাইটিকে আদর্শরূপে প্রতিপালন করিব; শিক্ষা দ্বারা, উপদেশের দ্বারা তাহার যে চরিত্র ফুটিয়া উঠিবে, তাহা আদর্শ হইবে এই আশা লইয়া জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করিতাম। মনে মনে গর্ব্ব করিতাম আমার সহোদর আধুনিক যুগের বালকদের মত উচ্ছৃঙ্খল হইবে না। যে দিন প্রথম সেই গর্ব্বে আঘাত লাগিল সে দিন কি বিষে মনপ্রাণ জর্জ্জরিত হইয়াছিল, সে কথা স্মরণ করিলে আজিও বেদনা পাই।

আমি ঘরে বসিয়া পড়িতেছিলাম, বাহিরে বারান্দায় আমার স্ত্রীর সহিত শরৎ কথা কহিতেছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ আর্দ্র—বরষার জলে ভিজিয়াছে—মুখে একমুখ হাসি, ওষ্ঠে খুব গর্ব্ব। আমি মনে করিলাম শরৎ ফুটবল খেলায় জয়লাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় এত গর্ব্বিত। আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল—একি এত ভিজে এলে কোথা থেকে?

শরৎ বলিল—মাঠ থেকে। খেল্‌তে গিয়েছিলাম। আজ বড় মজা হ'য়েছে।

স্ত্রী বলিল—একটু হ'য়েছে তা বুঝছি। খুব হাসছ দেখছি। কাদের হারিয়েছ?

শরৎ বলিল—সে তো রোজ জিতি। আসবার সময় খুব মজা হ'য়েছে। আমরা সব ভিজে কাপড়ে ট্রামের পিছনে দল বেঁধে দাঁড়িয়েছিলাম। চারজন কণ্ডাক্টারকে ফাঁকি দিয়েছি। আমি পয়সা—

একটা তীব্র বেদনায় জ্ঞানলোপ পাইবার উপক্রম হইল। বোধ হয় একসঙ্গে পাঁচটা বৃশ্চিক দংশন করিলে অত বেদনা অনুভব করিতাম না। আমার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতে লাগিল।

ভ্রাতাকে যথেষ্ট উপদেশ দিলাম। সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নূতন উৎসাহে ভ্রাতাকে আদর্শ পথ দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। তাহাকে নূতন বন্ধু সংগ্রহ করিতে পরামর্শ দিলাম। ফলে একদিন যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার বুক দশ হাত হইল। প্রাণের মধ্যে বড় আনন্দ উপভোগ করিলাম।

একটা কুশীদজীবী কাবুলিওয়ালা আমাদের পাড়ার প্রান্তে একটী গোয়ালাকে নির্য্যাতন করিতেছিল। আমি বারান্দায় বসিয়া দেখিতেছিলাম। আমার মনের মধ্যে অনেক প্রকারের সাধু সংকল্প জাগিতেছিল। প্রত্যেক সংকল্পটিই আদর্শ। নিজের বাক্স হইতে দশটা টাকা বাহির করিয়া ক্লিষ্ট নিতাই গোপকে উদ্ধার করিবার বাসনাও যে প্রাণের মধ্যে উত্থিত হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু উঠিয়া সেই অজ্ঞ ইতর লোকদিগের জনতার মধ্যে যাওয়া ঠিক ভদ্রলোকের আদর্শ চরিত্রের উপযোগী কি না তাহা নির্দ্ধারণ করিতে সময় লাগিতেছিল। হঠাৎ দেখিলাম, সেই ভিড়ের মধ্যে শরৎ প্রবেশ করিয়াছে। সে কাবুলিওয়ালার হাত ধরিয়া বলিল—ইস্‌কে ছোড়ো।

একটা পঞ্চদশবর্ষীয় বাঙ্গালী যুবকের বীরত্বে কাবুলী স্তম্ভিত হইয়াছিল। বোধ হয় তাহার পার্ব্বত্য জন্মস্থান ত্যাগের পর তাহার জুলুমের কার্য্যে সে অদ্যাবধি এরূপ বাধা পায় নাই। সে বলিল—বাবু হামারা রূপেয়া?

শরৎ বেশ তেজের সহিত বলিল—রূপেয়া ধারতা তো কোর্টমে যাও, মুখসে মাঙ্গো, ইস্‌মাফিক্ জুলুম নেহি চলেগা! খবরদার।

কাবুলি শরৎকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিল। সাহস পাইয়া এবার দর্শকমণ্ডলী শরতের পক্ষ সমর্থন করিল। একজন বলিল—ঠিক বাৎতো, তোমারা যদি টাকা পাওনা হায় তো আদালতমে কেন যাতা নেই?

আমাদের পাড়ার মুদী বলিল—হ্যাঁ তোম লোককা ঐ রকমই স্বভাব হায়। টাকা ধার দেনেকা সময় তো বেশ মিষ্টি মিষ্টি বাৎ বোলতা হায়।

দত্তদের নফর খানসামা বলিল—হ্যাঁ ছুঁচ হোকে ঢুকতা হায় ফাল হোকে বেরোতা হায়।

এবার সকলে হাসিল। নিজ পল্লীতে সাহেবের শিকারী কুকুর প্রবেশ করিলে গ্রাম্য কুকুরের দল যেমন তাহাকে বিরক্ত করে, কাবুলিওয়ালার সেই দশা হইল। সে কিন্তু অপর কাহারও কথার জবাব দিল না। শরতের দিকে চাহিয়া বলিল—আচ্ছা বাবু আপ্ ইসকো পুছো কব রূপিয়া দেগা।

শরৎ বলিল—এ বাৎ বহুৎ আচ্ছা হায়।

সে তাহাদের বিবাদের মীমাংসা করিল। কাবুলি তাহাকে সেলাম করিল, শরৎ হাসিমুখে তাহাকে সেলাম করিয়া গৃহে আসিল।

আমি তাহার কার্য্যটার অনুমোদন করিতেছিলাম বটে, কিন্তু মনে মনে সন্দেহ হইতেছিল যে ইতর লোকের মধ্যে অমনভাবে মিশিলে বোধ হয় সম্ভ্রান্ততার হানি হয়। আমি তাহাকে বলিলাম—হ্যাঁ লোককে উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করা—কিন্তু ছোট লোকদের—

শরৎ বলিল—দাদা মনের পাপের চেয়ে কাজের পাপ যেমন অধিক ঘৃণার বিষয়, তেমনি মনের সাধু বৃত্তির চেয়ে সাধু বৃত্তির কার্য্যে পরিণতি অধিক প্রশংসনীয়।

তাই বলিতেছিলাম, সে দিন আমার বুকটা দশ হাত হইয়াছিল।

(২)

আদর্শের জন্য মরিতাম, তাই ভ্রাতার প্রথম যৌবনে চরিত্রের উন্মেষণের সময় মনের মধ্যে নীরবে অনেক সুখদুঃখ অনুভব করিতাম। হায় হায়! তখন কেন বুঝি নাই যে মানবচরিত্র ঐ রকম করিয়াই বিকশিত হয়। ছাগল শিশুর মত উঠিয়া পড়িয়া অবিরত চেষ্টা করিতে করিতে মানুষ দেবতা কিম্বা পশু হয়। আমি বড় একটা কাজ করিতে পারিতাম না,—বাল্যাবধিই ভাবপ্রবণ এবং চিন্তাশীল। বাল্যে যখন অপর বালকেরা ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিত, আমি তখন পিতার বামহস্তের তর্জ্জনী ধরিয়া বৃদ্ধের মত ধীরে ধীরে বেড়াইতাম এবং মনে মনে সমবয়স্ক শিশুদের কার্য্যকলাপের সমালোচনা করিতাম। কতক শিক্ষার গুণে, কতক জন্মগত সংস্কারের বশে প্রত্যেক বিষয়ে শৃঙ্খলা দেখিতে ভাল লাগিত। মনের মধ্যে প্রত্যেক বিষয়ের এক একটা আদর্শ গড়িয়া তুলিয়াছিলাম। শরৎ রজঃ-প্রধান ছিল—সে কাজ করিত! তাই যেদিন তাহার কার্য্যের ফল তাহাকে আদর্শের দিকে অগ্রসর করিতেছে বুঝিতাম, সেদিন বড় সুখানুভব করিতাম, আর যেদিন বুঝিতাম যে সে আদর্শ পথ বিচ্যুত হইতেছে সে দিন বড় কষ্ট পাইতাম, ভ্রাতাকে নিকটে ডাকিয়া সুশিক্ষার দ্বারা তাহার চরিত্র সংশোধন করিবার প্রয়াস করিতাম।

আমি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলাম বলিলে অত্যুক্তি করা হয়। সঙ্গীতে বড় মুগ্ধ হইতাম। কিন্তু আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমাদের দেশে যে সকল লোক সঙ্গীতকলার চর্চ্চা করে তাহাদের স্বভাব মন্দ। দূর হইতে সঙ্গীত উপভোগ করিতাম, সুশ্রাব্য গীতবাদ্যে মন প্রফুল্ল হইত; কিন্তু যাহারা সঙ্গীতশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন তাহাদের সহিত সখ্যতা করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতাম। সারাদিনের পরিশ্রমের পর নিজের গৃহে শুইয়াছিলাম। জানালার গরাদের ভিতর দিয়া ধপ্‌ধপে চাঁদের আলো আসিয়া গৃহের স্থানে স্থানে পড়িতেছিল। কতকটা আমার সহধর্ম্মিণীর মুখের উপর পড়িয়া তাহার মুখখানিকে খুব উজ্জ্বল করিতেছিল। দূরে কোনও লোক হারমোনিয়ম বাদ্যযন্ত্রে রাগিণী আলাপ করিতেছিল—এলোমেলো সঙ্গীত, কখন ইমন আবার তখনই ভৈরবী, দুই চারিটা ভৈরবীর তান তুলিয়া তখনই আবার কাফি সিন্ধু—এই রকম ভাবে আলাপ করিতেছিল। তাহাতে সঙ্গীতটা আরও উন্মাদক হইয়া উঠিতেছিল। বেশ বাতাসের সঙ্গে শূন্যে একটা সুরের তাল উঠিতে উঠিতে হৃদয়ের তারগুলা যেমন সেই সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, অমনি সে সুরটার পরিবর্ত্তে আবার আর একটা সুরের তান উঠিল, পুরাতন সুরের অভাবটার জন্য প্রাণটা একটু ব্যথিত হইয়াই আবার নূতন সুরের সহিত রফা-রফিয়ত করিয়া লইল। শেষে লোকটা আলাপ ছাড়িয়া থিয়েটারের গান বাজাইতে লাগিল—পাঁচটা রাগিণীর মিশ্রণে জঙ্গলা সুর—কিন্তু বড় শ্রুতিমধুর, বড় উপভোগ্য। হঠাৎ স্ত্রী বলিয়া উঠিল—ও সুরটা আমি জানি।

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি জান?

স্ত্রী হাসিয়া বলিল—সেদিন শুনেছি, বেশ সুরটা। থিয়েটারের গান।

আমি বলিলাম—তুমি জানলে কোথা থেকে?

স্ত্রী বলিল—কেন সেদিন ঠাকুরপো বাজাচ্ছিল।

আমি বলিলাম—অ্যাঁ! কে বাজাচ্ছিল?

স্ত্রী বলিল—ঠাকুরপো—তোমার ভাই। কি হ'ল ভূত দেখলে নাকি?

আমি শয্যার উপর উঠিয়া বসিলাম। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কল্যাণী বলিল—ওকি ওরকম করছ কেন? হঠাৎ কি বিছে কামড়ালো নাকি? কিগো কি হ'য়েছে?

সেও বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিল। আমি ধীরে ধীরে বলিলাম—কে? শরৎ—শরৎ হারমোনিয়ম বাজাতে শিখেছে? বল কি! কি সর্ব্বনাশ!

কল্যাণী বলিল—এতে আবার সর্ব্বনাশের কথা কি আছে? বেটাছেলে

বন্ধুর কাছে গান বাজনা শিখছে, এতে আবার সর্ব্বনাশের কথা কি? বেশ মিষ্টি হাত! তোমার তো কোন গুণ নেই—কেবল সব কথায় বক্তৃতা আর উপদেশ।

মূর্খ! তাহার সহিত তর্ক নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিলাম। মনের মধ্যে কথাটা আন্দোলন করিতে লাগিলাম। ভ্রাতা নিজের প্রবৃত্তির বশে কাজ করিতে শিখিয়াছে। অভিজ্ঞতাশূন্য যুবক আদর্শ-পথ ছাড়িয়া সংসারের নানা পথের অনুসন্ধান পাইয়াছে, কি সর্ব্বনাশ! গীতবাদ্য—থিয়েটারের গান—যে গান হীনচরিত্র বারাঙ্গনা—ছিঃ ছিঃ কি ভয়ঙ্কর!

কল্যাণী বলিল—কি হ'ল কি? অমন ক'রে কপাল কুঁচকো না, ভয় হয়। কেন তুমি তো গান-বাজনা শুন্‌তে ভালবাস, এই তো এখনি ঐ বাজনা তন্ময় হয়ে শুনছিলে—

আহা! তখন যদি কথাটা বুঝিতাম, তখন যদি ধীরভাবে বিচার করিতাম। তাহা হইলে আজ এ জীবনব্যাপী তীব্র বেদনার কবল হইতে বোধ হয় পরিত্রাণ পাইতাম।

(৩)

ভ্রাতাকে নিরস্ত করিতে পারিলাম না। সে বলিল—কি হয়েছে? গান-বাজনা তো দেবতারা শেখে, নারদ মুনি গান করত। বীণা বাজাত! তুমি অপরের বাজনা ভালবাস, আমার বাজনায় দোষ দেখ কেন?

তাহাকে বুঝাইলাম, এ দেশে সঙ্গীতবিদ্যার নানা আনুষঙ্গিক দোষ আছে। লেখাপড়া শিখিবার সময় ওদিকে মন দিলে ক্ষতি হয়। ইংরাজের ছেলেমেয়েরা পাঠ্যাবস্থায় সঙ্গীতচর্চ্চা করে,তাদের অবস্থা স্বতন্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। ভ্রাতার নিস্তব্ধতা দেখিয়া মনে হইল সে আমার কথাগুলা গ্রাহ্য করিল না। আমার আদর্শের তাসের ঘরের একতালা খসিয়া পড়িল—লক্ষ্মণ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের অবাধ্য হইল, ভ্রাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধ নিজের মতে ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে সে নিজের প্রবৃত্তির বশে কাজ করিতে লাগিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বেশ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিল; কিন্তু তাহার পর পাঠে বেশ শৈথিল্য আসিল। পাড়ার সকলের প্রিয়পাত্র হওয়া, সকলের সহিত মেলামেশা, সকলের বিপদ আপদে প্রাণপাত পরিশ্রম করা—এ সবগুলায় প্রথম প্রথম একটু বিরক্ত হইতাম তাহার পাঠে বিঘ্ন হইবে বলিয়া। কিন্তু সে আমার কথা উপেক্ষা করিত।

একদিন তাহার টেবিলের মধ্যে একটা পেনসিল খুঁজিতে গিয়া এক বাক্স সিগারেট চুরুট দেখিতে পাইলাম। নিজের শয্যার উপর ভুজঙ্গ দেখিলেও তেমন

ভীত হইতাম না। হস্তপদ কাঁপিতেছিল—মনে হইতেছিল যেন আমার সম্মুখে আমার হাতেগড়া একখানা সৌধ হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। আমি নীরবে তাহা দেখিতেছিলাম—রক্ষা করিবার সামর্থ্য ছিল না—চীৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিবার শক্তি ছিল না। আমি এ ঘটনার তিন বৎসর পরে পাগল হইয়া গিয়াছিলাম—উন্মাদ পাগল; তিন বৎসর পাগল থাকিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছিলাম। আমার রোগের এই দিন পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা দিল। কিন্তু সে দিন যদি পাগল হইতাম, পরোপকারী কর্ম্মবীর ভ্রাতা হয়ত আমার সেবা লইয়া ব্যস্ত থাকিত, পাগল ভ্রাতার শুশ্রূষা করিতে করিতে আরও মন্দের দিকে ছুটিতে পারিত না। কিন্তু বিধিলিপি অন্য রকমের।

আমি আপনাদিগের নিকট ধীরে ধীরে ভ্রাতার অধঃপতনের কাহিনী বিবৃত করিতে গেলে আবার পাগল হইয়া যাইব। অথচ এ কাহিনী বিবৃত না করিলেও প্রাণের আগুন নিভে না। একদিন শয্যাকণ্টক হইয়াছিল, নিদ্রিতা কল্যাণীকে না তুলিয়া ভাবিলাম শরৎ যদি জাগ্রত থাকে তাহার সহিত একটু গল্প করিয়া আসিব। শরতের গৃহে গিয়া দেখিলাম তাহার শয্যা শূন্য। মনের কিরূপ অবস্থা হইল বলিব না, তাহার পরদিন যখন তাহার মুখে শুনিলাম যে সে রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিল তখনও মনের মধ্যে কি আশীবিষের দংশনজ্বালা উপলব্ধি করিলাম তাহা বলিয়াও আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। আমার মনের পরিচয় আপনাদিগকে যথেষ্ট দিয়াছি। আপনারা আমার মানসিক যাতনাটা কল্পনা করুন।

ভ্রাতা অবশ্য এফ-এ ফেল হইল। আমারও তাহার মধ্যে একটা বেশ যেন প্রাচীর উঠিতেছিল। দিন দিন তাহার স্বভাব-চরিত্র, চাল চলন মন্দ হইতে লাগিল। আমি দিন দিন তাহাকে প্রাণের ভিতর হইতে টানিয়া তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিলাম—কিন্তু পিতৃমাতৃহীন ছোট ভাই—বুকে পিঠে করিয়া পালন করিয়াছি, কত আশার চিত্রের মাঝখানে তাহাকে রাজা সাজাইয়া সিংহাসনে বসাইয়াছি—সেই ভাইকে প্রাণের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করা যে দুঃসাধ্য তাহা প্রতিক্ষণে অনুভব করিতেছিলাম। শেষে যেদিন—না বলিব না।

বলিব না কেন? এ সর্ব্বনাশের আসল সূত্রপাত ত সেইদিনই হইয়াছিল। যদি তেত্রিশ কোটী দেবতার মধ্যে কাহারও প্রাণে মমতা থাকিত তাহা হইলে সেইদিনের কার্য্যগুলা একটু অন্য প্রকারে হইলে—যাক্ বৃথা ক্ষোভ—বলিবা

দেবতার দল—আমার মত তাহারা নিষ্কর্ম্মা, বোধ হয় আদর্শবাদের এক একটি খাঁচার মধ্যে স্বাবদ্ধ। মোট কথা ভ্রাতা—না বলিব না।

কেন বলিব না? লজ্জা কি? ভ্রাতা মদ্যপান করিয়া গৃহে আসিল। কল্যাণী তাহাকে দেখিয়া পলাইল। আমার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিল। শেষে ক্রোধে সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। তাহাকে তিরস্কার করিলাম। পাদুকা খুলিয়া তাহাকে প্রহার করিলাম—এই প্রথম আর এই শেষ প্রহার। শরৎ বলিল—মারো দাদা মারো। বেশ কথা—ভাল কথা—তবু জীবনে একটা কাজ করলে। কেন একটু আদর্শের ওপর লেকচার দাও না।

আমি বলিলাম—শিগ্‌গির বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা।

সে বলিল—মাইরি দাদা আদর্শ নেশা—নেশার রাজা মদ—আদর্শ দেশ স্কটলণ্ড—সে দেশের আদর্শ জল—হুইস্কি। দাদা গঙ্গাসাগর হার—

আমি উপরে উঠিলাম। ভৃত্যকে বলিলাম—উস্‌কো নিকাল দেও।

(৪)

পাঁচ দিন গেল বাটী আসিল না। কল্যাণী বলিল—ডেকে আনো। ওগো এখনও চেষ্টা করলে শোধরাবে।

আদর্শবাদ বলিল—উহুঁ! ও কথাই না। মন জয় কর। ভুলিবার চেষ্টা কর।

ষষ্ঠ দিবস পত্র আসিল—আত্মগ্লানিতে পূর্ণ অনুরাগে ভরা স্নেহে ভরা প্রেমে ভরা। চোখে জল আসিল কাঁদিলাম। পত্রে লেখা ছিল মুখ দেখাইবে না। মুখ দেখিবার জন্য প্রাণটা ফাটিতে লাগিল। তবু মুখখানা দেখিলাম না। মনে পড়িল সেই শিশুমুখ—বালকের মুখ, কিশোরের মুখ। তবু ডাকিলাম না!

আহা! বিশ বৎসরের ছেলে। ছোঁড়া কত কষ্ট পাইয়াছে—কত যাতনা সহিয়াছে, কত আশা কত নিরাশা—সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা। কেবল ভুলিবার চেষ্টা করিলাম। কেবল মনকে বজ্র বাঁধনে বাঁধিবার ব্যবস্থা করিলাম,—কিন্তু ভুলা কি যায়?

এক বৎসর কাটিয়া গেল—পরম্পরায় শুনিতে পাই বকাটের দলে থাকে, ছোট বড় চুল ছাঁটে, বাজনা বাজায়। দ্বিতীয় বৎসর শুনিলাম থিয়েটারে বাঁশি বাজায়। বুকটা যেন ভেঙ্গে যায়, মাথাটা যেন ঘুরে যায়, তার মুখখানা যেন অজগর সাপ হ'য়ে বুকের মাঝে ছোবল মারিতে আসে। ভুলিবার চেষ্টা করি। কল্যাণীর ছয়মাসের শিশুর দিকে তাকাই—তার মুখখানা মনে পড়ে—পাঁজরের ভিতর দিয়া নিঃশ্বাস গুমরাইয়া উঠে—চোখের কোণে জল আসে। আবার প্রাণকে শক্ত করিয়া বলি—এই শিশুকে আদর্শপথে নিয়ে যাব।

ঘুরিলে ফিরিলে মনটা সুস্থ থাকে। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বাটীতে বসিয়া গঙ্গার খেলা দেখিতেছিলাম। ভাদ্র মাসের গঙ্গা, কানায় কানায় জল—খর-

স্রোতা ভাগীরথী। নানাকথা ভাবিতেছিলাম। এইখানে পরমহংসদেব সিদ্ধ হইয়াছিলেন—মানুষ সিদ্ধ হয় কেমন করিয়া—সিদ্ধ হইলে আর কোনও জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে না—আহা কি সঙ্গীত! দূরে খানকয়েক নৌকা আসিতেছিল, একখানা নৌকায় বাঁশী বাজিতেছিল—সাহানা সুর. আহা কি মিষ্ট! গঙ্গার তরঙ্গের উপর দিয়া ভাসিতেছিল গঙ্গা তাল দিতেছিল—ছপ্ ছপ্ কলাৎ কলাৎ—ঝাঁপতাল, সুরে তালে বেশ মিলিতেছিল। আমি চক্ষু মুদিয়া শুনিতেছিলাম। বড় মধুব সঙ্গীত। ক্রমশঃ আমাদের ঘাটের ধারে আসিতেছিল। দুই তিনখানা নৌকা আসিতেছিল—জোয়ারের টানে ভাসিয়া আসিতেছিল।

হঠাৎ একটা কোলাহল হইল—সাবধান সাবধান—এই! মাগী—

একখানা নৌকায় একটা স্ত্রীলোক রোরুদ্যমান একটা শিশুকে ভয় দেখাইবার জন্য জলের উপর ধরিয়াছিল। শিশুটা খুব চীৎকার করিতেছিল হাত পা ছুঁড়িতেছিল! পার্শ্বের একখানা নৌকার উপর দুই তিনজন বাবু দাঁড়াইয়া স্ত্রীলোকটাকে নিষেধ করিতেছিল। দুই তিন জন বাবুর মধ্যে একজন সে—শরৎ, আমার ভাই শরৎ—হাতে ক্ল্যারিয়নেট বাঁশী। তাহারই বাঁশীতে মুগ্ধ হইতেছিলাম। শরৎ স্ত্রীলোকটার দিকে চাহিয়াছিল—মুখে একটা দেব ভাব—কাতর ভাব। আমি নির্নিমেষ লোচনে তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম। একটা শব্দ হইল ছেলেটা জলে পড়িয়া গেল। স্ত্রীলোকটা চীৎকার করিয়া উঠিল! শরৎকে সকলে নিষেধ করিল—সে বাঁশী রাখিয়া জলে পড়িল।

সকলে চীৎকার করিল—আমি তারস্বরে চীৎকার করিলাম—ভাই উঠে পড়—কাজ নেই কাজ নেই।

সে আমার দিকে চাহিল—চারি চক্ষুর মিলন হইল। আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম—ভাই কাজ নেই। শরৎ রে একটা কথা শোন্।

সে হাসিয়া ছেলেটাকে ধরিল। আমার দিকে চাহিয়া হাসিল। কিন্তু শিশুটা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম—ওগো বাঁচাও বাঁচাও, ধর ধর—যত টাকা লাগে—ওগো আমার সর্ব্বস্ব—

আবার ভাই মুখ তুলিল—আমার দিকে চাহিল, আবার ডুবিল। মন্দিরের দিকে চাহিলাম—মাগো বাঁচা—মা ওমা বিশ্বজননী বাঁচা মা—

আবার উঠিল, কাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল—পাষাণী শুনিল না—মানুষে শুনিল না। আমি চীৎকার করিলাম—সর্ব্বস্ব দ'ব—ওঠ ভাই—ও ভাই—

একবার একটু মাত্র মাথা দেখা দিল। তাহার পর গঙ্গাগর্ভে! ডাক্ ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। মাথাটা ঘুরিয়া গেল—আবার একটু দেখা গেল—"ভাই ভাই ওঠ ভাই"—কেহ তুলিল না। জ্ঞান লোপ পাইল। উন্মত্ত হইলাম—পাগল হইলাম। তিন বৎসর পাগল ছিলাম। এখন সারিয়াছি, তবু পাগল, তবু তাপী! স্মৃতিতে বড় জ্বালা! বড় জ্বালা! ওঃ!

আত্মা।

[লেখক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার বি, এ।]

[পরিদৃশ্যমান জগতে চিৎ ও অচিৎ—জ্ঞান ও অজ্ঞান—সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্ব-পদার্থে একত্র ও একীভূত হইয়া বিরাজ করিতেছে *। কিন্তু পরমার্থতঃ একমাত্র নিত্য চৈতন্যই আছে, অচিৎ জড় জগৎ নাই †। অচিতের সত্তা ব্যবহারিক। এই ব্যবহারিক অসৎ অচিতের ভোক্তা জীবচৈতন্যও অসৎ—চৈতন্যের ব্যবহারিক আভাস মাত্র। এই চিদাভাস ও অচিতের পরস্পর ভোক্তৃভোগ্য সম্বন্ধের উপর ব্যবহারিক জগতের প্রতিষ্ঠা। শুদ্ধ চৈতন্য নিঃসঙ্গ ও পূর্ণজ্ঞান-স্বরূপ। তাঁহার নিকট অচিৎ ও চিদাভাস নাই। তথাপি উহা নিজের অচিন্ত্য ও অনন্তশক্তির দ্বারা চিদাভাস ও অচিতের ব্যবহারিক সত্তার কারণ হয়। চিৎ, অচিৎ ও চিদাভাস দ্বারা জীব গঠিত। অচিৎ ও চিদাভাসের মিথ্যাত্ব ও চিৎস্বরূপের উপলব্ধি হইলে জীব মুক্ত হয় ‡।]

জীবের কাছে চিতের অপ্রকাশ।

ভোক্তা ও ভোগ্য লইয়া ব্যবহারিক জগৎ। এখানে চিদাভাসরূপী জীবাত্মা ভোগ করিতেছে ও সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক সুখদুঃখমোহময় জড়জগৎ ভুক্ত হইতেছে। এই জগন্ময় নিরন্তর ভোগ-প্রবাহ মধ্যে শুদ্ধ চৈতন্যের সন্ধান কোথায়? কোথায় সে নিত্যজ্যোতিঃ জ্ঞানময় তমোহারী চিদ্বস্তু যেখানে সুখ দুঃখ-মোহ নিরস্ত, জগৎ বিধ্বস্ত, জীব মুক্ত। যেখানে হ্রাস নাই বৃদ্ধি নাই, জন্ম নাই মৃত্যু নাই, ব্যাধি নাই জরা নাই, রাগ নাই দ্বেষ নাই, কর্ত্তা নাই কার্য্য নাই, ভোগ নাই ভোগ্য নাই। পরিবর্ত্তনশীল মিথ্যা সংসারের মধ্যে সেই নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা পাই কই? অথচ, সেই সত্য পদার্থ আছে বলিয়াই এই মিথ্যা জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে। যেমন রজ্জু আছে বলিয়াই তাহাতে সর্পভ্রম হয় তেমনি চিৎ আছে বলিয়াই তাহাতে জগদ্ভ্রম হয়। যেমন সর্পভ্রম রজ্জুকে উপলব্ধির

---

* গত আষাঢ়ের 'অর্চ্চনা'য় "সচেতন ও অচেতন" শীর্ষক প্রবন্ধে একথা বুঝাইয়াছি।

† শ্রাবণের 'অর্চ্চনা'য় "চিৎ ও অচিৎ" শীর্ষক প্রবন্ধে একথা বুঝাইয়াছি।

‡ এ সব কথা ভাদ্রের 'অর্চ্চনা'য় "চিদাভাস" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছি।

বিষয়ীভূত হইতে দেয় না, তেমনি জগদ্ভ্রম চিৎকে উপলব্ধির বিষয়ীভূত হইতে দেয় না। পুনশ্চ, চিদালোকের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াই ভোগ্য জগৎ জ্ঞাত ও ভুক্ত হয়—এবং চিৎপ্রতিবিম্ব জীবাত্মাই জগতের জ্ঞাতা ও ভোক্তা হয়। এ হেন চিন্ময় পদার্থ যাহাকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া ব্রহ্ম বলা যায়, জীব মোহের ঘোরে তাহাকে দেখিতে পায় না—ছায়ারূপে নিরন্তর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিলেও চোখ মেলিয়া তাহাকে দেখে না। একবার চোখ মেলিলেই দেখিতে পায়, আর কিছু করিতে হয় না। অজ্ঞানের আবরণ, মোহের ঘোর, একবার চোখ হইতে মুছিয়া ফেলিলেই সে আপনিই তাহার সম্মুখে উজ্জ্বলবর্ণে মধুর মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়। জীব যে তাহারই প্রতিবিম্ব—বিম্বে প্রতিবিম্বে যে চির-মেশামিশি, চির-বাঁধাবাঁধি, চির-আলিঙ্গন।

সমস্ত বিষয়ানুভূতির পশ্চাতে চিতের নির্দ্দেশ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি-কালীন বিষয়ানুভূতি।

অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব জ্ঞানস্বরূপ চিৎকে চক্ষু মেলিয়া স্বস্বরূপে দেখিতে না পাইলেও, তাহার নিখিল অনুভূতির পশ্চাতে চিতের বিদ্যমানতা ত রহিয়াছে। জীবের অনুভূতির তিন ক্ষেত্র—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রদবস্থায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্যজগতের অনুভূতি হয়। এই অনুভূতি বিষয়ভেদে বিভিন্ন, যেমন শব্দানুভূতি, স্পর্শানুভূতি প্রভৃতি। কিন্তু এই সকল বিভিন্ন অনুভূতির মূলে এক অভিন্ন অনুভূতির অনুমান হয়। উহা শুদ্ধ সংবিৎ বা জ্ঞানমাত্র। শব্দ-স্পর্শাদির অনুভূতি হইতে শব্দ স্পর্শাদিকে পৃথক করিয়া ফেলিলে যে বোধমাত্র অবশিষ্ট থাকে উহা তাহাই। শব্দস্পর্শাদি উপাধিযোগে উহা শব্দানুভূতি, স্পর্শানুভূতি প্রভৃতিরূপে আবির্ভূত হয়। এই শুদ্ধ সংবিৎ বা জ্ঞানের পরিবর্ত্তন বা বিনাশ নাই। পরিবর্ত্তন বা বিনাশ হয় বিষয়ের ও বিষয়োপাধিক অনুভূতির। শব্দানুভূতি পরিবর্ত্তনশীল ও বিনশ্বর, কিন্তু এই অনুভূতির মূলে যে জ্ঞানস্বরূপ বিদ্যমান তাহা অপরিবর্ত্তনীয় ও অবিনশ্বর। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় হইলে ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ মনের সাহায্যে বিষয়ের অনুভূতি হয়। জাগ্রদবস্থায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে সকল বিষয়ের অনুভূতি হয় তাহারা সংস্কাররূপে মনে অবস্থান করে। স্বপ্নে এই সকল সংস্কার জাগরিত হইলে জীব পুনরায় ঐ সকল বিষয়কে অনুভব করে। এইরূপে স্বপ্নে যে সকল অনুভূতি হয় তাহারা বিভিন্ন হইলেও তাহাদের মূলভূত সংবিৎ বা জ্ঞান এক ও অভিন্ন। জাগ্রদবস্থায় যে অপরিবর্ত্তনীয় সংবিৎ ইহাও সেই সংবিৎ। জ্ঞানমাত্রে পার্থক্য হয় না। জাগ্রৎকালীন শব্দানুভূতি হইতে শব্দকে পৃথক করিয়া দিলে যে

জ্ঞানমাত্র থাকে, স্বপ্নকালীন শব্দানুভূতি হইতে শব্দকে পৃথক করিয়া লইলেও সেই জ্ঞানমাত্র থাকে। জাগ্রতে ও স্বপ্নে যে পার্থক্য তাহা জ্ঞানগত নহে, বিষয়গত। জাগ্রৎকালীন বিষয় স্থায়ী অর্থাৎ পুনঃপুনঃ প্রত্যক্ষযোগ্য; স্বপ্ন-কালীন বিষয় অস্থায়ী, স্বপ্নান্তে আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, পুনরায় স্বপ্নেও আর তাহাকে পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে না। এই বিষয়গত প্রভেদ বাদ দিলে, জাগ্রতে ও স্বপ্নে প্রভেদ থাকে না। কারণ, উভয়েই এক অভিন্ন শুদ্ধ জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে। পুনশ্চ, সুষুপ্তিকালে, অর্থাৎ নিঃস্বপ্ননিদ্রাবস্থায়, মন ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল সমস্তই নিষ্ক্রিয় থাকে, সুতরাং জীব বিষয়ের অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু বিষয়ের এই অননুভবকে জীব তখন অনুভব করে, অর্থাৎ, আমি বিষয়কে অনুভব করিলাম না এইরূপ জ্ঞান তখন জীবের হয়। ইহার প্রমাণ স্মৃতি। সুষুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তি, আমি বেশ নিদ্রা গিয়া-ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই, এইরূপ স্মরণ করে। সুষুপ্তিতে যদি অনুভব না থাকে, তাহা হইলে এই অনুভবের স্মৃতি আসিবে কোথা হইতে? পতঞ্জল ঋষি স্মৃতির লক্ষণ করিয়াছেন, "অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ" অর্থাৎ কেবলমাত্র অনুভূতবিষয়কেই অবলম্বন করিয়া যে চিত্তবৃত্তি হয় তাহাকে স্মৃতি বলে। সুতরাং সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির যে সৌষুপ্তিক স্মৃতি হয় তাহা সুষুপ্তিকালে অনুভূত বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের অননুভব সুষুপ্তি-কালীন অনুভবের বিষয়। অননুভব অনুভবের অভাব। সুতরাং সুষুপ্তি অভাবপ্রত্যয়বিষয়ক। তাই পতঞ্জলি সূত্র করিয়াছেন, "অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা" (নিদ্রা অর্থে সুষুপ্তি)। সুষুপ্তিতে মন ও ইন্দ্রিয়সকল অজ্ঞানরূপ অভাব পদার্থে লীন হইয়া যায়। জীব তখন এই অজ্ঞানের অনুভব করে, এবং পরে জাগরিত হইয়া এই অজ্ঞানানুভবের স্মরণ করে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, মনেরই যদি লয় হইল তাহা হইলে জীব এই অনুভব করে কিরূপে? জীব যে নিদ্রাকালে অজ্ঞানের অনুভব করে তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না, কারণ জাগ্রতকালীন স্মৃতি তাহার প্রমাণ। সুষুপ্তিতে অজ্ঞানের অনুভব যখন হয়ই, তখন এই অনুভব কে করে তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। সকল অনুভূতির ন্যায় এই অনুভূতিও চিদাভাসরূপ জীবচৈতন্য বা জীবাত্মা দ্বারা হয়। শুদ্ধচিৎ দ্বারা অজ্ঞানাদি কোন পদার্থেরই অনুভব হইতে পারে না, কারণ চিতের নিকট তাহাদের অস্তিত্বই নাই। অতএব বুঝিতে হইবে সুষুপ্তিতেও চিদাভাস বর্ত্তমান থাকে। সুষুপ্তিতে চিদাভাস অজ্ঞানকে ভোগ করে। এই

অজ্ঞানের ভোগ বা অনুভব সুখাত্মক, কারণ নিদ্রাভঙ্গে আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম এইরূপ স্মৃতি হয়। মন ও ইন্দ্রিয়াদি করণের সাহায্যে এই ভোগ সম্পাদিত হয় না। সৌষুপ্তিক অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস বা জীবাত্মা কোনরূপ করণের সাহায্য ব্যতিরেকেই ঐ অজ্ঞানকে ভোগ করে। অজ্ঞান স্বয়ংই তাহার নিকট প্রকাশিত হইয়া ভোগ্য হয়। সুষুপ্তিতে অজ্ঞানের এই স্বপ্রকাশ ভাব হইতে বুঝিতে হইবে যে উহা সত্ত্ববহুল ও বৃত্তিবিশিষ্ট, অর্থাৎ সক্রিয়, কারণ ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্বই প্রকাশধর্ম্মী এবং উহা সহস্থিত রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রকাশিত হয়। ফলতঃ সুষুপ্তিতে অজ্ঞানে এই সত্ত্বপ্রকাশরূপ বৃত্তি হয় বলিয়াই উহা ভুক্ত হইতে পারে। ভোগের প্রয়োজনেই অজ্ঞানে চিদাভাস হয়। ভোগের প্রয়োজন না থাকিলে, নিষ্কারণ চিদাভাস হইতে পারে না। কিন্তু অজ্ঞান বৃত্তিবিশিষ্ট না হইলে, অর্থাৎ উহার অন্তর্গত ত্রিগুণের মধ্যে কোন একটা গুণ অন্যগুলিকে অভিভব করিয়া সুখ, দুঃখ বা মোহরূপে আবির্ভূত হইতে না পারিলে, উহা ভোগের বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং বৃত্তিহীন অজ্ঞানে চৈতন্যের আভাস হয় না। পুনশ্চ, ভোগ্যরূপে সত্ত্ব সুখাত্মক; সুতরাং সৌষুপ্তিক অজ্ঞানের ভোগ সুখের ভোগ, আনন্দের অনুভূতি। অনন্তর, অন্যান্য সমস্ত অনুভূতির ন্যায় জীবের এই সুখাত্মক সৌষুপ্তিক অজ্ঞানানুভূতিও সংস্কাররূপে পরিণত হইয়া অজ্ঞানে অবস্থান করে। জাগ্রৎকালে এই সংস্কারবিশিষ্ট অজ্ঞান হইতে তদ্বিশিষ্ট মনের আবির্ভাব হয়। এইরূপে মন সুখাত্মক সৌষুপ্তিক অজ্ঞানানুভবের সংস্কারকে ধারণ করে। স্মৃতিরূপ মনোবৃত্তি দ্বারা এই সংস্কার জাগরিত হয়—তখন জীব স্মরণ করে, "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম,' কিছুই জানিতে পারি নাই"। এই সংস্কার বশতঃ, সৌষুপ্তিক সুখভোগের লালসায়, জাগ্রৎ স্বপ্নের জ্বালাময় অনুভূতির হাত এড়াইবার জন্য, সংসারতাপ জুড়াইবার ইচ্ছায় জীব পুনঃ পুনঃ নিদ্রাকে আহ্বান করে। সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানবৃত্তিগুলিকে স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থার চিত্তবৃত্তি সকলের তুলনায় সূক্ষ্মা বৃত্তি বলা যাইতে পারে। সুষুপ্তিকে বুঝাইতে যাইয়া উপস্থিত বিষয় ছাড়িয়া আসিয়াছি। সুষুপ্তিতে অজ্ঞান অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, মন ও ইন্দ্রিয় সকলের লয় হয়, শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ের অনুভব থাকে না এবং জীব অতীন্দ্রিয় অনুভবে তৃপ্ত হয়, এই সকল কারণে সুষুপ্তিকে বুঝা বিশেষ প্রয়োজন। এইবার আমরা উপস্থিত বিষয়ে ফিরিয়া যাই। সুষুপ্তিকালীন অনমুভূত বা অজ্ঞানানুভূতি হইতে অজ্ঞানকে

বাদ দিলে যে বিষয়নিরপেক্ষ বোধ বা জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেই জ্ঞান জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালীন বিষয়নিরপেক্ষ জ্ঞান হইতে অভিন্ন। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির মধ্যে পার্থক্য জ্ঞানগত নহে, বিষয়গত মাত্র। এই ত্রিবিধ অনুভূতির ক্ষেত্র হইতে বিষয়কে তুলিয়া লইলে যে শুদ্ধজ্ঞান বা সংবিৎ থাকে তাহা তিন ক্ষেত্রেই এক। জীব অনুভূতির যে স্তরেই থাকুক এই জ্ঞান তাহাকে ছাড়ে না। জীবগত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি সকলেরই পরিবর্ত্তন হয়, সকলেরই হ্রাস বৃদ্ধি, ক্ষয় উপচয়, জন্ম মৃত্যু আছে, কেবল এই এক জ্ঞানমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় ও অবিনশ্বর ভাবে সকল অবস্থার মূলেই সমানভাবে বিদ্যমান থাকে।

আত্মা ও অনাত্মা।

এই জ্ঞানই শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ কূটস্থ প্রত্যগাত্মা বা আত্মা, এবং এই জ্ঞান ভিন্ন সমস্তই অচিৎ, অনাত্মা। এই জ্ঞানরূপী আত্মা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি-কালীন সমস্ত অনুভাব্য ভোগ্য জড়ে প্রতিবিম্বিত হইলে সেই প্রতিবিম্ব ভোক্তা জীবাত্মা হয় ও ভোগ্য জড় ভোগের বিষয়ীভূত হয়। উপরে যে শব্দানুভূতি, স্পর্শানুভূতি প্রভৃতি জাগ্রৎ ও স্বপ্ন-কালীন অনুভূতির ও সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানানুভূতির কথা বলিয়াছি, এ সমস্তই চিদাভাসের অনুভূতি—মিথ্যা চিদাভাসের মিথ্যাজ্ঞান। শুদ্ধচৈতন্যের নিকট বিষয় নাই, সুতরাং বিষয়ের অনুভূতি থাকিবে কিরূপে? অতএব প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি সমস্ত অনুভূতিই মিথ্যা হইল তাহা হইলে তাহা হইতে সত্য চৈতন্যের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় কিরূপে? মিথ্যা বিষয়ানুভূতি হইতে মিথ্যা বিষয়কে বাদ দিলে সত্য চৈতন্য অবশিষ্ট থাকে কিরূপে? সুতরাং উপরে যে প্রণালীতে শুদ্ধচৈতন্যের নির্ণয় করা হইয়াছে তাহা ভুল। আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ বোধ হইতে পারে, কিন্তু একটু প্রণিধান পূর্ব্বক বিচার করিলেই বোঝা যাইবে যে উহা ভুল নহে। বিষয়ানুভূতিমাত্রেরই মূলে তিনটী বস্তু বিদ্যমান—চিৎ, চিদাভাস ও অচিৎ বা বিষয়। চিতের অনুগ্রহে অচিৎ বিষয়ে তাহার আভাস পড়িলেই সেই আভাস অনুভাবক হয় ও বিষয় অনুভূত হয়। অতঃপর এই বিষয়ানুভূতি হইতে বিষয়কে বাদ দিলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে চিদাভাসও বাদ পড়িয়া যায়, এবং তখন একমাত্র শুদ্ধচিৎই অবশিষ্ট থাকে। মনে কর, সূর্য্যের সম্মুখে একখানি দর্পণ রহিয়াছে এবং তুমি সেই দর্পণে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যালোক দ্বারা দর্পণখানিকে দেখিতেছ। তোমার দর্পণদর্শনের মূলে সূর্য্য, সূর্য্যপ্রতিবিম্ব ও দর্পণ রহিয়াছে। অতঃপর তুমি যদি দর্পণখানিকে সরাইয়া লও, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যপ্রতিবিম্বও লোপ পায়, কারণ প্রতিবিম্বের ক্ষেত্র না থাকিলে

প্রতিবিম্ব থাকিবে কাহার আশ্রয়ে ? তখন তোমার দর্পণদর্শনের মূলভূত তিন পদার্থের মধ্যে কেবল এক সূর্য্যই অবশিষ্ট থাকে। এইরূপ সমস্ত বিষয়ানুভূতি হইতে বিষয়কে সরাইয়া লইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনুভাবক চিদাভাসও আশ্রয়াভাবে সরিয়া পড়ে, এবং তখন এক নিঃসঙ্গ অপরিবর্ত্তনীয় অবিনশ্বর নিত্য কূটস্থ চৈতন্যই অবশিষ্ট থাকে।

চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা বুঝিতে হয় না। প্রত্যক্ষ ও অনুমান মনের বৃত্তি। মন অজ্ঞান। অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানের প্রত্যক্ষ বা অনুমান সম্ভব নহে। জ্ঞান স্বপ্রকাশ, উহা আপনিই আপনাকে মনের নিকটে প্রকাশ করে। মন অজ্ঞান হইলেও স্বভাবতঃ সত্বপ্রধান, সুতরাং স্বসমীপে প্রকাশিত জ্ঞানের ধারণা করিতে পারে। কিন্তু মন সত্বপ্রধান হইলেও, সকল জীবের মনে সত্ত্বের বাহুল্য সমান নহে—কাহারও মনে উহার বাহুল্য খুব বেশী, কাহারও মনে খুব কম। সেইজন্য সকল জীব জ্ঞানস্বরূপ আত্মার সমান ধারণা করিতে পারে না। যে সকল জীবের মনে সত্ত্ববাহুল্য খুব কম, তাহারা সচেতন স্থূলদেহকেই আত্মা বলিয়া ধারণা করে। কাহারাও বা ইন্দ্রিয়গণকে আত্মা বলিয়া ধারণা করে, কাহারাও বা প্রাণকে আত্মা বলিয়া ধারণা করে, কাহারাও বা মনকেই আত্মা বলিয়া ধারণা করে, ইত্যাদি। ইহাদের মন অধিক পরিমাণে রজস্তমোগুণ দ্বারা মলিন থাকায় চিদচিতে পার্থক্য করিতে পারে না, সুতরাং অচিদ্বিমুক্ত শুদ্ধ জ্ঞানের ধারণা ইহাদের হয় না। কিন্তু যে মনের রজস্তমোমালিন্য প্রায় দূর হইয়াছে সেই শুদ্ধ মন চিদচিতের পার্থক্য করিয়া শুদ্ধ জ্ঞানের ধারণা করে। এইজন্য কঠশ্রুতিতে ঋষি বলিয়াছেন, "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥" (কঠ ১।৩।১২), অর্থাৎ সর্ব্বভূতে গূঢ় এই আত্মা প্রকাশিত হন না ; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শিগণ সূক্ষ্ম মার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা উঁহাকে দেখিতে পান। পুনশ্চ, "ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিদেনং। হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥" (কঠ ২।৩।৯) অর্থাৎ, ইহার প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ বিষয়ে থাকে না, সুতরাং কেহই ইহাকে চক্ষু দ্বারা, কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই, দেখিতে পায় না ; কেবল হৃদয়স্থ বুদ্ধি দ্বারা বিকল্পবর্জ্জিত মননের সাহায্যে ইনি অভিব্যক্ত হন ; যাঁহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারা অমৃত হন। মন বা বুদ্ধির এই আত্মজ্ঞান (এখানে বরাবর মন ও বুদ্ধি এক অর্থেই ব্যবহৃত হইতেছে) জড়বিষয়জ্ঞানের ন্যায় নহে। জড় বিষয়

মনের আত্মজ্ঞান।

নিজে প্রকাশিত হইতে পারে না, সেইজন্য উহাতে চিদাভাস পড়িলে তবে উহা বুদ্ধির নিকট জ্ঞাত হইতে পারে—বুদ্ধি ও বুদ্ধিস্থ চিদাভাস, উভয়ে জড়বিষয়ে ব্যাপ্ত হইলে তবে বুদ্ধি উহাকে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু স্বপ্রকাশ আত্মা নিজের প্রকাশে চিদাভাসের কর্ত্তৃত্বের অপেক্ষা রাখে না, সুতরাং একা বুদ্ধিই উহাকে গ্রহণ করিতে পারে। যেমন চক্ষুর ঘটদর্শনে দীপের সাহায্য প্রয়োজন হইলেও সূর্য্যদর্শনে উহা প্রয়োজন হয় না তেমনি মনের বিষয়দর্শনে চিদাভাসের সাহায্য প্রয়োজন হইলেও আত্মদর্শনে উহা প্রয়োজন হয় না। পরন্তু যেমন চক্ষুর সম্মুখে সূর্য্য প্রকাশিত হইলে ক্ষুদ্রজ্যোতিঃ দীপ সেই বৃহজ্জ্যোতিতে মিশিয়া যায় তেমনি মনের সম্মুখে আত্মা প্রকাশিত হইলে মনঃস্থ চিদাভাস সেই অনন্তজ্যোতিতে মিশিয়া যায়। সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, "মনসৈবেদমাপ্তব্যং" অর্থাৎ, মনের দ্বারাই আত্মাকে পাওয়া যায় (কঠ ২।১।১১)।

দেহ হইতে আত্মার বিবেক।

বেশ, বুঝিলাম, মার্জ্জিত শুদ্ধ মন চৈতন্যস্বরূপ আত্মার ধারণা করিতে পারে। কিন্তু এই আত্মাকে কি স্থূলদেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, অজ্ঞান প্রভৃতি দৈহিক সমস্ত অচিৎ পদার্থ হইতে বাস্তবিক পৃথক করা যায়? আত্মা কি একেবারে বিদেহ, অর্থাৎ, দেহাশ্রয়শূন্য হইয়া থাকিতে পারে? পারে। প্রত্যুত, এ প্রশ্নটাই ভুল। মিথ্যা অচিৎ দেহের সহিত শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মার কোন সম্বন্ধই যখন আদৌ হইতে পারে না, তখন দেহের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদের কথা আত্মার দিক্ হইতে উঠিতেই পারে না। দেহের সহিত চিদাভাসেরই সম্বন্ধ হয়, এবং চিদাভাসের দ্বারা এই সম্বন্ধ কূটস্থ আত্মায় আরোপিত হয় মাত্র। অতএব, উপরের প্রশ্নকে সংশোধিত করিয়া এইরূপ করা যাইতে পারে যে, চিদাভাসের সহিত দেহের সম্বন্ধ লোপ করিয়া কূটস্থ চৈতন্যে দৈহিক সম্বন্ধের আরোপের উচ্ছেদ করা যায় কি না? পুনশ্চ, চিদাভাসের সহিত দেহের সম্বন্ধের লোপ মানে চিদাভাসের নাশ, কারণ দেহগত সুখ দুঃখের ভোগের জন্যই দেহে চৈতন্যের আভাস হয়, দেহই উহার আশ্রয়-স্থান, দেহ ছাড়িয়া উহার অস্তিত্ব অসম্ভব, যেমন দর্পণ ছাড়িয়া প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব অসম্ভব। অতএব, প্রশ্নটি এইরূপ আকার ধারণ করিল:—দেহগত চিদাভাসের লোপ হয় কি না, অর্থাৎ, জীবের দেহজ্ঞান বিনষ্ট হইতে পারে কি না? খুব পারে। জীবের স্বপ্নকালে স্থূলদেহের জ্ঞান ও সুষুপ্তিকালে স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের জ্ঞান ত নিত্যই বিনষ্ট হইতেছে। সমাধিকালে কারণদেহ অজ্ঞানেরও জ্ঞান

বিনষ্ট হয়। কারণ, সমাধি ভঙ্গে জীবের অজ্ঞানানুভবের স্মৃতি হয় না, পরন্তু আমি সমাহিত ছিলাম এইরূপ স্মৃতিই হয়। সুতরাং সমাধিতে জীবের দেহজ্ঞান একেবারে বিনষ্ট হয় এবং জীব কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপে বিরাজ করে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, সমাধিতে যে চিদাভাসের সহিত আত্মারও বিনাশ হয় না তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ অনেক। তাহার মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ এখানে করিব, যথা :—(১) সমাধিকালে স্থূলদেহ বিনষ্ট হয় না। স্থূলদেহ সংহত পদার্থ সুতরাং পরার্থ। এই পর চৈতন্য। অতএব স্থূলদেহের বিদ্যমানতা হেতু বুঝিতে হইবে যে সমাধিকালে চৈতন্যও বিদ্যমান থাকে। অবশ্য চিদাভাসের প্রয়োজনেই দেহ থাকে, কূটস্থ আত্মচৈতন্যের প্রয়োজনে নহে, কারণ কূটস্থ আত্মার কোনও প্রয়োজনই থাকিতে পারে না। কিন্তু সমাধিতে চিদাভাসের লোপ হয়। ইহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কারণ সমাধি ভাঙ্গিলেই পুনরায় চিদাভাসের উদ্ভব হয়। কিন্তু সমাধিভঙ্গে চিদাভাসের এই উদ্ভবের জন্য সমাধিকালে চৈতন্যের বিদ্যমানতা প্রয়োজন। ফলতঃ, চিদাভাসের ভোগ চিতে আরোপিত হয় বলিয়া অচিতের দিক্ দিয়া দেখিলে চিৎই ভোক্তা পর। এইজন্য শ্রুতি চিৎকে অশরীর হইলেও শরীরের অধিষ্ঠান বশতঃ সশরীরও বলিয়াছেন। "মঘবন্মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা, তদস্যাশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানম্, আত্তোবৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং, ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ॥" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮।১২।১), অর্থাৎ, "হে মঘবন্! এই শরীর নিশ্চয়ই মরণশীল, মৃত্যু দ্বারা গ্রস্ত; সেই অমৃত ও অশরীর আত্মার ইহা অধিষ্ঠান। সশরীর আত্মা প্রিয়াপ্রিয়ের দ্বারা গ্রস্ত— সশরীর আত্মার প্রিয়াপ্রিয় কখনও বিনষ্ট হয় না; কিন্তু অশরীর আত্মাকে প্রিয়াপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না।" এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে আত্মা বাস্তবিক অশরীর, কিন্তু শরীরের অধিষ্ঠান বশতঃ সশরীর এবং প্রিয়াপ্রিয়ের, অর্থাৎ, সুখদুঃখের, ভোক্তা হন।

সমাধি।

কেহ বলিতে পারেন, শরীর থাকিলেই যদি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে কি শরীর না থাকিলেই আত্মা থাকেন না এরূপ বুঝিতে হইবে? না, তাহা বুঝিতে হইবে না। কারণ, শরীরের অস্তিত্ব হেতু আত্মার অস্তিত্ব অনুমিত হইলেও শরীরের অনস্তিত্ব হেতু আত্মার অনস্তিত্ব অনুমিত হয় না। শরীরের ব্যাপ্তি আত্মায় আছে, শরীরাভাবের ব্যাপ্তি আত্মাভাবে নাই

("All A is B", এই premiss হইতে "No A is no B" এই inference হয় না; ধূম থাকিলেই বহ্নি থাকে, এই হেতু হইতে, ধূম না থাকিলে বহ্নি থাকে না, এই অনুমান হয় না)।

(২) সমাধিভঙ্গে, "আমি এতকাল সমাহিত ছিলাম", এইরূপ স্মৃতি হয়। স্মৃতি মনের বৃত্তি। এই বৃত্তি জাগরিত হইলে মনে অনুভূত বিষয়ের সংস্কার জাগরিত হয়—একথা উপরে বুঝাইয়াছি। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, সমাধিভঙ্গে মনে সমাধির সংস্কার থাকে। কিন্তু মনে এই সমাধির সংস্কার আসে কিরূপে? সমাধিকালে কি সমাধির অনুভব ও তজ্জন্য সংস্কার উৎপন্ন হয়? কিরূপে হইবে, অনুভাবক চিদাভাসেরই যখন লোপ হয় তখন অনুভব করিবে কে? সমাধিতে সুষুপ্তির ন্যায় অজ্ঞানে মনের লয় হয়। সুষুপ্তিতে এই অজ্ঞান চিদাভাসবিশিষ্ট হওয়ায় বৃত্তিমান্ হইয়া অনুভূত হয়। কিন্তু সমাধিতে অজ্ঞানে চিদাভাস না থাকায় উহা বৃত্তিমান্ হয় না, কারণ অনুভবের সম্ভব থাকে না। অজ্ঞান বৃত্তিমান্ না হইলে সমাধির সংস্কার তাহাতে উৎপন্ন হইবে কিরূপে? অথচ, উহা যে উৎপন্ন হয় তাহা নিশ্চিত, কারণ সমাধির স্মৃতি দ্বারা তাহা অনুমিত হয়। তাই ব্যাসদেব পাতঞ্জলভাষ্যে বলিয়াছেন, "নিরোধস্থিতিকালক্রমানুভবেন নিরোধচিত্তকৃতসংস্কারাস্তিত্বমনুমেয়ম্", অর্থাৎ, নিরোধের (সমাধির) স্থিতিকালের ক্রমের অনুভবহেতু (আমি এতকাল সমাহিত ছিলাম, সমাধিভঙ্গে উদিত এইরূপ স্মৃতি হেতু) নিরোধকালে (সমাধিকালে) চিত্তে (বেদান্ত মতে, চিত্তের লয় স্থান অজ্ঞানে) সংস্কার হইয়াছিল, ইহার অনুমান করা যায় (১।৫১ সূত্রের ভাষ্য)। অতএব সমাধির অনুভব ব্যতিরেকেই সমাধির সংস্কার হয়, এইরূপ বুঝিতে হইবে। প্রত্যুত, অনুভবের ফল সংস্কার হইলেও, অনুভবকে সংস্কারের সমবায়িকারণ বুঝিতে হইবে না, অর্থাৎ, সংস্কার থাকিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব আছে এরূপ বুঝিতে হইবে না। "সংস্কারাশ্চিত্তধর্ম্মা ন তে প্রত্যয়াত্মকা ইতি প্রত্যয়নিরোধে ন নিরুদ্ধাঃ" (পাতঞ্জল ব্যাসভাষ্য ৩।৯), অর্থাৎ, সংস্কার সকল চিত্তের ধর্ম্ম, প্রত্যয়াত্মক নহে; সুতরাং অনুভবের নিরোধ হইলেও সংস্কারের নিরোধ হয় না। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে অনুভাবক চিদাভাস বর্ত্তমান থাকে বলিয়া সংস্কার অনুভবমূলক হয়। সমাধিকালে অনুভাবক চিদাভাসের অবর্ত্তমানে সংস্কার স্বতঃই উৎপন্ন হয়। অতএব, "অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ", পূর্ব্বোক্ত এই সূত্রটি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালীন সংস্কারবিষয়ক, সমাধিকালীন সংস্কারবিষয়ক নহে। সমাধির

সংস্কার আত্মাকে আশ্রয় করিয়া হয়। কারণ "আমি সমাহিত ছিলাম" এইরূপ স্মৃতি সমাধি অন্তে হয়। সুতরাং সমাধিকালে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হয়।

(৩) সমাধি দ্বারা মনের মলিনতা দূর হইয়া মন শুদ্ধ হয়। ইহা যোগিগণের অনুভূত। কিন্তু মনে যে সকল মলিন সংস্কার থাকে, তাহারা মনে শুদ্ধ সংস্কারের উদয় ভিন্ন নষ্ট হইতে পারে না, যেমন আলোকের আবির্ভাব ভিন্ন অন্ধকার নষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং সমাধিকালে অজ্ঞানে শুদ্ধ সংস্কার জন্মে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। এই শুদ্ধ সংস্কার অজ্ঞানস্থ অশুদ্ধ সংস্কার সকলকে পরাভব করিয়া অজ্ঞানকে শুদ্ধ সংস্কার বিশিষ্ট করে। পরে সমাধিভঙ্গে এই শুদ্ধসংস্কারবিশিষ্ট অজ্ঞান শুদ্ধসংস্কারবিশিষ্ট মনে পরিণত হয়। এই চিত্তশুদ্ধি জীবের প্রয়োজনার্থ হয়, নিষ্প্রয়োজনে হইতে পারে না। সুতরাং সমাধিকালে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং" (পাতঞ্জল ১।৩), অর্থাৎ, সমাধিকালে দ্রষ্টা কূটস্থ চৈতন্য স্বস্বরূপে, অর্থাৎ দ্রষ্টৃস্বরূপে, অবস্থান করে, মিথ্যা আরোপিত ভোক্তৃস্বরূপে নহে। আত্মচৈতন্যে ভোক্তৃত্বের আরোপ না হওয়া মানেই চিদাভাসের লোপ। চিৎ, অচিৎ ও চিদাভাস, এই তিন লইয়া জীব, তন্মধ্যে চিৎ দ্রষ্টৃচৈতন্য, চিদাভাস ভোক্তৃচৈতন্য ও অচিৎ ভোগ্য। সমাধিতে চিদাভাসের লোপ হওয়ায় জীব দ্রষ্টৃচৈতন্যরূপে অবস্থান করে, জীব শিব হইয়া যায়। কিন্তু এ শিবত্ব সমাধিভঙ্গে ঘুচিয়া যায়, পুনরায় চিদাভাসের উদ্ভব হয়, অজ্ঞানের ক্রিয়া হইতে থাকে ও অজ্ঞানস্থ সুখ-দুঃখ-মোহ চিদাভাসের মধ্য দিয়া আত্মচৈতন্যে আরোপিত হইতে থাকে। তাহা হইলেও সমাধিকালে যখন অজ্ঞানের ভোগ বন্ধ হয়, যখন অজ্ঞানস্থ সত্ত্বরজস্তমোগুণ পরস্পরকে অভিভূত করিয়া সুখদুঃখমোহরূপে আবির্ভূত না হয়, তখন জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মচৈতন্যের অচিন্ত্যশক্তিবশতঃ ঐ অজ্ঞানেও আত্মার সন্নিধির সংস্কার জন্মে এবং এই পুণ্য সংস্কার দ্বারা অজ্ঞানে যে সকল মলিন সংস্কার থাকে তাহার ক্ষয় হয়। সমাধিভঙ্গে এই আত্মসন্নিধির সংস্কার।চিত্তে আত্মজ্ঞানরূপে উদিত হয়।

উপরোক্ত বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত হইল যে, সমাধিকালে জ্ঞান অজ্ঞান হইতে একেবারে বিবিক্ত হইয়া যায়। প্রত্যুত, জ্ঞান অজ্ঞান হইতে চিরকালই বিবিক্ত, কেবল চিদাভাসের বর্ত্তমানতা বশতঃ জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের একটা মিথ্যা সম্বন্ধ মিথ্যা চিদাভাস কর্ত্তৃকই স্থাপিত হয়। সমাধিতে মিথ্যা চিদাভাসের লোপ

হইলে এই মিথ্যা সম্বন্ধও লুপ্ত হয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে চিদাভাস কর্ত্তৃক জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এই সকল বিষয় জ্ঞান হইতে বিষয় বাদ দিলে যে জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট তাহাই সমাধিকালীন নির্ম্মুক্ত আত্মা।

এইরূপে নির্দ্ধারিত বিষয়সংস্পর্শশূন্য কূটস্থ, অর্থাৎ অবিকারী, জ্ঞানস্বরূপ আত্মায় কোনরূপ ভেদ থাকা অসম্ভব। সংহত ও পরিচ্ছিন্ন পদার্থেই ভেদ হয়। যে সকল উপাদান দ্বারা সংহত পদার্থ গঠিত হয় সেই সকল উপাদানের তারতম্যানুসারে সংহত পদার্থ সকলের মধ্যে ভেদ হয় ও উহারা পরিচ্ছিন্নরূপে আবির্ভূত হয়। চিৎ ও অচিৎ লইয়া জগৎ। ইহাদের মধ্যে অচিৎই সংহত, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা গঠিত। চিৎ অসংহত, জ্ঞানময়, সুতরাং ভেদরহিত, একরস। জ্ঞানমাত্র সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে জ্ঞানমাত্রই। এই জ্ঞান দ্রষ্টা; কর্ত্তা বা ভোক্তা নহে। শ্রুতি ইহাকে প্রজ্ঞানঘন, অর্থাৎ, অবিচ্ছিন্ন পূর্ণ জ্ঞান (Homogenous consciousness), বলিয়াছেন। জীবভেদে এই জ্ঞান ভিন্ন হইতে পারে না। বিভিন্ন জীবের বিষয়জ্ঞান বিভিন্ন হইলেও এই বিভিন্ন বিষয়জ্ঞান হইতে বিষয়কে বাদ দিলে, যে জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে তাহা বিভিন্ন নহে, এক। বিভিন্ন জীবের জীবত্বের মূলীভূত অচিৎ বা অজ্ঞানই বিভিন্ন। এই বিভিন্ন অজ্ঞান এক আত্মাকে প্রতিবিম্বিত করিয়া বিভিন্ন চিদাভাসরূপী জীবের উদ্ভবের কারণ হয়, যেমন বিভিন্ন দর্পণ এক সূর্য্যকে প্রতিবিম্বিত করিয়া বিভিন্ন প্রতিবিম্ব সূর্য্যের উদ্ভবের কারণ হয়। অতএব জীব বহু হইলেও আত্মা এক ও বিভু। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"—এই আত্মা ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী চিৎ। আকাশের সহিত সামঞ্জস্য বশতঃ এই জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে চিদাকাশও বলে। যেমন সর্ব্বব্যাপী এক আকাশ বিভিন্ন আধারে ঘটাকাশ, পটাকাশ প্রভৃতিরূপে খ্যাত হয়, তেমনই সর্ব্বব্যাপী এক আত্মা বিভিন্ন অজ্ঞানাধারে অমুকের আত্মা, অমুকের আত্মা বলিয়া খ্যাত হয়। ফলতঃ, অমুকের অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে আর অমুকের আত্মার ব্যক্তিত্ব থাকে না, অমুক তখন "অহং ব্রহ্মাস্মি", অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম, এই জ্ঞানে নিজের কাল্পনিক ব্যক্তিত্বকে লোপ করিয়া দেয়। দ্বৈতবাদীরা বলেন যে, আত্মা বহু, অর্থাৎ প্রতি জীবের আত্মা ভিন্ন, কারণ এক জীবের ভাব ও অবস্থা দ্বারা অন্য জীব পরিচালিত হয় না। একের জন্মে সকলের জন্ম হয় না, একের মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু হয় না, একের ইন্দ্রিয়বৈকল্যে সকলের ইন্দ্রিয়বৈকল্য হয় না, একজন পাগল হইলে

আত্মাই ব্রহ্ম।

সকলে পাগল হয় না, একজন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সকলে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, একজন ধার্ম্মিক হইলে সকলে ধার্ম্মিক হয় না, একজন পাপী হইলে সকলে পাপী হয় না, একের সুখে সকলের সুখ হয় না, একজনের দুঃখে সকলের দুঃখ হয় না, ইত্যাদি। অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর, কারণ আত্মার ভাব বা অবস্থাভেদ নাই। ভাব বা অবস্থা ভেদ চিদাভাস বা জীবাত্মার, এবং জীবাত্মা ত বহুই। ফলতঃ, উক্ত মতাবলম্বিরা কূটস্থ আত্মার সহিত ভোগের সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া উহাকে জীবাত্মাস্থানীয় করেন। তাঁহাদের মতের আত্মা ও অদ্বৈতমতের চিদাভাস বা জীবাত্মা এক। ইতি সর্ব্বমনবদ্যম্।

"আত্মজ্ঞানমিদং জ্ঞানং জ্ঞাত্বা পঞ্চস্ববস্থিতম্।
যং জ্ঞানেনাভিগচ্ছন্তি তস্মৈ জ্ঞানাত্মনে নমঃ॥"

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ৪৭ অধ্যায় ৭৭ শ্লোক।

এই শ্লোকের নীলকণ্ঠ স্বামীর ব্যাখ্যা :—

শব্দাদিবিষয়কো যো বোধঃ স বিষয়মনন্তর্ভাব্য আত্মস্বরূপভূতমেব জ্ঞানং।

"কতম আত্মেতি, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু
হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ।" (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৩।৭)

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।১।২)

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম।" (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৪।৫)

"অহং ব্রহ্মাস্মি।" (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১।৪।১০)

"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।" (ঐতরেয়োপনিষৎ ৫।৩)

"বিজ্ঞানঘন এব।" (বৃহ ২।৪।১২)

"আকাশো বৈ নাম।" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮।১৪।১)

"য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো
বিজিঘিৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ,
স অন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।" (ছান্দো—৮।৭।১)

"একঃ দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী।" (শ্বেতাশ্বতর—৬।১১)

"অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥" (কঠ—২।২২)

"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি।" (বৃহ—৪।৫।১৫)

"সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু—
ন লিপ্যতে চাক্ষুর্ষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥" (কঠ—২।২।১১)

"অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা
সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্।" (বৃহ—৪।৩।২১)

বৈতরণী।

[লেখক—শ্রীসতীশচন্দ্র বর্ম্মণ, বি-এল্।]

এ দেখি জগৎ নব,নাহি আলো, নাহি অন্ধকার,
গাঢ় কুহেলিকা যেন আবরিয়া রহিয়াছে ধরা.
নাহি বিহঙ্গম-কণ্ঠে সঙ্গীতের প্রমোদ ঝঙ্কার,
নাহি পুষ্প, নাহি হাসি,নির্ঝরিণী নাহি কলস্বরা!

চলিতেছে ছায়াসম দেহহীন নরনারী সবে,
কেহ নাহি কহে কথা,শুধাইলে নাহি শুনে বাণী,
একাকী চলেছি আমি নাহি হেরি আত্মীয়-বান্ধবে,
দূরে বহু দূরে ফেলি আসিয়াছি ধরণীর প্রাণী।

ফিরিতে চাহিছে মন, পূর্ব্ব-স্মৃতি ধরিছে জড়ায়ে,
ছুটে যাই একবার, দেখে আসি গৃহ সে আমার,
ফিরিতে পারি না আর, চলিতেছি আপনা হারায়ে,
ঘনাইয়া আসিতেছে চারিধারে তরল আঁধার!

সহসা নয়নপথে—ভয়ঙ্করা একি প্রবাহিণী,
আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঘুরি ধাইতেছে ক্ষুব্ধ ফেণময়,
ভয়াল তরঙ্গভঙ্গে, ঘোর শব্দে ছুটে উন্মাদিনী
গ্রাসিতে বন্ধুর বেলা ; বিশ্বত্রাসী কি চিরপ্রলয়!

বৈতরণী নদী একি! জীবলোক-পরলোক-সীমা!
কিংবা শুধু মায়াছল পরীক্ষিতে প্রত্যাগত নরে!
কিংবা কোটী দুঃখি-অশ্রু গড়িয়াছে এই নদী ভীমা,
বুঝিতে নারিনু আমি, দাঁড়াইনু আকুল অন্তরে।

কূলে কূলে ফিরে আত্মা, ভেসে আসে দূর আর্ত্তনাদ,
কেহ বা কাতরে ডাকে, 'লহ তুলে কর মোরে পার',
কেহ কাঁদে বসি তীরে নেহারিয়া সলিল অগাধ,
গর্জ্জিয়া ডাকিছে নদী,সর্ব্বজনে ডাকে বার বার!

* * * *

রহিতে পারি না আর,পলে পলে উঠিছে আহ্বান,
পৃথিবীর পাপ মোরে মরণেও রয়েছে ঘিরিয়া,
আজি দেহ-মুক্ত আমি,তবু কেন এ জড় পাষাণ,
বক্ষে আকর্ষিছে নদী শত বাহু যেন প্রসারিয়া!

* * * *

কভু ডুবি, কভু ভাসি, ওতপ্রোত তরঙ্গের গায়,
ঘাত-প্রতিঘাতে ছিন্ন আজি মম সমগ্র বন্ধন,
সলিল পরশমাত্র জ্বলে আত্মা কি তীব্র জ্বালায়,
অন্তরের প্রতি স্তরে গুমরিয়া উঠিছে ক্রন্দন।

নাহি তরী, নাহি তৃণ, শুধু বারি যত যায় দেখা,
তরঙ্গে তরঙ্গে নদী তীর-ভ্রম জাগায় নয়নে,
নিকটে নেমেছে শূন্য, শত পাপ দৃশ্য তায় লেখা
চক্রে চক্রে ঘুরিতেছি সলিলের ঘন আবর্ত্তনে!

সহিতে পারি না আর দুর্ব্বিষহ নরক-যাতনা,
অনুতাপে দগ্ধ আত্মা—তবু-তবু নাহি কি উদ্ধার,
কোথায় দেবতা মম, একি তব নিষ্ঠুর ছলনা?
কাতরে করুণা নাই,এ কেমন বিধাতা আমার?

সহসা উঠিল দূরে সুললিত সঙ্গীতের ধ্বনি,
মধুরে বাজিল বীণা নিরানন্দ বৈতরণী-বুকে,
প্রশান্ত হইল নদী মন্ত্রমুগ্ধ যেন ভুজঙ্গিনী,
কোমল আলোকস্তম্ভ বিকসিল নয়ন-সম্মুখে।

ধীরে অই আসে ধীরে, অতি কাছে যাইতেছে দেখা,
হিরণ্ময় ক্ষুদ্র তরী হেলে দুলে নাচিয়া নাচিয়া,

শশাঙ্কের জ্যোতি-সম নারী মূর্ত্তি বসি তায় একা,
ঝলকিছে দেব-দীপ্তি রমণীর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া।
'ভয় নাই—নাহি ভয়, অই দেখ রম্য পরপার,'
উঠিল সে দৈববাণী, পাপি-কর্ণে অমৃত ঢালিয়া;
পুছিনু 'কে তুমি মাতঃ?' 'আমি প্রেম, আমি কর্ণধার,
আত্মায় করিতে পার বসে আছি তরণী লইয়া।'

* * * *

চাহিনু মুছিয়া আঁখি,অন্তর্হিতা ত্রিদিব-মোহিনী,
কোথা বৈতরণী নদী,কোথা সেই রুষ্ট জলরাশি,
চৌদিকে নবীন ধরা, অপরূপ সদা শ্যামাঙ্গিনী,
প্রফুল্ল চলিল আত্মা পরলোকে প্রেমানন্দে ভাসি।

বিপত্তি।

[লেখক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার, বি-এ।]

সুশীলমাধব হোষ্টেলে নিজের কামরায় আরাম-কেদারায় বসিয়া সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছিল। পার্শ্বে টিপয়ের উপর শূন্য চায়ের পেয়ালা এবং ভুক্তাবশিষ্ট প্রাতরাশ পড়িয়াছিল। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া দুইখানি চিঠি দিয়া গেল। প্রথমখানি তাহার বাল্যবন্ধু এবং সতীর্থ, অতুলচন্দ্র ওরফে মিঃ এ সি রায় লিখিয়াছেন,—

"সুশীল,

বড়দিনের ছুটি ত আসিল, এবার তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি পালন করিবে ত? আমার মাতার এবং ভগিনীর একান্ত অনুরোধ, এবার ছুটিটা তুমি আমাদের এখানে কাটাও। তোমার জন্য তাঁহারা আমার সেই ছোট ঘরটা সাজাইতেছেন। তুমি ভাবুক মানুষ—গঙ্গার ধারের ঘরটা তোমারই উপযুক্ত। নিশ্চয়ই আসিও, নতুবা আমরা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইব। আর একটা সুখবর তোমাকে দিই—আমাদের টেনিস্ গ্রাউণ্ডটা এবার সম্পূর্ণ হইয়াছে—তোমার আসার অপেক্ষায় আমরা এখনও ব্যবহার করি নাই।

তোমার—অতুল।"

পত্রখানি পড়িয়া সুশীল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। দ্বিতীয় পত্র তাহার কাকার; —তিনি দেশ হইতে লিখিতেছেন:—

"কল্যাণীয়েষু,

এবার কালেজের ছুটি হইবামাত্র তুমি দেশে আসিবে। আমি এখানে তোমাকে সার্ভে শিখাইবার জন্য একজন ভাল লোক স্থির করিয়াছি। আর

কালকার দিনে জমীদারী-রক্ষার জন্য সার্ভে জানা একান্ত দরকার। তোমার পত্র পাইলে সার্ভেয়ারের সহিত পাকা বন্দোবস্ত করিব। আশা করি, কুশলে আছ। ইতি

আশীর্ব্বাদক—শ্রীভবতারণ মুখোপাধ্যায়।"

কাকার পত্র পড়িয়া সুশীলের সমস্ত উৎসাহ নিভিয়া গেল—কোথায় চন্দন-নগরের গঙ্গার ধারে বন্ধু-সম্মিলন আর কোথায় নদীয়া জেলার নির্জ্জন বাগানে নির্ব্বাসন তৎসঙ্গে সার্ভে শিক্ষা। কিন্তু উপায় কি! গম্ভীর এবং রুক্ষ-প্রকৃতি কাকা মহাশয়ের সঙ্গে পনের দিন কাটাইতে হইবে ভাবিয়াই সুশীলের মন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল—তার উপর থিয়োডোলাইট সার্ভের—সে যন্ত্রটার কথা মনে পড়িলে ত আর জ্ঞান থাকে না। কিন্তু কাকার বিরক্তিকে সে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভয় করিত। ভয় করিবার যথেষ্ট কারণও ছিল।

সুশীলমাধবের পিতামাতা বর্ত্তমান ছিলেন না; বাল্যে কাকীমার ক্রোড়ে সে মানুষ হইয়াছিল। খুল্লতাত রায় সাহেব ভবতারণ মুখোপাধ্যায় পাবলিক ওয়ার্কস্ বিভাগের ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। ত্রিশ বৎসর সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়া, বিপুল অর্থ, রায় সাহেব উপাধি এবং অতি রুক্ষ মেজাজ লইয়া তিনি দেশে বসিয়া পেন্‌সন্ ভোগ করিতেছেন। আজ দশ বৎসর হইল, তাঁহার গৃহিণী পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি নিঃসন্তান, সুশীলই তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারী। স্ত্রীর মৃত্যুর পর রায় সাহেব দেশে জমীদারী খরিদ করিয়াছেন এবং গ্রামের বাহিরে একটী বাগান ও বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া সেইখানেই বাস করিতেন। বাগানের উন্নতি-সাধন এবং জমীদারী-শাসন—এই দুই কাজ লইয়া তিনি থাকিতেন। দেশস্থ কাহারও সহিত তিনি মিশিতেন না—লোকেও সাহস করিয়া তাঁহার কাছে ঘেঁসিত না, সুশীলমাধবকে তিনি যত্ন করিয়া লেখা-পড়া শিখাইয়াছেন—সে এখন এম, এ পড়িতেছে। সুশীল তাঁহার একমাত্র বংশধর হইলেও, সে কখনও কাকার কাছে আদর পায় নাই। কাকীমার মৃত্যুর পর সে কাঁকাকে কখনও হাসিতে দেখে নাই।

কলেজের ছুটির সময় কিছু দিন করিয়া সুশীলকে কাকার কাছে কাটাইতেই হইত; সে ক'দিন তাহার যেন কাটিতে চাহিত না। স্নেহহীন কঠোর নিয়মের মধ্যে থাকা তাহার পক্ষে কঠিন কারাবাস বলিয়া মনে হইত। তাই সেখান হইতে ছুটি পাইলেই সে মিঃ রায়েদের বাড়ী গিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত। বন্ধুসঙ্গ ছাড়া—সেখানে তাহার আর এক প্রধান আকর্ষণ ছিল মিস্ রায়। মিঃ

রায়ের মাতার নিকট গিয়া তাহার মাতৃস্নেহ-লালায়িত হৃদয় তৃপ্ত হইত। আজ উভয় সমস্যার মধ্যে পড়িয়া সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—ভুলিয়া গেল যে কলেজের দেরী হইয়া যাইতেছে।

(২)

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে সুশীলমাধব দু'খানি পত্রেরই জবাব লিখিতে বসিল। কাকাকে লিখিল যে, তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য—ছুটি হইলেই সে সার্ভে শিখিতে দেশে যাইবে। আর মিঃ রায়কে লিখিল,—

"ভাই অতুল,

বড় মুস্কিলে পড়িয়াছি। কাকা লিখিয়াছেন যে, এবার বড় দিনের ছুটিতে দেশে গিয়া সার্ভে শিখ্‌তে হবে। তুমি ত জান যে, কাকার কাছে দু'হপ্তা কাটানর চেয়ে জেলখানা অধিক মনোরম। কোথায় তোমাদের কাছে গিয়া দু'দিন আনন্দে কাটাব—আর কোথায় এই বিপদ! কি কর্‌ব! উপায় নেই। না গেলে কাকা বড় বিরক্ত হবেন। তোমার মাতা ঠাকুরাণী ও ভগিনীকে সব বুঝিয়ে বলো। আমার অপেক্ষায় নতুন টেনিস গ্রাউণ্ডটা ফেলে রেখো না।

তোমার সুশীল।"

তাড়াতাড়ি পত্র লিখিয়া খামে বন্ধ করিয়া শিরোনামা লিখিল, তার পর টিকিট লাগাইবার জন্য দেরাজ খুলিয়া দেখে একখানি মাত্র টিকিট আছে। সে জানিত যে, রায় সাহেব পত্রের জবাব দেরীতে দেওয়া পছন্দ করেন না—তাই সে কাকার নামের খামখানির উপর টিকিট লাগাইয়া চাকরকে রওনা করিতে দিল। মিঃ রায়ের পত্র বৈকালে পাঠাইলেও চলিবে ভাবিয়া সে স্নানাহার করিতে চলিয়া গেল।

(৩)

আহারাদির পর ফিরিয়া আসিয়া হঠাৎ সুশীলের মনে হইল যে, অতুলকে টেনিস-গ্রাউণ্ড সম্বন্ধে আর একটা কথা লেখা দরকার। ভাবিয়া সে মিঃ রায়ের নামের খামখানা খুলিয়া ফেলিল। সর্ব্বনাশ! এ ত অতুলের নামের চিঠি নয়! সে ত তবে অতুলের পত্র কাকার নামীয় খামে পাঠাইয়া দিয়াছে! সুশীল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল! সে তাহার কাকাকে বেশ জানিত; সে অতুলকে যে সব কথা লিখিয়াছে তাহা কাল প্রাতে যখন তাহার কাকা পড়িবেন, তখন সে কথা ভাবিতে সে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিতেছিল! এখন

উপায়! হঠাৎ তাহার মনে হইল, হয়ত চাকরটা এখনও চিঠি ডাকে দেয় নাই —তাড়াতাড়ি কোট পরিয়া সে নীচের তলায় ছুটিল; সেখানে দেখে যে ভৃত্য দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কাহার সঙ্গে গল্প করিতেছে। ছুটিয়া গিয়া সে চিঠির কথা জিজ্ঞাসা করিল; দুঃখীরাম ভাবিল বুঝি বা দেরী হওয়ায় বাবু তাহার উপর রাগ করিয়াছেন, সে বলিল যে, সে নিজে হাতে সে চিঠি মাধব বাবুর বাজারের সামনের ডাক বাক্সে ফেলিয়া দিয়াছে, একটুও দেরী করে নাই। সুশীলমাধব যদি প্রকৃতিস্থ থাকিত, তবে তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইত না যে, ভৃত্যবর সম্পূর্ণ মিছা বলিতেছে। আসলে সে অতটা কষ্ট করে নাই,—চিঠিখানা সে তাহাদের দেশের একজন লোকের হাতে দিয়াছিল।

কোনও কথা না ভাবিয়া সুশীলমাধব ছুটিয়া মাধব বাবুর বাজারের সামনের ডাক-বাক্সের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল; দেখিল "Next clearance 12-30"। সাড়ে বারোটা বাজিতে তখনও এক ঘণ্টা দেরী। তবেত সে সর্ব্বনেশে চিঠি এখনও এই বাক্সেই আছে। যেমন করিয়াই হউক এ চিঠি ফেরৎ লইতেই হইবে। সে কোনও মতে ধৈর্য্য ধরিয়া ডাক-হরকরার অপেক্ষা করিতে লাগিল। সে ঘণ্টা আর কাটিতে চায় না! প্রেসিডেন্সি কালেজের ঘড়িটা কি আজ বন্ধ! অবশেষে হেলিতে দুলিতে ডাকহরকরা সাহেবের আবির্ভাব হইল! সুশীল তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার ভুলের কথা বলিয়া কত অনুনয়-বিনয় করিয়া তাহার সেই চিঠিখানি চাহিল। অনুনয়ে ফল হইল না দেখিয়া শেষে সে ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিল—একখানা দশ টাকার নোট দেখাইয়া বলিল যে, চিঠিখানি দিলে এ দশ টাকা তাহার। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, ইহাতেও হরকরার মন গলিল না, উপরন্তু সে বেশী বাক্যব্যয় না করিয়া ইঙ্গিতে অদূরস্থ কনেষ্টবলকে দেখাইয়া দিল এবং অতি সযত্নে বাক্সের চিঠিগুলি সংগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। সুশীলমাধব হতাশভাবে ভাবিতে লাগিল—এখন উপায় কি?

চট্ করিয়া তাহার মাথায় একটা মতলবের উদয় হইল; সে হোষ্টেলে ফিরিয়া একটা ব্যাগে খানকতক কাপড় গোছাইয়া লইল এবং ওভারকোটটা কাঁধে ফেলিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে ছুটিল। কিন্তু হায়! সন্ধ্যা ৬টার আগে ত তাহাদের দেশে যাইবার আর ট্রেণ নাই। সুশীলের হোষ্টেলে ফিরিবার ইচ্ছা হইল না; সে ষ্টেশনে বসিয়া ঘণ্টা গণিতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রি-জাগরণের পর প্রাতে সুশীলমাধব তাহার কাকার বাগান-বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। রায় সাহেব তখনও নীচে নামেন নাই। তাঁহার প্রিয়

ভৃত্য রামনিধি 'দাদাবাবু'র রক্তবর্ণ চক্ষু এবং শুষ্ক মুখ দেখিয়া বিপদাশঙ্কায় ব্যাপার কি জানিতে চাহিল। সুশীল বলিল,—এমন কিছু নয়—কলিকাতা ভাল লাগিল না—তাই ছুটীর আগেই সে দেশে ফিরিয়াছে। তার পর জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা কোথা ?" রামনিধি বলিল,—"কাল হইতে তাঁর শরীর বড় খারাপ—বাতের ব্যথায় উত্থানশক্তি-রহিত। ডাক্তারও পাঁচ সাত দিন শয্যাত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

সুশীলকে বসিতে বলিয়া রামনিধি রায় সাহেবের জন্য চা লইয়া উপরে চলিয়া গেল। সুশীল চিন্তাক্লিষ্টবদনে বসিয়া রহিল। সে এত কষ্টের মধ্যে একটা আশার আলোক দেখিতে পাইল; তবে ত এখনও তাহার সে চিঠি কাকার হস্তগত হয় নাই! সে বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। এমন সময় রামনিধি ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"দাদাবাবু, কর্ত্তা ম'শায়কে তোমার আসার কথা বল্লাম—তা' তিনি খুব রাগ কল্লেন, বল্লেন 'পড়াশুনো ফেলে ছুটির আগে আসার কি দরকার ছিল? আমার সঙ্গে দেখা হবে না—ফিরে যা'ক—আর বড়দিনের ছুটিতে এবার তার দেশে আস্‌তে হবে না'।"

সর্ব্বনাশ! তবে কি রায় সাহেব তাহার পত্র পাইয়াছেন! একথা ভাবিতে সুশীলমাধব ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া উঠিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া রামনিধির দয়া হইল; সে তাড়াতাড়ি চা ও কিছু খাবার আনিয়া দিল। কোনও রকমে জল-যোগ সারিয়া সুশীল ব্যাগ হাতে উঠিয়া পড়িল। যাক্! আর ভাবিয়া কি হইবে!

ধীরে ধীরে বাগান হইতে বাহির হইয়া সুশীল মাঠের রাস্তা ধরিয়া ষ্টেশনের দিকে চলিল। গ্রামের রাস্তায় শীঘ্র ষ্টেশনে পৌছান যায় বটে, কিন্তু গ্রামের কাহাকেও মুখ দেখাইতে আর প্রবৃত্তি নাই! ও কে'! রায় সাহেবের আরদালী নয়! এই লোকটাই ত তাঁহার ডাকের চিঠি আনে! হঠাৎ সুশীলের মাথায় একটা দুর্ব্বুদ্ধি গজাইয়া উঠিল! সে দৌড়াইয়া বাগানে ফিরিয়া গিয়া মালির ঘর হইতে একটা থলে সংগ্রহ করিয়া একটা ঝোঁপের ধারে লুকাইয়া রহিল। আরদালী নিকটে আসিবামাত্র সুশীল বাঘের মত তাহার ঘাড়ে গিয়া পড়িল এবং থলে দিয়া তাহার মুখ-চোখ বাঁধিয়া ফেলিল। তার পর, তাড়াতাড়ি চিঠির ব্যাগটা খুলিয়া সব চিঠি গুলো দেখিয়া লইল; কই তার চিঠিটা ত নাই! তবে সেটা গেল কোথায়! নিশ্চয়ই তাহা ইতিপূর্ব্বেই রায় সাহেবের হস্তগত হইয়াছে—তাই বা কেমন করিয়া সম্ভব! আর কোনও কথা না ভাবিয়া সুশীল আরদালীর হাতে

দশ টাকার একখান নোট গুঁজিয়া দিয়া এক দৌড়ে ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত। ভাগ্যক্রমে তখনি কলিকাতার দিকের একটা ট্রেণ ছিল; সেই ট্রেণেই সুশীল কলিকাতায় ফিরিল। যাহা হইবার, হইবে। সে ত চেষ্টা যথেষ্ট করিয়াছে, অদৃষ্ট ছাড়া ত পথ নাই—ইত্যাদি ভাবিয়া সে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

(৪)

পরদিন প্রাতে সুশীল নিজের ঘরে বসিয়া চা'পান করিতেছিল। গত দু'দিনের উদ্বেগ, অনিয়ম ও ছুটাছুটিতে তাহার শরীর ভাল ছিল না—শরীর ও মন দুই-ই যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। চা'পান শেষ হইতে হইতেই খবরের কাগজ আসিয়া পড়িল। সুশীল অলসভাবে সমস্ত কাগজটার উপর চোখ বুলাইতে লাগিল। হঠাৎ একটা টেলিগ্রামের উপর নজর পড়িবামাত্র সে খাড়া হইয়া বসিল।

"অদ্ভুত ডাকাতি।" "গত কল্য প্রাতে নদীয়া জেলার—গ্রামের জমীদার পেন্সনপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার রায় সাহেব ভবতারণ মুখোপাধ্যায়ের আরদালি যখন পোষ্ট অফিস হইতে তাঁহার ডাক লইয়া আসিতেছিল, তখন একজন ভদ্রবেশধারী যুবক উক্ত আরদালীকে আক্রমণ করে এবং রায় সাহেবের চিঠিপত্র কাড়িয়া লয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন চিঠিই লইয়া যায় নাই! রায় সাহেব পীড়িত; পুলিশ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তদন্তের ভার গ্রহণ করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত কোন প্রকার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।"

পড়িয়া সুশীলমাধবের মুখে একটু হাসি দেখা দিল; আরদালী-প্রবর তাহার প্রদত্ত নোটখানার কথা বেমালুম হজম করিয়াছে!

উক্ত টেলিগ্রামের পর আর একটা সংবাদ ছিল।

"পোষ্ট অফিসে অগ্নিকাণ্ড।" "—তারিখে সন্ধ্যার সময় কলিকাতার—পোষ্ট অফিসের ডাকবাক্স খুলিয়া চিঠি মোহর করা হইতেছিল। একখানা চিঠিতে মোহর দিবামাত্র সেটা ভীষণ শব্দে ফাটিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বলিয়া উঠে। সৌভাগ্যক্রমে পিয়ন বাঁচিয়া গেছে। কিন্তু সেই জ্বলন্ত চিঠিখানি পড়িয়া আরও অনেকগুলি পত্র পুড়িয়া গিয়াছে। যে চিঠিতে বিস্ফোরক পদার্থ ছিল, তাহার উপর কোনও বিখ্যাত সংবাদপত্রের সম্পাদকের নাম লেখা ছিল বলিয়া অনুমান হয়। পত্রখানির ভস্মাবশেষ পুলিশ পরীক্ষার জন্য লইয়া গিয়াছে।"

সংবাদপত্র পাঠ শেষ করিয়া সুশীলমাধব ভৃত্যকে আর এক পেয়ালা চায়ের

জন্য হুকুম করিল। চায়ের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখীরাম সুশীলের নামীয় ডাকের চিঠিগুলিও আনিয়া দিল। তাহার মধ্যে একখানি পত্র Dead Letter Office এর মোহরাঙ্কিত দেখিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য সুশীল সেঁইখানি প্রথমে খুলিয়া ফেলিল। এ কি! এ আধ-পোড়া চিঠিখানা'ত' তাহারই হাতের লেখা! পত্রের খামটা প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে; ভিতরের কাগজে তাহাদের হোষ্টেলের ঠিকানা এবং তাহার নাম দেখিয়া পত্রখানা পোষ্ট অফিস তাহাকেই ফেরৎ দিয়াছে! পত্র দেখিয়া সুশীল আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। এই চিঠিখানা ফেরৎ পাইবার জন্য সে কত কষ্টভোগ না করিয়াছে! আনন্দের আতিশয্যে সে দুষ্কৃতকারীদেরও আশীর্ব্বাদ না করিয়া থাকিতে পারিল না।

দ্বিতীয় পত্রে আর এক সুসংবাদ ছিল; রায় সাহেবের ম্যানেজার লিখিতেছেন—"বড়বাবুর শরীর বেশ সুস্থ না থাকায় আপনার সহিত তিনি দেখা করিতে পারেন নাই। ছুটির পূর্ব্বে এরূপভাবে সংবাদ না দিয়া বাড়ী আসায় রায় সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, নানা কারণে তাঁর অভিপ্রায় যে, এবার বড়দিনের ছুটিতে আপনি দেশে না আসিয়া অন্যত্র যাইতে পারেন—সার্ভে শিক্ষার ব্যবস্থা পরে হইবে। রায় সাহেব এখন অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। আপনার খরচের জন্য অদ্য একশত টাকার মনিঅর্ডার পাঠান হইল।"

তৃতীয় পত্র মিঃ রায়ের—তিনি পূর্ব্ব পত্রের জবাবের জন্য তাগিদ করিয়াছেন। উত্তরে সুশীলমাধব টেলিগ্রাম লিখিতে বসিয়া গেল।

সফদর জঙ্গ।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল্‌।]

সফদর জঙ্গের স্মৃতিসৌধ দিল্লিতে একটা দেখিবার জিনিস। ইহার শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া মোগল জাতির স্থাপত্যকলার প্রশংসা অনিবার্য্য। সাজাহানাবাদের দিল্লি ফটক দিয়া বাহির হইয়া ফিরোজসাহের কোটলা, অশোক-স্তম্ভ, পুরাণো কেল্লা, হুমায়ুনের সমাধি-মন্দির দেখিয়া কুতবের পথে যাইতে সহস্র সহস্র নরনারী এই বিশাল স্মৃতিসৌধের দিকে চাহিয়া দেখে, ইহার বিস্তৃত আঙ্গিনায়

ঘুরিয়া সৌধনির্ম্মাতার প্রশংসা করে, মনে মনে স্থির করিয়া লয় যে, যে লোকের স্মৃতিরক্ষার জন্য এমন সুবন্দোবস্ত তিনি নিশ্চয়ই মহাপুরুষ—প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। সাধারণ লোকে সন্দেহও করে না যে, সফদর জঙ্গের প্রাণ তাঁহার স্মৃতিসৌধের পাষাণের মত কঠিন ছিল; স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি রাজদ্রোহিতাকে পাপ বিবেচনা করেন নাই, বন্ধুত্বের ভাণ করিয়া নিজের অতিথিকে গুপ্তহত্যা করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। পৃথিবীর পূজা এই শ্রেণীর; জগতের অনেক স্মৃতি-মন্দিরের গাত্রে অদৃশ্য অক্ষরে এইরূপ কুটিলতার ইতিহাস লিখিত আছে।

প্রত্যেক স্মৃতিমন্দিরের এক একটা ইতিহাস থাকে। এক একটা বিষয়ের গৌরব ঘোষণা করিবার জন্য সাধারণতঃ স্মৃতিমন্দির রচিত হয়। দাম্পত্য-প্রণয়ের মহত্ত্ব ঘোষণা করিবার জন্য তাজের কল্পনা—এতখানি অমল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। বাবর ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু হুমায়ুন সে রাজত্ব একবার হারাইয়াছিলেন, আবার তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অধ্যবসায়ে সাফল্য লাভ হয়—তাহার দৃষ্টান্ত স্কটলণ্ডের রবার্ট ব্রুস ও ভারতের হুমায়ুন বাদসাহ। তাঁহার স্মৃতিমন্দিরের অর্থ বুঝি, তাঁহার স্মৃতিসৌধের গোলক-ধাঁধায় ঘুরিতে মনের ও চিন্তার সূত্র হারাইয়া যায়; চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া ভাবনার পথকে "ভুল ভুলাইয়া" বা গোলক-ধাঁধা করিয়া তুলে। জাহানারা সমাধির উপরের দুইটা ছত্র—

বেগয়ের সব্জাহ না পুষদ্ কসে মজারে মেরা
কি কবরপুষ গরীবাঁ হামে গিয়াহ বসান্ত—

পাঠকের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত করিয়া দেয়।* কিন্তু সফদর জঙ্গের সমাধি—সফদর জঙ্গের ইতিহাস যাহারা অনভিজ্ঞ তাহাদের পক্ষে ভাল, যাহারা সে ইতিহাস পড়িয়াছে তাঁহাদের পক্ষে বড় কষ্টকর। পৃথিবীর বিচার-শক্তির উপর ঘৃণার উদ্রেক হয়, অকৃতীর পূজা দেখিয়া মানব জাতির উপর ক্রোধের উদ্রেক হয়।

মোকাব্রাটি দেখিতে বেশ। 'অর্চ্চনা'র চিত্রে তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইবে। কোণের চিত্রটি স্বয়ং সফদর জঙ্গের। অবশ্য মর্ম্মরনির্ম্মিত নয়—লাল প্রস্তরে গঠিত। আকারে ঠিক তাজমহলের মত। তাজমহলের চারিকোণের চারিটী মিনার তাজের সৌধের চারি কোণে সংলগ্ন করিয়া দিলে যেরূপ দেখিতে হয়, আকারে সফদর জঙ্গের মোকাব্রা সেই প্রকারের। অবশ্য তাজের অপরিমেয়

* অর্চ্চনা ৮ম বর্ষ ৩৪০ পৃঃ "সাহজাদি সম্বন্ধে বার্ণিয়ো।"

সৌন্দর্য্য এ লাল পাথরের সৌধে মোটেই প্রতিবিম্বিত হয় নাই ; ইহার কাঠামোটা কেবল তাজের কাঠামোর অনুরূপ। ইহারই অনতিদূরে লর্ড হার্ডিঞ্জের নূতন দিল্লি নির্ম্মিত হইতেছে। ভারতের নূতন রাজধানীতে লোকসংখ্যা বাড়িলে বোধ হয় সফদর জঙ্গ সমাধি সহরের মধ্যে পড়িবে।

আবুল মনশুর খাঁ সফদর জঙ্গের অসাধারণ বলবিক্রম, সাহস ও অধ্যবসায় ছিল। তিনি এক সময় দিল্লি-সিংহাসনের দিকে নিক্ষিপ্ত অস্ত্ররাজি নিজের বক্ষ পাতিয়া গ্রহণ করেন নাই একথা বলিলেও সত্যের অপলাপ করা হয়। বাস্তবিক তিনি নিজ অধ্যবসায়ে, নিজ বিক্রমে, নিজ প্রতিভায় মোগল সাম্রাজ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে তিনি রাজভক্তি, প্রভুভক্তি ভুলিয়া রাজবিদ্রোহী হইয়াছিলেন, প্রতিযোগীকে গুপ্তহত্যা করিয়া কলঙ্কের পশরা শিরে তুলিয়াছিলেন। তাই বলিতেছিলাম, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজন মোটেই ছিল না।

অযোধ্যার বিখ্যাত নবাব-বংশের স্থাপয়িতা বারহান্ উল্‌মুল্ক সম্রাট মহম্মদ সাহের বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি মোগল সম্রাটের পক্ষ হইতে দুর্জ্জেয় মহারাষ্ট্রদিগের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বাদসাহ তুষ্ট হইয়া উত্তরোত্তর তাঁহার পদবৃদ্ধি করিয়াছিলেন ; শেষে তাঁহাকে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশ বহুদিন অযোধ্যায় একপ্রকার স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া শেষে ইংরাজের নিকট পরাস্ত হয়। আবুল মনসুর খাঁ এই অযোধ্যার নবাবী প্রতিষ্ঠাতা বারহান উলমুল্ক বাহাদুর সাদত জঙ্গের ভাগিনেয়।* ইনি মাতুলের সহিত মোগল সম্রাট মহম্মদ সাহের পক্ষ হইতে মহারাষ্ট্রদিগের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রুস্তম আলির তারিখি হিন্দ্ নামক ইতিবৃত্তে প্রকাশ যে, সফদর জঙ্গ মাতুলের অধীনে যুদ্ধ করিয়া মহারাষ্ট্রদিগকে আগ্রার পথে পরাজিত করিয়াছিল।

কেহ বলে, বারহান উলমুল্ক বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, কেহ

* ১০ম বর্ষের শ্রাবণ মাসের 'অর্চ্চনা' ২০১ পৃঃ "লক্ষ্ণৌর নবাব" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, নবাব সফদর জঙ্গ বরহান উল্‌মুল্কের ভ্রাতুষ্পুত্র। লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত একখানি উর্দ্দু পুস্তকে লিখিত আছে—"উন্‌কে বাদ উনকে দামাদ আওর ভাতিজে" ইত্যাদি। ঐ পুস্তক দেখিয়া তখন উক্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, কিন্তু বারহাতুন নাজীরিন্ স্পষ্ট করিয়া ভাগিনেয় শব্দ লিখিয়াছেন। উর্দ্দ পুস্তক বোধ হয় ইংরাজি nephew শব্দের অনুবাদ করিয়া ভ্রমবশতঃ ভাতিজে কথা লিখিয়াছে।

বলে, তিনি ক্ষতাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কিন্তু সফদর জঙ্গ অযোধ্যার নবাব-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যখন আহম্মদ সাহ আবদালী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন প্রভূত পরাক্রমের সহিত সফদর জঙ্গ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মুসলমান ইতিবৃত্তকার মহম্মদ আস্‌লাম তাঁহার ফরহাতুন নারীজিন নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"যখন নাদীর সাহের হত্যাকারী আহম্মদ সাহ আবদালী অসংখ্য সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষ জয় করিতে আসে তখন অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত সফদর জঙ্গ আপনার পদমর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং সেই দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর সহিত ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মন্ত্রী কমরুদ্দীন খাঁ কাল-কবলিত হইয়াছিলেন, রাজা জয়সিংহের পুত্র রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়াছিলেন। সেই সময় সম্রাটের মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হইয়াছিল, রাজসেনা পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তবু তিনি তাহাকে জয় করিয়া দূরীভূত করিয়াছিলেন"।

সম্রাট মহম্মদ সাহের সরদারদিগের সহিত আহম্মদ সাহ আবদালীর যুদ্ধের বর্ণনা Forsyth সাহেবের তারিখি আহম্মদ সাহ নামক গ্রন্থের অনুবাদে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সে সময় বৃদ্ধ মহম্মদ সাহ পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। ইতিমদ্-ইদ্-দৌলা তখন প্রধান সচিব। সফদর জঙ্গ, রাজা ঈশ্বরসিংহ প্রভৃতি আবদালীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরসিংহ আফগান বীরের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করেন। সফদর জঙ্গ সেই সময় প্রভূত পরাক্রমের সহিত আবদালীকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

এই সংগ্রামে সফদর জঙ্গ নিজ বিক্রমের পরিচয় দিয়া যশ ও গৌরবের উচ্চ শিখরে সমাসীন হইলেন। তখন তাঁহার প্রকৃত স্বভাব বিকসিত হইল। তিনি যুবরাজ আহম্মদ সাহকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজে উজীরের পদগ্রহণ করিলেন। আহম্মদ সাহকে দিল্লিতে আনিয়া তিনি নিজে সাম্রাজ্যশাসনভার একপ্রকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। আহম্মদ সাহ নামমাত্র সাজাহানাবাদের সিংহাসনে বসিলেন। সফদর জঙ্গের সহিত অন্যান্য ওমরাহগণ প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলে রাজ্য মধ্যে ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হইল। ইহাদের স্বার্থের জন্য যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্মলাভ করিল, তাহার ফলে দিল্লির সিংহাসন অবধি কাঁপিয়া উঠিল। *

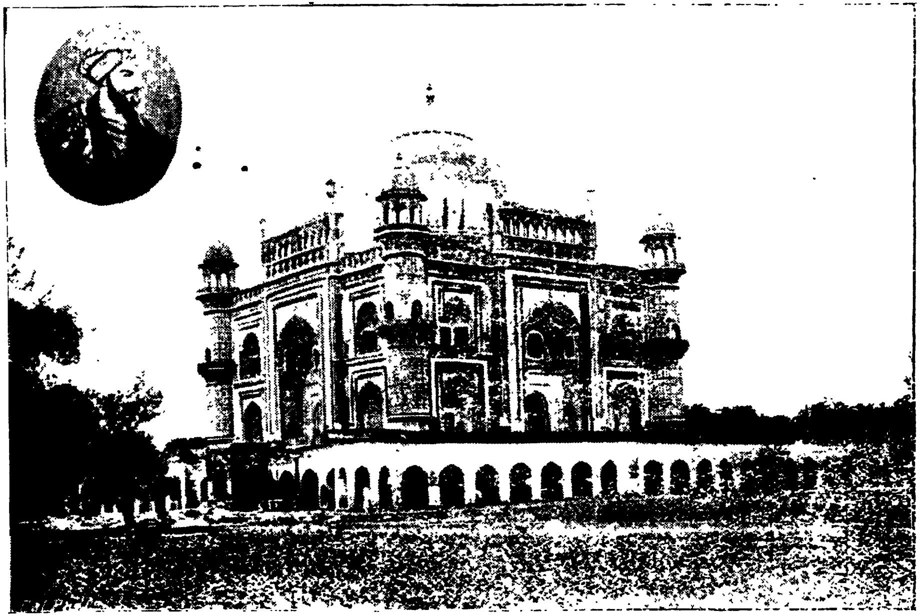
* মহম্মদ সাহের মৃত্যুর সময় আহম্মদ সাহ দিল্লিতে ছিলেন না এবং বাদসাহের

পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্পূর্ণ উচ্চাশাও তাঁহার মনে বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয় না। তিনি যখন পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া দিল্লির দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময়ে পানিপথের নিকট সফদর জঙ্গ-প্রেরিত মিছিল রাজছত্র প্রভৃতি লইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তখনও আহম্মদ সাহ সন্দিগ্ধচিত্তে একেবারে বাদসাহী গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু সফদর জঙ্গ জোর করিয়া তাঁহাকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। আহম্মদ সাহের মত ব্যক্তিকে সিংহাসনে অধিরোহণ করাইতে না পারিলে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে বিঘ্ন জন্মিত।

মহম্মদ সাহের রাজত্বকালের শেষ কয়েক বৎসর নবাব জাবেদ খাঁ নামক একজন খোজার প্রভাব অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। আহম্মদ সাহের জননী উদম বাই পূর্ব্বে রাজ অন্তঃপুরের একজন হিন্দু নর্ত্তকী ছিলেন। খোজা জাবেদ খাঁ হারেমের দারোগা ছিল। মহম্মদ সাহের অনেক মহিষী বিদ্যমান থাকিলেও তিনি যুবতী উদম বাইয়ের রূপ গুণে আকৃষ্ট হয়েন। খোদা জাবেদ খাঁ তাঁহাদের গুপ্ত প্রণয়ে সাহায্য করিয়া শেষে উদম বাইকে রাজমহিষী করিয়া দিয়াছিল। ইনিই আহম্মদ-জননী, ইতিহাসে খুড়সিয়া বেগম বলিয়া খ্যাত—দিল্লির খুড়সিয়া বাগান এই মহিষীরই স্মৃতিরক্ষার জন্য নির্ম্মিত। নবাব জাবেদের হস্তে হারেমের সকল কার্য্য ন্যস্ত ছিল; তিনি হারেমের মধ্যেই শয়ন করিতেন এবং বৃদ্ধ মহম্মদ সাহের আমলে তিনি ও তাঁহার মিত্র খুড়সিয়া বেগম রাজ্যের সকল কার্য্য পরিচালিত করিতেন; নামে মাত্র বাদসাহ ছিলেন মহম্মদ সাহ, উজীর ছিলেন ইতিমদ্-উদ-দৌলা; কিন্তু প্রকৃত সাম্রাজ্ঞী ছিলেন—উদম বাই ওরফে বাঈজিউ সাহেবা ওরফে খুড়সিয়া বেগম এবং উজীর ছিলেন নবাব জাবেদ খাঁ।*

সুতরাং যখন সফদর জঙ্গ মুরুব্বি হইয়া খুড়সিয়া-তনয় আহম্মদকে আকবর ঔরঙ্গজেবের তখ্‌তে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখন নবাব জাবেদ ও বেগম খুড়সিয়া বড় বিচলিত হইলেন। সফদরের মত প্রবল শত্রুর সহিত প্রকাশ্যভাবে বৈরিতা করাও বড় দুঃসাহসের কার্য্য। খাজা আবদুল করিম খাঁ তাঁহার বয়ানী ওয়াকী নামক ইতিবৃত্তে লিখিয়াছেন—"খোজা জাবেদ খাঁ নবাব বাহাদুরের অভিলাষ যে, তিনি একাকী কোনও অংশীদার না জুটাইয়া রাজমাতা নবাব খুড়সিয়ার সাহচর্য্যে সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। নবাব সফদার জঙ্গ উজীর-ই-

* Forsyth সাহেবের অনূদিত তারিখী আহম্মদ সাহ।



সফদর জঙ্গের সমাধি-সৌধ ও আলেখ্য

আজামেরও ইচ্ছা যে, তিনি ঐ কার্য্য নিজে করেন। সুতরাং এই দুই ব্যক্তি পরস্পরের শত্রু হইয়া উঠিলেন এবং উভয়েই সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন,—কিসে অপরকে রাজকার্য্যের অংশ হইতে বঞ্চিত করেন।" নবাব সফদার জঙ্গই প্রথমে প্রকাশ্য বৈরিতা আরম্ভ করিলেন। তিনি সহরের মধ্যে সূর্য্যমল জাটকে সসৈন্যে আসিতে নিমন্ত্রণ করিলেন; প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিলেন যে, সূর্য্যমল মোগল-বন্ধু, তাঁহার সহিত রাষ্ট্রের হিতসাধনবিষয়ে পরামর্শ করা হইবে। গোপনে তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন যে, যদি সম্রাটের সেনা জাবেদ খাঁর প্ররোচনায় তাঁহার বৈরিতা আচরণ করেন, তখন তিনি ও সূর্য্যমল একত্র মিলিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবেন।

কেবল এই কু-অভিসন্ধি দ্বারা সফদর ক্ষান্ত হইল না। আবদালী ও মহারাষ্ট্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সে যেমন পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছিল, জাবেদ খাঁকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়া সে তেমনি কাপুরুষতার পরিচয় দিল। প্রকাশ্যভাবে সে নবাব জাবেদ খাঁকে বলিল, সূর্য্যমল আসিয়াছেন, এক্ষেত্রে তিনিও উপস্থিত না থাকিলে সুপরামর্শের আশা করা যায় না। ১৭৫২ খৃঃ অব্দে ২৮শে আগষ্ট নবাব বাহাদুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। মহম্মদ আলী খাঁ তারিখী মজাফ্ফরী নামক ইতিহাসে বলিয়াছেন,—"যখন নবাব আসিলেন, সফদর জঙ্গ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অতি সম্ভ্রমের সহিত অভিবাদন করিলেন। আহারান্তে তিনি তাঁহার অতিথির হস্তধারণ করিয়া রাষ্ট্রের হিতাহিত আলোচনা করিবার ছলে তাঁহাকে গুপ্তগৃহে লইয়া গেলেন। অধিকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইবার পূর্ব্বেই সফদর জঙ্গ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিলেন। বিশেষ উত্তেজিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি উঠিয়া আপনার খাস কামরায় চলিয়া গেলেন। তখন আলী বেগ খাঁ ও জন কয়েক মোগল সেনাধ্যক্ষ আসিয়া ছুরিকা ও তরবারি দ্বারা তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার শিরচ্ছেদন করিয়া মস্তকটি বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।* নবাবের অনুচরবর্গ এই সকল দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিল এবং সহরের অলস ও ভবঘুরের দল তাঁহার আসবাব-সরঞ্জাম লুটপাট করিয়া লইল।"

বয়াণী ওয়াকী বলেন যে, সফদর জঙ্গের প্রশংসাকারিগণ নবাবের গুপ্তহত্যার জন্য তাঁহার সুখ্যাতিই করিত। তাহারা বলিত, প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ করিলে রাষ্ট্রবিপ্লব হইত, অনেক সাধারণ লোকের প্রাণনাশ হইত, অনেকে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কষ্ট পাইত। এরূপ গুপ্তহত্যার দ্বারা সফদর জঙ্গ কাপুরুষের মত ব্যবহার

* বয়াণী ওয়াকীতে উক্ত আছে যে, তাঁহার মৃতদেহ যমুনায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

করেন নাই, বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহারাই বোধ হয় তাঁহার স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমাদের কিন্তু সিদ্ধান্ত অন্য প্রকার।

নবাব জাবেদের গুপ্তহত্যায় উজীর সফদর জঙ্গের বীরত্ব-গৌরব মলিন হইয়া পড়িল। রাজভক্তি দেখাইয়া সে যে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিল এবার বুঝিতে পারা গেল যে, সে যশের সে অধিকারী নহে। জাবেদের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য রাজমাতা খুড়সিয়া বেগম বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দলের সকল ব্যক্তি একত্র হইয়া দিবারাত্র সম্রাটের কর্ণে সফদরের অপযশ ঘোষণা করিতে লাগিল। ক্রমশঃই বাদসাহের সহিত উজীরের মনোমালিন্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই অবসরে খুড়সিয়া বেগমের অমাত্যেরা বাদসাহকে বুঝাইয়া দিল যে, উজীর সফদর জঙ্গ মহম্মদ সাহের কনিষ্ঠ বুলন্দ আখতারকে সিংহাসনে বসাইবার আয়োজন করিতেছে। তিনি উজীরের উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সফদর জঙ্গকে তাঁহার অযোধ্যার নবাবী-পদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিলেন। ইতস্ততঃ করিয়া সফদর জঙ্গ দিল্লির বাহিরে প্রস্থান করিল।

দিল্লির বাহিরে গিয়া সফদর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহ-কেতন উড়াইয়া দিল। তাহার পুরাতন বন্ধু সূর্য্যমল জাটকে নিমন্ত্রণ পাঠাইল। সূর্য্যমল পুরাতন সহর—বোধ হয় পুরাণা কিল্লা ও ফিরোজসার কোটলা অধিকার করিয়া লুটপাট আরম্ভ করিয়া দিল। দিল্লিতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বাদশাহ কাতর হইয়া আল্লা নাম জপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সাহায্য করে এমন লোক দিল্লিতে নাই। বিষম বিপদে বাদসাহ বৃদ্ধ সৈনিক জুলফিকার খাঁকে ডাকিয়া সেনাপতি-পদে বরণ করিলেন। কিন্তু সাহস করিয়া কেহ সহরের বাহিরে যাইতে পারিল না। এদিকে সফদর ও সূর্য্যমল দিল্লি-আক্রমণের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

দুর্ব্বল বাদসাহের সহায় জুলফিকার। চক্রান্ত করিয়া সফদর তাহাকেও নিজ পক্ষে টানিয়া লইল। গোপনে পলাইয়া জুলফিকার সফদরের দলে যোগদান করিল। সকলে মিলিয়া মাঝে মাঝে দিল্লি সহর লুটিতে আরম্ভ করিয়া দিল, সফদর এবার রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া তাহার পুত্রের ক্রীত একটা সুন্দর খোজা বালককে বাদসাহ আকবর সাহ নাম দিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিল। সফদর স্বয়ং এই খোজা বালকের উজীর হইল, জুলফিকার মির বক্সী বা সেনাপতি-পদে বরিত হইল।

তাহার পর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শত্রুর দলে ৫০,০০০ সেনা; বাদসাহ আহম্মদ সাহের লোক-লস্কর নাই। তিনি দিল্লির সকল ফটক বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ইন্দিমাদ উদ্‌দৌলাকে উজীর করিয়া তিনি সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এদিকে শত্রুর দল দিল্লির উপর গোলা ছুঁড়িতে লাগিল। লোকে কাশ্মীরী ফটকের দিকে পলাইতে লাগিল। সহরের মধ্যে সফদরের যত আত্মীয়-স্বজন ছিল বাদসাহ তাহাদিগের নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। সহরে বাহিরে অশান্তি—লোকে মোগল-শাসনের উপর আস্থাহীন হইতে লাগিল।

সফদর জঙ্গ শেষ অবধি কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ক্রমশঃ তাহার দল ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার সেনানায়ক গোঁসাই কাল-কবলিত হইল। নাজীর খাঁ রোহিলা, পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা প্রভৃতি আসিয়া বাদসাহকে রক্ষা করিল। পুরাণা কিল্লা ও ফিরোজসার কোটলা ছাড়িয়া বিদ্রোহিগণ পলায়ন করিল। শেষে শান্তি স্থাপিত হইল। সফদর অযোধ্যার নবাবী করিতে প্রস্থান করিল।

ইহার কিছুদিন পরে সফদর ইহলীলা সম্বরণ করে। আমরা সংক্ষেপে সফদর জঙ্গের ইতিহাস মুসলমান ইতিবৃত্তকারদিগের লেখনী হইতে সঙ্কলন করিয়া দিলাম। সাধারণ ইতিহাসে তাঁহার কথা নাই। সফদর জঙ্গের মোকাব্রার বিশালতার ভিতরে যে এত কলঙ্ককাহিনী লুক্কায়িত আছে, তাহা সহজে মনে স্থান পায় না।

প্রত্যাবর্ত্তন।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল্।]

দীননাথ কাবুলিওয়ালার সরকার। শত্রুপক্ষ তাহাকে বলিত চামচিকা। অবশ্য এ কথায় তাহার মনিব গুরগণ খাঁ, কুরনিস খাঁ প্রভৃতি পাঠানপুঙ্গবদিগকে ছুছুন্দর বলা হইত। কথাটা তাহাদের মলিন কুন্তলপেটিকা এবং কর্দ্দমসিক্ত দীর্ঘকেশের ভিতর দিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করিলে শত্রুপক্ষের ভবিষ্যতে কথা কহিবার শক্তি বর্ত্তমান থাকিত কি না তাহা ভাবিবার কথা। দীননাথ স্বয়ং তাহার ডাকনামটা শুনিলেও সহরের শান্তির বিঘ্ন ঘটিত। দীননাথ বলিষ্ঠ তাহার উপর বাঙ্গালী-বিদ্বেষী। বোধ হয় বাঙ্গালী-বিদ্বেষী বলিয়াই দীননাথ সৃষ্টিছাড়া রকমের জীবিকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিল।

বাঙ্গালী দীননাথ বাঙ্গালী-বিদ্বেষী ছিল,—এ সংবাদে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। অনেক তথা-কথিত স্বদেশসেবক ধনাঢ্য বাঙ্গালী জজ, ব্যারিষ্টার, উকীল, খেতাবওয়ালা কণ্ট্রাক্টর বণিক পাপকে ঘৃণা করে না; কিন্তু বাঙ্গালীকে ঘৃণা করে। লোকে নানা কারণে স্বজাতিবিদ্রোহী হয়—প্রধান কারণ কমলার কৃপা ও ইংরাজ সমাজে মিশিবার বিফল প্রয়াস। দরিদ্র দীননাথ বাঙ্গালীর মত পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াও কেন বাঙ্গালীদ্রোহী হইয়াছিল তাহার কেহ কারণ নির্ণয় করিতে পারিত না। নিমতলার একটা ভগ্ন অট্টালিকায় প্রায় ত্রিশ জন কাবুলি বাস করিত। তাহারা প্রত্যেকে দীননাথকে মাসিক এক টাকা করিয়া বেতন দিত। দীননাথ তাহাদের হইয়া ইংরাজিতে হ্যাণ্ড-নোট লিখিয়া দিত, নানা বিষয়ে পরামর্শ দিত এবং আবশ্যক হইলে আদালতে তাহাদিগের পক্ষ হইতে মোকদ্দমার তদ্বির করিত। এ কার্য্যে দীননাথের যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। কারণ ইহাতে উকীলদিগের নিকট হইতে দীননাথ কমিসন পাইত এবং আবশ্যকমত মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া কাবুলিদিগের নিকট হইতে লাভের অংশ গ্রহণ করিত।

কিন্তু মোকদ্দমায় দীননাথ অধিক উৎসাহ দেখাইত যদি কাবুলীর বিপক্ষ পক্ষ বাঙ্গালী হইত। কাবুলিরা দীননাথের বাঙ্গালী-বিদ্বেষ জানিত। তাই গুরগণ খাঁ পরিহাস করিয়া বলিত—"ই দিখো দুনু বাবু! এ আসামী বাঙ্গালী আছে। তুমীর জাত বাই আছে। মিলমিলাপ রাজী বাজী হইয়ে বিটা কাবুলীর গর্দ্দানায় ছুরি দিও না।"

পাঠান মনিবদিগের সহিত বাক্যালাপ করিবার সময় দীননাথ তাহাদিগকে 'আঁটকুড়ির বেটা' 'আবাগের বেটা' প্রভৃতি ভাষায় সম্বোধন করিত। সে গুরগণের কথা শুনিয়া প্রকৃত রোষপরবশ হইয়া বলিত—'না রে আবাগের বেটা না। আমার বাঙ্গালীর সঙ্গে সম্বন্ধ থাক্‌লে আর তোদের দলে এসে মিশি? দুনিয়ায় আমার কেউ নেই। যে পয়সা দেবে সেই আমার বাপ-খুড়ো।'

গুরগণ খাঁ হাসিয়া সানেওয়াজ খাঁকে পস্তুভাষায় বলিত,—কাফেরদের মধ্যে এই একজন মাত্র ইমানদার লোক আছে।

(২)

দীননাথ পাথুরিয়াঘাটার একটা বাসা বাটীতে থাকিত। একেলা এক ঘরে থাকিত, সাধ্যমত কাহারও সহিত মিশিত না। নিজের ঘরে বাসার বৃদ্ধা পাচিকা কাদম্বিনী থালায় করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন আনিয়া দিত—ততোধিক বৃদ্ধা দাসী সর্ব্ব

আসিয়া ঘর পরিষ্কার করিয়া দিয়া যাইত। ইহাদের দুইজনের সঙ্গে দীননাথ একটু কথাবার্ত্তা বলিত। বাসার আর কাহারও সহিত সে সম্পর্ক রাখিত না। দারুণ শীতে যখন তামাক সাজিয়া দেশলাই অভাবে একদিন দীননাথ টীকা ধরাইতে পারিল না, তখন তাহার মনে একবার বাসনা হইল যে পার্শ্বের ঘরের হেমবাবুর নিকট হইতে দেশলাইটি চাহিয়া লয়। কিন্তু তাহার প্রাণের সতর্ক প্রহরী অমনি তাহাকে বলিয়া দিল—"কর কি! ও যে বাঙ্গালী! হতভাগা জাত—এখনি বর্ত্তমান ছেড়ে অতীতে যাবে, তোমার তিন পুরুষের ইতিহাস চাহিবে।" দীননাথ তামাকু সেবন করিবার লোভসম্বরণ করিল, তবু বাঙ্গালীর দ্বারস্থ হইল না।

একদিন সন্ধ্যার পর দীননাথ বাসার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, একজন লোক ধীরে ধীরে তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিল। শীতকাল—বেশ ঠাণ্ডা। আগন্তুকের মুখখানা শালে আবৃত। দীননাথ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—কি?

আগন্তুক মুখ খুলিল। দীননাথ তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। উভয়ের মুখ এক ছাঁচে গড়া—দীননাথের মুখের কঠোর বিদ্বেষপরবশ ভাবটা কেবল আগন্তুকের মুখে বিদ্যমান ছিল না। আগন্তুক দীননাথের হাত ধরিল, বলিল—দীনু শোন্ একটা কথা!

দীনু ঝট্‌কা মারিয়া হাত ছাড়াইল। তাহার কথার উত্তর না দিয়া চলিবার উপক্রম করিল। সে এবার দীনুর কাঁধ ধরিল, বলিল—দীনু বড় ভাইয়ের কথা শোন্। যা হবার তা হ'য়েছে, আর কেন?

এবার দীনু ফিরিল। কথা কহিবার জন্য সোজা হইয়া দাঁড়াইল। অগ্রজ কাশীনাথের চক্ষের দিকে দৃঢ়ভাবে চাহিয়া বলিল—কি বল্‌ছ?

কাশীনাথ বলিল—বল্‌ছি যা হবার হ'য়ে গেছে। ঘরে চল। লোকের কাছে আর মুখ দেখাতে পারিনি।

দীননাথ ভ্রুকুঞ্চন করিয়া বলিল—কেন?

কাশীনাথ বলিল—লোকে বড় মন্দ বল্‌ছে। বলছে নিমকিটোলার সেনেদের বাড়ীর ছেলে কাবুলিওয়ালার—

দীননাথ গর্জ্জন করিয়া বলিল—"কোন্—বলে।" তাহাদের উদ্দেশে অকথ্য ভাষায় গালি দিল। বলিল—তুমি যখন শ্রীচরণের জুতো খুলে এই মুখে—

দীননাথের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। ভয়ে কাশীনাথ দুই পা পিছাইল। দীননাথ বলিল—ভয় নেই। সে সব ইচ্ছে থাক্‌লে এত দিনে ঘাড় মট্‌কে—

কাশী সাহস পাইয়া বলিল—"আচ্ছা আমি তোর বড় ভাই। তোর পায়ে ধরছি। বাবা তোকে বিষয় দেন নি—আমি তোকে বাবার অর্দ্ধেক বিষয় দিচ্চি। আর বংশের নাম ডুবোস নি।"

"বংশের নাম। ভারি লম্বাচওড়া বংশ! বংশের—" তাহার পর অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া দীননাথ বাসার দিকে না গিয়া অপর দিকে চলিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কাশীনাথ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিল। প্রাণের ভিতর মানের জ্বালা, তাহার উপর ভয় যদি দুর্ব্বৃত্ত পিছন হইতে দেহের ভিতর ছুরি বসাইয়া দেয়।

(৩)

তাহার পর প্রায় এক বৎসরের মধ্যে আর দীননাথ কাশীনাথের সাক্ষাৎ পাইল না। মাঝে মাঝে তাহার ভয় হইত যদি অগ্রজ আসিয়া আবার পুরাতন কথার উল্লেখ করে। সে আত্মীয়-স্বজনকে ভুলিবার যতই চেষ্টা করিত, আত্মীয়-স্বজন ততই তাহার স্মৃতির পটে প্রতিবিম্ব নিক্ষেপ করিত। এক একবার দীননাথ ভাবিত তাহাদের ক্ষমা করাই ভাল, আবার এক একবার ভাবিত যে তাহাদের দণ্ডের বিধান না করিলে এ জীবনযাপন করিবার সার্থকতা কি? সে এক একবার পুরাতন কথা ভাবিত, তাহার প্রাণের প্রহরীর একটু তন্দ্রাবেশ হইলেই অতীত আসিয়া আপনার কক্ষ হইতে অনেক চিত্রপট বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিত। দীননাথ আবার সে ঘটনাগুলা লইয়া বিচার করিতে বসিত। সে যৌবনে দুর্ব্বৃত্ত ছিল, পড়াশুনা করিত না, মদ্যপান করিয়া পিতার বিরক্তিভাজন হইয়াছিল। বেশ কথা। দোষটা কি তাহারই নিজস্ব? পিতা শাসন করিলে তো তাহার পাপগুলা বাড়িতে পারিত না। পিতার শেষ পীড়ার সময় সে পিতার রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া মায়াকান্না কাঁদিত না। তখনও সে আমোদ-আহ্লাদ করিত। ভাল কথা। পিতার কি পরিচর্য্যার অভাব হইত? কাশীনাথ কেন পিতার কাছে কাছে থাকিত—পিতার রোগের সময় শোকের ভাণ করিত তাহা তো সে বেশ বুঝিয়াছিল। সেই সময় পিতা উইল করিয়া কাশীনাথকে তাহার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী করিয়াছিল। উঃ কি নারকী! কি মিথ্যাবাদী! কাশীনাথ বলিত সে পিতাকে এরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছিল, তখন তাহাদের পিতা সমস্ত সম্পত্তি দানের জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। একেবারে মিথ্যা! ষোল আনা ভণ্ডামী! আচ্ছা বেশ! বাপের সম্পত্তি পাইয়া কেন কাশী-

নাথ তাহাকে অর্দ্ধেক লিখিয়া দিল না? আবার মিথ্যা কথা। কাশীনাথ তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল যে,পিতা মৃত্যুশয্যায় তাহাকে শপথ করাইয়া লইয়াছিল। সে প্রায় বালক! সে প্রায় অজ্ঞান! কাশীনাথ তাহাকে বাটীতে থাকিতে বলিয়াছিল—বলিয়াছিল—"ভাই আমিও যেমন খাব পরব তুমিও তেমনি খাবে পর্‌বে।" কি অহঙ্কার! তাহাকে ভিক্ষুকের মত পালন করিবার বাসনা! কেন সে কি হস্তপদবিহীন? সে মদ্যপায়ী বলিয়া কি উপার্জ্জনে অক্ষম! সকলেই অগ্রজের দিক লইয়াছিল—কেহই পিতার দোষ দেখে নাই। হায় রে বাঙ্গালী! হায় রে গোলামের জাতির বিচার!

দীননাথ শেষ কলহের দিন স্মরণ করিল। তাহার ধমনীর রক্ত বেশ উষ্ণ হইয়া উঠিতেছিল। সেদিন দীননাথ একটু নেশা করিয়া গৃহে আসিয়াছিল। সে অভ্যাসমত কাশীনাথকে বলিল—"ওসব বুঝি না, বাপের বিষয় তুল্যমূল্য ভাগবখ্‌রা করে দাও, নইলে প্রাণে মার্‌ব।" প্রথম প্রথম কাশীনাথ অনুনয় বিনয় করিল, ভৃত্যদের সম্মুখে গোলযোগ করিতে নিষেধ করিল। শেষে একটু একটু ক্রোধ দেখাইল। দীননাথও ছাড়িবার পাত্র নয়। সে ভ্রাতাকে গালি দিল। তখনও কাশীনাথ কিছু বলিতে পারিল না। কোন্ মুখে বলিবে? ভ্রাতার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া কি আর সত্য গালাগালির উত্তর দিতে পারে? শেষে দীননাথ পিতাকে গালি দিল। কেন গালি দিবে না? যে পিতা আপন সন্তানকে পথের ভিখারী করিয়া যায় তাহার উদ্দেশে কে আবার কবে স্তুতিগান করে? দাননাথ মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিল। ভ্রাতার সে দিনের ব্যবহার স্মরণ করিয়া রোষে দীননাথ শয্যাকণ্টক অনুভব করিতে লাগিল। তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য কাশীনাথ প্রথমে অনুনয় বিনয় করিয়াছিল। শেষে ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। তাহার আজ্ঞায় ভোজপুরী দ্বারবান দীননাথকে ধরিয়াছিল। কাশীনাথ তাহাকে স্বহস্তে এক দুই গণনা করিয়া পঁচিশবার পাদুকা প্রহার করিয়াছিল।

দীননাথ সে কথা ভাবিতে ভাবিতে শয্যায় উঠিয়া বসিল। তাহার সর্ব্ব-শরীর জ্বলিতেছিল। সে আজ সাত বৎসরের কথা। সেই অবধি দীননাথ পিতৃগৃহে প্রবেশ করে নাই। তাহার ভ্রাতৃজায়া আসিয়া শেষে স্বামীকে নিরস্ত না করিলে দীননাথকে আরও নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত। ভ্রাতৃজায়ার উপর তাহার ক্রোধ ছিল না। তাহার কি দোষ, বড় শান্ত জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি। সে বিবাহ করিয়া শান্তজীবন যাপন করিলে তাহারও গৃহে অমন লক্ষ্মী বিরাজ

করিতে পারিত। দীননাথ আর ভাবিতে পারিল না। শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া একটা গেলাসে কতকটা মদ ঢালিয়া জল না মিশাইয়া গিলিয়া ফেলিল।

(৪)

"ই তুম্ বাবু শুনা হায় ?"—দমবাজ খাঁ বলিল—"এ তুমবাবু শুনা হায় ?"

"কি শুনা হায় রে আবাগের বেটা ?"

দমবাজ খাঁ তাহার হিন্দুস্থানীতে যথাসাধ্য বুঝাইল। মাড়োয়ারী হিন্দুগণ তাহাদের ধর্ম্মে বাধা দিয়াছে। মুসলমানেরা বকর্ ঈদের কোরবাণীর জন্য আমরাতলা গলিতে গরু কাটিবার সংকল্প করিয়াছে। মাড়বারী সম্প্রদায় সে কার্য্য করিতে দিবে না। কেবল আহারের জন্য সহরে নিত্য কত গোবধ হয় তাহার কেহ কিছু প্রতিবাদ করে না, কিন্তু ধর্ম্মের নামে গোবধ হইবে শুনিলেই হিন্দুরা বাধা দেয়। তাহাদের দেশে অত বেশী গোবধ হয় না বটে, কিন্তু তাহারা কাবুলের হিন্দুদের ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দেয় না। আমীর সাহেবের কড়া হুকুম।

বাঙ্গালীদ্বেষী হইলেও এ বিষয়ে কাবুলীর মতে মত দিতে দীননাথও পারিল না। বাঙ্গালী-সমাজের সহিত সংশ্রব না রাখিলেও এ সংস্কার তাহার মজ্জাগত। সে কথাটা উল্টাইবার জন্য বলিল—তোমাদের কাবুলে কি অনেক হিন্দু আছে ?

দমবাজ খাঁ বলিল—হ্যাঁ আছে। খাজানা-বিভাগের বড় বড় কর্ম্মচারী সব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়। মুদির দোকান, পোদ্দারের দোকানের মালিক সব বেনিয়া। তাদের ভাষাও পুস্তু, পোষাক-পরিচ্ছদও কাবুলীর মত—কেবল পাগড়ীর রং হরিদ্রাবর্ণ। কাবুলের হিন্দু মুসলমানের এই পার্থক্য।

দীননাথ বলিল—মন্দির আছে ?

সাহাবাজ বলিল—কাবুল সহরের ভিতর অনেক মন্দির আছে—কান্দাহারে আছে—গজনিতেও আছে। কিন্তু তোমাদের এখানকার মত তারা—

ফকীর সাহ কাবুলী বলিল—শয়তান নেহি।

ঘরের সব কাবুলীরাই বেশ উত্তেজিত হইয়াছিল। দীননাথ একটু অসুস্থতা বোধ করিতেছিল। সে ঘরের এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল কাবুলীদের খাবার রহিয়াছে। চর্ম্ম ও শৃঙ্গ সহিত ছাগমুণ্ড সিদ্ধ এবং ঢালের মত বড় বড় রুটী। ইহা কাবুলীদের বড় প্রিয় খাদ্য। সে বলিল—আচ্ছা আঁটকুড়ীর বেটা তুম লোক ইসমাফিক খালসাথ মুড়ি কেঁও খাতা।

জুলফক্কর খাঁ বলিল—আমাদের আদৎ। মগর এই কাফের মাড়বাড়ি লোককা জান মার ডালেঙ্গা।

তাহাদের উত্তেজনা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক একজন ঘুরিয়া আসিয়া এক একটা সংবাদ দিতে লাগিল, আর পাঠানের দল উত্তেজিত হইতে লাগিল। কথাবার্ত্তা পস্তুতে হইতে লাগিল। দীননাথ তাহাদের যুক্তিতর্ক বড়

বুঝিল না—তবে বুঝিল যে, বকর-ঈদের দিন অবধি কলিকাতায় আদৌ শান্তি থাকিবে না।

তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। তখনও কাবুলীরা উত্তেজিত ভাবে ঈদের বিষয় কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। সেদিন কাজকর্ম্ম কিছু ছিল না। দীননাথ একখানি জীর্ণ চার-পাইয়ের উপর শুইয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। অতি কৃষ্ণকায় ঘন শ্মশ্রুযুক্ত একজন হিন্দুস্থানী মুসলমান আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে একটা যষ্টির উপর দস্তার অর্দ্ধচন্দ্র। গৃহে ঢুকিয়া আরবী ভাষায় খানিকটা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সে কাবুলীদিগকে সেলাম করিল।

গুরগণ খাঁ বলিল—সিলাম। তুম্ কুন্ হায় ভাই ?

লোকটা আপনার পরিচয় দিল। সে ধর্ম্মের কাজ করে। কোনও মুসলমান মরিলে, সমাধির পূর্ব্বে সে শাস্ত্রসম্মত নিয়মানুসারে শবদেহ ধৌত করে। দীননাথ লোকটার দিকে সবিস্ময়ে চাহিল—বাস্তবিক লোকটা যমদূত। সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না যে, লোকটার বংশপরম্পরাক্রমে শবস্নান জীবিকা, না ইহার আকৃতি দেখিয়া কোনও রসিক লোক তাহাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে। সে আপনার আগমনের কারণ বিবৃত করিল। কোনও মসজিদের মৌলানা তাহাকে পাঠাইয়াছে। ইসলামের বিষম বিপদ। কাবুলীরা ধর্ম্মপ্রাণ। এ বিপদে দেশীয় মুসলমানেরা কাবুলীদের সাহায্য পাইতে পারে কি না তাহা মৌলানা জানিতে চাহিয়াছেন।

কাবুলীরা অবশ্য একবাক্যে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে স্বীকৃত হইল। বাগ্মী যমদূত ওজস্বিনী ভাষায় কাফের মারবাড়িদিগের স্পর্দ্ধার কথা বিবৃত করিল। অবশ্য সে উর্দ্দুর বার আনা কাবুলীরা বুঝিল না। হঠাৎ দীননাথকে দেখিয়া বক্তা বলিল—এ কি হিন্দু ?

জুলফক্কর বলিল—বাঙ্গালী। ও হামলোককা ভাই হায়।

শবধৌতকারী বলিল—বাঙ্গালীরা আমাদেরও ভাই। বাঙ্গালীরা বিদ্বান, বুদ্ধিমান জাতি। তাহারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে না। কেবল মারবাড়ী—কাফের বদ্‌বখ্‌ত মারবাড়ী—

সে আবার মারবাড়ীদিগের উপর কতকটা বিষ উদ্গার করিল। কাবুলীরা প্রতিশ্রুত হইল—ইসলামের জন্য প্রাণ দিবে।

(৫)

১৯১১ সালের বকরঈদ্ কলিকাতার ইতিহাসের একটা কলঙ্ক। দুই তিন দিনের জন্য দেশে অরাজকতা আশ্রয় করিল। মারবাড়িদিগের হিন্দু ভৃত্য ও গুণ্ডাদিগের সহিত নিম্নশ্রেণীর অজ্ঞ মুসলমানদিগের ভীষণ কলহ আরম্ভ হইল। উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোক বহু চেষ্টা করিয়াও এ বিবাদ মিটাইতে পারিল না। বাঙ্গালীরা দুইদলকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিল—তাহাদের কথা কেহ শুনিল না। রাজপুরুষদিগেরও চেষ্টা বিফল হইল। অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নিম্নশ্রেণীর অজ্ঞ মুসলমানগণ সুযোগ পাইয়া ধনাঢ্য মারবাড়িদিগের

গৃহ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। দুই দিন ধরিয়া লুটপাট চলিল—রাজপুরুষেরা শান্তিরক্ষা করিতে পারিল না। অনেক বিকলাঙ্গ বিবাদী হাসপাতালে প্রেরিত হইল। উভয় পক্ষের জনকয়েক ইহলীলা সম্বরণ করিল। সকলেই তটস্থ।

লুটের কার্য্যে কাবুলীরা বেশ উৎসাহের সহিত যোগদান করিল। প্রথম লুটের রাত্রি দীননাথ নিদ্রা গেল না। শয্যায় বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। প্রত্যূষে উঠিয়া ধীরে ধীরে সে কাবুলীদের বাড়ী উপস্থিত হইল।

কাবুলীদের মেজাজ বেশ প্রসন্ন ছিল। দশ বৎসর লাঠি মারিয়া সুদের চেষ্টায় বস্তিতে বস্তিতে ঘুরিলে যে লাভ হইত তাহারা একদিনে প্রায় সে লাভ করিয়াছিল। দীননাথকে তাহারা সকল কথা বলিল—কিরূপে এখন পুলিসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় তাহার উপায় জিজ্ঞাসা করিল।

আজ দীননাথ বড় গম্ভীর, বড় চিন্তাশীল। সে বলিল—সে সব বন্দোবস্ত ক'রে দব। চোরাই মালগুলা লুকাতে হ'বে।

একজন কাবুলী বলিল—হ্যাঁ বাবু বন্দোবস্ত করো। তুমারা হিস্‌সাভি ঠিক হায়।

দীননাথ বলিল—হামারা হিস্‌সা উস্‌মে নেহি। আজকা কাম যো হোগা উস্‌মে হিস্‌সা হোগা। সব আও হামারা সাথ।

জুলফক্কার জিজ্ঞাসা করিল—কোথায়?

দীননাথ বলিল—সরদারের বাড়ি। কাফেরদের প্রধান যে নেতা—যার পরামর্শে তোমাদের ধর্ম্ম বিপন্ন তাহার গৃহে। অনেক মাল আছে।

রক্তলোলুপ শার্দ্দূলদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট উত্তেজনা। ধর্ম্মের নামটা থাকিলে বিবেককে আঁখি ঠারিবার সুবিধা। তাহারা সম্মত হইল। "আল্লাহো আকবর" "দীন দীন" বলিতে বলিতে পিশাচের দল চলিল—অগ্রে দীননাথ।

(৬)

প্রত্যূষে কাশীনাথের মাত্র নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। শয্যায় শুইয়া সে ভগবানের নাম করিতেছে। তাহার সাধ্বী স্ত্রী মনোরমা প্রাতঃস্নান করিয়া ঠাকুরঘরের কবাট খুলিতেছে। তাহার পুত্র তিনটী তখনও নিদ্রামগ্ন। জ্যেষ্ঠটির বয়স প্রায় ষোল বৎসর। দ্বিতীয়টির বয়স বছর তের, তৃতীয়টি মাত্র পাঁচ বছরের। সদরের দ্বারবান চাকরেরা প্রায় সকলেই উঠিয়াছে।

দীন্ দীন্ শব্দে কাবুলীর দল অগ্রসর হইতেছিল। সম্মুখে বিভীষণ দীননাথ। সারারাত্রি ভাবিয়া সে এই নৃশংস কার্য্য করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছে। একেবারে ডাকাতের দল সদরে আসিয়া পড়িল। দ্বারবান বাধা দিল। যে দ্বারবান জুতা মারিবার সময় ধরিয়াছিল। তাহার মুখ দেখিয়া দীননাথ নূতন উৎসাহ পাইল। পিশাচের দলের সহিত সেও তাধিয়া তাধিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। একেলা রাম সিং। কতকক্ষণ যুঝিতে পারে? রক্তাক্ত দেহে সে ভূলুণ্ঠিত হইল। দীননাথের বড় আনন্দ। উপরে উঠিল। কাশীনাথ

তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। কাবুলীরা একটু থতমত খাইল। মৌলানার নিষেধ ছিল যেন বাঙ্গালার উপর অত্যাচার না হয়। দীননাথ বলিল—ভয় নাই। বাঙ্গালী হইলেও শয়তান। ইহারই পরামর্শে মারবাড়ীর দল—

পিশাচদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। তাহারা অগ্রসর হইল। কাশীনাথ ব্যাপারটা বুঝিল—হাঃ ভগবান! লোকে এমন ভাবেও বৈরী নির্য্যাতন করিতে পারে!

সে ভ্রাতার হাত ধরিল, পায়ে ধরিল। বলিল—ভাই তোর মনে যা আছে কর। পৈতৃক ভিটেয় একি ভাই—গোখাদক ম্লেচ্ছের দল এনে পৈতৃক বিষয় লুট করবি, তোর ভাইপোদের পথে বসাবি, কুলদেবতার গা থেকে মুকুট খোলাবি, নূপুর খোলাবি, বাঁশী কাড়াবি? ক্ষমা কর ভাই—ক্ষমা কর্।

দীননাথ ভীষণ অট্টহাস্য করিল—পৈতৃক বিষয়, পৈতৃক দেবতা—একচোখো বাপ্—এক চোখো দেবতা। ভাব দেখি সাত বছর কা'র ভাত খেয়েছি। পৈতৃক ভিটার না ম্লেচ্ছ কাবুলীর?

কাবুলীরা বাহিরের ঘর লুট করিতেছিল। তথায় বিশেষ কিছু লইবার নাই। রূপার হুকাগুলার নারিকেল খোল ভাঙ্গিয়া তাহারা রূপা সংগ্রহ করিল। একজন রঙ্গ করিয়া একটা বহুমূল্য ঝাড় ভাঙ্গিয়া দিল।

গোলমালে দীননাথের ভ্রাতুষ্পুত্রেরা আসিয়া পড়িল। রমেন্দ্রকে দীননাথ চিনিল। সে তাহাকে কোলে করিয়াছে, আন্দাজে সত্যেন্দ্রকে বুঝিল। সত্যেন্দ্র খুল্লতাতকে চিনে না। কাশীনাথ বলিল—ভাই পাঠান তাড়া, তুই সব ভোগ কর, আমি এদের নিয়ে কুঁড়ে ঘরে থাক্‌ব।

হাসিতে হাসিতে কাবুলীর দল অন্দরমহলের দিকে অগ্রসর হইল। কাশীনাথ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহার স্ত্রী ভিতরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। কাবুলীরা দ্বারে পদাঘাত করিতেছিল।

রমেন্দ্রও বুঝিল। সে কাকার পায়ে ধরিল। দীননাথ হাসিয়া উঠিল। কাবুলীরা দ্বার ভাঙ্গিয়া "দীন্ দীন্" শব্দে ভিতরে প্রবেশ করিল।

একজন আসিয়া রমেন্দ্রকে পদাঘাত করিল, কাশীনাথকে পদাঘাত করিল বলিল—ছোড়্ কাফের বাবুকো ছোড়্। আও বাবু তোষাখানা দেখলাও।

দীননাথ তাহাদের সহিত অন্দরে প্রবেশ করিল।

(৭)

সকল কক্ষ বন্ধ করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া মনোরমা ঠাকুরঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল। দীননাথের প্ররোচনায় কাবুলীর দল তাহার বাটী লুট করিতে আসিয়াছে, তাহা সে জানিত না। হিন্দুদিগের বাটী লুট হইতেছে, তাই লুণ্ঠনকারীর দল তাহাদের ধনরত্নের লোভে আসিয়াছে, মনোরমা তাহাই বুঝিল। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা হইবে, তবে যতক্ষণ প্রতিরোধ করিতে পারে। সে বাহিরে পতিপুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিতেছিল। তাহারা অক্ষত শরীর তাহা বুঝিয়া সে মুরলীমোহনের দিকে চাহিল। কালো পাথরের ঠাকুর এক গা গহনা

পরিয়া তাহার দিকে চাহিয়াছিল। পাষাণ-দেবতার মনের ভাব বুঝে সে সাধ্য তাহার নাই। সে কাঁদিতেছিল—দুর্ব্বলের অস্ত্র অশ্রুজল—সে সেই অস্ত্রে সজ্জিত হইতেছিল।

তিনটা কাবুলী দেখা দিল। ভীমদর্শন রক্তলোলুপ বনের শার্দ্দূল অপেক্ষা ভীষণ। অপরগুলা ঘরের দ্বারে দ্বারে পদাঘাত করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া তাহারা হাসিয়া উঠিল। মুরলীমোহনের স্বর্ণালঙ্কার দেখিয়া তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল। বন্যার স্রোতের মত কাবুলীর দল ঠাকুরঘরের সম্মুখে আসিল। তাহাদের চারি চক্ষু মিলিত হইল। তবে কি দীননাথ তাহাদিগকে আনিয়াছে?

মনোরমার মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই একটু ইতস্ততঃ করিল। জুলফক্কর বলিল —এ বিবি হট্ যাও।

মনোরমা তাহার কথার উত্তর দিল না। সে প্রস্তরমূর্ত্তির মত দীননাথের দিকে চাহিল। এবার দীননাথ শিহরিল। মনোরমা বলিল—ঠাকুরপো তুমি!

দীননাথ স্থির হইয়া রহিল। মনোরমা বলিল—ঠাকুরপো! তোমার ভাইয়ের সঙ্গে শত্রুতা, তোমার বাপের সঙ্গে শত্রুতা! তোমার মাকে মনে কর। তিনি এই ঠাকুরঘরে বসিতেন। মার মূর্ত্তি একবার মনে কর ভাই! আর আমার ছেলেরা তারাও কি তোমার শত্রু?

কাবুলীরা বুঝিল না। একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। মনোরমা দ্বারের সম্মুখে পদ্মাসনে বসিল। বলিল—ঠাকুরপো আর সব ঘর লুট কর, কিছু বলব না। কিন্তু এই ঠাকুরঘর লুট ক'র না। তোমার মা এই ঘরে বসে পূজা করতেন। আমি বেঁচে থাকতে তোমার সাধ্য নেই—

সে করুণদৃষ্টিতে দীননাথের দিকে চাহিল। এ অস্ত্র তাহার উপর আর কেহ নিক্ষেপ করে নাই। তাহার মাতৃমূর্ত্তি তাহার চক্ষের সামনে ভাসিতে লাগিল, তাহার যেন চমক ভাঙ্গিল। সে কাবুলীদের বলিল—কাজ নাই চলো।

গুরগণ হাসিয়া বলিল—কি হুজুরবাবু খাপসুরত আওরাতটাকে দেখে—

চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দীননাথ বলিল—চোপ্।

আর একজন বলিল—বাবু ভয় কি আমরা ওকেও নিয়ে যাচ্চি।

সকলে হাসিল। দুই চারিজন বলিল—আগে অপর ঘরে যাই।

তাহারা দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল। এবার দীননাথের চমক ভাঙ্গিল। জ্ঞাতিবৈরিতায় যে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে বুঝিল। সে যথাসাধ্য ক্ষিপ্ত তস্করদের নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। হায় অদৃষ্ট! অগ্নি ধরিয়াছে আর কি নির্ব্বাপিত হয়!

কে কাহার কথা শুনে? তাহার কথায় কাবুলীরা হাসিল। দুড়ুম দাড়াম শব্দ হইতে লাগিল। দরজায় ভীষণ বেগে কাবুলীরা পদাঘাত করিতে লাগিল। শেষে একটা দ্বার ভাঙ্গিল। হুড় মুড় করিয়া তাহারা কক্ষে প্রবেশ করিল।

দীননাথ শিরে করাঘাত করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কাবুলীদের অনুনয় করিল। তাহারা গৃহের সাজ-সরঞ্জাম, মাল-পত্র লুট্ করিতে ব্যস্ত।

দীননাথ মনোরমার দিকে ছুটিল। বলিল—বউ, বউঠাকরুণ ওটা কোন্ ঘর! মাপ কর বৌ, আজ প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করব। তোমার টাকাকড়ি কোন্ ঘরে?

মনোরমা চক্ষু চাহিল। বলিল—ওটা ছেলেদের ঘর, আমার ঘর পার্শ্বে। এই নাও চাবি নাও। আর ছলনায় কাজ নেই। কিন্তু মার কথা ভাব—মার মুখ ভাব—মুরলীমোহনের দিকে এস না—আমি তোমার গুরুজন, তোমার পায়ে ধরছি ঠাকুরপো—মার মুখ ভাব—

দীননাথ চাবির থোকাটা লুকাইল। এখন মনোরমাকে বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা। সে কাজে দেখাইবে। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! সাধ্বী ভ্রাতৃজায়া! সুকুমারমতি ভ্রাতুষ্পুত্রগণ! ধর্ম্মপ্রাণ অগ্রজ! প্রাণ তুচ্ছ! সে প্রাণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

সে কাবুলীদের অনুনয় করিল। শেষে বলিল—পুলিস আসিতেছে, পালাও পালাও।

কাবুলীরা তখনও হাসিল। এবার সে "পুলিস পুলিস" করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। একজনের লাঠি কাড়িয়া ঘুরাইতে লাগিল। খাল কাটিয়া কুমীর আনিয়াছে—কি সর্ব্বনাশ!

এবার কাবুলীরা রাগত হইল। এবার তাহারা বুঝিল, বাঙ্গালী বেইমানী করিতেছে। তাহাদের এ বাড়ীতে আনিয়া পুলিস ডাকিতেছে। এদিকে কাশীনাথ পুত্রগণকে লইয়া পাড়ায় গোলযোগ করিয়াছে। বাড়ীর সম্মুখে অনেক লোকজন আসিয়াছে, দুই চারিজন পুলিস আসিয়াছে—আরও পুলিসের হল্লা আসিতেছে। এখনও পলাইবার সময় আছে।

কিন্তু পলাইবার পূর্ব্বে বেইমানীর শাস্তি! তাহারা সকলে দীননাথের উপর লাঠি চালাইল। সে একেলা কত লড়িবে? রক্তাক্ত দেহে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। কাবুলীর দল পলাইয়া গেল।

মনোরমা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। ঠাকুরঘর হইতে গঙ্গাজল আনিয়া তাহার মুখে দিল। নিজের পট্টবস্ত্রে তাহার রক্ত মুছিল আর কাঁদিল—মুরলীমোহন প্রাণ দাও ঠাকুর! বাঁচাও দেব!

কাশীনাথ আসিয়া ভ্রাতার গলা ধরিয়া কাঁদিল—ভাই দীনু ওঠ্ ভাই। তোর কোনও দোষ নেই। দোষ আমার।

মনোরমা ডাকিল—ঠাকুরপো! একবার চাও ভাই! ঠাকুরপো!

দীনু চক্ষু চাহিল—ভ্রাতৃজায়ার সাশ্রুনয়ন দেখিল—ভ্রাতার ক্রন্দন শুনিল—ছেলেদের কাতর মুখ দেখিল। সে কাঁদিল; শরীরের বেদনায় নয়—প্রাণের জ্বালায়। দেহের তুচ্ছ যন্ত্রণা সে অনুভব করিল না। প্রাণের ভিতর বিষম জ্বালা! সে অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—দাদা, বৌঠাকরুণ ক্ষমা—

বউঠাকুরাণী বস্ত্রাঞ্চলে তাহার চক্ষু মুছিল। অগ্রজ গলা ধরিয়া কাঁদিল। রমেন্দ্র ঊর্দ্ধশ্বাসে ডাক্তার ডাকিতে গেল। নীচে পুলিস তিনটা পাঠানকে

গেরেপ্তার করিয়া রাখিয়াছিল। সে সেদিকে চাহিল না। কাকা ঘরে ফিরিয়াছে—সে ডাক্তারের জন্য ছুটিল।

৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল।]

বহুদিন হইল, আমরা ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের একখানি জীবনচরিত প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তকখানি ইংরাজিতে লিখিত; মনীষী গিরিশচন্দ্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম্-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।*

গিরিশচন্দ্র সুপ্রসিদ্ধ 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তিনি তদানীন্তন কালের বাঙ্গালার আকাশের উজ্জ্বল তারকা ছিলেন। বাঙ্গালীজাতির কৃতজ্ঞতার গুণে তাঁহারা আজকাল তাঁহার নাম একপ্রকার বিস্মৃত! তাঁহার পৌত্র মন্মথনাথ তাঁহার জীবনচরিত সঙ্কলিত করিয়া এই বাঙ্গালী মনীষীর স্মৃতি পুনরুদ্দাপিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আশা করি, তাঁহার শ্রম সফল হইবে। এখনও বাঙ্গালী জাতি তাঁহার স্মৃতি স্থায়িভাবে জাগাইয়া রাখিবার কোনও সুব্যবস্থা করিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিবে। যতদিন বাঙ্গালী নিজের দেশের প্রতিভার পূজা করিতে না শিখিবে, নিজের দেশের মনীষীদিগের স্মৃতিতে গর্ব্ব অনুভব না করিবে, ততদিন দেশের অবস্থা উন্নত হইবে না,—এ কথা সকলের মুখে শুনিতে পাই বটে; কিন্তু কার্য্যের সময় একথা সকলকে বিস্মৃত হইতে দেখি। কাজে কথায় আমরা সামঞ্জস্য করিতে পারি না, ইহা আমাদের প্রধান দোষ।

গিরিশচন্দ্রের পিতামহ নদীয়া জেলা হইতে আসিলেও গিরিশচন্দ্রের জন্মস্থান কলিকাতা। তিনি ৺গৌরমোহন আঢ্য মহোদয়ের Oriental Seminary স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে ৺গৌরমোহন আঢ্য মহাশয়ের স্কুল ইংরাজি শিক্ষার একটি কেন্দ্রস্থল ছিল। আঢ্য মহাশয়ের নামও বাঙ্গালা দেশে প্রাতঃস্মরণীয় হওয়া উচিত। শত শত বাঙ্গালী তাঁহার বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া বাঙ্গালীজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে চারিটী নাম অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—শম্ভুনাথ পণ্ডিত, অক্ষয়কুমার দত্ত, কৃষ্ণদাস পাল এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ। এই পুস্তকের লেখক এই বিদ্যালয়ের অনেক পুরাতন গল্প লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকের জ্ঞানবৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র সরকারী কাজ করিতেন। তিনি বিদ্যালয় ছাড়িয়া মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে প্রতিভাবান বুঝিয়া ১৮৪৭ সালে তাঁহাকে Military Auditor-Generalএর অফিসে ৫০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হয়। এই পদে তিনি ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া মাসিক

* The Life of Grish Chunder Ghose; the Founder and First Editor of "The Hindoo Patriot" and "The Bengalee."

৩০০৲ টাকা বেতন পাইয়াছিলেন। তাঁহার পদের আধুনিক বেতন ৬০০৲ টাকা। সেকালে কিন্তু ৩০০৲ টাকার অধিক বেতন সে পদের ছিল না।

এই সকল কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া লেখক সেকালের ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সেকালের সাহেবেরা উদারনীতির পরিপোষক ছিলেন; তাঁহারা গুণের আদর করিতে জানিতেন।

সেকালের ইংরাজদিগের অপর একটী গুণ ছিল, তাঁহারা বাঙ্গালীর স্পষ্টবাদিতার প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেন না; বাঙ্গালী কর্ম্মচারা তাঁহাদের অফিসের কার্য্য ষোল আনা সম্পন্ন করিয়া বিশ্রামের সময় যদি খবরের কাগজ চালাইতেন, বা দেশহিতৈষিতার পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা সে কার্য্যে বাধা দিতেন না। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উভয়েই সরকারী অফিসে কার্য্য করিতেন; উভয়েই সংবাদপত্রে লিখিতেন। সাহেবেরা তাহাতে বিরক্ত হইতেন না, বরং তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতেন। আমরা গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনার পুস্তকও একখানি উপহার পাইয়াছি। পরে সে কথার আলোচনা করিব। সে লেখা বেশ তেজের। একালের গবর্ণমেণ্টের কোন চাকর সে রকম প্রবন্ধ লিখিবার অনুমতি পান না। এখনকার আইন সেকালে প্রবর্ত্তিত থাকিলে বাঙ্গালা দেশ দুইটী রত্ন হারাইত—আমরা গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বোধ হয় নামও শুনিতাম না; কৃষ্ণদাস পালের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' কি নামে বাহির হইত কে বলিতে পারে?

গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা প্রকটিত হইয়াছিল তাঁহার সরস ওজস্বী লেখনীতে এবং তাঁহার মনোরম বাগ্মিতায়। বাল্যাবধি সংবাদপত্রে লিখিবার তাঁহার সাধ। পাঠ্যাবস্থায় তিনি "Hindu Intelligencer" নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। সে ১৮৪৬ সালের কথা। তিনি কৈলাসচন্দ্র বসুর "Literary Chronicle" নামক পত্রেও লিখিতেন। তাহার পর তাঁহার ভ্রাতা শ্রীনাথ ঘোষ 'The Bengal Recorder' নামক সংবাদপত্র বাহির করেন। গিরিশচন্দ্র ঐ কাগজে রীতিমত লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতার সহিত ঐ পত্রের সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। এই সংবাদপত্রের ইতিহাসের সহিতও তখনকার ইংরাজ রাজপুরুষদিগের একটী মহত্ত্বের কাহিনী জড়িত আছে। প্রসিদ্ধ গ্রীস ইতিহাস-প্রণেতা গ্রোট্ সাহেব তখন কলিকাতার কলেক্টার ছিলেন। তিনি Bengal Recorderএর লেখায় মুগ্ধ হইয়া ঘোষ ভ্রাতাদ্বয়কে দেখিতে চাহেন। গিরিশ সরকারী কর্ম্ম করিতেছিলেন। গ্রোট সাহেব শ্রীনাথকে ১৫০৲ টাকা বেতনের চাকুরি দিলেন। পরে ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে শ্রীনাথ ২০০৲ বেতনে ডেপুটি কলেক্টরের পদে উন্নীত হইলেন। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে কিন্তু Bengal Recorder বন্ধ হইয়া গেল।

১৮৫৬ সালে গিরিশচন্দ্র "হিন্দু পেট্রিয়ট" সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন। বাহুল্যভয়ে আমরা ইহার প্রথম প্রকাশের গল্প উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

গ্রন্থকার সে মনোরম গল্প এই জীবনচরিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অনেকের ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে, হরিশচন্দ্র Hindu Patriotএর জনক। লেখক সপ্রমাণ করিয়াছেন, হিন্দু পেট্রিয়টের পিতা—গিরিশচন্দ্র, হরিশচন্দ্র নহে। শুভক্ষণেই গিরিশচন্দ্র ঐ পত্র বাহির করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি একা হিন্দু পেট্রিয়ট দেশে যত কাজ করিয়াছে তাহার মূল্য অতুল।

১৮৫৮ খৃঃ অব্দে Calcutta Monthly Review নামে একখানি পত্র বাহির হয়। গিরিশচন্দ্র তাহাতেও লিখিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন।

সে কালের অধিকাংশ সদনুষ্ঠানের সহিত মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম সংশ্লিষ্ট। তাঁহারই আর্থিক সাহায্যে ১৮৬১ খৃঃ অব্দে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় Mookerji's Magazine নামক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। গিরিশচন্দ্র এই পত্রিকায় অনেক সরস ও সুখপাঠ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

১৮৬২ খৃঃ অব্দে ৬ই মে প্রসিদ্ধ Bengalee সংবাদপত্র গিরিশচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এখন বেঙ্গলীর নাম, বেঙ্গলীর প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত। কিন্তু অনেকেই বিস্মৃত হইয়াছেন যে, যে বেঙ্গলীর নামে অত্যাচারী রাজপুরুষ শিহরিয়া উঠে, যাহার প্রভাব রাজকীয় মন্ত্রণা সভায় অবধি অনুভূত হয়, সেই বেঙ্গলীর জন্মদাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ। জন্মিয়াই বেঙ্গলী ন্যায়ের সুর ধরিয়াছিল। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও দেশনায়ক মিঃ ডবলিউ সি বনার্জ্জি তখন সামান্য বেতনে বেঙ্গলীতে সাপ্তাহিক সমাচার লিখিতেন। রতনে রতন চিনে। মনীষী গিরিশচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন তাঁহার বন্ধুপুত্র উমেশচন্দ্র ভবিষ্যতে স্বনামধন্য পুরুষ হইয়া যশের খ্যাতিতে দেশ-বিদেশ ছাইয়া ফেলিবে। তাঁহার দেশহিতৈষিতার হাতে-খড়ি একপ্রকার গিরিশচন্দ্রের দ্বারাই হইয়াছিল।

গিরিশচন্দ্র বাগ্মিতাগুণে ভূষিত ছিলেন। কলিকাতার তদানীন্তন কালের সকল রাজনীতিক ও সাহিত্যিক সভার সহিত তাঁহার সংস্রব ছিল। British Indian Association, Dalhousie Institute, Bethune Society প্রভৃতি সমিতির তিনি সভ্য ছিলেন। আমাদের এ প্রবন্ধে তাঁহার জীবনের এ অধ্যায়ের পূর্ণ পরিচয় দিবার স্থান নাই। তাঁহার জীবন-চরিতে অতি মনোরম ভাষায় এ সকল কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের জীবনচরিতখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার ইংরাজি প্রাঞ্জল ও উচ্চদরের। এ পুস্তকে গিরিশচন্দ্রের জীবনচরিতের সহিত তদানীন্তন কালের ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রত্যেক কথার প্রমাণ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

১৮৬৯ খৃঃ অব্দে গিরিশচন্দ্র ইহধাম পরিত্যাগ করেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ টাউনহলের সভায় রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দেশের সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকল সংবাদপত্র একবাক্যে তাঁহার যশোগান করিয়াছিলেন। এ পুস্তকে সে সকল মতামত লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

হিন্দুর দেবতত্ত্ব।

[লেখক—শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।]

খলকুমারী দেবী।

খলকুমারী মাতা পূর্ব্ববঙ্গের কতক স্থানে সুপরিচিতা, উত্তরবঙ্গে বা দক্ষিণ-বঙ্গে ইহার অর্চ্চনা হয় কি না, তাহা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই *।

অনুসন্ধানে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় স্মরণাতীত কাল হইতে ইহার পূজা পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া আসিতেছে; রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ দেশান্তর হইতে ঐ প্রদেশে যাইবার পূর্ব্বে যে সকল জাতি ঐ দেশে বাস করিত, উক্ত পূজা তাঁহাদেরই প্রাদেশিক অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। ক্রমে দেশান্তরাগত বিভিন্ন শ্রেণীর লোক এই প্রাদেশিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এই পূজার যে সকল অঙ্গ আছে, সেইগুলি বড়ই রহস্যময়। এই পূজা ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়, কিন্তু ইহার প্রধান পাণ্ডা গুর্ম্মা নামে অভিহিত। গুর্‌মার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক, নতুবা পাঠকগণ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অভিধান খুঁজিয়াও এই অদ্ভুত শব্দের অর্থ বাহির করিতে সমর্থ হইবেন না, কলিকাতা প্রদেশে যাহাকে হিজ্‌রা বলে, গুর্‌মা তাহারই প্রকারান্তর। তবে ইহাতে একটা কৃত্রিম ঘটনার সম্পর্ক আছে। যাহারা পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারাই দেবীর প্রভাবে তাঁহার পূজা নির্ব্বাহার্থ অর্জ্জুনের মত ক্লীবত্ব ধারণ করে। তবে এইটুকু বিশেষ যে অর্জ্জুন কিছুকালের জন্য ক্লীবত্ব ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু গুর্‌মা সারা জীবনই স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া ক্লীবত্বের ভান করিয়া থাকে।

অশিক্ষিত লোকের বিশ্বাস যে দেবী যাহাকে গুর্‌মা হইবার উপযুক্ত মনে করেন, তাহাকে হঠাৎ ধরিয়া লইয়া পদ্মবনে লুকাইয়া রাখেন এবং তিন দিবসের মধ্যে পূজার অঙ্গীভূত যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দিয়া গুর্‌মা করিয়া ছাড়িয়া দেন।

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় মালদহ হইতে কতকগুলি মূর্ত্তি আনিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি কুম্ভীর-বাহনা মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। উহা বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহাগারে রক্ষিত হইতেছে।

গুর্‌মার প্রধান কার্য্য অশ্লীষ-ভাষায় গান করা। ইহাতে যেরূপ অশ্লীল ভাষা প্রযুক্ত হয়, তাহার আর উপমান নাই। এই অশ্লীষ-বাক্য-প্রয়োগের নাম "গুরমার চৈতাল"। যদি কেহ একাধিকবার অশ্লীষ বাক্য প্রয়োগ করে, তবে সাধারণে বলে যে, লোকটা যেন গুর্‌মার মত "চৈতাল" করিতেছে। গুর্‌মা দীর্ঘকেশ মুক্ত করিয়া জিভ্‌ বাহির করিয়া চক্ষু উল্টাইয়া উন্মত্তের মত মাথা ঘুরাইতে থাকে। এই অনুষ্ঠানের নাম গুর্‌মার বান্‌ করা। মেয়েদের দৃঢ় ধারণা যে, ঐ সময়ে গুর্‌মার শরীরে খলকুমারী ঠাকুরাণী আশ্রয় করেন। সুতরাং তাহার নিকট অনেকের শুভাশুভ-বিষয়ক প্রশ্ন করা হয়। গুর্‌মাও সেই সকল প্রশ্নের একটা একটা উত্তর দিয়া থাকে। গুর্‌মার সহকারী অনেকগুলি লোক পূজার ব্রতীরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। ইঁহাদিগকে সংযম এবং উপবাস করিতে হয়, কিন্তু গুর্‌মা স্বয়ং উপবাসের পরিবর্ত্তে চিপিটক ভক্ষণ করিয়া থাকে। ঐ প্রদেশে সাধারণতঃ লোকে এই মতলবী কাজটাকে দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করে, "গুর্‌মা চিড়া খাইয়া ব্রত করিতে পারে, অন্যের বেলাই দোষ"।

খলকুমারী মাতার সাধারণ নাম "ডরাই"। ইহার পূজা ৺বিষহরী মাতার পূজার সহিত জড়িত। যেখানেই ডরাই পূজা সেখানেই বিষহরী-পূজা হইয়া থাকে। দুরারোগ্য রোগ হইতে আরোগ্য-লাভ-কামনায় অথবা মৃতবৎসা দোষ বা বন্ধ্যাদোষ দূর করিবার অভিপ্রায়ে লোকে ডরাই বিষহরীর পূজা মানসিক করে। অনেক স্থলেই এই পূজায় মহিষের শিরশ্ছেদ হইয়া থাকে।

মনসা বা বিষহরীর পূজার অঙ্গরূপে মনসার ভাষান গীত হইয়া থাকে, এবং "ডরাই" পূজার অঙ্গরূপে গুর্‌মার "চৈতাল" অনুষ্ঠিত হয়।

নিম্নশ্রেণীর হিন্দু গুর্‌মা হইয়া থাকে, অনেকস্থলে মুসলমান গুর্‌মাও দেখা যায়। এই পূজা পুকুরের পাড়ে অথবা অন্য কোনও উন্মুক্ত স্থানে অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে অনেক স্থানে গুর্‌মার অভাব হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং গুর্‌মার "চৈতাল" ব্যতীতও পূজা হইতে দেখা যায়। চৈতাল ছাড়া গুর্‌মার আরও অনেকগুলি কাজ আছে।

খলকুমারী মাতার মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিতে পূজা হয়। ইহার ধ্যানগম্য রূপটী এই প্রকার—ইনি বিশ্বের প্রকাশকারিণী গৌরবর্ণা চতুর্ভুজা এবং বিশ্বের ঈশ্বরী, ভয় হইতে ত্রাণকারিণী বিশ্ব ইঁহার স্বরূপ, ইনি দয়ার আধার সর্ব্বদেবময়ী নিত্যা ঘোররূপা এবং ভয়ঙ্করী, ইঁহার মুখ গম্ভীর, আকার স্থূল; ইনি কুম্ভীরের উপরে উপবিষ্ট, ইনি নানাবিধ মণির শোভাসম্পন্ন, নানাপ্রকার ভূষণসমলঙ্কৃত

নবযৌবনসম্পন্না কুমারী এবং কামরূপিনী অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থা। ইহার পরিধানে পট্টবস্ত্র, দেহ কুঙ্কুমচর্চ্চিত এবং মনোহর। ইনি খলরূপে সমুদ্ভুত ত্রিনেত্রা এবং অভীষ্ট ফলদায়িনী।

বিশ্বপ্রকাশিনীং দেবীং গৌরবর্ণাং চতুর্ভুজাম্।
বিশ্বেশ্বরীং ভয়ত্রাতাং বিশ্বরূপাং কৃপালয়াম্।
সর্ব্বদেবময়ীং নিত্যাং ঘোররূপাং ভয়ঙ্করীম্।
গম্ভীরবদনাং স্থূলাং কুণ্ডিরোপরি-সংস্থিতাম্।
নানামণিবিশোভাঢ্যাং নানালঙ্কার ভূষিতাম্।
নবযৌবন সম্পন্নাং কুমারীং কামরূপিনীম্।
পট্টবস্ত্র-পরীধানাং কুঙ্কুমাক্তাং মনোহরাম্।
খলরূপেণ সম্ভূতাং ত্রিনেত্রাং বরদাং ভজে॥

এই পূজা পৌরাণিক রীতি অনুসারে হইয়া থাকে। কোন্ পুরাণে ইহার বিস্তৃত বিবরণ নিহিত আছে, তাহা জানা যায় নাই। কালিকাপুরাণে শারদীয়া দুর্গাপূজার বিসর্জন ব্যাপারে অশ্লীলতা পূর্ণ সাবরোৎসবের বিধান দেখা যায় (১) সুতরাং অশ্লীলানুষ্ঠান পূর্ব্বকালে স্থলবিশেষে পূজা প্রভৃতি কার্য্যের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হইত, এ বিষয়ে সংশয়ের কারণ নাই। এমন কি বৈদিক মহাব্রত প্রভৃতি যজ্ঞেও নিরতিশয় অশ্লীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই পূজায় যে চৈতালের কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেও আমরা আর একটি অশ্লীষতা পূর্ণ বৈধক্রিয়ার পরিচয় পাইতে পারি। চৈত্র মাসে যাহা হয় সচরাচর তাহা চৈতালী নামে অভিহিত হইতে দেখা যায়। যেমন চৈতালী খন্দ।

চৈত্র মাসে অশ্লীল গীতাদির দ্বারা কামদেবের পূজানুষ্ঠান অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। স্কন্দপুরাণে এই বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

"মধুমাসেতু সংপ্রাপ্তে শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশী।
প্রোক্তা মদনজগ্নীতি সিদ্ধিদা তু মহোৎসবে॥

(১) ধ্যাবেদ্দশভুজাং দেবীং দুর্গামন্ত্রেণ পুজয়েৎ।
বিসর্জনং দশম্যাস্তু কুর্য্যা দ্বৈ শাবরোৎ সবৈঃ।
ধূলিকর্দ্দমবিক্ষেপৈঃ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ।
ভগলিঙ্গাভিধানৈশ্চ ভগলিঙ্গপ্রগীতকৈঃ। (দুর্গোৎসব তত্ত্ব)

পুষ্পয়িষ্যন্তি যে মর্ত্ত্যা স্তদঙ্গভবপল্লবৈঃ।
তেষাস্তি পরমং স্থানং মদনস্ত প্রভাবতঃ॥
চৈত্রে মাসি চতুর্দ্দশ্যাং মদনস্ত মহোৎসবঃ।
জুগুপ্সিতোক্তিভি স্তত্র গীতবাদ্যাদিভি র্নৃনাম্॥
ভগবাংস্তুষ্যতে কামঃ পুত্রপৌত্র-বিবর্দ্ধনঃ।" (তিথিতত্ব)

হুগলীর ফৌজদার।

[লেখক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।]

মুসলমান শাসনকালে হুগলী সহরে একজন ফৌজদার বাস করিতেন। হুগলী ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের শাসনভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত ছিল। শাসন-পরিচালনকার্য্যে বর্ত্তমান সময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার যে ক্ষমতা দেখা যায়, ফৌজদারেরা প্রায় সেই সমস্ত ক্ষমতারই পরিচালন করিতেন। ফৌজদারের অধীন নায়েব নামধেয় আর একজন রাজকর্ম্মচারীর কথা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরাজেরা তাঁহাদিগের পুরাতন কাগজপত্রে তাঁহাকে Deputy Governor বা সহকারী শাসনকর্ত্তা নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু শাসনকার্য্যে তাঁহাদিগের অধিকারের কথা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। তবে এ কথা নিশ্চয় যে, বর্ত্তমান সময়ে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণের যে ক্ষমতা আছে, নায়েবগণ তাহার অধিক ক্ষমতা পরিচালন করিতেন।

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। হুগলীর ফৌজদারগণের বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহাদিগের নামের তালিকা ধারাবাহিকরূপে সংগ্রহ করা সহজ নয়, বুঝি বা অসম্ভব। কালের নির্ম্মম হস্ত মুসলমান শাসনকে অতীতের স্বপ্ন-সমুদ্রে বিলীন করিয়া দিয়াছে; তাহার ফলে আজ যে দুই একটী ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক তথ্য আমাদিগকে চিরদিনের জন্য হারাইতে হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, ধারাবাহিক ভাবে সমস্ত ফৌজদারের নাম পাওয়া না যাইলেও, সমধিক প্রসিদ্ধ ফৌজদারগণের বিষয় ইতিহাস হইতে কিছু কিছু আমরা অবগত হইতে পারি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কতিপয় প্রসিদ্ধ ফৌজদারগণের কথা আলোচনা করিব।

১। মালিক বেগ ঃ—ইতিহাসে যে ফৌজদারগণের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মালিক বেগই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইনি দীর্ঘকাল হুগলীর ফৌজদার-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কারণ, ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হুগলীর শাসনভার ইঁহার উপর ন্যস্ত ছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে (১) মালিক বেগ সুশাসক ছিলেন। কারণ তাঁহার সময়ে তাঁহার দ্বারা শাসিত জনপদ হইতে রাজকর্ম্মচারিগণের বেতন বাবদ ৫০ লক্ষ মুদ্রা সংগৃহীত হইত।(২) সত্য বটে, বাঙ্গালা দেশ চির উর্ব্বর ; দুর্ভিক্ষ নামক ভীষণ দৈত্য তখনও বাঙ্গালা অধিকার করিয়া বসিতে পারে নাই, ক্ষেত্রদেবী মাঠে মাঠে শস্য পাকাইয়া বঙ্গসন্তানগণকে পেট পূরিয়া আহার করাইতেন। ইহার উর্ব্বরতা ও সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিয়া য়ুরোপীয় ভ্রমণকারিগণ পর্য্যন্ত শতমুখে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। (৩) তথাপি দেশে সুশাসন ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়া এত অধিক রাজস্ব সংগ্রহ করা নিতান্ত অল্প যোগ্যতার পরিচায়ক নহে।

২। মহম্মদ সেরিফ—অল্পদিনের জন্য ইনি হুগলীর ফৌজদার-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে হুগলী একটী ব্যবসায়ক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ইহার ঐশ্বর্য্য-খ্যাতিতে লুব্ধ হইয়া আরাকানের মগ ও চট্টগ্রামের জলদস্যুগণ বাঙ্গালার শান্তি ক্ষুণ্ণ করিয়া তুলে।(৪) মালিক বেগকে তাহাদিগের অত্যাচার দূর করিতে অসমর্থ জানিয়া ও দুর্বৃত্তগণের অত্যাচার হইতে হুগলীকে মুক্ত করিবার জন্য সম্রাট ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া, সমরকুশল সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনিই মালিক বেগকে ফৌজদার পদ হইতে অপসারিত করিয়া, মহম্মদ সেরিফকে হুগলীর ফৌজদার-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন।(৫) ইনি একজন সমরকুশল সেনানায়করূপে পরিচিত। যে সময়ে সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম জয় করিতে অগ্রসর হন, ইনি সেই সময়ে সংগ্রামগড় প্রভৃতি স্থানসমূহ সুরক্ষিত করেন। ফিরিঙ্গি দস্যুগণের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য ইনি হুগলীকে সুরক্ষিত করিবার যথেষ্ট বন্দোবস্ত করেন। পরন্তু ইঁহাদিগেরই কর্ম্মকুশলতাতেই অল্প সময়ের মধ্যে

---

(১) See Countries round the Bay of Bengal.

(২) Travernier's Travels.

(৩) Barneir's Travels, Page 437—446.

(৪) The Firinghe Pirates of Chittagong. J. A. S. B. 1907.

(৫) District Gazetteer—Hoogly.

চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি জলদস্যুগণ দমিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে ও বঙ্গে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, শান্তিস্থাপনের পর, মালিক বেগ আবার হুগলীর শাসনভার ফিরাইয়া পান এবং তিনি ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফৌজদার-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

৩। মালিক কাশিম—ইনি মালিক বেগের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি হুগলীর শাসনকার্য্য পরিচালন করেন। ইহার পর দুই বৎসরের জন্য কেন তাহাকে উক্ত পদ হইতে অপসারিত করা হয়, ইতিহাসে তাহার কারণ পাওয়া যায় না। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, তিনি আবার হুগলী শাসন করেন। এই সময়ে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আদেশে মুসলমান ব্যতীত সমস্ত প্রজার উপর 'জিজিয়া' কর স্থাপিত হয়। হুগলী সে সময়ে য়ুরোপীয় বাণিজ্যের একটী কেন্দ্র; বাণিজ্য-ব্যপদেশে বহু ইংরাজ তথায় বাস করিত। তাহারা এই কর-প্রদানে ঘোরতর আপত্তি করিল।(১) সুবিচারক সায়েস্তা খাঁর উপর জিজিয়া কর-সংগ্রহের ভার অর্পিত ছিল। তিনি তাহাদিগের আপত্তি অগ্রাহ্য করা সঙ্গত মনে করিলেন না। ফলে তাহারা তাঁহার অনুগ্রহে জিজিয়া কর হইতে মুক্তিলাভ করিল।

৪। মালিক বুরকদার—১৬৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি হুগলীর ফৌজদার-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। যে বৎসর মালিক কাশিম ফৌজদার পদত্যাগ করেন, সেই বৎসরেই হুগলীর ইংরাজগণ আপনাদিগকে মাদ্রাজের শাসনকর্ত্তার শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, আপনাদিগের কার্য্য তত্ত্বাবধানের জন্য একজন গভর্ণর নিযুক্ত করেন। হুগলীর ইংরাজ গভর্ণরগণের মধ্যে জব চার্ণকই সমধিক প্রসিদ্ধ। মালিক বুরকদার সুশাসক ছিলেন না, ইংরাজগণের উপর নানা অত্যাচারের কথা ইতিহাসে লিখিত আছে।(২) ইংরাজগণ তাঁহার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া উঠে। জব চার্ণক ইংরাজগণের পক্ষ হইতে এই সব অত্যাচারের প্রতিবাদ এবং সমস্ত গোলযোগ মিটাইয়া উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্যস্থাপনের যথেষ্ট চেষ্টা করেন।

৫। আবদুল গণি—আবদুল গণির সময়ে এই অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পায়। জব চার্ণক এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া কিরূপ

(১) Early Records of the British Empire.
(২) Diary of W. Hedge—June I.

অপমানিত হন ও পরিশেষে হুগলী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, ইতিহাস-পাঠকমাত্রের নিকট তাহা সুপরিচিত, এখানে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

৬। আসান উল্লা খাঁ—আবদুল গণির পর কয়েকজন ফৌজদারের নাম পাওয়া যায় না। যে সময়ে মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙ্গালার সিংহাসনে আসীন, সেই সময়ে আসান উল্লা খাঁ হুগলীর ফৌজদার। সম্ভবতঃ ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে ইনি হুগলীর ফৌজদারী গ্রহণ করেন। ইঁহার ন্যায় যথেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তার কথা কমই শুনা যায়। তাঁহার অত্যাচারে ইংরাজ বণিকগণ জর্জ্জরিত হইয়া উঠে। ইঁহারই আদেশে বিখ্যাত ইংরাজ কোম্পানী—Ostend Companyর কুঠী লুণ্ঠিত হয়।(১) ইঁহার ইন্দ্রিয়াসক্তির কথা মুসলমান ঐতিহাসিকগণ পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার সময়ে কুলললনাগণের মানসম্ভ্রম বজায় রাখা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল।

৭। সুজা কুলী খাঁ—নবাব সুজা উদ্দীনের রাজত্বকালে, আসান উল্লা ফৌজদার-পদ হইতে অপসৃত হন। তাঁহার পর নবাবের অনুগত সুজা কুলী খাঁ নামক এক ব্যক্তি ঐ পদ গ্রহণ করেন। সুজা কুলী খাঁও আসান উল্লার ন্যায় ঘোর অত্যাচারী শাসনকর্ত্তারূপে ইতিহাসে চিত্রিত হইয়াছেন। তাঁহার অত্যাচারে হুগলীর ইংরাজগণ উত্যক্ত হইয়া উঠেন, এবং এই অত্যাচারের প্রতিবিধানের উপায় না দেখিয়া হুগলীর ব্যবসায় একেবারে উঠাইয়া দেন। এই সময় হইতেই হুগলীর পতনের সূত্রপাত হয়। হুগলীর ব্যবসায় নষ্ট হওয়ায় ইংরাজ ব্যবসায়িগণ হুগলী পরিত্যাগ করিয়া জব চার্ণক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন, এবং তাহা হইতেই কলিকাতার উন্নতির সূত্রপাত হয়। এইরূপেই চিরচঞ্চলা লক্ষ্মী হুগলীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।(২)

সুজা কুলী খাঁ ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হুগলীর ফৌজদার-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সময়ে বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে বাঙ্গালার ইতিহাস কৌতুকময় হইয়া উঠে। বাঙ্গালার শ্যামল প্রান্তর নর-শোণিতে রঞ্জিত হইয়া উঠে। তাঁহার সময়েই সাফরাজ খাঁর সহিত আলিবর্দ্দি খাঁর যুদ্ধ হয় এবং বিজয়লক্ষ্মী বহুকাল পর্য্যন্ত কাহার অঙ্কশায়িনী হইবেন ঠিক করিতে না পারিয়া, পরিশেষে

(১) রিয়াজুসালাতিন্।
(২) রিয়াজুসালাতিন।

আলিবর্দ্দী খাঁর উপরই প্রসন্না হন। আলিবর্দ্দী খাঁ নবাবী গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। কিন্তু বাঙ্গালার সমস্ত আকাশ জুড়িয়া যে মেঘ উঠিয়াছিল, সে মেঘ ইহাতেই অপসারিত হইল না। নূতন উৎপাতের ন্যায় মারহাট্টাগণ বাঙ্গালা আক্রমণ করিল। তাহাদিগের অত্যাচারে বাঙ্গালীমাত্রকে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতে হইয়াছিল। কতদিন অতীত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি আজিও 'বঙ্গে বর্গী' শব্দে সেই পুরাতন স্মৃতি বাঙ্গালী মাত্রেরই মনে সজাগ হইয়া তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া তুলে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত সে সব ঘটনার কোন সংস্রব নাই, সুতরাং তাহার আলোচনা এই প্রবন্ধে করিয়া কোনও লাভ নাই।

হুগলী কিছুদিন মহারাট্টাগণের অধিকারে ছিল। বাঙ্গালার জমিদারগণের নিকট হইতে চৌথ আদায় করিবার জন্য তাহারা ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে বঙ্গদেশে উপস্থিত হন (১) আলিবর্দ্দী খাঁও দুর্ব্বল হস্তে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন না। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দীর সহিত ভাস্কর পণ্ডিতের কাটোয়ার নিকটে যুদ্ধ হয়; এই যুদ্ধে মারহাট্টাগণ পরাজিত হইয়া বাঙ্গালা ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কিন্তু পর বৎসর আবার রঘুজী ভোঁসলা এবং বালাজী রাও সসৈন্যে বাঙ্গালায় দেখা দেন এবং বাঙ্গালার নানাস্থান অধিকার করিয়া বসেন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ভাস্কর পণ্ডিত হুগলী প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া, সন্ধি করিবার ছলে, নবাব আলিবর্দ্দী ভাস্কর পণ্ডিতকে মানকরে আপনার তাঁবুতে নিমন্ত্রণ করিয়া হত্যা করেন। ইহার পরও বাঙ্গালাকে তাহাদিগের আক্রমণ হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। মারহাট্টাগণ প্রায় দশ বৎসর পর্য্যন্ত হুগলী প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। গড়মন্দারণ ও কাটোয়া প্রভৃতি স্থানে তাহারা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রার পরিবর্ত্তে তাহারা বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তাহাদিগের অত্যাচারে হুগলী ও অন্যান্য ব্যবসায়-কেন্দ্রসমূহের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার বিবরণ ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।(২) 'হুগলী জেলার বর্গীর উৎপাত' নামক প্রবন্ধে আমরা তাহার বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

(১) Orme's Hindusthan, Vol. II. P. 30.

(২) See Holwell's Interesting Events, P. 157.

৮। মহম্মদ ইয়ার খাঁ—ইহার পর হুগলীর ফৌজদারগণের নাম আর ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যায় না। আলিবর্দ্দীর পর তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহম্মদ ইয়ার খাঁ হুগলীর ফৌজদারী পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি ঐ পদে কতদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন, ইতিহাসে সে কথা জানিতে পারা যায় না। ইহার পরই বাঙ্গালার শাসনদণ্ড লইয়া মহাগোলোযোগ উপস্থিত হয়। এক হিসাবে ইনি হুগলীর শেষ ফৌজদার। সিরাজদ্দৌলার পর যেমন আর কাহাকেও নবাব নামে অভিহিত করিতে প্রবৃত্তি হয় না, ইহার পর সেইরূপ আর কাহাকেও ফৌজদার-নামে অভিহিত করিলে ঐ পদের অবমাননা হয় বলিয়া মনে হয়। সুতরাং এইখানেই আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

পুরাতনী

[সাহিত্য-কথা]

(লেখক—শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।)

আজ ভাষা-জননীর যে প্রতিমা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পূজিত হইতেছে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেই প্রতিমা নির্ম্মিত হয় নাই। তখন প্রতিমা-রচনার চেষ্টা চলিতেছিল। অথবা সোজা কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, সে সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান প্রতিমার কাঠামো তৈয়ারী হইতেছিল।

"নানান দেশে নানান ভাষা,
বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা?"—

বাঙ্গালা গীতি-সাহিত্যের অন্যতম সম্রাট নিধুবাবু এ গান আলোচ্য যুগের প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে গাইয়া থাকিলেও তখনও কিন্তু লোকে স্বদেশী ভাষায় আশা পূরাইতে প্রয়াসী হয় নাই। বরং অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের নাম শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন।

দেশের যখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময়ে কতিপয় কৃতবিদ্য বঙ্গবাসী ও দুই চারিজন উদার-স্বভাব ইংরেজ ভদ্রলোক বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান গরীয়সী মূর্ত্তি-রচনার সূত্রপাত করেন।

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের মত যদিও ইঁহারা জনসাধারণের নিকট তাদৃশ সুপরিচিত নহেন, কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকগণের নিকট তাঁহারা যে চিরদিন

অপরিচিত থাকিবেন, ইহাও ত কোনও ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠন-ব্যাপারে ও প্রসার-কল্পে এই সকল অপরিচিত বা অল্পপরিচিত ব্যক্তি যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহা কোনও মতেই অস্বীকার করা চলে না।

তখনও পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই। গড়িয়া উঠা ত দূরের কথা,—তখন বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের নিতান্তই শিশু অবস্থা। এ সময়ে তাঁহারা ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত করিয়া জনসাধারণকে বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের রসাস্বাদ করাইয়াছিলেন। ইঁহাদের চেষ্টায় বঙ্গদেশের বিদ্যালয়সমূহে বাঙ্গালা ভাষায় সুন্দর সুন্দর পাঠ্যপুস্তক ও অবসর-রঞ্জন গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছিল। তাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসার ও পুষ্টিকল্পে যেরূপ চেষ্টা, যত্ন ও ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা কোনও ক্রমেই বিস্মৃতির সলিলে নিমগ্ন হইতে দেওয়া উচিত নহে।

এই স্বল্পপরিচিত সাহিত্যিকদিগের কীর্ত্তি ও সাহিত্য-সাধনার নিদর্শন "ভার্ণাক্যুলার লিটারেটার সোসাইটী"র প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সোসাইটীর বাঙ্গালা নাম ছিল—"অনুবাদক-সমাজ।" ঠিক কোন্ সময়ে এই অনুবাদক-সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা এখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখি নাই। তবে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে যে ইহার অস্তিত্ব ছিল, তাহার প্রমাণ আমরা স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" নামক মাসিক-পত্রের দ্বিতীয় পর্ব্বের উনবিংশ খণ্ডে প্রাপ্ত হইয়াছি। দ্বিতীয় পর্ব্ব ১৭৭৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। "অনুবাদক-সমাজে"র মাসিক কার্য্যের বিবরণ প্রদান-উপলক্ষে "বিবিধার্থ-সংগ্রহ"-সম্পাদক লিখিয়াছেন :—

"গত ৮ই জুলাই দিবসে মেং ওয়াযিলী সাহেবের বাটীতে উক্ত সমাজের মাসিক বৈঠক হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত ওয়ায়িলী, শ্রীযুক্ত সিটনকার, শ্রীযুক্ত বেলী, শ্রীযুক্ত কালবিন, শ্রীযুক্ত প্রাট্, শ্রীযুক্ত পাদরি লং, শ্রীযুক্ত বাবু রসময় দত্ত এবং শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন; এবং তাঁহারা নিম্নে লিখিত প্রস্তাব সকল গ্রাহ্য করিয়াছেন।

প্রথম। কলম্বসের জীবনচরিত গ্রন্থের কোন২ স্থান পরিবর্জ্জন করিয়া, স্থানে২ টিপ্পনী ও এক ভূমিকা সহযোগ পূর্ব্বক, বঙ্গভাষায় অনুবাদ করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়। সেক্সপিয়র সাহেবের গ্রন্থ হইতে লাম্ব সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত গল্পের অনুবাদ যাহা ডাক্তর রোয়র সাহেব প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা অবিলম্বে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয়। ভবিষ্যতে যে কোন গ্রন্থ অনুবাদ-করণের অনুমতি হইবে, অনুবাদক আদৌ

তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া সমাজে সমর্পণ করিবেন। সমাজ তাহার রচনার পরিপাট্য নিরূপণার্থে তাহা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও শ্রীযুক্ত পাদরি জে, রবিনশন সাহেবকে সমর্পণ করতঃ তাঁহাদের অভিপ্রায় লইবেন; ও রচনা উত্তম বোধ হইলে পর ঐ আদর্শ পাদরি লং সাহেবকে সমর্পিত করিবেন। তিনি তাঁহার গ্রাম্য পাঠশালায় তাহা পাঠ করিয়া নিরূপণ করিবেন, ঐ রচনা গ্রাম্য বালকদিগের বোধগম্য হয় কি না।

চতুর্থ। "ইজিপসিয়ান" নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ কি প্রকার হইয়াছে তাহা নিরূপণানন্তর সমাজকে বিজ্ঞাপন করণার্থে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সরকার, এবং শ্রীযুক্ত পাদরি জে, রবিন্‌সন সাহেবকে অনুরোধ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত প্রাট্ সাহেব সমাজকে জ্ঞাত করিলেন যে, ডাক্তর বেডফোর্ড সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় ব্যক্তিব্যূহের উপদেশার্থে প্রজাবর্গের সুস্থতা বিষয়ক কয়েকটী প্রবন্ধ ইংরাজিতে রচনা করা কর্ত্তব্য। তাহাতে অনুমতি হইল, ডাক্তর বেড্‌ফোর্ড সাহেবকে অনুরোধ করা যায়, তিনি আদৌ এতদ্রূপ একটি প্রস্তাব রচনা করিয়া সমাজে সমর্পণ করুন।

শ্রীযুক্ত উড্‌রো সাহেবের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীযুক্ত প্রাট্ সাহেবকে অনুরোধ করা গেল যে, তিনি পূর্ব্বোক্ত সাহেবের নিকট হইতে সমাজের সাম্পাদক্য কর্ম্মের ভার গ্রহণ করুন।"

"বিবিধার্থসংগ্রহ" হইতে উদ্ধৃত এই অংশটুকু পাঠ করিলে ইংরেজী পুস্তকাদি বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি-চেষ্টা যে তখন হইতেছিল তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। আর একটা সত্যও আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, সেকালে দুই চারিজন ইংরেজ ভদ্রলোক বাঙ্গালা ভাষা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ইহা আয়ত্তও করিয়াছিলেন। ইঁহাদের ভিতরে আবার যাঁহাদের বাঙ্গালা ভাষায় বিশিষ্ট অধিকার জন্মিয়াছিল, তাঁহারা ইংরেজী গ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর দুই একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের নাম আমরা পাইয়াছি। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

রেভারেণ্ড জন্ রবিন্‌সন ও পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

সুপ্রসিদ্ধ ডানিয়েল ডিফো-প্রণীত "রবিন্‌সন্ ক্রুসো" নামক সদুপদেশ ও নীতিপূর্ণ ইংরেজী পুস্তক রেভারেণ্ড জন রবিন্‌সন্ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত হয়। এই পুস্তকখানি বাঙ্গালী পাঠকের নিকটে এরূপ সমাদর লাভ করিয়াছিল যে, অল্পদিনের মধ্যে ইহার তিনটী সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু অনূদিত গ্রন্থখানির ভাষায় অনেক দোষ ছিল, এইজন্য 'স্কুল বুক সোসাইটী'র কর্ত্তৃপক্ষ ইহার ভাষা সংশোধন প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের তদানীন্তন সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা এই গ্রন্থের ভাষা সংশোধিত করিয়া প্রকাশিত করেন।

এই পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে"র একস্থানে শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা লিখিয়াছেন :—

"বর্ণাকিউলর লিটরেচর সোসাইটী এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালায় অনুবাদিত করান। রেবরেণ্ড জন্ রবিন্‌সন্ সাহেব ইহার অনুবাদক। ইহা তিনবার মুদ্রিত হইয়া নিঃশেষিত হওয়াতে, স্কুলবুক সোসাইটীর অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ইহার ভাষা সংশোধন প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও উক্ত সোসাইটীর অন্যতম সভ্য মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের উপর ভার অর্পণ করেন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সেই কর্ম্মের ভার দেন। আমি তাঁহার অনুমত্যনুসারে এই গ্রন্থের ভাষা-সংশোধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। * *"

মধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

"ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটী" বা "অনুবাদক-সমাজ" "গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক-সংগ্রহ"-পর্য্যায়ভুক্ত যে সকল পুস্তক প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির কয়েকখানিতে মধুসূদন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম প্রণেতা বা প্রকাশকরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার কোনও পরিচয় আমরা এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। "জীবরহস্য," "নুরজাঁহান রাজ্ঞীর জীবন-চরিত" নামক দুইখানি পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই দুইখানি পুস্তকের রচয়িতা—মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। "জীবরহস্যে"র দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে "বাহির মিরজাপুর বিদ্যারত্ন যন্ত্রে" মুদ্রিত হয়। "অনুবাদক-সমাজ" ইহা প্রকাশিত করেন। পুস্তকখানি জীববিদ্যা-বিষয়ক। পাদরি লংয়ের উৎসাহে ও প্রদর্শিত পথে মধুসূদন বাবু বাঙ্গালা ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় জীববিদ্যামূলক কোনও প্রাথমিক পুস্তক রচিত হইয়াছিল কি না, তাহার সন্ধান লওয়া উচিত।

"নুরজাঁহান রাজ্ঞীর জীবন-চরিত"—ইহাও "অনুবাদক-সমাজ" কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে "তত্ত্ববোধিনী প্রেসে", আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। প্রথম সংস্করণ—মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০। মধুসূদন বাবু ইংরেজী হইতে এই গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত করেন।

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে "বৃহৎ কথা" নামক একখানি পুস্তক সংস্কৃত হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত করেন। ইহা "অনুবাদক-সমাজে"র উদ্যোগে বাহির মিরজাপুর—সুচারু প্রেসে মুদ্রিত হয়।

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সংস্কৃত ভাষা হইতে "বিষ্ণুশর্ম্মকৃত পঞ্চতন্ত্রের শেষ তিন তন্ত্র" "হিতকথাবলী" নামে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত করেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 'বিদ্যারত্ন যন্ত্রে' ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়। "অনুবাদক-সমাজ" ইহার প্রকাশক।

"অদ্ভুত ইতিহাস—তৈমুরলঙ্গ বৃত্তান্ত" নামক একখানি গ্রন্থ পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ইংরেজী হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে "স্কুল বুক সোসাইটী"র ছাপাখানায় ইহা মুদ্রিত হয়। ইহার প্রকাশকও "অনুবাদক-সমাজ।"

"অনুবাদক-সমাজ" সে যুগে যতদূর সম্ভব, ততদূর চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় সদ্গ্রন্থাদির প্রকাশ করিতেন। বাঙ্গালা ভাষার তখন ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুস্তক-রচনার চেষ্টা বড় একটা কেহ করিতেন না। অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিতেছি। কিন্তু তাঁহাদের ভাষা সমাজের সে যুগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও তখনকার যুগ-প্রভাব তাঁহারা কেহই অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাই বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়চন্দ্রের প্রতিভাকেও প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থাদি রচনায় ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। আর তাহা না করিলেও বাঙ্গালা সাহিত্যের আজ এমন উন্নত অবস্থা হইত না। সে যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, "অনুবাদক-সমাজ" সেকালে একরূপ অসাধ্য সাধনই করিতে-ছিলেন। তাঁহাদের কৃতিত্বের কথা অস্বীকার করা চলে না। বিধাতা বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্ত যে বিশাল সৌধ নির্ম্মাণের ইঙ্গিত করিয়াছেন, "অনুবাদক-সমাজ" ও তাঁহার সমকালবর্ত্তী সাহিত্যিকগণ সে সৌধের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

এইবার "অনুবাদক-সমাজে"র একটা 'বিজ্ঞাপন' উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। ইহাতে অনুবাদক সমাজের কার্য্য-প্রণালীর বিষয় অনেক পরিমাণে উপলব্ধি হইবে।

"Vernacular Literature Society.

অনুবাদক-সমাজ

বিজ্ঞাপন

অনুবাদক-সমাজের অধ্যক্ষেরা এই নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে, যে কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে কোন অভিনব গ্রন্থরচনা করিয়া উক্ত সমাজের মনোনীত করিতে পারিবেন, তাঁহাকে ২০০৲ দুইশত টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক। এই নিয়ম একজনের এবং একবারের জন্য নহে, যখন যে ব্যক্তি এই নিয়মানুসারে গ্রন্থরচনা করিবেন, তাঁহাকেই উক্ত ২০০৲ দুইশত টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক।

১ম। পুস্তকখানি সুনীতিসম্পন্ন বা চরিত্রশোধক হইবেক।

২য়। নিম্নলিখিত বিষয়ে বা তদ্রূপ অন্য কোন বিষয়ে লিখিত হইবে।

১ প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত এবং বিজ্ঞানশাস্ত্র।

২ দেশ প্রদেশের বিবরণ ও ভূগোলবৃত্তান্ত।

৩ বাণিজ্য এবং লোকযাত্রাবিধান।

৪ লোকপ্রিয় ও উপকারক বিজ্ঞানশাস্ত্র।

৫ শিল্পবিদ্যা। ৬ শিক্ষাবিধান।

৭ জীবন-চরিত। ৮ নীতিগর্ভ গল্প।

৩য়। বঙ্গভাষার যথার্থ রীত্যনুসারে অথচ সরল ভাষায় গ্রন্থের রচনা হইবেক, বিশেষতঃ ঐ রচনা ও উহার ভাব এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, এতদ্দেশীয় লোকের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

৪র্থ। পুস্তকখানি মুদ্রিত হইলে তাহার পৃষ্ঠার সংখ্যা ১২ পৃষ্ঠা ফরমায় ১০০ একশত পৃষ্ঠার ন্যূন না হয়।

৫ম। যে পুস্তকের নিমিত্ত এই নিয়মানুসারে পুরস্কার প্রদান করা যাইবেক, সেই পুস্তক অনুবাদক-সমাজের সম্পত্তি হইবেক, তাহাতে লেখকের কোন স্বত্ব থাকিবেক না।

৬ষ্ঠ। নূতন লিখিত পুস্তক প্রথমতঃ সমাজের অধ্যক্ষগণের বিবেচনাধীন হইবেক, তাঁহারা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যেরূপ আদেশ করিবেন গ্রন্থকারকে সেইরূপ করিতে হইবেক। কিন্তু সকল গ্রন্থকারেরাই তাঁহাদিগের ইচ্ছামত যন্ত্রালয়ে কেবল প্রথমবার আপন আপন গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিবেন।

৭ম। পুস্তক প্রচারিত হওনাবধি এক বৎসরের মধ্যে ২০০০ দুই সহস্র পুস্তক যদি যথার্থতঃ বিক্রয় হয় তবে সমাজের অধ্যক্ষেরা গ্রন্থকারকে পুনর্ব্বার পুরস্কার প্রদান করিবেন। ঐ পুরস্কার ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার ন্যূন হইবেক না।

ই, বি, কাউয়েল।

বর্ণাকিউলর লিটরেচর সোসাইটির সেক্রেটরি।

"অনুবাদক-সমাজ" যে ভাবে বাঙ্গালা রচনায় লেখকগণকে উৎসাহ দিতেন, আজ বাঙ্গালা ভাষার উন্নত অবস্থায় লেখকেরা তাহা অপেক্ষা অধিক উৎসাহ দূরের কথা—সমান উৎসাহও পান কি ?

দুইটি চিত্র।

[লেখক—শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, বি এ।]

(১)

মহিম বয়ঃস্থ হইয়াই বিবাহ করিয়াছিল। বিবাহকে একটা জৈবিক ধর্ম্ম বলিয়াই সে জানিত—রোম্যান্সের ধার সে ধারিত না।

কলেজে 'ভাল ছেলে' বলিয়া খ্যাতি না থাকিলেও, ক্রিকেট ফুটবল প্রভৃতি খেলায় সে সকলের অগ্রণী ছিল। Sportএ প্রতি বৎসরই প্রথম প্রাইজ কয়টা সে-ই আদায় করিত এবং সেই সূত্রে সাহেব অধ্যাপক ও সতীর্থদের নিকটে বেশ খাতির জমাইয়াছিল।

উপর্য্যুপরি দুইবার বি-এ ফেল করার পর পিতা তাহাকে কলেজ হইতে ছাড়াইয়া আপনার দালালি কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। মহিমের লক্ষ্মী সুপ্রসন্না—সে বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে লাগিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার চালও বাড়িয়া গেল। সে আর "মহিম বাবু" নয়, এখন সে "মিষ্টার বসু"।

কর্ম্মসূত্রে মহিম এটর্ণি কালীপদ মিত্রের সহিত পরিচিত হইল এবং নিত্য গতায়াতে মিত্র-কন্যা বিনোদিনীর সহিতও ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা করিয়া ফেলিল। বিনোদিনী তখন সমাজের 'মহিলা-সমিতি'র অবৈতনিক সম্পাদিকা এবং বেথুনে পড়ে। ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হইতেই উভয়ে উভয়ের পাণিগ্রহণ করিল, এবং বিনোদিনী কলেজ ও সমিতি হইতে অবসর গ্রহণ করিল।

বিবাহের পর-সপ্তাহেই উভয়ে দেশ-ভ্রমণে বাহির হইল। বিনোদিনী ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার বাহিরে বড় একটা যায় নাই—যা-কিছু নূতন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে তাহাতেই তার প্রাণের সুপ্ত কবিত্ব জাগিয়া উঠে, তাহাই তাহার চক্ষে সুন্দর লাগে। কিন্তু সকল সৌন্দর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া একটী মাত্র সুন্দর ছবি—স্বামীর অকলঙ্ক মুখখানি—তাহার চক্ষের সম্মুখে অনুক্ষণ ফুটিয়া থাকিত।

দেশভ্রমণে গিয়া বিনোদিনী কয়েকটা কবিতা লিখিয়া ফেলিয়াছিল। একদিন কথায় কথায় মহিমকে সে সেকথা জানাইল। মহিম হাসিল, কবিতা দেখিতে চাহিল না,—বিনোদিনীও ক্ষুণ্ন হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আর কবিতা দেখাইল না।

কয়েকমাস পরে বিনোদিনী আর একদিন বলিল—"দেখ, আরও কতক-

গুলা কবিতা লিখেছি।" মহিম হাসিয়া বলিল—"তাই নাকি? আচ্ছা, পড়ে শোনাও দেখি?" বিনোদিনী লজ্জা-বাধ স্বরে একটা কবিতা আবৃত্তি করিল। মহিম ভালমন্দ কিছু বলিল না, শুধু হাসিল। বিনোদিনী ক্ষুব্ধা হইল। তার কাছে কবিতাটার মূল্য ছিল—সে যে তা'র নিভৃততম অন্তরের কথা! কিন্তু মহিমের কাছে কবিতাটার বিশিষ্ট অর্থ ছিল না—কোনই অর্থ ছিল না।

ইহার পর হইতে বিনোদিনী আর এ সম্বন্ধে কোন কথা স্বামীকে জানাইত না, তবে কবিতা-রচনা বন্ধ করিল না; ভাল লাগিত তাই লিখিত—ভাবের স্রোতে লিখিয়া যাইত।

বৎসর খানেক পরে বিনোদিনী একদিন স্বামীকে বলিল—"দেখ, আমার গোটা কতক কবিতা 'বঙ্গনারী'তে পাঠিয়েছিলাম। "বঙ্গনারী"র সম্পাদিকা আমার বন্ধু—কাল চিঠি পেয়েছি কবিতা ক'টা তাঁরা ছাপ্‌বেন।"

মহিম কোন উত্তর করিল না। বিনোদিনী বলিল "কবিতা ক'টা নাকি তাঁর ভাল লেগেছে—তিনি আরও কতকগুলা কবিতা চেয়েছেন, তাঁর নিজের ছাপাখানায় ছেপে বই বার কর্‌বেন বলে'—তুমি কি বল? তোমার মত না জেনে তাঁর চিঠির উত্তর দিতে পারিনি।"

মহিম কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। 'কবিতা' জিনিসটাকে চিরদিনই সে বাতুলের প্রলাপ বলিয়া জানিত। হাসিয়া সে বলিল—"তা বেশ।"

তাই স্থির হইল। 'বঙ্গনারী'র সম্পাদিকা পুস্তক ছাপাইবার সমুদয় ভার গ্রহণ করিলেন। বিনোদিনী সাগ্রহে পুস্তক-প্রকাশের প্রতীক্ষায় রহিল। মহিম পরদিনই একথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইল।

দুইমাস পরে "রেণু-কণা" প্রকাশিত হইয়া সাহিত্য-সমাজে একটা আন্দোলনের প্রবাহ তুলিল। প্রবীণ নবীন সকল সমালোচকের জয়মাল্য লইয়া "রেণু-কণা" কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রন্থকর্ত্রী "বিনোদিনী-মিত্রজা"কে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, এবং প্রায় সব মাসিকেই তাহার কবিতা বাহির হইতে লাগিল।

মহিমের কিন্তু সেটা ভাল লাগিল না—স্ত্রীর এই আকস্মিক যশকে সে প্রশংসমান চক্ষে দেখিতে পারিল না। এ যশ যেন তাহার কাছে একটা দুর্ণাম বলিয়া মনে হইল। তার উপর—বন্ধুবান্ধবদের টিট্‌কারি এবং পরিহাস তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। অতঃপর বন্ধু-মহলে "মিষ্টার বসু" "মিঃ মিত্রজা" নামে পরিচিত হইলেন।

মহিম প্রথমটা হাসিয়া উড়াইত, ক্রমে বিরক্ত এবং অবশেষে ক্রুদ্ধ হইল। শেষে একদিন স্ত্রীকে আপন মনোভাব জানাইয়া বলিল—"দেখ, তুমি কাগজে এই সব কবিতা লেখা ছেড়ে দাও,—তা'দের বলে দাও মাসে মাসে যেন এ সব কাগজ আর না পাঠায়,—মোট কথা তাদের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ যেন তোমার না থাকে ;—আমার এ ভাল লাগে না।"

বিনোদিনী শুধু বলিল—"বেশ।" তাহার পর হইতে সে কাগজে কবিতা পাঠান বন্ধ করিল, যে সব কবিতা পাঠাইয়াছিল তাহা ছাপিতে নিষেধ করিয়া দিল, 'বঙ্গনারী'-সম্পাদিকার পত্রের উত্তরে জানাইল "আর একখানা যে কবিতার বই ছাপিতে দিয়াছি তাহা আর ছাপিবেন না। কবি হইবার ধৃষ্টতা আমি সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়াছি। 'বিনোদিনী মিত্রজা' মৃত—আজ হইতে আমি 'বিনোদিনী বসু'!"

* *
*

রমা ধনীর কন্যা। বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিলেও এবং সমাজে পাণিপ্রার্থী যুবকের অভাব না থাকিলেও, এখনও সে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় নাই—কতকটা ঘটনাচক্রে এবং কতকটা খামখেয়ালির বশে।

একমাত্র সন্তান বলিয়া পিতা তাহার শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ব্যয় করিয়াছিলেন। সাধারণ শিক্ষা, সঙ্গীত, চিত্রকলা প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত ছিল। কিন্তু সঙ্গীত অপেক্ষা চিত্রকলার প্রতিই রমা সমধিক অনুরাগিনী ছিল। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া রমা চিত্রকলার উন্নতি এবং পরিপুষ্টিকল্পে যথেষ্ট ব্যয় করিতে লাগিল। হীরালালের সহিত তাহার সেই সূত্রে পরিচয়। পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র যুবক চিত্রশিল্পের উপর নির্ভর করিয়া অনশনে-অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতেছিল। প্রতিভা তাহার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সমজদার কেহ ছিল না,—কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার সহায় কেহ ছিল না। "সন্ধ্যায় গঙ্গাবক্ষে" চিত্র লইয়া সে একদিন রমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। তাহার প্রদর্শনীতে সকলের অব্যাহতগতি ছিল। রমা নিজে নাম কিনিতে না পারুক, চিত্রের সে একজন পাকা সমালোচক ছিল। চিত্রের মৌলিক কল্পনা এবং নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া চিত্রকরের আশাতীত মূল্যে ছবিখানি সে ক্রয় করিল।

শুভমুহূর্ত্তে রমার সহিত হীরালালের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। রমার অনুগ্রহে ক্রমে ক্রমে তাহার প্রতিভা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। শেষে রমা তাহাকে

দিয়া নিজের একটা অয়েল পেন্টিং করাইয়া লইল, এবং বিধির নির্ব্বন্ধে তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিল। ভাল যখন বাসিয়াই ফেলিল, তখন কে আর "পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ ?" সুতরাং একদিন যথারীতি তাহাকে বিবাহও করিল। হীরালালের পিতামাতা উৎফুল্ল হইলেন ; রমার জননী এবং আত্মীয়-স্বজন ক্ষোভে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন।

অবশ্য বিবাহের পর আর হীরালালের অর্থকষ্ট রহিল না। গ্রাম্য বিশেষণটা না দিয়াই বলি—অতঃপর সে শ্বশুর-পরিবারভুক্ত হইল। প্রাসাদতুল্য আবাসে দাস-দাসীর পরিচর্য্যা লাভ করিয়া, প্রতিদিন স্ত্রীর মোটরে চড়িয়া—অতীত-কর্ম্মজীবনের সকল কথা সে দু'দিনে বিস্মৃত হইল। মাঝে মাঝে তাহারা দেশভ্রমণে বাহির হইত—আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে যাইয়া স্ত্রী যখন সেখানকার স্থপতিকার্য্য প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণে ব্যাপৃত থাকিত সে তখন ইজি চেয়ারে বসিয়া চুরুট ফুঁকিত বা থিয়েটার দেখিত। কুষ্টিয়ার ছিটের কামিজ, ঠন্‌ঠনের জুতা, মিলের মোটা কাপড়, বিবাহের পরই অদৃশ্য হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য ; এখন তাহার পরণে মিহি শান্তিপুরে, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, পায়ে বাকৃস্কিনের পাম-সু, হাতে বাহারি ছড়ি। চক্ষুর অসম্পূর্ণতা দূর করিবার জন্য একটা স্বর্ণমণ্ডিত কাচময় আবরণেরও উদ্ভব হইল। সে আর এখন নগণ্য হীরালাল নয়, সে এখন রায়-জামাতা—'জামাই বাবু'। আধুনিক সভ্যতানুযায়ী আপনার কথাও সে একটু 'টান' করিয়া ফেলিল।

বাহ্য-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তঃপ্রকৃতির পরিবর্ত্তনও সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু সেটা ক্রমে ক্রমে—রমাও সে পরিবর্ত্তনটা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু যখন হইতে সে রমাকে তাহার কাছে "বাজার" "দোকান" প্রভৃতি কথা কহিতে নিষেধ করিল, যেদিন সে কোন্ "মহারাজা"র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবে বলিয়া একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রকরের সহিত সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল না, সেইদিন রমার মনে স্বামীর এ পরিবর্ত্তন স্পষ্ট প্রতিভাত হইল। তাহার পর হইতে রমা লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তাহার পরিচিত চিত্রশিল্পীদের প্রতি তাহার স্বামীর ব্যবহার যেন কিছু গর্ব্বিত, অথচ নিজ পরিচিত 'বড়লোক'দের কাছে তিনি কত নম্র, কত ভদ্র!

হীরালাল চিত্রাঙ্কন ত ত্যাগ করিয়া ছিলই—চিত্রকলার আলোচনা-প্রসঙ্গ হইতেও সে দূরে থাকিত। স্ত্রী যখন সে সব কথা বলিত, তখন সে অমুক রাজা অমুক মহারাজার কথা তুলিত ; স্ত্রী যখন কোন চিত্র দেখিয়া উৎফুল্ল

হইত, সে তখন নূতন কোন বড়লোকের সহিত পরিচিত হইবার কল্পনায় তন্ময় হইয়া থাকিত। রমা ক্ষুণ্ণ হইত।

কয়েক বৎসর বিদেশে ঘুরিয়া যখন তাহারা দেশে ফিরিল, রমার মাতা শীর্ণা কন্যাকে দেখিয়া যেমন ক্ষুব্ধ হইলেন, জামাতাকে দেখিয়া ততোধিক উৎফুল্ল হইলেন।—জামাতার সে গ্রাম্যভাব সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়াছে, এখন তাহার পুরাদস্তুর "ভদ্রলোকে"র চাল।

গৃহে ফিরিয়া রমা ঘর ও বাগান সাজাইতে ব্যস্ত হইল। হীরালাল বেয়ারা ও দ্বারবানদের নূতন জাঁকাল পোষাকের ফরমাইস দিল।

হীরালাল প্রতিদিনই কনসার্ট-পার্টি, টি-পার্টি, ডিনার-পার্টি প্রভৃতি দিয়া ময়ূরপুচ্ছধারী বন্ধুবর্গকে লইয়া আসর জাঁকাইয়া বসিল। রমার সেটা ভাল লাগিতে ছিল না। তাই সে একদিন বলিল—"এ সব ত হচ্ছে, কিন্তু তোমার আসল কাজের কি করছ?"

"কোন্ আসল কাজ?"

"চিত্রাঙ্কন,—চিত্র-প্রদর্শনী।"

"পাগল!"

"তুমি কি চিত্রকলার চর্চ্চা একেবারে ছেড়ে দিলে?"

"তা নয় ত কি? তুমি কি বল! যখন দরকার ছিল তখন সে সব করেছি—তখন সেই আমার একমাত্র অবলম্বন, জীবিকা ছিল। এখন আর তা'তে কি দরকার? তার দরকারও নেই, তা'তে আর আমার প্রবৃত্তিও নেই!"

"এই পরিণাম? ছি!"

"রমা! কেন তুমি যখন তখন আমাকে এমন করে অপমান কর? আমার সে অতীত দিনের কথা নিয়ে এমন করে আমাকে খাটো করতে চাও? আমি চাই তোমার চিত্রকলা থেকে দূরে থাকতে; আমি চাই সমাজে প্রবেশ করতে। বুঝেছ? কেন তুমি তা'তে আমাকে বাধা দাও?"

রমা স্তব্ধ, নির্ব্বাক! তাহার বলিবার আর কিছু ছিল না। তাহার স্বর বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল,—চোখ ফাটিয়া জল পড়িবার উপক্রম হইতেছিল।*

* ইংরাজী চিত্র অবলম্বনে।

ভারতের অর্ণবযান।

[লেখক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।]

শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের "Indian Shipping" নামক ইংরেজী গ্রন্থখানি যখন প্রকাশিত হয়, তখন তাহা লইয়া বাঙ্গালার সাহিত্য-সমাজে বেশ একটু আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। মনে আছে, সেই সময় বাঙ্গালার ছোট-বড় প্রায় সকল কাগজেই তাঁহার গ্রন্থের খুব স্তুতিপূর্ণ সমালোচনা বাহির হয়। এমন কি, সেই সমালোচনার সঙ্গে এক-আধখানা কাগজে তাঁহার চেহারাও ছাপা হইয়াছিল। শুধু এইটুকু নহে। শুনিতে পাই, এই বহি লিখিয়া রাধাকুমুদ বাবু নাকি "প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ" বৃত্তি পর্য্যন্ত লাভ করেন!

মৌলিক গবেষণার অবশ্য এমনই মান বটে! বিশেষতঃ, দেশের অতীত ও বিস্মৃতপ্রায় গৌরব-কাহিনী যিনি দেশবাসীর চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া দিতে পারেন, তিনি আমাদের যথার্থই অশেষ ধন্যবাদের ও প্রশংসার পাত্র। রাধাকুমুদ বাবুকে লোকে যে এতটা আদর করিয়াছিল, তাহাও অবশ্য ঐ হিসাবে। তাঁহার "Indian Shipping" গ্রন্থ, তাঁহার অসাধারণ গবেষণার অপূর্ব্ব ফল মনে করিয়াই বাঙ্গালী লেখকেরা তাঁহার শীর্ষে ভাষার পুষ্প-বৃষ্টি করিয়াছিল!

কিন্তু এই প্রশংসার পুষ্প-বৃষ্টি যে আরও একজন বাঙ্গালী লেখকের প্রাপ্য, দুঃখের বিষয়, কোনও লেখকই তাহার উল্লেখ করেন নাই। এমন কি, শ্রদ্ধাস্পদ পাঁচকড়ি বাবুর মতন লেখকও এই পুস্তক সমালোচনার সময় বলিয়াছেন,—"একদিন দুই দিনের অধিকার নহে, একাদিক্রমে দুই তিন সহস্র বর্ষ কাল ভারতের নাবিক এসিয়ার সকল সমুদ্র ও সমুদ্রাঞ্চলে একাধিপত্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার এই আড়াই শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ সুবৃহৎ পুস্তকে ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগের সাহায্যে আমাদিগকে এইটুকু শিখাইয়াছেন। তাঁহার এই পুস্তকখানি বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত হইয়া যদি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে আর কিছু না হউক, বাঙ্গালার আধুনিক হিন্দুগণ বুঝিতে পারিবেন যে, সমুদ্র-যাত্রা, দূরদেশে গমন, বাঙ্গালী তথা সাধারণ হিন্দুর পক্ষে কখনই ধর্ম্মবিরুদ্ধ বা সমাজ বিরুদ্ধ ছিল না।" কিন্তু এ কথাও ঠিক নহে। রাধাকুমুদ বাবুর জন্মগ্রহণ করিবার বহুকাল পূর্ব্বেই বাঙ্গালী এ খবর জানিত। প্রায় ৬৮ বৎসর পূর্ব্বে, একজন বাঙ্গালী লেখকই

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগের সাহায্যে বাঙ্গালীকে শিখাইয়া গিয়াছিলেন যে, ভারতের নাবিক বহু শত বর্ষ ধরিয়া 'এসিয়ার সকল সমুদ্র ও সমুদ্রাঞ্চলে একাধিপত্য করিয়াছেন।' কিন্তু রাধাকুমুদ বাবুর অদৃষ্টের গুণেই হউক, বা পরলোকগত উক্ত লেখকের অদৃষ্ট-দোষেই হউক, বাঙ্গালী পাঠকেরা 'তত্ত্ববোধিনী'র ঐ তথ্যটুকু ভুলিয়া গিয়াছিলেন!

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' দেখিলাম, একজন লেখক 'তত্ত্ববোধিনী'র লেখার উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি শুধু এক সংখ্যায় (তৃতীয়ভাগ, ৭৮ সংখ্যা ১৭৭১ শক) প্রকাশিত প্রবন্ধের নাম করিয়াছেন। কিন্তু এই সংখ্যা ছাড়া, আরও দুই সংখ্যায় ভারতের অর্ণবযান সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম, ১৭৭১ শকাব্দার ৭১ সংখ্যা কাগজে "প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা" নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার পর, ঐ শকাব্দারই ৭৭ ও ৭৮ সংখ্যায়, দুইবার "ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের পূর্ব্বকালীন বাণিজ্য ব্যাপার" নাম দিয়া দুইটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হয়। 'ভারতবর্ষে'র লেখক শুধু শেষোক্ত সংখ্যার লেখারই উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এই লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করিয়া সবটুকুই 'অর্চ্চনা'র পাঠকবর্গকে উপহার দিবার ব্যবস্থা করিলাম। পাঁচকড়ি বাবু রাধাকুমুদ বাবুর গ্রন্থের বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে, রাধাকুমুদ বাবুর বহির বাঙ্গালা তর্জ্জমা আর দরকার করে কি না! তবে রাধাকুমুদ বাবুর কি কিছু প্রশংসা করিবার নাই? আছে বৈকি! দীনেশচন্দ্রের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকের যদি কেহ একটু বাড়াইয়া, কমাইয়া, সামান্য অদল বদল করিয়া, তাহার ভাল ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তিনি যে যশের অধিকারী হন, রাধাকুমুদ বাবুরও সেই যশ প্রাপ্য। 'তত্ত্ববোধিনী'র লেখক পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণের বিচার-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আর্য্যযুগের অর্ণবযানের কথাই ইহাতে সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

একটা বড়ই দুঃখের কথা! রাধাকুমুদ বাবু যাঁহার লেখা হইতে ধার লইয়া এত নাম কিনিলেন, সেই পুণ্যশ্লোক লেখকের নাম আমরা জানিতে পারি নাই। প্রবন্ধের নীচে কাহারও নাম নাই। এই লেখকের নাম আবিষ্কৃত হওয়া একান্ত উচিত। যদি কাহারও তাহা জানা থাকে, আমাদের জানাইলে অনুগৃহীত হইব।

"প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা।

এপ্রকার লোকপ্রবাদ আছে যে হিন্দুরা কোন কালে সমুদ্র পরিভ্রমণ করেন নাই, সুতরাং কদাপি পোত বাহন কর্ম্ম শিক্ষাও করেন নাই; কেবল চিরকাল ভারতবর্ষের আপন আপন জন্মভূমিতে অন্তর্গত থাকিয়া কালযাপন করিতেছেন। একথার প্রামাণ্যার্থে তৎ প্রবাদকেরা কহিয়া থাকেন যে হিন্দু-দিগের শাস্ত্রে তদ্বিষয়ের বিধি নাই। বস্তুতঃ উক্ত প্রবাদ নিতান্ত অমূলক। পূর্ব্বকালে হিন্দুদিগের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এবিষয়েরও যথেষ্ট উন্নতি ছিল, কারণ অতি প্রাচীন বেদাবধি নব্য নব্য কাব্য পর্য্যন্ত সকল গ্রন্থেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ঋগ্বেদ সংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের পঞ্চবিংশ সূক্তে সামুদ্রিক নৌকার উল্লেখ আছে, যথা—

বেদা যোবীনাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাং।
বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ।—৭ঋক্।

যে বরুণ দেবতা খেচর পক্ষিদিগের স্থান জানেন, এবং যিনি সমুদ্রে স্থিতি করিয়া জলগামি নৌকা সকলের স্থান জানেন তিনি আমারদিগের প্রতি অনুগ্রহ করুন।

হিন্দুসন্তানেরা সমুদ্র পোত চালন না করিলে এ ঋচের উদয়ের কারণাভাব হয়, কারণ হিন্দুরা সমুদ্র গমনাগমনের ফল ভোগ না করিয়া তদ্বিষয়ক বাক্যে বরুণের স্তব করিবে ইহা সম্ভব নহে। আর ইহা অনুমানসিদ্ধ বটে, যে যে কালে ঋগ্বেদের প্রকাশ হইয়াছিল তৎকালে বিদেশীয় কোন জাতি এমত সভ্যতা প্রাপ্ত হয় নাই যে সমুদ্র পথ দ্বারা ভারতবর্ষে আগমন করিতে পারে।

মনুসংহিতার অন্তর্গত এই পোতপণ বিষয়ক শ্লোক অনেকেরই বিদিত আছে যথা—

দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথাকালং তরোভবেৎ।
নদীতীরেষু তদ্বিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণং। মনু ৪অ।৪০৬ শ্লোক।

দীর্ঘ পথ অর্থাৎ অধিক দূরে গমন করিলে দেশ কাল বিশেষে পোত মূল্যের যে তারতম্য আছে, তাহা নদীবিষয়ে জানিবে সমুদ্রগমন বিষয়ে তাদৃশ নির্দ্দেশ নাই।

রামায়ণে সমুদ্রগ-বণিকের এবং সামুদ্রিক রত্নের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে *। ঐ সকল বণিক হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতীয় হওয়া সম্ভবে না এবং ঐ রত্নও হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতীয় লোকদ্বারা আনীত হয় নাই। সুশ্রুতাদি

* উদীচ্যাশ্চ প্রতীচ্যাশ্চ দক্ষিণাত্যাশ্চ কেরলাঃ।
কোট্যাঃ পরান্তাঃ সামুদ্রারত্নান্যুপহরন্তুতে।
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমাধ্যায়ে ৫৪৩ শ্লোকঃ।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত প্রমাণানুসারে যে সকল ঔষধ প্রস্তুত হয়, তাহাতে জায়ফল জয়িত্রী দারুচিনি প্রভৃতি নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য সংযোগ করণের বিধি আছে, ইহাতে অনুমান হয় যে এতাদৃশ প্রাচীন কালেও উক্ত দ্রব্য সমুদায়ের গুণ হিন্দুদিগের নিকট বিশেষরূপে প্রকাশিত ছিল, কিন্তু দক্ষিণ সমুদ্রস্থ যাবা, মলাকা, বোর্ণিয়ো প্রভৃতি উপদ্বীপ সমূহে ঐ সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, এবং তাহা আনয়নার্থ তত্তদ্দেশে যাইতে হইলে অবশ্যই সমুদ্রযাত্রা স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং তন্নিমিত্ত সমুদ্র পোতের সম্যক্ ব্যবহার ছিল তাহার সন্দেহ নাই। অপর দুই সহস্র বৎসরের প্রাচীন অভিজ্ঞান শকুন্তলা ধৃত ধন বৃদ্ধিনামা বণিকের আখ্যান, চতুর্দ্দশশত বৎসরাধিক প্রাচীন * হিতোপদেশের কন্দর্প-কেতুর আখ্যান †, আর স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ধৃত কলিযুগে সমুদ্র যাত্রা গমন নিষেধক আদিপুরাণ বচন ‡ কাব্যাদি গ্রন্থোক্ত বণিক্ ও বাণিজ্য দ্রব্য বিবরণ, ও নব্যেতিহাস কথিত চাঁদ সদাগরের ও কবিকঙ্কণোক্ত শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহলাদি উপদ্বীপে গমনাগমনের উপাখ্যান এই সমুদায়ে এ বিষয়ের বিস্তর প্রমাণ আছে।

পরন্তু কেবল হিন্দুশাস্ত্রেই যে এবিষয়ের প্রমাণ আছে এমত নহে। অন্যান্য প্রাচীন সভ্য জাতিদিগের গ্রন্থে তথা দক্ষিণ সমুদ্রস্থ অনেকানেক উপদ্বীপের পুরাবৃত্তে এবিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। পেরিপ্লস আব্ দি ইরিথ্রিয়াণ্ সি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে আরব, গ্রিক্, এবং হিন্দু বণিকেরা শকট্রা উপদ্বীপে যাইয়া বাণিজ্যার্থে বাস করিয়া থাকিত। ক্রফর্ড ও রাফল্স্ সাহেবেরা সমূহ প্রমাণ দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে যাবা উপদ্বীপের প্রাচীন লোকেরা হিন্দু ছিল ; তাহারা সপ্তদশ শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। যাবাতে বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব কালীন তত্রত্য হিন্দুরা ঐ দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তন্নিকটস্থ বালি নামক এক ক্ষুদ্রোপদ্বীপে বসতি করে, এবং অদ্যাপি তথায় আপনারদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক কালযাপন করিতেছে, এই লোকেরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ চতুষ্টয়ে বিভক্ত, এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৪৭ সংখ্যার ৭৬ পৃষ্ঠে দেখিবে।

† অহং সিংহলদ্বীপে ভূপতিজীমূতকেতোঃ পুত্রঃ কন্দর্পকেতুর্নাম। একদা কেলিকাননাবস্থিতেন ময়া পোতে বণিঙ্মুখাৎ শ্রুতং যদত্র সমুদ্রমধ্যে চতুর্দ্দশ্যামাবির্ভূতকল্পতরুতলে রত্নাবলী কিরণকর্ব্বুরপর্য্যঙ্কে স্থিতা সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা লক্ষ্মীরিব বীণাং বাদয়ন্তী কন্যা কাচিৎ দৃশ্যতে।

‡ সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণং ইত্যাদি।

দেবোপাসক। ইহারদিগের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, এবং অদ্যাপি তাহারা সংস্কৃত ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া থাকে। যাবা দ্বীপস্থ হিন্দুরা সপ্তদশ শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ হয়, অতএব তাহারা ঐদেশে তৎকালের পূর্ব্বে গমন করিয়া থাকিবে। যাবা দ্বীপের পূর্ব্বতন লোকেরা অতি অসভ্য এবং পোত নির্ম্মাণে সম্যক্ অক্ষম ছিল, আর চীন জাতীয় জঙ্ক নামক পোত ষট্‌শত বৎসরের পূর্ব্বে যাবা দ্বীপ পর্য্যন্ত আসিতে পারে নাই। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুরা স্বকীয় সমুদ্র পোত বাহন পুরঃসর তথায় গমন করিয়া বসতি করিয়াছিল। বোর্ণিয়ো উপদ্বীপস্থ সরাবকা প্রদেশে এক জাতি বাস করে, তাহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ চতুষ্টয়ে বিভক্ত, এবং যদিও তাহারা এক্ষণে হিন্দু-ধর্ম্ম-বিরোধি নানাপ্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে, তথাপি তাহারা যে যথার্থ হিন্দুসন্তান ইহার সন্দেহ নাই। ক্রিয়র সাহেবের দেশ ভ্রমণের বৃত্তান্তে জাপান দেশপ্রচলিত এরূপ এক উপাখ্যান লিখিত আছে যে অতি পূর্ব্বকালে কতকগুলি সুশীল অসুর ও কতকগুলি দুষ্ট অসুর এক সর্পকে রজ্জু করিয়া ও এক পর্ব্বতকে মন্থান দণ্ড করিয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিল। এই আখ্যান পুরাণোক্ত সমুদ্র মন্থনের আখ্যান হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে যখন যাপান দ্বীপের লোকেরা ভারতবর্ষে আগমন করিতে অশক্ত ছিল, তখন এই আখ্যান তাহাদের দেশে প্রচার হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়। চীন জাতীয় গ্রন্থ সকল এদেশে প্রচার নাই, এবং তদ্দেশীয় বিদ্যা ব্যবসায়ী লোকও এপ্রদেশে দুষ্প্রাপ্য, অতএব চীন শাস্ত্র মধ্যে হিন্দুদিগের বাণিজ্য বিষয়ক যে সকল প্রমাণ আছে তাহা সংগ্রহ করা অতি কঠিন হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুপুরাবৃত্তানুসন্ধায়ি মহাশয়ের এবিষয় অপরিচিত রাখিবেন না, বোধ হয় প্রাচীন হিন্দুদিগের পোত বাহন ক্ষমতা বিষয়ক প্রমাণ অবিলম্বে সমূহ রূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। আশিয়াটিক্ সভার বিজ্ঞবর সম্পাদক শ্রীযুক্ত লেড্‌লি সাহেব ফোকোফি নামক চীন গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে ন্যূনাধিক ১৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে সিফাহিয়ন্ নামা একজন চীন দেশীয় বৌদ্ধ আপন দেশে স্বধর্ম্মের দুরবস্থা দৃষ্টে অতি খিন্নমনা হইয়া তদ্ধর্ম্মের আকর স্থান ভারতবর্ষে তীর্থ পর্য্যটন, তথা ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহ করণার্থে চীন তাতার ও তিব্বতাদি দেশভ্রমণ করিয়া পরে হিমালয় পর্ব্বত বেষ্টন পূর্ব্বক সিন্ধুনদী উৎক্রমণ করিয়া পাঞ্জাব, দিল্লী, মথুরা, প্রয়াগ, বৈসলি, রোহিলখণ্ড, অযোধ্যাদি নানা

বৌদ্ধতীর্থ ভ্রমণ করেন, পরে মগধ হইতে তাম্রলিপ্তি অর্থাৎ তমলুকে দুই বৎসর কাল স্থিতি করিয়া বুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি ও বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহ করেন। এতৎ সময়ে কতকগুলি বণিক্ বৃহৎ বৃহৎ নৌকায় সমুদ্রপথে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করে, তিনিও তাহাদের সহিত যাত্রা করিলেন, এবং চতুর্দ্দশ দিনের পরে সিংহল রাজ্যে উত্তীর্ণ হইলেন। তৎকালে তাম্রলিপ্তি গ্রামের লোকেরা কহিয়াছিল যে এই রাজ্য তাহাদের দেশ হইতে সপ্তশত যোজন * অন্তর। ইহা এক উপদ্বীপোপরি স্থাপিত, এবং ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে পঞ্চাশৎ যোজন † দীর্ঘ এবং ত্রিংশৎ যোজন ‡ উত্তর দক্ষিণে প্রশস্ত। ইহার বাম দক্ষিণে একশত ক্ষুদ্র উপদ্বীপ আছে। এসকল উপদ্বীপ প্রধান উপদ্বীপের অধীন, তথায় নানাবিধ রত্ন ও মুক্তা উৎপন্ন হয়। এই রাজ্যে ফাহিয়ান দুই বৎসর বাস করেন, এবং মিশাসি § প্রোক্ত নয়-গ্রন্থ ও দীর্ঘ আহন্ ¶ ও বহুবিধ আহন্ নামক গ্রন্থও প্রাপ্ত হয়েন। ফান || ভাষায় লিখিত এই সকল গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া তৎসমুদায় সমভিব্যাহারে করিয়া সিংহল দ্বীপ হইতে এক বৃহৎ সমুদ্রপোতে আরোহণ করেন। ঐ পোতে দুইশত মনুষ্যের স্থান হইতে পারিত। কি জানি সমুদ্রে কোন দুর্দ্দৈব ঘটিয়া পোত ভগ্ন হয়, এই বিবেচনায় তাহার পশ্চাতে এক ক্ষুদ্র নৌকা বদ্ধ থাকিত। বায়ু সহকারে এই পোত পূর্ব্বাভিমুখে দুইদিন গমন করিলেক, পরে এক ঝড় উপস্থিত হইয়া তাহাতে জল উঠিতে লাগিল, এবং পোতস্থিত বণিকেরা ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিতে মানস করিলেক, কিন্তু অতিশয় ভারি হইবেক বলিয়া নাবিকেরা তাহার বন্ধন রজ্জু কাটিয়া দিলেক। বণিকেরা ইহাতে অত্যন্ত ভীত হইল, এবং প্রতিক্ষণ পোত জলমগ্ন হইবেক ইত্যাশঙ্কায় পোতস্থ ভারবৎ বস্তু সকল সমুদ্রে নিঃক্ষেপ করিতে লাগিল। ফাহিয়ন নাবিকদিগের সহিত জলসেচন করিতে লাগিলেন, এবং অনাবশ্যক স্বীয় দ্রব্যসকল সমুদ্রে ক্ষেপ করিলেন। কিন্তু কি জানি বণিকেরা তাঁহার গ্রন্থ ও

* ২৭৯০ জ্যোতিষ সম্মত ক্রোশ।

† ২০০ জ্যোতিষ সম্মত ক্রোশ।

‡ ১২০ জ্যোতিষ সম্মত ক্রোশ। ফাহিয়ান সিংহল দ্বীপের পরিমাণ উত্তমরূপে লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে, উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ এবং পূর্ব্ব পশ্চিম প্রস্থ রেখা কর্ত্তব্য ছিল।

§ বৌদ্ধ ঋষিবিশেষ।

¶ সংস্কৃত আগম।

|| পালি।

বৌদ্ধ প্রতিমা সকল পোত হইতে নিঃক্ষেপ করে ইহা ভাবিয়া অতিশঙ্কাতুর হইলেন এবং তদ্বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া ধর্ম্মবেত্তাদিগের * চীনদেশে প্রত্যাগমন নিমিত্ত কোয়ানশিইন দেবের † ভজনা করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন "আমি শাস্ত্র সংগ্রহের নিমিত্তে এই দূরদেশে ভ্রমণ করিয়াছি, অতএব প্রার্থনা দেবতারা এই পোত রক্ষা করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।"

ত্রয়োদশ দিন ও ত্রয়োদশ রাত্রি গতে এই মহাবায়ু নিবৃত্ত হইলে পর তাহারা এক উপদ্বীপের তটে উপনীত হইল। এবং ভাঁটা পড়িলে তাহারা পোতের ছিদ্র অন্বেষণ পূর্ব্বক তাহা রোধ করিয়া পশ্চাৎ ঐ পোত সমুদ্রে নামাইল। তৎসমুদ্রে অনেক বোম্বেটে ছিল, তাহাদিগের হস্তে পড়িলে ত্রাণ পাওয়া দুষ্কর হইত। ঐ সমুদ্র অতি প্রশস্ত; ইহার পূর্ব্ব পশ্চিম ভাগ দুজ্ঞের্য়। যখন রজনী অত্যন্ত তিমিরাবৃত হইল, তখন পোতস্থ ব্যক্তিরা কেবল প্রকাণ্ড জলতরঙ্গের পরস্পর আঘাত ও অগ্নিবৎ বিদ্যুৎ ও কূর্ম্ম কুম্ভীরাদি সামুদ্রিক জন্তু এবং অন্য অন্য অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন ও শ্রবণ করিতে লাগিল। তৎকালে পোত কোন্ স্থানে ভাসিয়া যাইতেছে তাহা না জানিয়া বণিক্‌গণ অত্যন্ত ভীত হইল। এই অতলস্পর্শ সমুদ্রে এমত কোন ভূমি বা প্রস্তরশৃঙ্গও ছিল না যাহাতে তাহারা উত্তীর্ণ হইতে পারে। পরে যখন গগনমণ্ডল মেঘশূন্য হইয়া পরিষ্কৃত হইল, তখন তাহারা পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেক। এবম্প্রকারে তাহারা নবতি দিবসান্তে যাবাদ্বীপে উত্তীর্ণ হইল। এইদেশে বহুতর ধর্ম্মদ্বেষী ও ব্রাহ্মণ ছিল, তথায় ফোর ‡ ব্যবস্থা প্রচলিত হয় নাই ¶। এই রাজ্যে দশমাস বাস করিয়া ফাহিয়ান পুনর্ব্বার দুই শত মনুষ্যের স্থানোপযোগী এক বৃহৎ পোতে কতকগুলি বণিকের সহিত যাত্রা করিলেন। তাহারা পঞ্চাশৎ দিবসের উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী সমভিব্যাহারে লইলেক। চতুর্থ চন্দ্রের § ষোড়শ দিবসে তাহারা যাত্রা করত উত্তর পূর্ব্বে কোয়াঙ্চু ‖ নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

---

* এই শব্দের দ্বারা বোধ হইতেছে যে পোতে ফাহিয়ান ব্যতীত অন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বি লোক ছিল।

† সংস্কৃত নাম অবলোকিতেশ্বর। বৌদ্ধমতানুসারে তিনি জগত্তর সৃষ্টি করেন।

‡ বুদ্ধের চীন দেশীয় নাম।

¶ অর্থাৎ প্রবল হয় নাই, কারণ পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে তথায় বৌদ্ধমত প্রচারের আরম্ভ হয়।

§ অর্থাৎ চীনদেশীয় চান্দ্র বৎসরের চতুর্থ মাসে।

‖ চীনের অন্তঃপাতী নগর বিশেষ। ইংরাজেরা তাহাকে ক্যাণ্টন বলে।

একমাস অতীত হইলে তাহারা আর এক অতি ভয়ানক ঝড় বৃষ্টিতে পতিত হইল। বণিক এবং অন্যান্য যাত্রী সকলেই ভীত হইল। এই কালে ফাহিয়ান এবং হান * দেশীয় অন্যান্য ধর্ম্মবেত্তারা তাহাদের রক্ষা এবং ঐ দৈবোপদ্রব শান্তির নিমিত্ত কুয়ানশিইনের সবিশেষ ভজনা করিতে লাগিলেন। পোতস্থ ব্রাহ্মণেরা একত্রে বিচার করিয়া কহিলেক এই শামনের † সংসর্গ নিমিত্ত আমাদিগের এই দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছে, অতএব এই সমুদ্রস্থ কোন উপদ্বীপের তটে ইহাকে নামাইয়া দিব; কারণ এই একজনের নিমিত্ত সকলের বিপদে পড়া উচিত নহে। ফাহিয়ানের পরম হিতকারী এক ব্যক্তি কহিলেক, যদ্যপি তোমরা এই শামনকে নামাইয়া দেও তবে হানদেশে উত্তীর্ণ হইয়া তত্রস্থ রাজার নিকট আমি তোমাদিগের নামে অভিযোগ করিব। হানদেশের রাজা স্বয়ং বৌদ্ধ মতাবলম্বী এবং ধর্ম্মবেত্তা ও ভিক্ষুকদিগকে বিস্তর সমাদর করেন। ইহাতে বণিকেরা সন্দিগ্ধ হইয়া তাহাকে নামাইয়া দিল না।

আকাশের ঘনাবৃততা প্রযুক্ত নাবিকেরা ভীত হইয়া পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিল। তাহারা সপ্ততি দিবস পর্য্যন্ত সমুদ্রে থাকাতে ভোজ্য পেয় সমুদায় দ্রব্য প্রায় শেষ হইল। তখন তাহারা সমুদ্রের লবণাম্বু দ্বারা পাক করিতে লাগিল। উত্তম জল অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা অংশ করিয়া লইতে লাগিল, ইহাতে প্রত্যেক অংশে দুই শিং ‡ পরিমিত পাইল। এই অবশিষ্ট জলেরও শেষ হয় এমত সময়ে বণিকেরা পরামর্শ করিলেক যে পঞ্চাশৎ দিবসেতে কোয়াঙ্গুতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু বহুদিবস অতীত হইয়াছে, আমাদিগের খাদ্যসামগ্রী শেষ হইয়াছে, অতএব এক্ষণে উত্তর পশ্চিম অভিমুখে ভূমি প্রাপ্তির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ক্রমাগত দ্বাদশ দিবস গত হইলে তাহারা লাও নামক পর্ব্বতের দক্ষিণাংশে উপস্থিত হইল, কিন্তু সেস্থান চীনদেশের অন্তঃপাতী কি না তাহা অনুভব করিতে পারিলেক না। পরে স্থান নির্ণয়ার্থে এক ক্ষুদ্র তরি আরোহণ করিয়া নদীমুখে প্রবেশ করিতে যায়, এমত সময়ে দেখে যে দুইজন ব্যাধ গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে। তখন ফাহিয়ান সকলের সম্মত্যনুসারে তাহারদিগকে অভয় দান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন্

* চীন। পূর্ব্বে হান বংশোদ্ভব রাজারা চীনদেশে রাজত্ব করেন, এ প্রযুক্ত তাহা হান নামে প্রসিদ্ধ হয়।

† সংস্কৃত নাম শ্রমণ। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বিশেষ।

‡ চীনদেশীয় পরিমাণ বিশেষঃ।

জাতীয় মনুষ্য ? ইহাতে তাহারা উত্তর করিল আমরা ফো মতাবলম্বী *। অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা এই পর্ব্বতে কি জন্য আসিয়াছিলা ? তাহারা কপটতা করিয়া উত্তর করিল, কল্য সপ্তম চান্দ্র মাসের পঞ্চদশ দিবস, অতএব কল্যই ফোর মহোৎসব হইবেক, একারণ আমরা ফো দেবের বলি প্রদানার্থ বস্তু বিশেষের অন্বেষণে আসিয়াছিলাম। তদনন্তর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এ রাজ্যের নাম কি ?" তাহারা কহিল "ইহার নাম থ্ সিঙ্গ চিউ †" ইহা লিও বংশাধিকৃত ছাঙ্গ কোএঙ্গ কিউঙ্গ নামক রাজ্যের সীমাবর্ত্তী। বণিক্‌গণ এই কথা শ্রবণ করিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইল, এবং দেশ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বাণিজ্য কার্য্যে মনোযোগী হইল।

এতাবৎ হিন্দু বণিক্‌দিগের বিবরণ এই গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, এবং ইহাতে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইতেছে যে পঞ্চদশ শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরা বৌদ্ধের সহিত একত্রে গমনাগমন করিত এবং একাদিক্রমে তিন মাসের অধিককাল সমুদ্রপোতে স্থিতি করিয়াও তাহারা জাতিভ্রষ্ট বা নিন্দনীয় হইত না। মুশলমানদিগের প্রাদুর্ভাব এবং কাল্পনিক ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা এইক্ষণে ভারতবর্ষের তাদৃশ গৌরব এককালীন উৎসন্ন প্রায় হইয়াছে, এবং অজ্ঞানবশতঃ তাহার পূর্ব্ব মহিমার সত্যতার প্রতিও সন্দেহ জন্মিয়াছে। কিন্তু অজ্ঞানরূপ তিমির কতকাল থাকিতে পারে ? ভারতবর্ষের নূতন জ্ঞান দিবসের উষাকাল মাত্র সম্প্রতি উপস্থিত বোধ হয়, ত্বরায় জ্ঞানস্বরূপ অত্যুজ্জ্বল দিবালোক প্রকাশ পাইবে।

কেরাণী।

[লেখক—শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।]

১

যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র প্রত্যক্ষভাবে বীরদিগের উপরেই পতিত হয় বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ ব্যতীত যুদ্ধের আর একটা দিক আছে, তাহাকে যুদ্ধের পরোক্ষ বা গৌণ দিকে বলা যাইতে পারে। যুদ্ধের এই পরোক্ষ বা গৌণ প্রভাব

* বৌদ্ধ মতাবলম্বী।

† চীনের অন্তঃপাতী নগর বিশেষ।

যত নিরীহ লোকেরই উপর পতিত হয়। সেরূপ একটী চিত্র আমরা 'অর্চ্চনা'র পাঠকপাঠিকার সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম।

কলিকাতায় ব্লাকউড টেলর কোম্পানীর নাম হয়ত অনেকের পরিচিত নহে। ইহারা প্রধানতঃ আমদানী ও রপ্তানীর কার্য্যই করিয়া থাকেন। প্রায় ২০০ শত বাঙ্গালী কেরাণীর 'দানা-পানির কর্ত্তা' ইহারা ছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধের জন্য ইহাদের ব্যবসায়েও মন্দা পড়িয়াছে। ফলে প্রায় অর্দ্ধেক কেরাণীকে ইহারা কর্ম্ম হইতে অপসারিত করিয়াছেন। এখনও পর্য্যন্ত সামান্য অজুহাতে মধ্যে মধ্যে দুই একজন করিয়া কেরাণীর কর্ম্ম যাইতেছে। যুদ্ধের সহিত লেখনী-ধারী কেরাণী-চমূর এমন একটী নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে কে জানিত?

২

"হ্যাঁগা তুমি অমন করে গালে হাত দিয়ে বসে রইলে যে। আফিস থেকে এলে,—হাত মুখ ধোও।" পত্নী হেমনলিনী সদ্যঃ অফিস-প্রত্যাগত স্বামীকে এই কয়েকটী কথা বলিল।

হেমনলিনীর স্বামী ব্লাকউড টেলরের অফিসের কেরাণী। নাম—নিশিকান্ত বসু। আজ নয় বৎসরের উপর এই অফিসে কর্ম্ম করিতেছেন। মাসিক পনের টাকায় অফিসে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন; এখন ৩০৲ টাকা বেতন পান। বলা বাহুল্য, অজীর্ণ রোগকে নিজের দেহে কায়েমী করিয়া, চোখের মাথা খাইয়া'ও মাথার অর্দ্ধেক চুল পাকাইয়া নিশিকান্তকে পনের টাকা হইতে ত্রিশটাকার পদে উন্নীত হইতে হইয়াছিল।

স্ত্রীর অতগুলি কথার উত্তরে নিশিকান্ত একটী ক্ষুদ্র 'হাই' বলিয়া আবার চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

স্ত্রী তখন স্বামীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "পুঁটুর গা যেন আগুন! আজ বিকেল থেকে বাছার জ্বর এসেছে। তুমি শীগ্‌গির ক'রে হাত মুখ ধুয়ে তা'র কাছে একটু বস; আমি তোমার খাবার ঠাঁই করে দেই।"

নিশিকান্ত বলিল,—এইবার পুঁটুর কাছে বস্‌বার মৌরসী পাট্টা পাওয়া যাবে। আফিসের সাহেবেরা যেরূপ আমাদের উপর খাপ্পা হয়েছেন, তা'তে কবে যে কা'র চাকরী যাবে তাই ভেবে আমরা শিউরে উঠ্‌ছি। বল ত হেম আমার যদি চাকরী যায়, তবে তোমাদের খাওয়াব কি করে? এ বাজারে আবার যে চাকরী জুটবে তা'ত মনে হয় না।"

হেম।—এ সব কথা নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে কি হবে? চাকরী যায় যাবে। ভগবানের রাজ্যে কেউ অনাহারে থাক্‌বে না। যিনি জীব দিয়েছেন, তিনিই আহার দেবেন।

নিশিকান্ত।—কথা সত্যি বটে! কিন্তু আজ যে সামান্য দোষে সতীশ মজুমদারের চাকরী গেল, তেমন দোষ ত কেরাণীদের হ'য়েই থাকে। সতীশ দু' মিনিট দেরী ক'রে এসেছিল ব'লে সাহেব তা'কে জবাব দিলেন। সতীশ যাবার সময় ব'লে গেল,—"আমার এক সেকেণ্ডও দেরী হয়নি, আফিসের ঘড়ি 'ফাষ্ট' ছিল।"

হেম।—আহা! তা' তিনি এখন কি কর্‌বেন?

নিশিকান্ত।—সতীশ আমায় বল্লে,—সে দেশে গিয়ে চাষ বাস কর্‌বে। আমার ত সে গুড়েও বালি! দেশ নেই, জমি নেই,—সেভিং ব্যাঙ্কের খাতায় ৮০৸৶০ আমার ভরসা। এ ক'টা টাকায় তোমাদের ক'দিন চল্‌বে?

হেম।—তোমার ত এখনও চাকুরী যায় নি, এরই মধ্যেই এত ভাবনা কেন?

হাত-মুখ ধুইয়া নিশিকান্ত বিছানায় গিয়া পুঁটুর কাছে বসিল। পুঁটুর গায়ে হাত দিয়া সে চমকিয়া উঠিল; তাহার হাত যেন পুড়িয়া গেল!

নিশিকান্ত পুঁটুর গায়ে বেশ করিয়া গরম কাপড়-চোপড় ঢাকা দিয়া দিল। তার পর স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"আজ রাত্তির হয়ে গেছে, কাল পুঁটুকে ডাক্তারের বাড়ী নিয়ে যাব।"

৩

নিশিকান্ত মাসিক আট টাকা ভাড়ায় সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে এক দ্বিতল বাড়ীর তলায় দুই কামরা ঘর ভাড়া লইয়াছিল। ইহার একটী শয়ন ঘর, এবং অপরটীতে জিনিষপত্র রাখা হইত। দুইখানি ঘরই অন্ধকার—দিনের বেলাতেও সেখানে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিত না। ঘর দুইটীতে একটীও জানালা ছিল না। তাহার উপর ঘর দুইটী খুব স্যাঁতসেতে ছিল। বাধ্য হইয়াই নিশিকান্তকে এই অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিতে হইত। কারণ—নিশিকান্ত যে কেরাণী—ত্রিশ টাকার কেরাণী। চাকুরীর পেষণে, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবে কেরাণীদের মৃত্যু এমনই তিল তিল করিয়া হইয়া থাকে। নিশিকান্তও সপরিবারে এমনই ধীরে ধীরে মরণের পথে অগ্রসর হইতেছিল।

এই স্যাঁতসেতে ঘরের মেঝেতে একটী ছিন্ন আসনে বসিয়া নিশিকান্ত ভাত

খাইতে বলিল। পত্নী হেমনলিনী ইতিপূর্ব্বে ভাত 'বাড়িয়া' রাখিয়াছিল। এখন স্বামীর নিকটে বসিয়া পান সাজিতে লাগিল। নিশিকান্ত বলিল—"অভাবের সময়েই যত বিপদ আসে। এখনও মাসকাবারের ৮।৯ দিন বাকী। পুঁটুর জ্বর হ'ল। হাতে এমন একটী পয়সা নেই যে, ওষুধপত্র কিনি। ডাক্তারের বাড়ী নিয়ে গেলে পয়সা লাগ্‌বে না, কিন্তু ওষুধের দাম ত চাই—সে ত আর অমনি কেউ দেবে না।"

হেম।—ছ'মাস ধরে সেই যে 'উলের' গলাবঁধ বুনেছিলুম, যার জন্যে তুমি আমাকে বক্‌তে—তার দরুণ আমার কাছে ৩৲ টাকা আছে। এই টাকা দিয়ে তুমি আপাততঃ পুঁটুকে ডাক্তার দেখাও।

নিশিকান্ত আর কথা কহিতে পারিল না। সাধ্বী পত্নী নিজের দেহপাত করিয়াও স্বামীর দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে, একথা মনে হইতেই তাহার গলার স্বর বন্ধ হইল, নয়ন প্রান্তে অশ্রু দেখা দিল। নিশিকান্ত কেবল অনুচ্চস্বরে বলিল,—'তাই হ'বে।'

৪

সারারাত্রি পুঁটু পিপাসায় জল জল করিয়াছে। সকালে উঠিয়াই নিশিকান্ত পুঁটুকে ডাক্তার-বাড়ী লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। বেলা সাড়ে আটটার সময়ে ডাক্তার উপস্থিত রোগীদিগকে দেখেন। নিশিকান্ত সেই সময়ে ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়া বসিয়া রহিল। পুঁটু তাহার কোলেই ছিল। ডাক্তার এ:ক এ:ক রোগী দেখিয়া যখন পুঁটুর হাত দেখিলেন, তখন বেলা সাড়ে নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। তিনি নিশিকান্তকে বলিলেন,—"একে কোলে করে এনেছেন কেন, নড়াচড়া করান ভাল হয় নাই। জ্বরটা বাঁকা। এখনি এই ঔষধটী খাওয়ান গে। দু'পুর বেলা কেমন থাকে, খবর দেবেন। বোধ হয় দেখ্‌তে যেতে হ'বে।"

নিশিকান্ত ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করিয়া কম্পাউণ্ডারের নিকট ঔষধ লইতে গেলেন। কাছেই পাল্কীর আড্ডা ছিল, সেখান থেকে একটা পাল্কী ডাকিয়া উহার মধ্যে খুকীকে শোয়াইয়া দিলেন। তার পর ঔষধ লইয়া বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন।

পুঁটুকে বিছানায় শোয়াইতে শোয়াইতে নিশিকান্ত পত্নীকে বলিলেন,—"দেখ ডাক্তার বলেছেন জ্বরটা বাঁকা। বগল ও কুঁচ্‌কি যেরূপ লাল হয়ে উঠেছে, তা'তে প্লেগ ব'লেই তাঁর সন্দেহ হয়েছে। আমি এখনই আফিসে

গিয়ে ছুটি নিয়ে আস্‌ছি। দু'পুর বেলা ডাক্তার আন্‌তে হ'বে। তুমি সাবধানে থেকো।"

নিশিকান্ত জলস্পর্শ না করিয়াই অফিসের দিকে ছুটিল। অফিসে যখন পঁহুছিল, তখন সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। সাহেব অফিসে ছিল না। নিশিকান্ত সহকর্ম্মী কেরাণীদিগকে আপনার অবস্থা জানাইল এবং বলিল,—"বাড়ীতে সংক্রামক রোগী, কেমন ক'রে অফিসে বসে কাজ করি? আমি আপিসের বাইরে গিয়ে বসে থাকিগে। তোমরা সাহেবের কাছ থেকে ছুটি মঞ্জুর করে দিও। আমি একখানা দরখাস্ত এই অবসরে লিখে দিয়ে যাচ্ছি।"

নিশিকান্ত অফিসের বাহিরে দারোয়ানের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মেয়ের অসুখ জানাইয়া এক আনা সুদে দরোয়ানের কাছে পনেরটী টাকা ধার করিল। তার পর দরখাস্ত লিখিয়া অফিসের ভিতর পাঠাইয়া দিল। কারণ, সংক্রামক রোগ যে কেরাণীর বাড়ীতে হইবে, অফিসের মধ্যে সে প্রবেশ করিতে পাইবে না—সাহেবের এইরূপ আদেশ ছিল। প্রথমবার গোপনে নিশিকান্ত অফিসে ঢুকিয়াছিল। সাহেব জানিলে তাহার যে কি কঠোর দণ্ড হইত, নিশিকান্ত তাহা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল।

নিশিকান্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। সাহেব আর ফিরেন না। সে বেলা একটার সময়ে অফিস হইতে বাহির হইল। বাড়ীতে না ফিরিয়া সে বরাবর ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে গেল। ডাক্তারবাবু তখনই অন্য একটী 'কলে' যাইতেছিলেন, নিশিকান্ত তাঁহাকে অনুনয় করিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিল।

ডাক্তারকে লইয়া নিশিকান্ত যখন ঘরে ঢুকিল, তখন পুঁটুর চোখ কপালে উঠিয়াছে। তাহার তখন অন্তিম অবস্থা। ডাক্তার তাহার জন্য শেষ ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন এবং বলিলেন,—'কাল রাত্তিরে আমাকে ডেকে আন্‌লে ভাল করতেন।'

৫

সেই দিনই রাত্রি আটটার সময় পুঁটুর মৃত্যু হইল। তার পর দিন বেলা দশটার সময়ে সদ্যঃ শ্মশান-প্রত্যাগত নিশিকান্ত যখন শুষ্কমুখে ও উদাসনেত্রে অফিসে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সাহেব তাহাকে ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন,—'তুমি এখনই অফিস থেকে বেরিয়ে যাও। যে কর্ম্মচারী আমার আদেশ মানে না, তা'কে আমি আফিসে রাখ্‌ব না।'

নিশিকান্ত বলিল,—"সাহেব, আমি পনের বছর এই অফিসে কর্ম্ম করছি, কোনও কসুর কখনও করিনি। কাল রাত্তিরে আমার মেয়েটী মারা গেছে। আমার রুটী মারবেন না।"

সাহেব নিশিকান্তের কথা কানে না তুলিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে "ক্যাসিয়ার" বাবুকে হুকুম করিলেন,—"এই মাসের মাইনে বাবুকে দিয়ে দাও। আরও এক মাসের মাইনে ক্ষতিপূরণের জন্যে দিয়ে এখনই একে বিদেয় কর। আমি কোনও কথা শুনতে চাইনে।"

নিশিকান্ত দরোয়ানের ১৫৸৴৹ পরিশোধ করিয়া হতাশভাবে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। পত্নী হেমনলিনী তখনও গৃহপ্রাঙ্গণে নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছিল।

সহযোগী সাহিত্য।

[লেখক—শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।]

নানকের বাণী।

ইতিপূর্ব্বে 'অর্চ্চনা'য় বলিয়াছিলাম, গুরু নানকের বাণী আরও শুনাইব। এবার সেই প্রতিশ্রুতি রাখিবার চেষ্টা করিতেছি।

গুরু নানক জন্মান্তর-বাদী ছিলেন। তিনি জন্মান্তরে বিশ্বাস করিতেন। অন্যান্য শিখ-গুরুগণও জন্মান্তর-বাদী ছিলেন। গুরু নানকের মতে,—এক জন্ম যাইতেছে, আবার জন্ম হইতেছে। সেই সঙ্গে পুরাতন জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া আত্মা নূতন দেহ আশ্রয় করিতেছে। আত্মার এই নব নব দেহে ভ্রমণ সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতেই চলিতেছে। যতদিন কর্ম্ম আছে, কর্ম্মের বন্ধন ঘুচিতেছে না, ততদিন আত্মাকে পুনঃ পুনঃ 'খোলস' ছাড়িতে অর্থাৎ নূতন নূতন দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

নানক বলেন,—মনুষ্যদেহ ধারণ করিবার পূর্ব্বে আত্মাকে '৮৪ লক্ষ যোনি' ভ্রমণ করিতে হয়। তাই মনুষ্য-জন্ম সার্থক জন্ম। আত্মার সদ্গতি ও উন্নতি এই মানব-জন্ম হইতেই হইয়া থাকে। মনুষ্য-জীবনে কর্ম্মের গুণ অনুসারে আত্মার গতি ও উন্নতি নির্দ্দিষ্ট হয়।

আত্মার পরিচয়-সম্বন্ধে গুরু নানকের বাণী এই :—

(১) বায়ুকে যেমন মুঠা করিয়া ধরা যায় না, আত্মাও তেমনই।

(২) আত্মা দৃষ্টির অতীত, ধৃতির অতীত ; আবার দৃশ্যমান হইয়াও অদৃশ্য থাকে।

(৩) আত্মা ভাঙ্গিতেও পারে, গড়িতেও পারে ; তবে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর এই ভাঙ্গা-গড়া নির্ভর করে।

(৪) স্বীয় কর্ম্মের গুণে বা দোষে আত্মার ক্ষতি ও লাভ হয়।

গুরু নানকের মতে আত্মা অবিনশ্বর।

সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্বন্ধেও নানকের উক্তি আছে; তাহা এই :—

(ক) সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ভগবানই বিদ্যমান ছিলেন; তাঁহারই' ইচ্ছায় এই জগতের সৃষ্টি।

(খ) সৃষ্টির ইচ্ছা তাঁহার অন্তরে উদিত হইবামাত্র তিনি চারিজন দেবতা সৃজন করেন। বায়ু, বরুণ, অগ্নি প্রথমে সৃষ্ট হয়; তার পর ক্ষিতি-দেবতাকেও সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের দলপুষ্ট করেন।

(গ) পঞ্চম দেবতা—ব্যোমেরও সৃষ্টি তিনি পরে করেন।

(ঘ) এই পঞ্চদেবতাই প্রত্যক্ষ।

(ঙ) ষষ্ঠ দেবতা সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং; তিনি সৃষ্টি হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন ও প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন;

আত্মার পরিচয় স্বরূপ নানকের আরও অনেক বাণী আছে; আমরা নিম্নে সেগুলি প্রদান করিতেছি :—

(১) বায়ুর আকার নাই; রূপ নাই; আত্মাও নিরাকার।

(২) অগ্নি জগদীশ্বরের আলোক; ইহার অন্ত নাই, সীমা নাই।

(৩) প্রাসাদে প্রদীপ জ্বালাইলে সমস্ত প্রাসাদই আলোকিত হয়; কিন্তু একটী ক্ষুদ্র ও অল্পপরিসর মৃৎপাত্রমধ্যে প্রদীপ জ্বালিলে তাহার আলোকও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে।

(৪) ক্ষিতি ও অপের সমাহারে অসংখ্য দেহের সৃষ্টি হইয়াছে।

(৫) লক্ষ লক্ষ দার্শনিকের জ্ঞান একত্র করিলেও তাহা ভগবানের জ্ঞানের সমকক্ষ হইতে পারে না।

(৬) ভগবানই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক; তিনি ৮৪ লক্ষ জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা।

(৭) প্রত্যেক জাতীয় জীবের মধ্যে আবার বহুপ্রকার শ্রেণিভেদ আছে।

(৮) আকাশ হইতে ব্যোমের উদ্ভব হয় এবং আত্মা শব্দ সৃষ্টি করে।

(৯) জগদীশ্বরের স্বভাব বা প্রকৃতির সহিত আত্মার মিলন হইলে সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(১০) আত্মার উপাদান কি? আত্মা স্বয়ং ভগবান।

[জগৎ-সৃষ্টিরূপ মহানাটকের অভিনয় অর্থাৎ সংসারে কর্ম্ম করিবার জন্ত আত্মা মায়াচ্ছ আবৃত হয়। তখন সে তাহার স্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং সে যে ভগবানেরই অংশ তাহা ভুলিয়া যায়।"

(১১) দেহ দুই প্রকার, স্থূল ও সূক্ষ্ম; প্রথমটী প্রত্যক্ষ, শেষোক্তটী অদৃশ্য; স্থূল দেহই মিথ্যা এবং সূক্ষ্ম দেহই সত্য। জগদীশ্বরই এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(১২) এই জগতে জন্ম ও মৃত্যুর জন্ত স্থূল দেহের প্রয়োজন।

(১৩) দেহের সহিত আত্মার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ; একের অভাবে অন্তের অস্তিত্ব থাকে না।

(১৪) দেহ ব্যতীত আত্মা নাই; আত্মা ব্যতীত দেহও নাই।

(১৫) যখন এ জগতের কার্য্যকলাপের হিসাব-নিকাশ হয়, তখন দেহ ও আত্মা দুইজনকেই কাঁদিতে দেখা যায়।

(১৬) যখন দেহের শাস্তি হয়, তখন আত্মা যাতনায় ক্রন্দন করে।

নানক বলেন—"সমগ্র জীবজগৎ—মানব-সমাজ জন্মান্তর-বিধির অধীন। আত্মা নিয়ত 'আসা-যাওয়া' করিতেছে। এই 'আসা-যাওয়া'র হাত থেকে সাধারণ জীবের পরিত্রাণ নাই।"

(১৭) জন্মিলেই মরিতে হইবে।

(১৮) মৃত্যুর পর আত্মা ঊর্দ্ধলোকে গিয়া পুনরায় নিম্নলোকে ফিরিয়া আসে এবং ক্ষিতির সহিত মিশিয়া উদ্ভিদ্-জন্ম পরিগ্রহ করে।

(১৯) উদ্ভিদের বীজ হইতে আবার অপর উদ্ভিদ জন্মে; তাহারা আবার মরে, আবার বাঁচে। এই জন্ম-মৃত্যু-ক্রিয়া নদীর জোয়ার-ভাঁটার ন্যায় অনবরতই চলিতেছে।

(২০) বেদে-পুরাণে এ রহস্যের কথা লেখা নাই; কেবল মুক্ত পুরুষেরাই এই রহস্যের বিষয় বুঝাইতে পারেন।

(২১) পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন হইতেই জীব-সৃষ্টি হয়।

(২২) সৃষ্টি হইলেই বিনাশ, জন্ম হইলেই মৃত্যু এবং মৃত্যু হইলেই পুনর্জন্ম।

(২৩) মৃত্যুর পরে মানুষের একরূপ যায়; জন্মান্তরে সে অন্য রূপে, অন্য বেশে জগতে আবির্ভূত হয়।

(২৪) মানুষকে পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, ভগিনী—এইরূপ কোনও না কোনও আখ্যায় আহ্বান করা হয়। এ সকল মিথ্যা ও মায়ার সম্পর্ক। তাহারা যতদিন দেহধারণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে, ততদিন তাহারা সকলের প্রত্যক্ষ; মরিলেই তাহারা অদৃশ্য। [নানক বলিতেছেন,—এ সকলই মিথ্যা ও শেষে একদিন সকলেই জানিবে,—ইহা জগন্মায়া।]

(২৫) আত্মার শ্রেষ্ঠ আধার—মানবদেহ। ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া, ক্রমিক উন্নতি লাভ করিয়া সে এই সার্থক নরজন্ম ধারণ করে। এই জীবনেও সে যদি আত্মোন্নতির চেষ্টা না করে ও অসৎকর্ম্মে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে পুনরায় মানবেতর যোনিতে ভ্রমণ করিতে হয়।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ।—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

বাক্যবীর-বহুল বাঙ্গালাদেশে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ একজন কর্ম্মবীর—কীর্ত্তিমান পুরুষ। তাঁহার কথা উঠিলেই গিরিশচন্দ্র বলিতেন,—"ঊনত্রিংশ বৎসর বয়সের মধ্যে ৺কালীপ্রসন্ন যে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তেমন কাজ অত অল্প বয়সের মধ্যে আর কোনও আধুনিক বাঙ্গালী পারেন নাই। তাঁহার হৃদয়বত্তা ও মনীষা এ দুয়ের সাহায্য না পাইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে কি ক্ষতি হইত, তাহা বলা যায় না। মাইকেল ও দীনবন্ধুর প্রতিভা-উদ্দীপনে তিনি উৎসাহের বাতাস দিয়াছিলেন! যে ছন্দে আমি নাটক লিখি, যাহাকে তোমরা 'গৈরিশছন্দ' বল, তাহার জন্যও আমি কালীপ্রসন্নের নিকট ঋণী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেশের এমন একটা মানুষের কথা কাহাকেও কখন বলিতে শুনি না।"—গিরিশচন্দ্র যদি আজ জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থখানির প্রকাশ-সংবাদে নিশ্চয়ই সুখী হইতেন।—কালীপ্রসন্নের এ কীর্ত্তি-কীর্ত্তন অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন।

এখন কথা হইতেছে, শুধু কীর্ত্তি-কীর্ত্তনকেই কি ঠিক জীবন-চরিত বলা চলে? শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলিতেছেন,—"কীর্ত্তিই জীবন। মহাপুরুষগণের কীর্ত্তি-কীর্ত্তনই তাঁহাদের প্রকৃত জীবনী।"—এ বিবৃতি গ্রাহ্য করিলে এ গ্রন্থকে জীবন-চরিত বলিলেও বলা যায়। কিন্তু মনীষী স্যর সিড্‌নে লী জীবন চরিতের আর একটু অন্তরঙ্গ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"Character and exploit jointly constitute biographic personality. চরিত্র এবং কীর্ত্তি, এই দুইটিই চরিত-আখ্যানের মূল উপাদান। 'যে চরিতে বিশিষ্টতা নাই, যাহা সমাজের উপর একটা ছাপ দিয়া যাইতে না পারে, তাহা আখ্যানযোগ্য নহে। যে পুরুষ কীর্ত্তিমান নহেন, যাঁহার যশ স্থায়ী হইবে না, তাঁহার চরিতও আখ্যানযোগ্য নহে। যিনি কীর্ত্তিমান্ ও চরিত্রবান্ পুরুষের জীবনচরিত লিখিবেন, তাঁহার লিখন-ভঙ্গী ও শব্দ চয়ন সামর্থ্য এমন হইবে যে, গ্রন্থ পড়িবার সময় মনে হইবে যে, উৎকৃষ্ট উপন্যাস পড়িতেছি। যেমন যোগ্য বিষয় হওয়া চাই, তেমনই তদুপযুক্ত লিখনভঙ্গী হওয়া চাই, তবে চরিত-আখ্যান ভাষায় ও সাহিত্যে স্থায়ী স্থান অধিকার করিতে পারে।'—এই মতানুযায়ী এ গ্রন্থের বিচার করিতে হইলে বলিতে হয় গ্রন্থখানি 'জীবন-চরিত' নামের আদৌ যোগ্য হয় নাই। কালীপ্রসন্নের জীবন যে আখ্যানযোগ্য, সে কথা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে যে কি বিশিষ্টতা ছিল, এ গ্রন্থ পাঠে তাহা জানা যায় না। ভণ্ডের শত্রু, দুর্ব্বলের সহায়, গুণীর গোলাম বলিয়া কালীপ্রসন্নের যে ছবি বাঙ্গালী হৃদয়-পটে আঁকিয়া রাখিয়াছে, সে ছবিত ইহাতে নাই-ই; তা' ছাড়া, কোনও ছবিই ইহাতে পাওয়া যায় না। থাকিবার মধ্যে আছে কেবল কতকগুলা কাজের তালিকা ও প্রশংসা-পত্র; এবং সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে লেখকের উচ্ছ্বাস। অতএব, এ বহির যে বিশেষ আদর হইবে, এমন মনে হয় না। ভূদেবের জীবন-চরিতে, কৃষ্ণদাসের জীবন-চরিতে, এই মনীষীদ্বয়ের কীর্ত্তি ও চরিত্র এ দুয়েরই পরিচয় দিবার চেষ্টা আছে, শুধু লিখন-ভঙ্গীর দোষে, শব্দ চয়ন-সামর্থ্যের অভাবে ঐ গ্রন্থ দুইখানি বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া গেল। এমন অবস্থায় এ গ্রন্থ কি টিকিতে পারিবে?

ভণ্ড বামুনদের টিকি কাটিতেন বলিয়া কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে যে একটা কথা চলিত আছে, লেখক তাহা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, ঐ কথায় কিন্তু 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'-রচয়িতা'র চরিত্র পরিস্ফুট করে। এমন অনেক ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা অতি সামান্য হইলেও, 'তাহার সমাবেশে জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব দেদীপ্যমান হয়, চরিত্র পরিস্ফুট হয়, এক কথায় তদ্দ্বারা জীবনীতে জীবনী শক্তি স্বতঃ সঞ্চারিত হয়;—আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য যে, আমাদের আলোচ্য এই জীবনী গ্রন্থে তাহার একান্ত অভাব।'

'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' কালীপ্রসন্নের এক শ্রেষ্ঠ দান। লেখক গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন,—"হুতোমের জ্যাঠামোগুলি পরিবর্জ্জন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতেই কালীপ্রসন্নের বাল্য-জীবনের রুচি, আকাঙ্ক্ষা ও আশার কথা স্পষ্টভাবে শ্রবণ করুন।" কিন্তু 'হুতোমে'র রসিকতা কি জ্যাঠামি? যে রসিকতার তীক্ষ্ণ অস্ত্রে কত ভণ্ডের ভণ্ড-জীবন শেষ হইয়াছে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র যে রসিকতার সহিত টেকচাঁদের রসিকতার সাদৃশ্য নির্ণয় করিয়াছেন, সেই রসিকতা জ্যাঠামি? সত্য বলিতে কি, ঐ লাইনটি পড়িবার সময় মনে হইয়াছিল যে, যিনি কালীপ্রসন্নের লেখা বুঝেন নাই, যিনি কালীপ্রসন্নকে সম্যক্ চিনিতে পারেন নাই, তিনি কোন্ সাহসে এ কাজে হস্তক্ষেপ করিলেন?

তারপর ভূমিকার কথা। 'ভূমিকা' লিখিয়াছেন,—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। ২৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'ভূমিকা'য় অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে, স্বীকার করি; কিন্তু অনেকস্থলেই তাহা 'ধান ভানিতে শিবের গীত হইয়াছে'।—কালীপ্রসন্নের জীবনীর সঙ্গে তাহার উপযোগিতা কি, বুঝিলাম না। তবে এ পুস্তক সম্বন্ধে একটা কথা বলা যায়। বাঙ্গালায় একটা কথা চলিত আছে, 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল'। এই হিসাবে এ গ্রন্থের আদর করিতে পারি। অনেক সমসাময়িক সংবাদ পত্রাদি হইতে লেখক ইহাতে কালীপ্রসন্নের প্রকৃত জীবনী লিখিবার অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। কোনও পাকা লেখক সেগুলির সদ্ব্যবহার করিলে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের উৎকৃষ্ট জীবন-চরিত রচিত হইতে পারে।

হিন্দুর দেবতত্ত্ব।

অর্দ্ধলক্ষ্মী হরি।

[লেখক—শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।]

দেব-প্রতিমায় এক শরীরে স্ত্রীপুরুষাবয়বের সমাবেশ বড়ই কুতূহলোদ্দীপক। ইহাতে দাম্পত্যের সাফল্য, আশ্লেষবাসনার পরিসমাপ্তি ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা সর্ব্বতোভাবে প্রকটিত হয়। প্রেমতরঙ্গে প্লবমান মানব-দম্পতিও এক হইয়া যাইতে অভিলাষ করে, কিন্তু তাহাদের সেই অভিলাষ সফল হইয়া উঠে না। কারণ ভগবান্ মানব প্রভৃতি প্রাণিবর্গকে এমতভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহারা প্রবল বাসনা সত্ত্বেও অনেক বিষয়ে সফলমনোরথ হইতে পারে না। নরদেহধারী ভগবান্ও মানব-রীতির অতিক্রম করিতে পারেন না; সুতরাং মানব-পদ্ধতির অনুবর্ত্তী হইয়াই লীলা-বিলাস সম্পাদন করেন। পরন্তু মানবরূপে তিনিও বিরহদুঃখে কাতর হইয়া মনের আবেগে বিলাপ করেন। তাঁহার মানসিক অবস্থা ও প্রেমের পদ্ধতি কবির কথায় অনেকস্থলে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সীতা-বিরহে কাতর হইয়া ভগবান্ রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়াবিশ্লেষ ভীরুণা।
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎ সাগর ভূধরাঃ॥

আমি বিশ্লেষভয়ে অর্থাৎ ব্যবধানভয়ে ভীত হইয়া কণ্ঠে হার নিহিত করি নাই; কারণ কণ্ঠে হার থাকিলে সম্পূর্ণরূপে মিলনের ব্যাঘাত হইতে পারিত; কিন্তু দৈব বশতঃ এখন আমাদের মধ্যে নদী সমুদ্র পর্ব্বত ব্যবধায়ক হইয়া অবস্থান করিতেছে।

ভগবান্ রাম আগন্তুক ক্ষণিকমিলনব্যাঘাতভয়ে হার পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া মানব-প্রেমের প্রকটভাব প্রকাশিত করিয়াছেন। দেবশক্তি মানবশক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী, মানুষ মানুষ, দেবতা দেবতা।

শ্রুতি বলিয়াছেন, মানবের সুখাপেক্ষা গন্ধর্ব্বাদির সুখ দশগুণ অধিক, তদপেক্ষা কর্ম্মদেবদিগের সুখ দশগুণ অধিক।॰ তাহাদের সুখের তুলনায় আজানদেবদিগের আনন্দ দশগুণ অধিক। যাঁহারা কর্ম্মের দ্বারা দেবত্ব লাভ